সংস্কৃতি বিষয়ক

যোগসূত্র

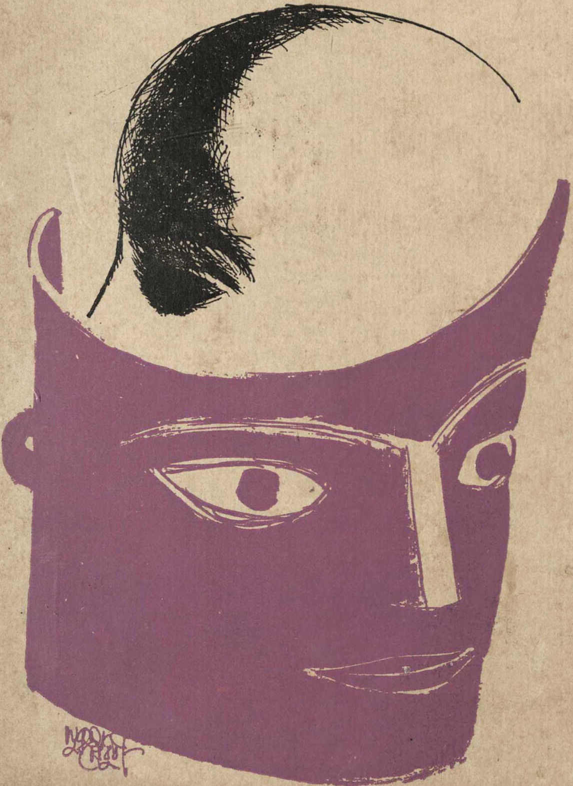

তারপর ঘাসের জঙ্গলে প'ড়ে আছে তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি। এবং
আকাশ আজ দেবতার ছেলেমেয়েদের নীল সার্ট-পাজামার মতো বাস্তবিক।
একা ময়ূর ঘুরছে খালি দোতলায়। ঐ ঘরে সজল থাকত।
সজলের বউ আর মেয়েটি থাকত। ওরা ধানকল পার হয়ে চ'লে গেছে।
এবার বসন্ত আসছে সম্ভাবনাহীন পাহাড়ে জঙ্গলে এবার বসন্ত আসছে
প্রতিশ্রুতিহীন নদীর খাঁড়ির ভিতরে নেমে তু'জন মানুষ তামা ও অভ্র খুঁজছে।
তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি হারিয়েছে বাদাম পাহাড়ে।
আমার ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা আমি হারিয়েছি বাদাম পাহাড়ে।

সংস্কৃতি বিষয়ক

যোগসূত্র

অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৪

সম্পাদক	:	বিনয় ঘোষ
কার্যকরী সম্পাদক	:	সঞ্জয় চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	:	কল্যাণ ভট্টাচার্য, অসীম রক্ষিত, মানস বসু, শ্যামলী সুর
ব্যবস্থাপক	:	প্রশান্ত পাল
বিজ্ঞাপন	:	মধুছন্দা সিন্‌হা
প্রচার	:	সোমা মুখোপাধ্যায়
পরিচালক মণ্ডলী	:	সুমিত বসু, অলোকসুন্দর বসু, তপন দে, স্বপন দে, ডা. শুভানন রায়, মধুমিতা বসু, আশিস সেনগুপ্ত
প্রচ্ছদ	:	সুব্রত চৌধুরী
স্কেচ	:	যোগেন চৌধুরী
যোগাযোগ	:	টি জি ২/২৯, তেঘরিয়া, হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০ ০৫৯ ৪৩/১এ, মলঙ্গা লেন কলকাতা-৭০০ ০১২
ফোন	:	৫৯ ৪০৪৮

অনিরুদ্ধ লাহিড়ী / পাঠ্য পাঠক্রিয়া পঠন : পাঠ্যব্যাপৃতি কী ও কেন ৫ □ শিবাজীপ্রতিম বসু / মিখাইল বাখতিন : উপন্যাসের সমস্যা ৪৯ □ পার্থ চট্টোপাধ্যায় / আমাদের আধুনিকতা ৭১

উৎপলকুমার বসুর পঁচিশটি সাম্প্রতিক কবিতা ১-২৭

তক্কাতক্কি আর গুলতানি ২৯ □ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় / একটি অসম্পূর্ণ সাক্ষাৎ-কার ৬৫ □ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় / উৎপলকুমার বসুর প্রকাশিত গ্রন্থাবলির তালিকা ও তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৭৭ □ যোগেন চৌধুরী / আমার বন্ধু উৎপল ৮৭ □ প্রশান্ত মাজী / 'টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম' ৯৫ □ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত / একটি চিঠি ১০৯ □ মিহির চক্রবর্তী / অমীমাংসার আলো-আঁধারি ১১৭ □ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় / লোচনদাস নামে এক কারিগর ১৩৩ □ বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত / 'আর কী দ্যাখো তুমি' ১৪৯ □ উপল দত্তগুপ্ত / ভাষার ব্যবহার : উৎপলকুমার বসু ১৭৫ □ গৌতম বসু / ব্যক্তিগত লিখন-ভঙ্গিমা ১৭৯ □ চৈতালী চট্টোপাধ্যায় / কোরা কাপড়, গিঁট এবং পাপ সমুদ্রের মতো কবিতা ১৮৫ □ কালীকৃষ্ণ গুহ / নক্ষত্রে সাজানো ডানা ১৯৫ □ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় / 'ঝর্না জলে সেই গ্রামোফোন…' ২০১

পত্রিকার বয়স চার বছর পূর্ণ হয়নি। বাংলাভাষায় শুধু সাহিত্যচর্চা নয়, আমাদের আলোড়িত করে এরকম বিবিধ বিষয় এবং প্রশ্নের সদুত্তরও খুঁজতে চাই— পত্রিকার এই মেজাজ নির্ভুলভাবে ধরতে পেরেছেন বেশ কিছু লেখক-চিত্রকর ও চিন্তাবিদ। তাঁরা অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করছেন, আমরা এঁদের সান্নিধ্য পেয়ে গর্বিত। এরকম একটি পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব বর্তায় আমরা কিন্তু তার প্রতি সুবিচার করে উঠতে পারিনি। কবি শৈলেশ্বর ঘোষ একটি চিঠিতে তা স্পষ্ট করে দেখিয়েও দিয়েছেন। শৈলেশ্বর লিখেছেন : 'আপনার কাগজের জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৪ সংখ্যায়···শাস্ত্রবিরোধিতা ছয়ের দশক লেখাটির, কাগজের ৯৬ পাতায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা কথা লেখা হয়েছে'। তিনি জানিয়েছেন 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকায় শঙ্খ ঘোষের রচনার কোনও বাদ প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়নি। শঙ্খ ঘোষ সম্পর্কে ওই অশালীন মন্তব্য আদৌ ক্ষুধার্তে ছাপা হয়েছিল কিনা তা দেখে নেওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য ছিল। আমরা সে দায়িত্ব পালন না করে নির্বোধের মতো ঝুঁকি নিয়েছি, এটা শুধু ভুল নয়, অন্যায়। শৈলেশ্বর এই অন্যায় স্বীকারের সুযোগ করে দেওয়ায় তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ হলেন। শঙ্খ ঘোষ তাঁর স্বভাব মাধুর্যে আমাদের এ ত্রুটি লক্ষ করেও উপেক্ষা করেছেন।

বর্তমান সংখ্যার বহুপৃষ্ঠা ছিনিয়ে নিয়েছেন উৎপলকুমার বসু। বাংলা কবিতায় তাঁর স্থান খুবই বিশিষ্ট এবং ততটাই উজ্জ্বল। উৎপলের মস্তিষ্কে আজও এক ফোঁটা মেদ জমেনি, এর থেকে আহ্লাদের কথা আর কী হতে পারে !

১. ১০. ৯৪

পাঠ্য পাঠক্রিয়া পঠন : পাঠ্যব্যাপৃতি কী ও কেন

অনিরুদ্ধ লাহিড়ী

বিশেষ কোনো কোনো পাঠ্য সম্পর্কে এক সময়ে এরকম একটি প্রশংসাসূচক মন্তব্য করার রেওয়াজ চালু ছিল যে তারা সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু সচেতন নিয়ন্ত্রণের কথাটা উঠলেই আধুনিক পাঠক জরুরি একটি প্রশ্ন তোলেন : সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত, হ্যাঁ, কিন্তু কার দ্বারা ? তাঁদের আপত্তিটা অনেকটা এরকম দাঁড়ায় যে বাইরে থেকে লেখকের আগন্তুক চৈতন্যের দ্বারা পাঠ্য সংগঠিত ; পাঠ্য-পুত্তলীর তিনিই বাজিগর, তিনি নিয়ন্তা। সেক্ষেত্রে, তাঁদের মতে, পাঠ্য তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে, জড়-পুত্তলীবৎ, পরবশ হয়ে পড়ে ; অর্থ উৎপাদনের দায় ও অধিকার ন্যস্ত হয়, বা কার্যত থেকে যায়, বাইরে, দেশান্তরে, নিয়ন্তা লেখক-চৈতন্যের অনুপস্থিত মুঠোয়। পরবশ্যতার এই দায়কে নাবালক যে পাঠ্য মেনে নিয়েছে তার অর্থগৌরব খর্ব হতে বাধ্য ; অনেকাংশে তা নিয়ামক লেখক-চৈতন্যের স্বরপ্রক্ষেপে পর্যবসিত হয় মাত্র। অনুরাগী পাঠক সে পাঠ্যে কান পাতবেন ঠিকই ; তবে সেখানে তিনি শুনবেন— না, পাঠ্যের নয়— দূর থেকে ভেসে আসা লেখক-চৈতন্যের আত্ম-বিজ্ঞাপক কণ্ঠস্বরটুকু কেবল। পাঠ্যের আধুনিক

প্রবক্তারা যা খুঁজছেন— বহুস্বর, তাই অনেকান্ত, এবং অর্গলমুক্ত পাঠ্য— ঔপনিবেশিক লেখক-কর্তৃত্বকে সর্বাঙ্গীণভাবে মেনে নিলে তার সমূহ বিলুপ্তি ঘটা সম্ভব, অন্তত তার সংকোচন তো অবশ্যম্ভাবী।

এই গোত্রের পাঠ্যকে যদি বন্ধ পাঠ্য বলে অভিহিত করা যায়, এবং যদি ধরে নেওয়া যায় এই জাতের পাঠ্য আদৌ আছে, দেখতে হবে তাদের অর্থব্যাপ্তি এবং নানামাত্রিকতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কি না ; এবং হলে, তা কতদূর পর্যন্ত ও কিভাবে। প্রশ্নগুলিকে অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে বিবেচনা করা দরকার। তবে তাদের সদুত্তর পেতে হলে আমাদের আলোচনাকে কিছুটা তাত্ত্বিক মাত্রা দিতে আমরা বাধ্য হব। আরো যা বড় কথা, সেক্ষেত্রে তা কোনো অর্থেই টুকরো টুকরো বা ছাড়া ছাড়া ভাবে পাঠ্য নির্মিতির দু-একটি উপাদান কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, আলোচনার সেই এলাকাটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। নির্মিতির ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ এবং যুক্তি মেনে পাঠ্যকে গড়ে তুলছে সংগঠক নানা উপাদান। এসবের সমবায়ে বা, আরো জটিলতর অর্থে, টানা-পোড়েনে গড়ে ওঠে যাকে বলা চলে পাঠ্য নির্মিতির ন্যায়। যা প্রয়োজন তা হল এই ন্যায়টিকে ঠিক মতো চিনে নেওয়া, তা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না।

প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে আদি-মধ্য-অন্তের ক্রমিকতা হল বদ্ধ আখ্যান রীতির একটি প্রধান লক্ষণ, এমন কি তখনও যখন অ্যারিস্টটলিয় মুখোস বা নির্মাণ-ক্রমের যুক্তি মেনে তার অগ্রপটে টেনে আনা হয়েছে ঘটনা ক্রমের[১] অন্তর্বর্তী একটি নির্বাচিত ঘটনা বিন্দুকে : ক নয়, হয়তো গ বা ঘ-কে। গঠন ও বুননের শৈথিল্যকে— অন্তত পরিশ্রমী লেখক-চৈতন্যে যা শৈথিল্য বলে প্রতিভাত হয়েছে, তাকে— দেখা যাবে এ জাতের পাঠ্য বরদাস্ত করতে খুব কিছু উৎসুক নয়।

বদ্ধ আখ্যান সচেতনভাবে সংগঠিত, যদিও আখ্যান এক নয় এবং তাদের সংগঠনের আদর্শ ও যুক্তি ভিন্ন ভিন্ন। এক হিসাবে অবশ্য এটা ঠিক যে, সচেতন সংগঠনের মাত্রার হেরফের যতটুকু যা ঘটুক না কেন, সব পাঠ্যই সংরচিত। সচেতনভাবে সংরচিত যেহেতু, পাঠ্যে ঐ চৈতন্য কার অনুদান ? বাইরে থেকে লেখকেরই তো। তাছাড়া সংগঠিতই বা কে করল তাকে ? লেখকই তো, বা তাঁর পরিশ্রমী ধ্যান। লেখক-ঈশ্বর যদি মৃতও হন— ইদানীং যে গুজবটা কানে আসছে— ঐ মৃত্যুটা তো রূপক মৃত্যু। লিখছেন যে তিনি সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশই নেই কোনো। এই অর্থে পাঠ্য মাত্রই লেখকজন্য।[২] সব পাঠ্য সম্পর্কে কথাটা কমবেশি সত্য হলেও, লেখকের ধ্যান যখন সচেতনভাবে আড়াল গ'ড়ে, নিজ কর্তৃত্বের ঘেরাটোপের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দাবিয়ে রাখে পাঠ্যকে, প্রয়োজনে তার আভ্যন্তরীণ প্রবণতাকে নাকচ করে হলেও, তখনই মাথা চাড়া দেয় লেখক কর্তৃত্ব-বাদ, পাঠ্য হয়ে ওঠে বদ্ধ এবং পরবশ। এটা যে ঘটতে বাধ্য, সব পাঠ্যের ক্ষেত্রেই এরকম যদি কোনো তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হই আমরা, লেখক কর্তৃত্ববাদের প্রযোজ্যতা না মেনে উপায় থাকবে না কোনো। মুশকিল

এখানেই। কারণ কিয়দংশে বদ্ধ পাঠ্য এবং বিশেষ করে লেখক কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে দেখা যাবে আধুনিক রুচি প্রবলভাবে সোচ্চার। কেন, তা ভেবে দেখা যাক।

তত্ত্বগতভাবে এরকম একটি দাবি জানানো হয়— বদ্ধ আখ্যান রীতি তার যুক্তিও আদায় করে এরকম একটি বিশ্বাস থেকে— যে পাঠ্যে লেখককর্তৃত্বই সার্বভৌম। যা নির্মিত হল, এবং নির্মিতির কথামুখে যা বিবক্ষিত হল, তা কেবল হরবোলা লেখকেরই স্বরপ্রক্ষেপ ; অধীশ্বর লেখকেরই দাপট চূড়ান্ত, তাই পাঠ্যের তাৎপর্য থেকে যেতে বাধ্য একমাত্র তাঁরই অধীনে। তাৎপর্য কী, তার ঘোষক স্বয়ং তিনি ; এবং পরবশ পাঠ্য, নিজে বোবা, তাঁর ঘোষণা মাত্র। লেখক এবং পাঠকের মধ্যে, উপর থেকে নীচে, তাঁর অকৃপণ বিবক্ষার ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে বাণীর ঐশ্বর্য। বাণীর প্রেরক তিনি, তাৎপর্যেরও। পাঠক কেবল কৃতজ্ঞ প্রাপক মাত্র। গ্রহণ করবার সামর্থ্য কি তাঁর আছে ? তিনি কি উৎকর্ণ, শুনছেন ? তা যদি হয়, তবেই তিনি সার্থক।

লেখককর্তৃত্বের আবেষ্টনীর মধ্যে, একা তাঁর নিয়ন্ত্রণে, গড়ে ওঠে বদ্ধ পাঠ্যের তাৎপর্য— নিজের সম্পর্কে এটাই তার দাবি। বিশেষ করে যেসব পাঠ্য সম্পর্কে এ জাতের দাবি রাখা হয় তারা খাপী। তাদের ঘন বুননে এমন কোনো ফাঁক-ফোকর চোখে পড়ে না যার চোরাপথে পাঠ্যে ঢুকে পাঠকের অভিপ্রায় নিজের জন্য জায়গা করে নিতে পারে, অনেকটা যেন লেখকের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে নিজের মতো করে গড়ে পিটে নিতে পারে পাঠ্যকে। এতটাই যদি খাপী হয় পাঠ্য, তাৎপর্য সেক্ষেত্রে অধীশ্বর লেখকের বশে থেকে যেতে বাধ্য। তাকে গড়ে তোলবার ব্যাপারে বেচারা পাঠকের কোনো ভূমিকা থাকে না— তাঁর দ্বারা তা গৃহীত হয় মাত্র। লেখকের দাবি নিঃশর্ত, তাঁর নিরূঢ় স্বত্ব মেনেই কেবল তাৎপর্য গ্রহণের কাজটিতে পাঠককে ব্যাপৃত হতে হয়। তাঁর এই উদ্যোগ বহরে খাটো, এবং ওজনে লঘু ; এবং তা এই সরল অর্থেই যে এই পাঠ্য-সংসারের সং-টুকু ছেড়ে সারটুকু বেছে নেবার মধ্যেই নিঃশেষিত হয় তাঁর উদ্যোগ।[৩]

এরকম একটি তাত্ত্বিক অবস্থানের বিরুদ্ধে আপত্তি কমবেশি চারের দশকেই উঠেছিল। পাঠ্য যদি নিশ্ছিদ্র বা নীরন্ধ্র হয়— যুক্তিটা ছিল অনেকটা এরকম— পাঠকের অভিপ্রায়ের কোনো তোয়াক্কা না রেখে তার ঘেরাটোপের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় স্বয়ম্ভু তাৎপর্য। তবে শুধু পাঠকের নয়, লেখকের অভিপ্রায়েরও তো তেমন কোনো প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। প্রবেশাধিকারও কি থাকে ? কী তাঁর অভিপ্রায় ছিল, তিনি শিব গড়তে চেয়েছিলেন কি না, আমরা যারা হাতে পেলাম শিবের পরিবর্তে বাঁদরকে, এ অলস জল্পনা তো তাদের কাছে পণ্ডশ্রম মাত্র। কাহিনীকার নয়, তোমার আস্থার পাত্র হোক কাহিনীটি —লরেন্সের এই সাবধান-বাণীর তাৎপর্য তো মনে হয় এটাই।

পাঠ্য একটি শব্দব্যূহ। তার অভ্যন্তরে সশব্দ কোলাহলের জটলা ভেদ করে, আমাদের মনোযোগের কাছে স্বীকৃতির দাবি রাখছে প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক স্বর। তাদের কাকে অগ্রাধিকার দেব, কেন, তা কে বলে দেবে ? কাহিনী নিজে, না কাহিনীকার ?

অর্থের এই মঞ্জুষাটি খুলবার চাবিকাঠিটি কি শেষ বিচারে লেখকেরই হাতে রয়ে গিয়েছে ? তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নি যে, হ্যাঁ, এই অনেকান্ত কোলাহলের মধ্যে তাঁর অভিপ্রায়টি মুখ্য, তাঁর দাবি অবশ্যমান্য, তাঁর অনুপস্থিতিতে বা যেখানে কোনো টীকা জোড়েননি তিনি পাঠ্যে, বিশেষ কোন্ তাৎপর্যটি তাঁর অভিপ্রেত, তা বুঝে নেব কোন্ কষ্টিপাথরে ঘষে ? বা টীকাভাষ্য যেক্ষেত্রে রয়েছে, তাকে অগ্রাধিকার দিতে কি আমরা তত্ত্বগতভাবে বাধ্য ?

পাঠ্যের বহুস্বর প্রতিযোগী জটলার মধ্যে সঠিক তাৎপর্যের নির্ণায়ক কে— সুদূর, অনুপস্থিত লেখক-ঈশ্বরের আত্ম-বিজ্ঞাপক ঘোষণা, যা শেষ বিচারে পাঠ্য-বহির্ভূত ? না কি তার শব্দব্যূহের ভিতরে কার্যকর আত্ম-নির্বাচনের আদর্শ ও তাগিদ ? তাৎপর্য যে আত্মনিয়ন্ত্রিত, অনুপস্থিত লেখক-ঈশ্বরের ভ্রূকুটি-শাসন বা ফতোয়ার পরোয়া না করে পাঠ্যশরীর থেকে স্বতই যে তা উৎসারিত হচ্ছে, এরকম একটি সিদ্ধান্ত মেনে নিলে, এটাও আমরা কার্যত মেনে নিতে বাধ্য হই যে নির্জিত বা পরবশ নয়, পাঠ্য স্বাশ্রয়ী —হয়তো অনেকাংশে তা স্বরাটও। পাঠ্য ও তার তাৎপর্যের মধ্যে, উত্তর-সংগঠনবাদীদের আপত্তি সত্ত্বেও, একটি অভেদ যদি কল্পনা করে নেওয়া যায়, তাহলে বলা চলে যে পাঠ্য নিজেই নিজের সংগঠক ও উন্মোচক। সে কোনো প্রতিনিধি নির্বাচন করে না বা কোনো বকলমা সে দেয় না। সে কী বলছে তা জানতে ও বুঝতে হলে, যেতে হবে তারই কাছে।

কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য কি তাকে নিশ্ছিদ্র, তাই ইতিহাসের প্রতি বি-মুখ, করে তুলছে না ? সব পাঠ্যই কি এই অর্থে রুদ্ধ-দ্বার, তাই বদ্ধতার দায় মেনে নিশ্চল ? না কি পাঠ্য ছিদ্রল, এবং কোনো কোনো পাঠ্য তো তা বিশেষ করে ? দাবি করা চলে না কি যে, কমবেশি হলেও, ছিদ্রান্বেষী পাঠকের জন্য নানা রন্ধ্র, নানা ফাঁক-ফোকর থেকেই গিয়েছে পাঠ্য শরীরে ? অন্তত পাঠ্যের তো রকমফের নিশ্চয় আছে ? বস্তুত নিশ্ছিদ্রতার যুক্তি মেনে নিলে, পাঠ্যের সীমান্তে, ইতিহাসের সঙ্গে তার ভেদরেখা বরাবর নয়, বা যেখানে যেখানে তা ইতিহাসের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট সে এলাকাগুলিতে নয়, বরং তা থেকে দূরে, বিজনে, তার আভ্যন্তরীণ ন্যায়েই কেবল ধরে নিতে হবে উদ্ভূত এবং নিঃসৃত হচ্ছে তার আত্মিক নির্যাস। এই বিচারে পাঠকের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ : সহৃদয় সামাজিক তিনি, তাই যা নিঃসৃত হল, তার রসাস্বাদনে উন্মুখ একজন অলস ভোক্তা তিনি ; বা হয়তো অলস তিনি নন, যা নিঃসৃত হল কেবল তার পরিশ্রমী নিষ্কাশনেই তাঁর উদ্যোগ নিঃশেষিত। লেখকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তাৎপর্যকে গড়েন না তিনি। পাঠ্যকে ব্যেপে তাৎপর্য তো পড়েই রয়েছে। এই যুক্তিতে, তাকে বেছে ছেঁকে নিতে পারলেই সফল হয় তাঁর দ্বারা সম্পাদ্য আবিষ্ক্রিয়ার কাজটি।

সমান গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি সমস্যা কিন্তু দেখা দেয় সেক্ষেত্রে। তা দেখা দেয় কালিক নিশ্চলতার প্রশ্নটিকে ঘিরে। পাঠ্য যদি নিশ্ছিদ্র হয়, বদ্ধতার আড়ালে, সংগঠনের আভ্যন্তরীণ ন্যায় মেনেই কেবল তা গড়ে তুলতে পারে তাৎপর্যকে। সেক্ষেত্রে, বোঝা

কঠিন নয়, পাঠ্য এবং তার তাৎপর্য উজানে, নিজ অতীতে, প্রোথিত, তাই বাধ্য হয় কার্যত নিজ অতীতের সঙ্গে সমকালীন থেকে যেতে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে পাঠ্য এই অর্থে নিশ্চল, পাঠক্রিয়া কিন্তু আদপে তা নয় ; কাল থেকে কালান্তরে এবং দেশ থেকে দেশান্তরে তা তো চলতেই থাকছে। স্থাণু পাঠ্যকে পিছনে ফেলে তার ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রিয়া, বলা যেতে পারে, এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। এটা তাই নিশ্চিত যে নিজের ইতিহাস থেকেই যদি নিজেকে পুরোপুরি গড়ে তোলবার রশদ ও যুক্তি সংগ্রহ করতে একান্ত বাধ্য হয় পাঠ্য, সেই ইতিহাসেরই নিভৃতে অন্তরীন থেকে যাবে সে ; ক্রমবর্ধমান কালিক দূরত্বের কারণে অবশেষে একদিন পাঠক্রিয়ার সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ বি-যুক্তিই হবে তার অভ্রান্ত এবং একমাত্র পরিণতি। আর তা যদি ঘটে, ভিকোর যুক্তি নাকচ ক'রে, ঘনীভূত মানব-চৈতন্য পাঠ্যের মধ্যে যে স্বাক্ষর রেখে গেল, ঐতিহাসিক অনচ্ছতার আড়ালে একদিন দেখা যাবে তার পরিচয় হারিয়ে বসে আছে সে। এবং সব পাঠ্যের ক্ষেত্রেই এটা যখন সর্বাংশে সত্য, সাংস্কৃতিক স্মৃতিভ্রংশই হবে অতীতের সঙ্গে সার্বিকভাবে বি-যুক্ত মানুষের চরম আত্মিক পরিণতি।

কিন্তু তাৎপর্যের এই অবলুপ্তি কি ঘটতে বাধ্য ? পাঠ্য তো শোনাই যাচ্ছে স-বাক। এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই যে বহু যুগের ওপার হতেও কথা সে বলে, অবশ্য যদি মনোযোগী পাঠক কান পাতেন তার বাঙ্ময়তার এলাকাটির মধ্যে। তবে কি ধরে নিতে হবে যে কান পাতবার সময়ে, অন্তত ঐ মুহূর্তটিতে, নিজ কালে গর-হাজির পাঠক উজিয়ে পৌঁছেছেন পাঠ্যের সমকালে ? কালিদাস পড়বার সময়ে তাঁর কালে, শেক্সপীয়র পড়বার সময়ে তাঁর যুগে। কালিক এবং স্থানিক ব্যবধান যাই হোক না কেন, পাঠ্যের শ্রাব্যতার গণ্ডিটুকুর মধ্যেই কিন্তু থেকে যাচ্ছেন তিনি ; উৎকর্ণ হলে, যদি তিনি তা চান, পাঠ্যের চুম্বকক্ষেত্রের আকর্ষণে গা ঢেলে দিয়ে অথবা সচেতন উদ্যোগে সাঁতার কেটে, ফিরে যেতে হয় তাঁকে বাণীর ঐ উৎসে। ব্যাপারটা সুতরাং দাঁড়াল এই যে পাঠ্য স্থাণু, এবং তার মধ্যে যেসব অভিপ্রায় যেসব যুক্তি মেনে বিবক্ষিত হল তারাও তা-ই। উৎসে পৌঁছে, জঙ্গম কালের দ্বারা অনাহত, পাঠ্যের ঘনীভূত সারাৎসারকে পাঠকের কর্তব্য হবে এবার তাহলে কায়মনোবাক্যে উদ্ধার করা ; এবং তা ক'রে— ভিন্-কালে ঘর বাঁধা তো আর সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে— তিনি নিশ্চয় ফিরে আসবেন নিজের সমকালে। এবং যে কোনো মনোযোগী পাঠকের ক্ষেত্রে এই গমনাগমনটি চলতে থাকবে বারেবারেই।

পাঠক্রিয়া চলাকালীন এতক্ষণ তাহলে কিন্তু বেচারা পাঠকটি গর-হাজির ছিলেন নিজের কালে, ফলত নিজের জীবনে। ঐ একই যুক্তি মেনে বলা চলে, যত বেশিক্ষণ যত বেশি সংখ্যক পাঠ্যে মনোযোগ দিতে হয় তাঁকে তাদের সারাৎসার সযত্নে ছেঁকে নেবার উদ্দেশ্যে, তত বেশি ব্যাপ্ত হয় তাঁর গর-হাজিরা। আর এই গর-হাজিরার ক্ষেত্রটি বিশেষ করে কী ? না, তাঁর নিজেরই কাল, নিজেরই জীবন ! বলা চলে, দাক্ষিণ্যের ক্ষেত্রটি যেহেতু প্রসারিত ছিল বাইরে, ঘরের জোগানে টান পড়েছে তাঁর ; মনোযোগের

ঢাল গড়িয়ে গেছে দূরে, নিকটের জগৎ তাই আবৃত হয়েছে বিমনোযোগে। প্রশ্ন এই : শিক্ষিত পাঠককে বিশিক্ষিত হতে বলা, যা শিখেছেন তা ভুলে যেতে বলা, খুব অসমীচীন, খুব গর্হিত হবে কি এর পরেও ? এঁদেরই কেউ কেউ তত্ত্বরচনার আগ্রহে ধ্যানে তৈরি করেন সুরম্য অট্টালিকা ; নিজেরা অবশ্য রাত কাটান কায়ক্লেশে, ভাঙা চালের নীচে।

ব্যাপারটা কিন্তু এতটা করুণ না হতেও পারে। কোনো পাঠ্যই নিশ্ছিদ্র বা নিশ্চল নয় ; তাছাড়া এমনও নয় যে পাঠক্রিয়ায় রত হবার প্রাথমিক শর্তই হল এটা যে সমকাল থেকে সম্পূর্ণরূপে বি-রত, গরহাজির পাঠককে ছুটি নিয়ে পৌঁছতে হবেই হবে কালান্তরে, পাঠ্য ও তার তাৎপর্যের ঐতিহাসিক উত্থানভূমিতে। বরং জঙ্গম অনুক্রমের মধ্যে স্থাপিত ক'রে, কালিক ধারাবাহিকতার আদর্শে চিহ্নিত করতে হবে পাঠ্যকে ; বুঝতে হবে, তার মধ্যে অতীত থেকে প্রবহমান অভিপ্রায়সমূহ[৪] প্রবেশ করছে ঠিকই,ব্যক্তও হচ্ছে নিশ্চিত ; কিন্তু প্রক্রিয়াটি সেখানেই থেমে যাচ্ছে না। প্রতিটি নিবিষ্ট পাঠক্রিয়ার বাবদে ভবিষ্যতের সঙ্গেও যুক্ত হচ্ছে সে, এবং তা সে বারেবারে হতেই থাকছে। তাই বিবক্ষিত কী ছিল, কী নয়, তাকে চিনে নেবার তাগিদেই, বিশেষ করে মতাদর্শগত পালাবদলের বাঁকে বাঁকে, আবিষ্কৃত— বলা চলে, উৎপন্ন— হতে থাকে তাৎপর্য ; না, তার কোনো সুনির্দিষ্ট, একরোখা, জেদী একক নয় ; বরং তাৎপর্য থেকে তাৎপর্যান্তরের যেন এক নিরবচ্ছিন্ন পর্যায় : তাৎপর্য সন্ততি। পাঠক্রিয়ার পরম্পরা এইভাবে অতীতকে বাজিয়ে বুঝে নেবার সূত্রে, বলা চলে, যেন অতীতকেই উৎপন্ন করছে ; পাঠক্রিয়ার ঔরসে একই পাঠ্য থেকে তাই জাত হচ্ছে তাৎপর্যের পর্যায়। যাকে মনে করা হত স্থাণু, একটি অখণ্ড, গোটা একক, তা হয়ে উঠছে পিচ্ছিল, জঙ্গম ও অনেকান্ত ; পাঠ্যকে আমরা খুঁজছি ঠিকই, কিন্তু যা নজরে পড়ছে, যাকে খুঁজে পাচ্ছি, তা হল তার অবিরত নানামাত্রিক বিচ্ছুরণ।

যেভাবে বক্তব্যটিকে পেশ করা হল তাতে করে একটি আপত্তি উঠতে পারে। সেটি হল এই যে এর মধ্যে একটি বিপজ্জনক ঝোঁক কাজ করছে : তাত্ত্বিক স্বেচ্ছাচারিতা। বেপরোয়া, লাগামছুট পাঠক্রিয়া যে হতে পারে না বা তা যে নেই এমন তো নয়, বা এমনও নয় যে আমাদের কারো অভিজ্ঞতায় এতদিনেও এই সহজ সত্যটি ধরা পড়েনি। অমনোযোগ-প্রসূত ও অলস, তাই অবিবেচক, এবং চালাক ও পল্লবগ্রাহী, তাই মেকি, পঠনের হাজারটা নিদর্শন তো ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র, বিশেষত স্বর্গাদপি যা গরীয়সী আমাদের সেই মাতৃভাষায়। প্রস্তাবিত ব্যাখ্যানে— আপত্তিটি অনেকটা এরকম দাঁড়াচ্ছে— পঠন মাত্রই নাকি হয়ে উঠছে তাৎপর্যের উৎপাদক, অন্তত বিশেষ বিশেষ পঠন তো নিশ্চয় ; এবং উৎপন্ন পঠনমাত্রই না কি বৈধতার দাবি রাখছে! তা যদি হয়, তবে এই অমনস্ক, উদ্ভট তাৎপর্য-তরঙ্গ রুধিবে কে ? কোন্ অধিকারে ? সঠিক তাৎপর্যের উৎপাদক একটি কোনো বিশেষ পঠন বেছে নেওয়া কঠিন হতে পারে ; বস্তুত তেমন একটি বিশেষ পঠন যে আছেই এমনও হয়তো নয়। কিন্তু সম্পূর্ণ বেঠিক,

বিভ্রান্ত তাৎপর্যের উৎপাদক পাঠক্রিয়া যে আছেই আছে, অন্তত তত্ত্বগতভাবে তা যে খুবই সম্ভব, এ বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র কোনো অবকাশ নেই। তাকে বা তাদের সেক্ষেত্রে চিহ্নিত ক'রে খারিজ করা হবে কোন্ যুক্তিতে ?

এরকম একটি অবস্থানকে যে তাত্ত্বিক স্বেচ্ছাচারিতার দায়ে[৫] অভিযুক্ত করা চলে তার একটি কারণ এটাই যে, নিখাদ বা জাল, সব পাঠক্রিয়াকেই তা অগ্রিম বৈধতা দিচ্ছে ; বাতিল করবার ব্যাপারে ততটা নয়, যে কোনো পঠনের বৈধতা নাকচ না করবার ব্যাপারে তার তাত্ত্বিক অসহিষ্ণুতা দেখা যাচ্ছে যতটা উগ্রভাবে সক্রিয়। অভিযোগটিকে আরো বিশদ করে এভাবেও বলা চলে যে প্রতিটি নয়া কিসিমের পাঠক্রিয়াই যখন নয়া কিসিমের তাৎপর্যের জনক, প্রতিটি পঠনই যেহেতু বৈধ, পাঠক্রিয়ার পরম্পরা চলতেই থাকবে। পাঠ্য নামের এই রত্নগর্ভা বহু-ভর্তৃকা সেক্ষেত্রে বাধ্য হবে কেবলই, নিরন্তরই প্রসব করে যেতে— তাৎপর্যের পর তাৎপর্যের এক অনন্ত পরম্পরাকে। আরো এগিয়ে গিয়ে হয়তো বলা চলে, কঠোর পিতৃতান্ত্রিক ভগবান যেমন ভগবতীর তোয়াক্কা না রেখে শুধু ইচ্ছা দ্বারাই জন্ম দিতে সক্ষম— বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায়টি বা মিশেলাঞ্জেলোর আদমের জন্ম স্মরণ করুন— পাঠক্রিয়াও তেমনি অনেকটা যেন পাঠ্য-নিরপেক্ষভাবে, অর্থাৎ তার সঙ্গে আদৌ মিলিত না হয়ে, নিজ নিজ চিদাকাশেই তাৎপর্যকে গড়ে তোলবার ক্ষমতা রাখে : প্রসূতি ছাড়াই এ যেন অলীক প্রসব এক ! পাঠ্যের সঙ্গে অভিনিবিষ্টভাবে যুক্ত না হয়েই তা যখন ফল উৎপাদন করছে, সার্বভৌম পাঠ-ক্রিয়া তখন ক্রিয়া হয়েও যে আর পাঠ্য-সাপেক্ষ থাকছে না, এরকম একটি ভয় মনে হয় না খুব কিছু অমূলক।

এর ফলে কি, উল্টো দিকে, তাৎপর্য নিজেই পাঠক্রিয়া-সাপেক্ষ হয়ে পড়ছে না ? তা যদি হয়, তাৎপর্যকেও কি সেই একই সঙ্গে পাঠ্যের বাইরেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে না ? পাঠ্যের বাইরেই— তবে লেখকের নয়, পাঠকের দিকটি ঘেঁষে— যেহেতু এই বিচারে তাৎপর্যের উত্থানভূমি ও চলাচল, লেখকের অভিপ্রায় বা পাঠ্যের আভ্যন্তরীণ ন্যায় নয়, তাৎপর্য তার বৈধতা অর্জন করছে পাঠক্রিয়ার আত্মরতি থেকেই মূলত। এভাবেই ধাপে ধাপে, লেখককর্তৃত্ববাদ থেকে স'রে, পাঠ্যস্বাতন্ত্র্যবাদকে অনায়াসে ডিঙিয়ে, আমরা পৌঁছলাম এসে পাঠক্রিয়ার অবাধ স্বেচ্ছাচারিতায় ; লেখকের হিসাবি অভিভাবকত্ব থেকে ছিনিয়ে আনা পাঠ্য এখন পরিত্যক্ত, তাই অবলীলায় নিমজ্জিত, হল অনিশ্চিতির নৈরাজ্যে। এভাবেই রুচি, অন্তর্দৃষ্টি এবং মনোনিবেশের ক্ষমতা বা তাদের অভাব যার যেমন, তার সঙ্গে সংগতি রেখে চলতে থাকবে পাঠক্রিয়া, নিরন্তর উৎপন্ন হতে থাকবে তাৎপর্যের নব নব হিং-টিং-ছট। আরো যা বড় কথা, খাঁটি বা মেকি, অনুসন্ধানী বা দায়িত্বছুট, সব পাঠক্রিয়াকেই বৈধতা দিতে আমরা কার্যত বাধ্য থাকব। ঘোষক পাঠক্রিয়াসমূহের উদ্যোগেই কেবল তাদের বাচাল প্রতিনিধিত্বের মারফৎ, মূক পাঠ্যকে শোনা যাবে উক্ত হতে ; ধরে নিতে হবে, নাবালক পাঠ্যের মুখে যা ফোটে, বা ফোটে না, তা হল 'অনভিব্যক্তবর্ণা ধ্বনিমাত্ররূপা পরা' বা বড় জোর 'পশ্যন্তী',

পাঠক্রিয়ার মধ্যস্থতায় তা হয়ে ওঠে 'বিবিধ জ্ঞানপ্রকাশিকা সর্ব্বব্যবহারপ্রদর্শিকা চতুর্থী ভাষা— বৈখরী'। এরকমই দাঁড়াল তাহলে অভিযোগের চেহারাটা।

প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া যাক যে আমাদের অবস্থানে অনিশ্চয়তার একটা ঝুঁকি থেকেই যায়, যদিও তা যে তাত্ত্বিক নৈরাজ্যের সমার্থক এই অভিযোগটি মেনে নেওয়া গেল না। অবশ্য নীরন্ধ্র, নিশ্চল পাঠ্যের ধারণাকে মেনে নিলে— অর্থাৎ যদি ধরে নেওয়া যেত যে এ জাতের পাঠ্য আদৌ আছে অথবা পাঠ্য মাত্রই নীরন্ধ্র ও নিশ্চল— ঝুঁকিটা আর থাকত না তখন। পাঠ্যই যেহেতু এই বিচারে তাৎপর্যের একমাত্র জনক ও আশ্রয়, পাঠ্যশরীরে তা ওতপ্রোত থেকে যেত ; এবং তার নিবিষ্টতার তত্ত্বের সঙ্গে মিল রেখে দাবি করা চলত যে পাঠ্য এবং পাঠক্রিয়ার সন্ধিদেশ বা উভমুখে নয়, নিরবকাশভাবে পাঠ্যশরীর ব্যেপে, তবে তার অভ্যন্তরেই কিন্তু, তাৎপর্য চুঁইয়ে পড়ছে অথবা জমাট বেঁধে ভাসছে। পাঠক্রিয়ার কাজ হত এবার তাহলে তন্নতন্ন করে খুঁজে ও ছেঁকে পাঠ্যের অন্দর থেকে পঠনের সদরে তাকে হাজির করা। পাঠক্রিয়ার তাত্ত্বিক প্রস্তুতি কতটুকু, কোন্ মতাদর্শগত ঝোঁক তাগিদ দিয়ে তাকে পাঠ্যের অভিমুখে প্রেরিত এবং তার সঙ্গে অন্বিত করছে —এসব প্রশ্ন পড়ে থাকত সমস্যাপটের বাইরে।
সমস্যাপটের বাইরে, সুতরাং অনৈতিহাসিকতার হিমঘরে। নীরক্ত পাঠক্রিয়াকে একমাত্র এভাবেই কিন্তু বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিকতার আদল দেওয়া যেত। পাঠক নিশ্চয় খেয়াল করেছেন, এটা হল দৃষ্টবাদী বা ধ্রুববাদী তত্ত্বপ্রকল্পের একটি প্রচলিত রণকৌশল। অভ্রান্ত পঠন সেক্ষেত্রে হত একটি এবং তা হত বিকল্পরহিত ; তার নির্বিকল্প আধিপত্যের মধ্যে চিরকালের জন্য ধরা পড়ে যেত পাঠ্য-নিঃসৃত তাৎপর্যের শাশ্বত সারাৎসার।[৬] প্রতিটি পাঠ্য ব্যক্তি প্রাতিস্বিক। পাঠক্রিয়ার বৈজ্ঞানিকতার বাবদে— তর্কের খাতিরে দাবিটি মেনে নিয়ে বলছি— যার মধ্যে তার তাৎপর্যটি মূর্ত বা উক্ত হত, অর্থাৎ একক এবং বৈধ প্রতিনিধিত্বের দাবি রাখত তদ্-গত যে গঠনটি, অন্য অধস্তন পঠনদের নায়ক ও সেনাপতি, সে-ও সেক্ষেত্রে হত একমেবাদ্বিতীয়ম্। (পুনরুক্তি হলেও, স্ট্যালিনবাদের উল্লেখ কি এক্ষেত্রে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে ?)
একজন সৎ, মেধাবী এবং পরিশ্রমী পাঠকের দ্বারা— আদর্শ সমালোচকই বলা যাক তাঁকে— পাঠ্যের এই বিচারে সুনির্দিষ্ট, অভ্রান্ত এবং নির্বিকল্প তাৎপর্যটি ধরা যাক ছেঁকে নেওয়া হল একবার। পাঠ্যের চার দেওয়ালের মধ্যে তাৎপর্যের যতটা যা মজুত থাকবার কথা তা যেহেতু ঐ একমাত্র বৈধ পঠনের মধ্যে গৃহীত হয়ে গিয়েছে, পরবর্তী অন্য কোনো পাঠক্রিয়ার নতুন করে করবার কিছু থাকত না আর ; তা পর্যবসিত হত চর্বিতের নিছক চর্বণে। স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, হ্যাঁ, প্রতিটি পাঠ্যই সৃষ্ট হয় ব্যক্তি ও ইতিহাসের যৌথ উদ্যোগে, কিন্তু পাঠক্রিয়া থেকে যায় নিজ ইতিহাসের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক, তাই সেখান থেকে ফেরারি। ডক্টর জনসন কিভাবে শেক্সপীয়র পড়েন, কেনই বা ; কোলরিজের পঠনেরই বা ঐতিহাসিক যুক্তি এবং চরিত্রটি কী ;

নারীমুক্তি আন্দোলনে আজ যাঁরা সামিল হয়েছেন তাঁরা বা আমরা তৃতীয় বিশ্বের কালো মানুষজনই বা তাঁকে কিভাবে পড়ব, কোন্ যুক্তি মেনে; —এই বিচারটি মেনে নিলে এসব প্রশ্ন অবান্তর হয়ে পড়ত। বস্তুত তাৎপর্য যে সর্বাঙ্গীণভাবে পাঠ্যগুহাতেই নিহিত—পাঠ্য-নিবিষ্টতার এই তত্ত্বকে মেনে নিলে, একটি কায়েমী, শাসক পঠন ব্যতীত, ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবান পঠনের, তাদের ভিন্নতার, বৈধতাই যেত হারিয়ে। অধস্তন পঠন যে থাকত তা নিশ্চিত, সংখ্যায় তারা কিছু কম হত না, তবে তা কেবল মূল গায়েনের দোহার হিসেবে।

কিন্তু এটাও তো না মানলে চলছে না, প্রতিটি জরুরি পাঠ্যের ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যা সত্যি, অধস্তন নয় এমন নানা পঠন তৈরি হয় ও তা হচ্ছে। আবার এটাও তো সত্যি নয়, উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে যে দাবিটি রাখা হয়েছে, এসব নানা পঠনের মধ্যে একটি ছাড়া বাকি সবকটি হয় পুনরুক্তি, নয় বেঠিক। করুণ হলেও পরিহাসের কথা বরং এটাই যে পাঠ্যের যদি মতাদর্শগত এবং তাত্ত্বিক গুরুত্ব থেকে থাকে— খ্রীষ্টীয় এবং মার্ক্সীয় তত্ত্বাকাশের ক্ষেত্রে যা রয়েছে যথাক্রমে বাইবেল এবং ডাস ক্যাপিটালের —অনেক সময়েই, ক্ষেত্র বিশেষে, পুনরুক্ত হয় তাদের প্রতিটির সেই বিশেষ পঠনটি যা গ্রাহ্যত বেঠিক, নিদেনপক্ষে ধোঁয়াটে ও নির্বোধ। এইভাবে, গির্জার পিতাদের কৃপায় বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত শারীরিক কামনার সেই সুপ্রসিদ্ধ গাথাটি অর্জন করে এক আজব এবং আজগুবি অশরীরী আধ্যাত্মিক তাৎপর্য। তবে কেন এটা ঘটে তার কারণ বোঝা কিন্তু কঠিন নয় : চতুরভাবে নির্বাচিত পঠনটিকে পুনরুক্তির মাধ্যমে কায়েমি করে তোলাই হল প্রাতিষ্ঠানিকতার অভিজ্ঞতালব্ধ একটি সুপ্রাচীন কৌশল। নিখাদ এবং সাঁচ্চা পঠন যে আছেই আছে এবং তা একটি বৈ দুটি নয় এবং শাসক পঠনটির দাবিটি যে সার্বভৌম—জনমানসে দৃঢ়মূল এরকম একটি অপরীক্ষিত কু-সংস্কার থেকেই অবশ্য নিজের সমর্থনে বৈধতা আদায় করে প্রাতিষ্ঠানিকতা ; এবং তার আগ্রাসন কমবেশি নাকচ করে অন্যান্য পঠনের গড়ে ওঠবার দাবি।

মেকি এবং ফাঁকিবাজ পঠন অবশ্য আছে, তারাই হয়তো সংখ্যায় বেশি। তা বলে এটা তো ভুল না যে প্রতিটি তত্ত্বাকাশের নীচেই এমন অনেক পঠনের খোঁজ মিলছে, মতাদর্শগত ঝোঁক তাদের যাই থাকুক না কেন, চটজলদি বাতিল যাদের করা কোনো মতেই সম্ভব নয়। পাঠ্য এক হলেও মূল্যবান পঠন সংখ্যায় অনেক কেন, এ ব্যাপারে বুঝতে গেলে আমাদের মাথায় রাখতে হয় পাঠক্রিয়ার চরিত্রটি ; বুঝতে হয় কিভাবে, দেশে ও কালে, নিজ নিজ ইতিহাসের যুক্তি ও তাগিদ মেনে, সম্পন্ন হচ্ছে বিবিধ মেধাবী পাঠক্রিয়া, বিবিধ পঠন ফলে অর্জন করছে তাদের ঐতিহাসিক সুনির্দিষ্টতা। উপরন্তু এটাও ঠিক যে পাঠক্রিয়া এবং পঠনের ঐতিহাসিকতার প্রশ্নটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত : এক বা অনেক, বেঠিক পঠন সুনিশ্চিতভাবেই রয়েছে। কিন্তু এমন একটি কোনো সুনির্দিষ্ট পঠন নেই, তা তাত্ত্বিক অর্থে সম্ভব নয় বলেই, যা সঠিক, তাই ইতিহাস নির্বিশেষে নির্বিকল্প, অর্থাৎ যার মধ্যে পাঠ্যের হস্তান্তরিত

অন্তর্বস্তু বা শাঁসটি চিরকালের জন্য গচ্ছিত রয়ে গেছে। তা যদি হত, তাহলে দাবি করা চলত যে পাঠ্যব্যক্তির দ্বিতীয় বা বিকল্প অহং সে— তা এতদূর পর্যন্ত যে পাঠ্য গায়েব হলে, লুপ্ত পাঠ্যের হয়ে হাকিমের সামনে সাক্ষ্য দেবার অতর্কিত অধিকার থাকত একমাত্র তার : সোঽহং।[৭]

বেঠিক নয়, একই পাঠ্যের এসব পঠন সংখ্যায় অনেক এই সহজ কারণেই যে তারা চরিত্রে ঐতিহাসিক, তাই নিজ নিজ উদ্ভবের যুক্তি মেনেই পৃথগন্ন। আবার একই সঙ্গে, উদ্ভবের ঐতিহাসিক তাগিদগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তাদের চটজলদি বাতিল করা সম্ভব হচ্ছে না এই কারণেই যে এদের গ'ড়ে তুলেছে ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রিয়ার সজাগ ও মেধাবী নৈতিকতা : তাদের আভিমুখ্য, ব্যাপৃতি এবং বস্তুবিবেক। পরিশ্রমী আভিমুখ্য পাঠক্রিয়াকে ঠেলে দিচ্ছে পাঠ্যের অভিমুখে ; অভিনিবিষ্ট ব্যাপৃতির তাগিদে পাঠ্যের সম্মুখীন হয়ে তার সঙ্গে ব্যাপৃত হচ্ছে তা ; অবশেষে, তা হবার সময়টিতে, তার মধ্যে কার্যকর হয়ে উঠছে যাকে অভিহিত করা হল বস্তুবিবেক বলে। কোন্ কোন্ অন্তর্বস্তু বা অনুপুঙ্খ পাঠ্যের মধ্যে আছে, তা কিভাবে ও কী যুক্তি মেনে, এবং কোন্ কোন্‌টি তা নেই, অর্থাৎ কোন্‌টি বস্তু, কোন্‌টি অবস্তু — এই উৎকর্ণ অন্তর্দৃষ্টি হল পাঠক্রিয়ার বস্তুবিবেক। এসব গুণসন্নিপাত তাকে দিচ্ছে তার মেধা ও নৈতিকতা।

এসব আদর্শ কার্যকর বলেই, না, পাঠ্য থেকে দূরে নিজ নিজ চিদাকাশে নয়, পাঠ্যের উত্থানভূমিতে নেমে, সরজমিন, অর্থাৎ পরিপাঠ্যের মধ্যে স্থাপিত ক'রে, তাকে বাজিয়ে বুঝে দেখবার ও শোনবার আগ্রহ থেকে যাচ্ছে এসব পাঠক্রিয়ার মধ্যে। ভাষাব্যবহারে কিঞ্চিদধিক পুলিসি প্রভাব নজরে পড়বে কি যদি বলি, পাঠ্যকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করে তদন্ত করবার পরিশ্রমেও তারা পেছপা নয়? বৈয়াকরণের মতে, বাক্যের স্তরে শাব্দবোধকে সম্পূর্ণতা দেয় পদসমূহের মধ্যে কার্যকর পারস্পরিক আকাঙ্ক্ষা। কার্যকর সূত্র হিসাবে ধারণাটিকে মনে হয় সামগ্রিকভাবে পাঠ্যের স্তরেও উন্নীত করা সম্ভব। সম্ভাবনাটিকে মাথায় রেখে বলা চলে, দৃশ্যত উপস্থিত, সবাক যেসব অনুপুঙ্খ রয়ে গিয়েছে তাদের তো বটেই, প্রয়োজনে, নজরের বাইরে তার নিশ্চেতন থেকেও, পাঠ্যের স্তরে কার্যকর আকাঙ্ক্ষার সূত্রটি মেনেই, পাঠক্রিয়া অধ্যাহার করে নিচ্ছে যা যা উহ্য এবং তাদের জায়গা করে দিচ্ছে নিজের বা নিজেদের ধ্যানে গড়ে তোলা ঐ সামগ্রিকেরই অবয়বে। তা পাঠ্যের অবয়ব ঠিকই, কিন্তু তাকে গড়ে তুলছে, নিজেদের উদ্ভবের ঐতিহাসিক ভিন্নতাকে মেনে, পাঠক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান।[৮] সাক্ষাৎকারের এই উভমুখে, ব্যাপৃত হবার সন্ধিদেশে, পরস্পরের দ্বারা অন্তঃপ্রবিষ্ট পাঠ্য এবং পাঠক্রিয়ার দুটি ঢাল বেয়ে, দুদিক থেকে এসে সুতরাং যুক্ত হচ্ছে মনন এবং অভিপ্রায়ের দুটি পরিচ্ছিন্ন ইতিহাস ; এবং এই আশ্লেষের পরিণতিতে, পাঠ্যবিহারের শেষে, উদ্ভবের ঐতিহাসিক তাগিদ ও যুক্তি মেনে, জাত হচ্ছে বিশেষ বিশেষ পঠন। একমাত্র বৈধ পঠন তা বা তারা নিশ্চিত নয় ; বস্তুত বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিকতার দাবিও তারা রাখছে না। কিন্তু অপর একটি কায়েমি শাসক পঠনের নামে, অবৈধ এই অজুহাতে, তার

তার ঐতিহাসিকতার যুক্তিকে খারিজ কোনোভাবেই করা সম্ভব হচ্ছে না।

পাঠক্রিয়ার— এবং পঠনেরও— চরিত্র সম্পর্কে দু-একটি যা মন্তব্য করা হল এতক্ষণ তাতে ক'রে মনে হয় না যে তার, বা তাদের, মধ্যে কার্যকর উভ-বলতার আদর্শটি খুব একটা প্রাঞ্জল হয়েছে। পাঠক্রিয়ার নৈতিকতার প্রসঙ্গটি আগেই উত্থাপিত হয়েছে। উক্ত তাগিদটি তাকে উদ্বুদ্ধ করছে যাতে করে প্রাণপাত করেও সে, বা পঠন, তাত্ত্বিক স্বচ্ছতা অর্জন করতে পারে। পাঠ্য তার বিষয়; তাতে তদ্‌গত, অর্থাৎ লীন, হলে তবেই কেবল এই স্বচ্ছতা তার, এবং পঠনেরও, করায়ত্ত হবে। কিন্তু সাংস্কৃতিক দৃশ্যমানতা না হারালে এটা কিছুতেই হবার নয়। তা সে, বিশেষত পঠন, হারাবে,— নিজের ওপর প্রতিটি তন্নিষ্ঠ পাঠক্রিয়ার এটাই চূড়ান্ত দাবি। পরিণতির তাত্ত্বিক সীমাতে এসে এই তার আত্মোৎসর্গ।

একই সঙ্গে কিন্তু বিষয়ী হিসেবে এটাও মেনে নিতে হচ্ছে যে, পিছন দিকে, নিজের উদ্ভবের ইতিহাসের মধ্যে তার শিকড় গাড়া, অসহায়ভাবে সেখানে সে প্রোথিত। এটা ঠিক যে তার অভিমুখ তাকে প্রেরিত করছে সামনে, বিষয়ের দিকে, এবং তার সঙ্গে কিনা, সে ব্যাপৃতও হচ্ছে সে। তাই বলে নিজের উদ্ভবের জমিটুকু থেকে কোনো মতেই নিজেকে উন্মূল করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা সে টের পেয়েছে আলোচনায় আমরা পরে যাচ্ছি। কিন্তু এই হল পাঠক্রিয়া এবং পঠনের উভ-বলতা, তাদের মধ্যে কার্যকর দো-টানা। এক দিকে, তাদের অভিমুখ, তন্নিষ্ঠা, পাঠক্রিয়ার নিজের ওপর ন্যস্ত নৈতিকতার তাগিদ; অন্য দিকে, এই সম্ভাব্য আত্মোপলব্ধি, ফলত দ্বিধান্বিত অচরিতার্থতার বোধ, যে তার উদ্ভবের ঐতিহাসিকতা তাকে বর্ণাঢ্য, তাই অনচ্ছ ও দৃশ্যমান করে রেখেছে। যা বর্ণাঢ্য, অন্য প্রেক্ষিত থেকে দেখলে তা-ই তো আবিল। ফলে পঠনে মনোযোগ দেবার সময়ে তাকে পেরিয়ে শুধু পাঠ্যই চোখে পড়ছে না আমাদের, পাঠ্যের সামনে বর্ণাঢ্য আড়াল গড়ে তুলে সে নিজেও দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। ঐতিহাসিক আবিলতা সম্ভব ক'রে তুলছে পঠনের ভিন্নতা।

এইভাবেই তাহলে তন্নিষ্ঠ পাঠক্রিয়া এবং যা তার উদ্দিষ্ট সেই পাঠ্যের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে আড়াল, সম্পূর্ণ অনচ্ছ না হলেও পুরোপুরি স্বচ্ছ যা নয়। এক দিকে, তার ঐতিহাসিকতা, উদ্ভবের যুক্তি ও তাগিদ; অন্য দিকে, তার আভিমুখ্য, নিজেকে ডিঙিয়ে উদ্দিষ্টে বিলীন হবার নাছোড় গোঁ। উভ-বলতা ব'লে যাকে অভিহিত করা হল, তা হল সুতরাং পাঠক্রিয়ার, এবং পঠনেরও, মধ্যে সক্রিয় এই দো-রোখা ঝোঁক। উদ্ভবের দিকে পিছু-টান থেকে যায় বলেই, তন্নিষ্ঠা সত্ত্বেও কোনো পঠনই পাঠ্যের মধ্যে এতটা লীন হতে পারে না যাতে ক'রে নিজের ঐতিহাসিকতাকে ধুয়ে মুছে পুরোপুরি অনাবিল হওয়া সম্ভব হয় তার পক্ষে। তবে তাত্ত্বিক সীমা হিসেবে এই প্রার্থিত আত্মোৎসর্গের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে উপেক্ষা করা ভুল হবে। কেন, সে আলোচনায় প্রবেশ করছি পরে।

মূল্যবান পাঠ্যের ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবান পঠন যে গড়ে উঠছে তার একটি কারণ তাহলে

এই যে পাঠ্যের প্রতি ঐকান্তিক তন্নিষ্ঠা সত্ত্বেও নিজেদের ঐতিহাসিক উদ্ভবের তাগিদ থেকে তারা কখনো এবং কোনো মতেই বিযুক্ত হতে পারে না। কিন্তু শুধুই কি পাঠক্রিয়ার ঐতিহাসিকতা, তাদের উদ্ভবের ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শগত আবিলতা ? না কি তার অপর গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হল পাঠ্যের আত্ম-দীর্ণতা, তার ভিতরে গড়ে ওঠা তাৎপর্যের নানা থাক ? পাঠ্য অনেকান্ত ও বহু-তল, তা ভেদচিহ্নিত, নিজের সঙ্গে ছেদহীনভাবে অন্বিত নয়। যে কাঠামো তার অন্তর্বস্তুকে সংগঠিত করে তা অসমতল এবং স্তরবিন্যস্ত। শুধু বুননের মধ্যে ফাঁক-ফোকর বা রন্ধ্র নয়, পাঠক্রিয়া চলাকালীন যা আমরা জুড়ে জুড়ে এগোই, এর খাঁজে-ভাঁজে ও পরতে পরতে রয়ে গিয়েছে নানা বিরুদ্ধ প্রত্যয় ও তাগিদ ; নি-টোল, নি-খুঁত নয়, নানা মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের দ্বারা পাঠ্য তাই বিদীর্ণ। পাঠক্রিয়ার ঐতিহাসিকতা পঠনকে যে ভিন্নতা দেয়, তা নিশ্চিত। তবু, মনে হয়, তা ততটা নয়, পাঠ্যের আত্ম-দীর্ণতা, তার আভ্যন্তরীণ নানা-রোখ টান যতটা গড়ে তোলে তার বহুমাত্রিক উদ্বৃত্তকে।

পঠন যে বিবিধ তার অপর প্রধান কারণ সুতরাং এটাই যে তাৎপর্যের এই উদ্বৃত্ত বহুমাত্রিক, তাই কোনো একটি সার্বভৌম পঠনে, তার যত না কেন বিস্তার ও আগ্রাসন থাকুক, তা জব্দ, অর্থাৎ অধিকৃত এবং বাজেয়াপ্ত, হবার নয়। পাঠক্রিয়ার তাগিদ ও চরিত্র সাপেক্ষে, পাঠ্যের ফাঁকফোকর দিয়ে, নানা রকমফের নিয়ে, তাৎপর্য ধরা দেয় ভিন্ন ভিন্ন পঠনে। প্রায় কোনো দুটি গুরুত্বপূর্ণ পঠন তাই অবিকল এক নয়। নব নব পঠনে, নিজেকে বারে বারে ছাপিয়ে, ধরা দিচ্ছে তাৎপর্য ; ফলে গড়ে উঠছে তার উদ্বৃত্ত। নিজেকে উপচে ওঠবার এই ক্ষমতা রাখে বলেই কোনো মূল্যবান পাঠ্যই নিজের সঙ্গে পুরোপুরি অন্বিত, বা সম-বিস্তৃত, নয়।

আমাদের আলোচনার মুখটিকে একটু ঘুরিয়ে দেখা যাক কিভাবে পাঠক্রিয়ার ঐতিহাসিকতা যেমন গড়ে তোলে পঠনের ভিন্নতাকে, মতাদর্শগত পালাবদলের বাঁকে বাঁকে যার ফলে সঞ্জীবিত হতে থাকে একই পাঠ্য, ভিন্ন ভিন্ন পঠনও তেমনি গড়ে তোলে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যকে। এরা উত্তর-পাঠ্য। যে কোনো পঠন পাঠ্যের দিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে মাত্র ; নিজে অদৃশ্য থেকে পাঠ্যকে চিনিয়ে দিয়েই সে দায়মুক্ত। পাঠ্য হিসেবে গড়ে ওঠবার, ফলে সাংস্কৃতিক দৃশ্যমানতা অর্জন করবার, কোনো আগ্রহ তার নেই। আমরা যাদের পাঠ্য বলছি, স্বভাবতই, তাদের কাছে এই নীরব আত্মোৎসর্গ আশা করা ভুল হবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রাক্-পাঠ্য এদের পোষক কেননা পরজীবী উত্তর-পাঠ্য কিয়দংশে এদের কাছ থেকেই জোগাড় করে নেয় নিজেদের তাত্ত্বিক পুষ্টি। এবং তা করবার সময়ে নীরবে হলেও, তাদের মধ্যে সক্রিয় থেকে যায় পোষক প্রাক্-পাঠ্য বিষয়ে অনুগত বা প্রতিবাদী কোনো না কোনো পঠন। সুতরাং, দৃশ্যমান বা অদৃশ্য বহিরঙ্গ বা অন্তর্লীন, কোনো না কোনো পঠন থাকছেই, তা বলে পঠন নিজে স্বাশ্রয়ী কোনো পাঠ্য নয় ; তা হয়ে ওঠবার প্রবল কোনো আগ্রহ তার মধ্যে কার্যকর নয়।

প্রতিটি জাতীয় সাহিত্যে— প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগে— পোষক হিসেবে বিশেষ করে পুরাণের এই ভূমিকাটি লক্ষ করার মতো। তবু অনুলোম এবং প্রতিলোম ভেদে— অর্থাৎ প্রাক্-পাঠ্যের তাত্ত্বিক ন্যায়কে তা কি অনুমোদন করছে, তাই বজায় রাখছে, না কি প্রতিবাদে তার যুক্তির বিরুদ্ধেই সে নিজেকে গড়ে তুলছে— উত্তর-পাঠ্যকে আবার দুটি বর্গে সাজিয়ে নেওয়া যায়।[৯] সংখ্যায় খুব কম হলেও তৃতীয় একটি বর্গের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, নানা উত্তর-পাঠ্য থেকে পিছন থেকে যাত্রা শুরু করে প্রাচীনতম প্রাক্-পাঠ্যে— প্রত্ন-পাঠ্যেই বলা যাক তাকে— যখন পেঁছই আমরা, অবাক হয়ে লক্ষ করি তার তাত্ত্বিক ন্যায়ের তাৎপর্যটিই পরবর্তী কালে হারিয়ে গিয়েছে। এই সাংস্কৃতিক স্মৃতি-ভ্রংশের একটি চমৎকার উদাহরণ হল কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়, যার প্রত্ন-রূপটি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ধৃত হয়েছে একটি রহস্যময় সংক্ষিপ্ত সংলাপে। কোশাম্বি দেখিয়েছেন কিভাবে কালিদাসের কাব্যে রূপান্তরিত হবার অনেক আগেই তার গূঢ় এবং নির্মম আদিম ঐতিহাসিক যুক্তি এবং স্মৃতিটিকে খুইয়ে বসে আছে কাহিনীটি। বস্তুত স্মৃতিটি তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে টিকে থাকলে মহাকবি পাঠ্যটি রচনা করতেন কি না তা সন্দেহের বিষয়।

সমক্রম এবং অনুক্রম, অর্থাৎ দেশ এবং কাল বা চারপাশের অনুভূমিক বিস্তার এবং কালানুগ ধারাবাহিকতা— এই দুটি অক্ষ বরাবর গড়ে ওঠে সব পাঠ্য। প্রতিটি পাঠ্য আবার এক একটি বা অনেক সময়ে একই সঙ্গে একাধিক পাঠ্য পরিবার বা গোত্রের মধ্যে অবস্থিত। অন্তর্ভুক্তির ন্যায় রচনা করে বর্গীকরণের প্রায় একটি বিশ্বজনীন কাঠামো তৈরি করেছেন নরথ্রপ ফ্রাই, পাঠকের হয়তো তা মনে পড়তে পারে। কিন্তু আমরা সে আলোচনায় প্রবেশ করছি না। সমক্রমের অক্ষ বরাবর প্রতিটি পাঠ্য চারপাশে তার নিজের প্রজন্মের অপরাপর সহযোগী বা প্রতিযোগী পাঠ্যের সঙ্গে অনুমোদন বা বিরুদ্ধতার ন্যায়ে গ্রন্থিত। অন্য দিকে, অনুক্রমের অক্ষ বরাবর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ডিঙিয়ে বয়ে চলে পাঠ্যের পরম্পরা। এ ভাবেই গড়ে ওঠে নানা পাঠ্য গোত্র। জেন্ এয়ারকে লিভিস দলছুট বা উদ্ভট বলেছেন ঠিকই, তা বলে এটা সত্যি নয় যে পাঠ্যটি অন্য সব পাঠ্যের সঙ্গে সম্পর্ক-চ্যুত, তাই বিবিক্ত। এ পাঠ্যসংসারে এমন কোনো পাঠ্য নেই যা এই চূড়ান্ত অর্থে উদাসীন, তাই সংসার-বিবাগী।

প্রতিটি প্রাচীন পাঠ্যই, তা যত না কেন দলছুট মনে হোক, যেমন কোনো না কোনো পরবর্তী পাঠ্যের প্রাক্-পাঠ্য, বা পাঠ্য-গোত্রের প্রবর, একই সঙ্গে পরম্পরার বিচারে তা আবার পূর্বতর কোনো না কোনো প্রাক্-পাঠ্যের উত্তরসূরি। তাই দেখা যায়, রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল, হোমারের কাব্য, এমন কি গিলগামেশের পুরাণের তল থেকে উঁকি মারছে এইসব প্রত্ন-পাঠ্যের প্রায় অবলুপ্ত সাংস্কৃতিক স্মৃতি। ভাবাদর্শগত বশ্যতার কারণে, বলা হয়েছে, অনুলোম উত্তর-পাঠ্য মেনে নেয় প্রাক্-পাঠ্যের তাত্ত্বিক ন্যায় : রামায়ণের তাত্ত্বিক ন্যায়কে রদবদল সহ পল্লবায়িত করে উত্তররামচরিত, যোগবাশিষ্ঠ, অধ্যাত্ম-রামায়ণ, রঘুবংশম্, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, রামচরিতমানস, অসংখ্য যাত্রা, পালা, নাটক ; সাহিত্যের

বাইরে তার জের এসে পড়ে চিত্র, ভাস্কর্য, নৃত্যগীত এবং চলচ্চিত্রে। ঠিক বিপরীত কারণে ঐ ন্যায়কেই কমবেশি ভাঙে প্রতিলোম উত্তর-পাঠ্য : ইক্ষ্বাকু-কুল-সম্ভূত নরচন্দ্রমা, যার সাংস্কৃতিক স্মৃতি আজকের ভারতবর্ষে সব চাইতে ভয়াবহ অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সতীনাথ ভাদুড়ীর হাতে হয়ে ওঠেন একজন অচ্ছুৎ তাৎমা। তুলনীয়ভাবে, রামকাহিনীর প্রেক্ষিতটি অনেকাংশে পাল্টে রাবণকাহিনী করে না নিলে মাইকেলের কাব্যটি সম্ভব হত কি? এই প্রক্রিয়াটির ফলে, অনুভূমিক অক্ষ বরাবর পাঠ্য থেকে পাঠ্যান্তরের বুনন গড়ে তোলে সমক্রমকে; অন্য দিকে, কাল থেকে কালান্তরে পাঠ্য পরম্পরার ঢাল বেয়ে, অনুক্রমের অক্ষ বরাবর চালু থাকে বশ্যতা ও প্রতিরোধের বাদ-প্রতিবাদ।

প্রাক্-থেকে উত্তর-পাঠ্য গড়ে ওঠবার প্রক্রিয়াটির নানা রকমফের। ক্ষেত্রবিশেষে তা কতটা জটিল হতে পারে, কেন্দ্রীয় নয় এরকম কয়েকটি পাঠ্যের সাহায্যে সে ব্যাপারে দু-একটি ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করা যেতে পারে। চীনা বাঁদর পুরাণটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে মূলত লোকায়ত কাহিনীর পিছনে কাজ করছে ইউয়েন চ্যাঙের ভারত-ভ্রমণের স্মৃতি। এবং পাঠ্যের আরো তল দিয়ে, ক্ষীণতরভাবে, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে রামায়ণের হনুমান কাহিনীর স্মৃতি। চীনা প্রেক্ষিত থেকে দেখলে বলা চলে, যে দেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন উক্ত শ্রমণটি সেদেশের পুরাণ থেকে কিয়দংশে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে বাঁদর চরিত্রকে। কিন্তু যে পাঠ্যের পিছনে প্রাক্-পাঠ্য হিসেবে তা সক্রিয় থাকছে, যার মধ্যে তা উক্ত হচ্ছে, মার্গ সাহিত্যের বনেদী বদ্ধ গঠন নয়, তাকে গড়ে তুলছে খাঁটি দেশজ এবং লোকায়ত আখ্যান আদর্শ; ফলে তার কাঠামোর মধ্যেই থেকে যাচ্ছে অনর্গলতার, নিজেকে বারেবারে ভেঙে অনবরত ডিঙিয়ে যাওয়ার ঝোঁক। উপমহাদেশ ব্যেপে তাই তৈরি হচ্ছে একই কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন পাঠ।

স্বার্থপর দৈত্যের রূপকথাটিতে খ্রীষ্ট স্বয়ং উপস্থিত। সুখী রাজপুত্র পড়বার সময়ে অনেকেই হয়তো খেয়াল করে দেখেন না যে এর প্রাক্-পাঠ্যটি আসলে বুদ্ধ-জীবনী। হয়তো আর্নল্ডের এশিয়ার আলো বা অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত পড়তে পড়তে মুগ্ধ ওয়াইল্ড ব্যক্তি-ইতিহাসের এই পুরাকল্পটি ভেঙে গড়লেন রূপকথাটি; তা করবার সময়ে আধ্যাত্মিক প্রাক্-পাঠ্যের পরিচয় সযত্নে গোপন রেখে, তা থেকে তাঁকে ছেঁকে নিতে হল তার নৈতিক নির্যাসটুকু। কাহিনীটির মধ্যে দু-একটি ইঙ্গিত অবশ্য রেখে দিলেন তিনি যে এর উৎস ভারতবর্ষ, বিশেষ করে মহাযান মতের অবলোকিতেশ্বরের ধারণাটি। বিহারে, হর্মিকের ওপর থেকে তিনি অবলোকন করেন ত্রিলোকের দুঃখ, আপ্লুত হন মুদিতা, করুণা ও উপেক্ষায়। রাজপুত্রের ক্ষেত্রেও কি ঠিক এটাই ঘটছে না? আর যে চোখ দিয়ে নগরের দুঃখ তিনি দেখছেন তা-ও তো গড়া হয়েছে সেই দুটি নীলকান্ত মণি দিয়ে যা, রাজপুত্র নিজেই জানাচ্ছেন, আনীত হয়েছে সুদূর ভারতবর্ষ থেকে। এইভাবে প্রাক্-পাঠ্যের পরিচয়টি সযত্নে গোপন রেখে, ইঙ্গিত-বহ কিছু ইশারার সাহায্যে, তার এবং উত্তর-পাঠ্যের মধ্যে লেখক গড়ে তুললেন একটি লুকোচুরির সম্পর্ক; ফলে

চিনেও চিনতে না পারার একটি অনুরণন ঘটতে দেখা যাচ্ছে পাঠকের মনে।

এক্ষেত্রে, প্রাক্-পাঠ্য এবং উত্তর-পাঠ্যের মধ্যে যে মেজাজের ব্যবধান গড়ে উঠল, ওয়াইল্ডের বিচারে তার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই প্রয়োজনটি আদৌ কেন অনুভূত হল ? বুদ্ধজীবনী বলতে যা আমরা বুঝি, তাঁর এই আধ্যাত্মিক পক্ষোদ্গমটি, মূলত হল অমনস্ক সম্পদের ঘেরাটোপ থেকে সুখী রাজপুত্রের বহির্গমন। দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে তাঁর প্রব্রজ্যা এবং অবশেষে তাঁর উত্তরণ। এই পুরাকল্পটির মধ্যে তার উত্থান-লগ্নেই, নানা উত্তর-পাঠ্যের বীজ উপ্ত হয়েছিল। জাতকের অসংখ্য কাহিনী থেকে শুরু করে ক্ষেমেন্দ্রের বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা পর্যন্ত, বা আর পরেও, সুদূর থেকে উঁকি মেরে মনে হয় নিমাই সন্ন্যাসের নানা পালার মধ্যেও, এই সব সম্ভাবনাই কি বাস্তবায়িত হয়ে উঠছে না ? 'কল্পলতা' শব্দটির মধ্যেই, পরম্পরা বেয়ে পাঠ্য থেকে পাঠ্যান্তরে, পুরাকল্পটির এই পল্লবায়নের সামর্থ্যকেই কি সূচিত করা হল না ? এই পল্লবায়নেরই একটি সম্ভাব্য অন্তিমে, কেবল তার নৈতিক তাৎপর্যটুকুকে মূর্ত করে গড়ে উঠল ওয়াইল্ডের কাহিনীটি।

উদ্ভবের অপর একটি যুক্তি মেনে, পল্লবায়নের অপর একটি প্রত্যন্তে এর সঙ্গে এসে যুক্ত হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথের নালক— প্রত্যন্তে, কেননা, কাহিনীটির মধ্যে অশ্বঘোষের প্রভাব সত্ত্বেও, বৌদ্ধ তত্ত্বাকাশের তলায় ঠিক নয়, বরং হিন্দু এবং বৌদ্ধ এই দুটি তত্ত্বাকাশের উভমুখে, গড়ে উঠছে কাহিনীটি। কথক নালকের মুখ থেকে আশ্রমের শ্রোতাদের জন্য কথিত হচ্ছে বুদ্ধজীবনের ধারাবিবরণী : মণ্ডলীর কথক ও শ্রোতারা অবৌদ্ধ ; আবার অবৌদ্ধ অবনীন্দ্রনাথ তা লিখছেন সাধারণভাবে তাঁর অবৌদ্ধ পাঠকদের জন্য। বাইরে থেকে পরিপাঠ্য যে ন্যায় গড়ে তুলছে তার চাপ এসে পৌঁছচ্ছে পাঠ্যের ভিতরে ; তার আভ্যন্তরীণ ঝোঁকও তাই যেন অনেকটা হল, বৌদ্ধ থেকে হিন্দু, একটি ধর্মের আবেষ্টনী থেকে অন্য ধর্মের তলায় এসে পৌঁছনো। লক্ষ করুন, আশ্রমে তথাগত যখন আগত-প্রায়, মায়ের ডাক কানে এসেছে নালকের, সেখান থেকে নিঃশব্দে বিদায় নিচ্ছে সে। এরে ভিখারী সাজায়ে কী রঙ্গ যে করা হল, ভেবে আকুল হচ্ছি আমরা।

নালককে— কিছুটা তার কাহিনীকেও হয়তো— অন্তেবাসী বলা চলে। কাহিনীটি বুদ্ধদেবের যতটা, নালকেরও ততটাই। সে সেই এলাকাটির বাসিন্দা যেখানে, পরস্পরের অন্তিমে, হিন্দু এবং বৌদ্ধ এই দুটি তত্ত্বাকাশ পরস্পরের কাছে পৌঁছেও বিযুক্ত থেকে যায়। এতক্ষণ যাঁদের উদ্দেশে বুদ্ধজীবনী কথিত হচ্ছিল বুদ্ধদেব অচিরে তাঁদের মধ্যে এসে পৌঁছবেন। তার আগেই কিন্তু কথক নালকের কানে এসে পৌঁছেছে তার মায়ের ডাক, সাড়া দিয়ে সে ফিরে চলেছে ঘরে, তার নিরাপদ হিন্দু বৃত্তে। তাই এতটা বছর বুদ্ধজীবনের ধারাবিবরণ দিলেও তাঁর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হবার আত্মিক সম্ভাবনা থেকে সে চ্যুত থেকে যাচ্ছে। তাই কি সে 'ভিখারী' ? এক দিকে বুদ্ধজীবনের তাৎপর্য সম্পর্কে আন্তরিক শ্রদ্ধা ; অন্য দিকে, মায়ের ডাক, ঐতিহ্য-লব্ধ হিন্দু নিরাপত্তার টান —পাঠ্যের মধ্যে এই উভ-টান নজরে পড়ছে কি ?

দুটি তত্ত্বাকাশের সন্ধিদেশে, তাদের নিজ নিজ প্রত্যন্তে, এইভাবে যে উত্তর পাঠ্যকে স্থাপিত করা হল, তার আরেকটি কারণ এটাও নিশ্চিত যে নিজের সাংস্কৃতিক পরিপাঠ্য থেকে যে তাগিদ ও আবেগ উপচে প্রবেশ করেছিল পাঠ্যে তার উদ্ভব-মুহূর্তে, ভিতর থেকে গড়ে তুলেছিল তার ন্যায়, তার নিজের মধ্যেই সক্রিয় ছিল সুগভীর উদ্বেগ-জনিত বিহ্বলতা। রাজেন্দ্রলাল, হরপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, কুমারস্বামী, হ্যাভেল, ওকাকুরা, নিবেদিতা— এসব নাম যে সাংস্কৃতিক আবহ এবং প্রকল্পের অনুষঙ্গ বহন করে, যদি একটি কোনো সূত্রে তাদের গেঁথে দিতে হয়, সেটা তো মনে হয় এটাই হবে : বৌদ্ধ গৌরবের পুনরুদ্ধার। এর সঙ্গে, সাংস্কৃতিক অনুশীলনের সূত্র ধরে কি অবনীন্দ্রনাথের নামটিও জুড়ে দেওয়া যায় না ? আমরা যে আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হারিয়ে আজ 'ভিখারী' হয়েছি, পরিপাঠ্য থেকে তাহলে সেই সাংস্কৃতিক উদ্বেগই সঞ্চারিত হচ্ছে পাঠ্যে : বুদ্ধজীবনের সূত্র ধরে গড়ে উঠছে নালকের কাহিনী।

বুদ্ধজীবনের এই পুরাকল্পটিকে যদি খ্রীষ্টীয় তত্ত্বাকাশের নীচে টেনে আনতে হয় তাহলে যে অসুবিধা দেখা দেয় তার চরিত্রটি বুঝে নেবার চেষ্টা করা যাক। পরস্পরকে বোঝবার ক্ষমতা বা প্রচেষ্টা দূরস্থান, অনন্বিত, নিঃসম্পর্ক, তাই পরস্পরের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে দেখা গেছে বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টীয় এই দুটি তত্ত্ববিশ্বকে। অপরিচিতির এই ব্যবধানের ফলে, এমনকি পরস্পর সম্পর্কে বিরুদ্ধ-প্রত্যয় গড়ে তুলে— মধ্যযুগের খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম যা গড়েছিল— আত্ম-পরের ভেদচিহ্নের সহায়তায় নিজেদের আলাদা করে চিনে নেবার আগ্রহ পর্যন্ত এ দুটি তত্ত্বাকাশের মধ্যে কোথাও নেই ; —অন্তত প্রাগাধুনিক যুগ পর্যন্ত তা ছিল না : পুরাকল্পটিকে খ্রীষ্টীয় তত্ত্বাকাশের গোচরে আনতে হলে, হয়, খোল-নলচে পাল্টে রঙিন খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের মোড়কে সাজিয়ে নিতে হয় তাকে ; নতুবা, দুটি অসম্পৃক্ত তত্ত্ববিশ্বের সম্পূর্ণ বাইরে, রূপকথার কান্তারে স্থাপিত করতে হয় তাকে। আশ্চর্যের কথা, ঠিক এটাই ঘটতে দেখা গেল আগে-পরে, এক সহস্রকের দুটি প্রান্তে।

ডামাস্কাসের পথ ধরে বুদ্ধজীবনের পুরাকল্পটি যখন ইউরোপে প্রবেশ করেছিল, সেই প্রথমবার বার্লাম এবং জোসেফাট, উক্ত সন্তদ্বয়, হাজির হয়েছিলেন খ্রীষ্টানের পোশাকে। জোসেফাট নামটির তল দিয়ে যে বোধিসত্ত্ব নামটি উঁকি মারছে আমরা তা বুঝি, কাহিনীটির প্রচারক সন্ত জন বা সিমেঅন থিওফ্রাসটাস তা টের পাননি। সন্দেহ নেই, ব্যাপারটি হাস্যকর। তাই, বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টীয়, এই তত্ত্বাকাশদুটির সম্পূর্ণ বাইরে, একটি সর্বজনীন মানবিক তাৎপর্যে গড়ে পিটে নিতে হবে পুরাকল্পটিকে, আমাদের দিকে, সহস্রকের নিকটতর প্রান্তে, নিজের ওপর এটাই ছিল ওয়াইল্ডের দাবি। অবিকল এক না হলেও চিত্রশিল্প বা মূর্তিতত্ত্বে তুলনীয় একটি পরিবর্তনকে প্যানোফস্কি অভিহিত করেছেন আইকনোট্রপি বলে : লিম্বো থেকে আদমকে ছিনিয়ে আনছেন যীশু এবং তা অবিকল সেই ভঙ্গিতে যে ভঙ্গিতে, প্রাচীনতর শিল্পরীতিতে, হারকিউলিসকে দেখা যেত হেডিস থেকে সেরবারাসকে ছিনিয়ে আনতে। সে যাই হোক, পুরাকল্পটিকে ঢেলে

সাজাবার ব্যাপারে ওয়াইল্ড কতদূর সফল হয়েছিলেন সে বিষয়ে, অধ্যাপক বুশরুই যেমন লক্ষ করেছেন, একটি মন্তব্যই মনে হয় যথেষ্ট হবে : য়েটসের মতে, সুখী রাজপুত্র-ই হল তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা ভেবে দেখা যেতে পারে। আমি যাকে প্রাক্-পাঠ্য বলেছি, যেমন যীশুর ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রথম তিনটি সুসমাচার, তার তল দিয়ে উঁকি মারতে পারে প্রাচীনতর প্রত্ন-পাঠ্যের স্মৃতি। এক্ষেত্রে প্রত্ন-সুসমাচারটির বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন পণ্ডিতেরা। তবে ধর্মীয় অনুষঙ্গ প্রবল বলে, প্রত্ন-, প্রাক্- এবং উত্তর-, সব পাঠ্যের ক্ষেত্রেই উপাদান হিসেবে খোঁজ মিলবে পুরাকল্পের টুকরো টুকরো নানা বা অখণ্ড একটি সামগ্রিকের। যীশুর, বা যে তত্ত্বাকাশ তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠল তার ক্ষেত্রে উপাদানগুলি হল : ঈশ্বর-দ্রোহ, উষার পুত্র লুসিফারের স্বর্গচ্যুতি, প্রথম মানবের অবাধ্যতা ও পতন, ত্রাতা দেবতাটির জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান, আর্মাগেডনে শুভ বনাম অশুভ-র ভাবী মহাহব এক শেষ বিচার। পুরাকল্পটির মধ্যে কার্যকর এসব বা আরো নানা উপাদান খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসকে পিছন দিকে যুক্ত করছে— নিকট- ও মধ্য-প্রাচ্যের প্রাচীনতর নানা ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ; যেমন, সামনের দিকে, তারাই আবার তাকে যুক্ত করে চলল পল্লবায়িত অসংখ্য উত্তর-পাঠ্যের সঙ্গে।

সমক্রম ও অনুক্রমের অক্ষ বরাবর, পাঠ্য থেকে পাঠ্যান্তরের ঢাল বেয়ে বিস্ময়কর স্ফীতি ও বিস্তার ঘটল মূলত অনুলোম পাঠ্যের। তারা সংখ্যায় যত অজস্র, ভাববৈচিত্র্য ও বিষয়মহিমায় ঠিক ততটাই সমৃদ্ধ। ম্যাজিক মাউন্টেনের পিটারকর্ন কি কিয়দংশে যীশুরই শিলষ্ট রূপায়ণ বলব? কিছুটা পর্যন্ত শহিদ দেবতাটির আত্মক্ষয়ী ভালবাসাকেই তো ডস্টয়েভস্কি রূপ দিলেন ইডিয়ট-এ। কেন্দ্রীয় পাঠ্যের বাইরে সরে এসে বলা যায়, আকারে এবং চরিত্রে যা বাহ্যত ধর্মীয়, ওয়াইল্ডের মতো, তার খোলস ছাড়িয়ে এই পুরাকল্পটিকে, অন্তত তার কোনো কোনো নির্বাচিত উপাদানকে তো রূপকথায় পরিণত করা যায়। তাঁদের নিজেদের রূপকথায় তো ঠিক এটাই করলেন ধার্মিকপ্রবর সি এস লিউয়িস এবং যিনি আদৌ ধর্মধ্বজী নন সেই সাঁৎ-এক্সুপেরি। অথবা স্মরণ করুন হের্নার ভ্যান ডাইকের রূপকথাটি, যেখানে প্রাক্-পাঠ্যে অনুল্লেখিত চতুর্থ মেগাসটি, তিন মেজাই-এর পুরাকল্পটির বিপরীত ন্যায়ে, অবশেষে এসে পৌঁছলেন— তবে, না, সদ্যোজাত ত্রাতা দেবতাটির পায়ে তাঁর উদয়ে অস্তমিত-মহিমা প্রাচীনতর ধর্মবিশ্বাসের শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্যটি দেবার জন্য কেবল নয় ; আর্তের দুঃখমোচনে পথে বড় দেরি করে ফেলেছেন তিনি। তাই প্রেম ও ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে ক্রুশে বিদ্ধ দেবতাটির মৃত্যু যন্ত্রণার শরিক হতে এলেন তিনি। অন্য তিন মেজাই যা পারেন নি, তিনি তা পারলেন : যীশুজীবনের প্রকৃত তাৎপর্যের কাছে এসে তিনি পৌঁছলেন। অনুলোম পাঠ্য হলেও, কান পাতলে এর মধ্যে প্রাক্-পাঠ্য সম্পর্কে মৃদু অভিযোগ যেন একটা শোনা যাচ্ছে। কেননা এই নিখাদ ভক্তের কথাই তো বলা হয় নি সেখানে।

খ্রীষ্ট ধর্মের ক্ষেত্রে, প্রাক্-পাঠ্যকে ঘিরে উত্তর-পাঠ্যের এই বিস্তার ও ঘনত্ব তুলনারহিতভাবে

সমৃদ্ধ। কিন্তু এই বিস্ময়কর সমৃদ্ধিই কি তত্ত্ববিশ্বটিকে— না, বহিরাক্রমণের ফলে নয়, ভিতর থেকেই— ভেদ-চিহ্নিত, তাই দীর্ণ, করে তোলে না? অনুলোম পাঠ্যের অনন্ত পর্যায় তৈরি হয়েছে। তাদের চিনে নিতে নিতে কোথায় এসে থামব; বলব, না, অনুলোম পাঠ্য শেষ হয়েছে এবার, এখান থেকে শুরু হয়েছে প্রতিলোম পাঠ্য? এবং প্রতিলোম পাঠ্যের খোঁজ নিতে নিতে কোথায় থামব, বলব; প্রতিবাদের দুঃসাহসে মরিয়া. প্রতিলোম পাঠ্যই এ জায়গাটিতে এসে আমাদের পেঁাছে দিচ্ছে তত্ত্বাকাশের বাইরে, অন্তত তার নির্গমনের মুখে, বহির্দ্বারে? কদাচিৎ হলেও এরকম ঘটনা ঘটে—ফয়েরবাক পথ ছেড়ে দেন মার্ক্সকে: ইহ-বিমুখতার খ্রীষ্টীয় যুক্তিকে নাকচ করে গড়ে ওঠে ঐহিকতার তাগিদ ও তার তাত্ত্বিক স্বীকৃতি। বিজ্ঞানের জগতে তুলনীয় ভাববিপ্লবটি ঘটলে, কুনকে অনুসরণ করে বলা চলত, সব কিছুকেই এখন ছ'কে নিতে হবে বলবান এবং উর্বর নতুন তত্ত্বপটের মধ্যে, তার যুক্তিতে।

তবে তা যদি নাও ঘটে, খ্রীষ্টীয় তত্ত্বাকাশটির মধ্যেই যদি থেকে যাই আমরা, একথা না মেনে তো উপায় থাকে না যে এত বৃহৎ দেশ ও কাল পরিধি ব্যেপে, দুহাজার বছর ধরে যা অবিরাম গড়ে উঠেছে, ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী অভিপ্রায় যাকে বারেবারে ভেঙে পুনর্নির্মিত করে এসেছে, সেই তত্ত্ববিশ্ব তো কোনো মতেই একটি নির্দিষ্ট, স্থাণু, ছেদহীন, গোটা একক নয়। মরুকান্তারে প্রলোভনকে জয় করে মিল্টনের যীশু মানুষের হয়ে পুনর্বার স্বর্গারোহণের সম্ভাবনাকে অর্জন করেন; অন্য দিকে, প্রলুব্ধ বলেই কিন্তু কাজান্ট-জাকিসের যীশু ফিরে পান মানুষ হিসেবে তাঁর আত্মিক উত্তরাধিকার: মানুষের রিরংসা। তত্ত্বজিজ্ঞাসার চরিত্র ও গুরুত্বে মিল্টন এবং কাজান্টজাকিস যে নিতান্তই অসম এবং বিসদৃশ তা আমি জানি; তা-ও যে উদাহরণদুটি দিলাম তার কারণ শুধু সম্ভব হলে এটা দেখানো যে, ভিতর থেকেই, খ্রীষ্টীয় তত্ত্বাকাশ কতটা অনেকান্ত, বিরোধী সম্ভাবনা এবং আকাঙ্ক্ষার দ্বারা কতটা দীর্ণ।

এর একদিকে, বিবিধ মুক্তিকামী প্রতিলোম পাঠ্য এবং পঠনের মধ্যে সাক্ষ্য দিচ্ছে রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিধিনিষেধকে পদে পদে ভেঙে, নিজের ঐহিকতাকে অকপটে মেনে নেবার সততা ও সাহস; তাই রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক অবদমনের বিরুদ্ধে, নানা তাৎপর্য-সহ এবং নানা লয়ে, গড়ে উঠছে ব্লেকের নানা পাঠ্য বা আমাদের সময়ে ব্র্যান্ডন বা কার্দেনালের পঠন ও পাঠ্য। এর বিপরীতে, সার্বিক অবদমনের শক্তিকে পুষ্ট করবার তাগিদে নিজেদের যথাসাধ্য নিয়োজিত করছে খ্রীষ্টীয় তত্ত্ববিশ্বের সবচাইতে ক্ষুরধার সব মেধা: সন্ত পল এবং সন্ত অগাস্টিন থেকে পাস্কাল এই অর্থে গড়ে তুলছেন সর্বাঙ্গীণভাবে ইহ-বিমুখ, আত্মনিপীড়নের আদর্শে উদ্বুদ্ধ সব তাত্ত্বিক পাঠ্য ও পঠন। একই ভাবলোকে তবে এতটা অনৈক্য!

নিঃসন্দেহে, বশীভূত তাত্ত্বিক ঝোঁক ও প্রেরণাটি যে অর্থে মতাদর্শগত আধিপত্যের মধ্যে ওতপ্রোত, প্রতিবাদী প্রেরণাটি তা নয়। ফলে, যেসব প্রতিলোম পাঠ্যে দ্বিতীয় বর্গের ঝোঁক ও আদর্শগুলি ব্যক্ত ও মূর্ত হচ্ছে, সামাজিক উপস্থিতির বিস্তার ও ঘনত্বে

তা অসম। টেম্পটেশ্যান অব্ দ্য ওয়েস্ট-এর চীনা যুবকটি চিঠিতে যে বিস্ময় ব্যক্ত করেছিল তার যুক্তি উঠে এসেছিল এই তর্কাতীত অপ্রতিসাম্য থেকে : কেন চিত্র, ভাস্কর্য, সংগীত, সাহিত্য, লোককথায় ; কেন ধর্মবিশ্বাস, অভ্যাস ও তত্ত্বচিন্তায়, কেন তার চৈতন্যকে পরিব্যাপ্ত করে, প্রতীচ্য সভ্যতা তার উপ্যাসের বেদীতে বসায় এক ক্লিষ্ট, দুঃখী দেবতাকে ? কী সে খুঁজে পায় আর্তির, আত্ম-নিগ্রহের এই নিরুপম আদর্শটির মধ্যে ? গ্রুনেভাল্ড থেকে রুয়ো পর্যন্ত এই প্রেমিক ত্রাতা-দেবতাটির যন্ত্রণা-দীর্ণ মুখচ্ছবির কথা স্মরণ করুন। আর্তিকে ঘিরে এই মহোৎসবের পিছনে কি, নীটশের অভিযোগ মাথায় রেখে প্রশ্ন করা যায়, অবদমনের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা গোষ্ঠী-চৈতন্যের মর্ষকামী অসুস্থতা সাক্ষ্য দিচ্ছে না ? প্রতীচ্য ভাবলোকে, ক্রুশে বিদ্ধ দেবতাটির এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থতার কথা মাথায় রেখেই মনে পড়েছে শ একবার তাঁর স্বভাবসুলভ তির্যক পরিহাসের সুরে কোথায় যেন বলেছিলেন : ক্রিশ্চিয়ানিটি নয়, ক্রশচিয়ানিটি।

বশ্যতা ও প্রতিরোধের জটিল দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায়, নানা পর্যায়ে নানা লয়ে, ভাবাদর্শগত আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। একটা ধাপ পর্যন্ত, প্রাক্-পাঠ্যের অনেকান্ত দীর্ণতার সুযোগ নিয়ে, নির্বাচিত পঠনের সহায়তায় বেছে নিজের স্বপক্ষে যুক্তি আদায় করে প্রতিলোম উত্তর-পাঠ্য। সংকটের বোধ তীব্রতর হয়, দ্রুততর হয় পরিণতি পাবার লয়টি। দীর্ণতা এবং আত্ম-বিরোধের প্রবলতর বোধটি প্রতিবাদী ঝোঁকগুলিকে তাগিদ দিয়ে ঠেলে দিতে থাকে তত্ত্বাকাশটির বাইরে। এই প্রক্রিয়াটি তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলে দেখা যায় তত্ত্বপটটি পরিত্যক্ত হয়েছে, পরিবর্তে গৃহীত হয়েছে বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধের— অর্থাৎ মনন ও অভীপ্সার— যৌথ উদ্যোগে রূপায়িত নতুন একটি তত্ত্বপট। পরিবর্জিত তত্ত্বপটটির অনেক উপাদান অবশ্য জায়গা করে নেয় নতুন তত্ত্বপটটিতে, তবে তারা তা নেয় সংগঠক বিন্যাসের নবীনতর যুক্তি মেনে, পরিবর্তিত তাৎপর্য সহ। যা বড় কথা তা হল, নতুন তত্ত্বপটটি দেখা যায় জায়গা করে দিচ্ছে সেইসব গূঢ়েষা এবং মূল্যবোধকে, তার উদ্ভবের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যা যা ছিল নিষিদ্ধ, তাই অবদমিত। অবলুপ্ত হয় বিভাজন, ব্লেকের নরক থেকে উন্নীত গূঢ়েষা মুক্তি পায় আপ্ত-কাম মানুষের বেঁচে থাকবার দৈনন্দিন স্বর্গে।

স্বর্গ ও নরক সমীকৃত হবে, দ্বিভাজিত ব্যক্তিসত্তা ফিরে পাবে তার অখণ্ডতা— এটাই ছিল ব্লেকের প্রতিবাদী বিশ্বাস। কি খ্রীষ্ট জগতে, কি তার বাইরে, কাঙ্ক্ষিত হলেও মনে হয় না সম্ভাবনাটি খুব কিছু নিকটবর্তী। প্রতিবাদ তা বলে থেমে থাকেনি। তা তৈরি হয় ও হচ্ছে ; এবং, নিঃসন্দেহে, একটি জটিল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াই তাকে সম্ভব করে তুলছে। একই সঙ্গে এটাও কি ঠিক নয় যে একেবারে তার গোড়ায়, খ্রীষ্টীয় পুরাণের কেন্দ্রেই, এমন কিছু উপাদান সক্রিয় ছিল যেগুলি পুষ্টি জুগিয়েছিল এইসব প্রতিবাদী উত্তর-পাঠ্যকে ? মৃত্যুর মধ্যেই দুঃখী দেবতাটির তাৎপর্য নিঃশেষিত হচ্ছে না, তাকে তিনি জয় করছেন। ফীনিক্সের চালু উপমাটির সহায়তায় বলা চলে নিজের ভস্মাবশেষ থেকেই উত্থিত হচ্ছেন তিনি। তল দিয়ে পুরাকল্পটির মধ্যে

ক্রিয়াশীল ঐ দো-টানাকেই আবার পুষ্টি জুগিয়েছে আরো নানা প্রত্ন-স্মৃতি ও বিশ্বাস, এবং তাদের ঘিরে গড়ে ওঠা আরো নানা প্রত্ন-ধর্ম। ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-প্রাচ্যে মিশর থেকে একটি বৃত্ত এশিয়া মাইনর হয়ে পৌঁছল গ্রীসে: ওসিরিস থেকে ডায়োনিসাসের উপাসনাকে ঘিরে, সামগ্রিকভাবে এই এলাকাটিতেই তাহলে মৃত্যু-বিজয়ের প্রত্ন-স্মৃতিটি সক্রিয় ছিল।

আমার বক্তব্য শুধু এটাই যে তল থেকে তাগিদ দিয়ে এসব প্রত্ন-পাঠ্যই মনে হয় খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যে এনে দিয়েছিল মৃত্যু-বিজয়ের দ্যোতনা। শুধু আর্তির মহোৎসব নয় তাহলে, পুনরুত্থান বা মৃত্যু-বিজয়ের কল্পনার মধ্যে একই সঙ্গে ঐহিকতার বোধটিও সক্রিয় ছিল, যেমন সক্রিয় ছিল তাকে স্বীকৃতির দাবি। ঐতিহাসিক পিচ্ছিলতার কারণ মেনে পাঠক্রিয়ার তাগিদ ও ভর বারে বারে সরে গিয়েছে নিশ্চিত, কিন্তু মূলত পুরা-কল্পের এসব উপাদানের মধ্যে থেকেই, অবদমিত ঐতিহাসিক আকাঙ্ক্ষাকে তাত্ত্বিক বৈধতা দেবার তাগিদেই তা গড়ে তুলেছে নানা প্রতিলোম পাঠ্য।

সব পাঠ্যই উত্তর-পাঠ্য। সব পাঠ্যের মধ্যেই, চুপ করে হলেও, কার্যকর থেকে যায় এক বা অনেক প্রাক্-পাঠ্য সম্পর্কে তাত্ত্বিক সায় বা আপত্তি; এই সায় বা আপত্তিকেই বলা চলে পূর্ববর্তী ঐ ঐ পাঠ্য বিষয়ে তার তার মতাদর্শগত তবে অন্তর্লীন পঠন। উদাহরণ স্বরূপ, কাঁদিদ-এ এই পঠন, তার সোচ্চার বিতর্কশীলতার সঙ্গে সংগতি রেখে, উচ্চ-গ্রাম; অন্য দিকে, নর্দাঙ্গার অ্যাবি-র ক্ষেত্রে পাঠ্যে প্রযুক্ত পঠনটি শ্লিষ্ট, ফলে ঊন-কণ্ঠ; তাই তাকে শুনতে হলে, মনোযোগকে সংহত করে আমাদের কান পাততে হয় পাঠ্যে এবং, তাকে পেরিয়ে, কোনো কোনো প্রাক্-পাঠ্যে— এক্ষেত্রে যেমন হয়তো মিস্ট্রিজ অব্-উডালফো-তে।

উত্তর পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে যায় সায়- বা আপত্তি-সূচক অন্তর্লীন যে পঠনটি ডুব-জলের নীচে অনেক সময়েই সে দেখা যায় মৌন-ব্রতী। টুঁ শব্দটি করতেও সে মনে হয় নারাজ। বস্তুবিবেকের কথা যা আগে উঠেছে, তা খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে এই জায়গাটিতে। কারণ পাঠ্যে অন্তর্লীন তাই প্রায়শ দৃশ্যাতীত এই পঠনকে খুঁজে চিনে বুঝে বাজিয়ে নিতে হয়। এখানে যা খুব প্রয়োজনে আসে, যা ব্যতীত আমাদের একেবারে চলে না, তা ঐ বস্তুবিবেক— অর্থাৎ পাঠক্রিয়ার সংবেদনা, তার প্রবল ঘ্রাণশক্তি।

বশ্যতার পারম্পর্যকে মেনে তাকে আপ্রাণ টিকিয়ে রাখে বশংবদ অনুলোম উত্তর-পাঠ্য, যেমন প্রাক্-পাঠ্যের ন্যায়কে সচেতন প্রয়াসে তছনছ করে, অন্তত কিছুটা তার বিরুদ্ধতায়, নিজেকে গড়ে তোলে প্রতিটি প্রতিলোম উত্তর-পাঠ্য। গ্রহণ ও বর্জনের যুক্তি মেনে পোষক প্রাক্-পাঠ্য থেকে এভাবেই সব উত্তর-পাঠ্য জোগাড় করে নিজেদের পুষ্টি। তবে পুষ্টি যেমন তারা জোগাড় করে, তারা তা ফিরিয়েও দেয়। সমক্রমের তো বটেই, অনুক্রমেরও অক্ষ বরাবর, তার উভ-মুখী ঢাল বেয়ে, চালু থাকে নব নব তাৎপর্যের

আদান-প্রদান। এই অর্থে তারা দো-রোখা। তাই অতীতই যে শুধু পুষ্ট করে ভবিষ্যৎকে তা নয় ; রদবদল সহ, মতাদর্শগত পরিবর্তনের প্রতিটি বাঁকে, ঐতিহ্য ব'লে যা আমরা ছকে নিচ্ছি তার মারফৎ, বর্তমানও ফিরে গিয়ে উৎপাদন করে, অর্থাৎ নব নব আদল দেয়, অতীতকে।[১০] অবশ্য উত্তর-পাঠ্যের চাইতেও আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এক্ষেত্রে পালন করে বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক পঠন ; তাদের তাত্ত্বিক সক্রিয়তাই শিলীভূত, চলচ্ছক্তিরহিত ঐতিহ্যকে ভাঙে-গড়ে, নব নব তাত্ত্বিক সীমা, আকার ও চরিত্র দেয় ; গড়ে ওঠে, রেমন্ড উইলিয়ামসের ভাষায়, নির্বাচিত ঐতিহ্য : নির্বাচিত শুধু নয়, যা নির্বাচকও। পাঠ্য-পরম্পরার কোন্ কোন্‌টি ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত, কেন, তা সে বারেবারে পুনর্বিবেচনা করে ; যাকে আমরা সংস্কৃতি বলছি, গড়ে ওঠে তার ক্রম-পরিবর্তিত নানা আদল।

অনুলোম উত্তর-পাঠ্য প্রাক্-পাঠ্যের ন্যায়কে গভীরতা ও বিস্তার দেয় ; তার মধ্যে যেসব সম্ভাবনা অবিকশিত ছিল তারা সম্পূর্ণতা ও পরিণতি পায় উত্তর-পাঠ্যের দ্বারা। গড্ডলিকা-বৎ হয়তো নয়, কিন্তু সে অনু-গত, তাই প্রাক্-পাঠ্যের ন্যায়কে মাঝে মাঝে ছাপিয়ে উঠতে চাইলেও তার এই উদ্বেলতা একটি সাময়িক প্রবণতা মাত্র ; তাকে সে নিয়ন্ত্রণে আনে শেষ পর্যন্ত। অন্য দিকে, পোষক পাঠ্যের যুক্তিকে চিনে, কম বা বেশি, তাকে ভাঙতে পারাটাই হল কিন্তু, প্রতিলোম উত্তর-পাঠ্যের ক্ষেত্রে, নিজেকে গড়ে তোলবার একটি পূর্বশর্ত ; অন্তত অন্তর্লীন পঠনের এই তাগিদই ভিতর থেকে তাকে সচেষ্টতা জোগায়। এর ফলে মতাদর্শগত বদ্ধতা প্রাক্-পাঠ্যের মধ্যে কোথায় কী ছিল, জটগুলি খুলে কিভাবে তাকে নিরর্গল করে দেওয়া যেতে পারে— সে তৎপর হয় এসব সমস্যাকে ঘিরে।

পাঠ্য চক্ষুষ্মান। নিজের মনোযোগকে সে সংহত করতে পেরেছে, ফলে আলোকপাত ঘটেছে কতকগুলি নির্বাচিত প্রশ্নের ওপর। তবে খুব বড় একটা দাম দিয়েই কিন্তু এই সংহতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে তার পক্ষে : মনোযোগের বাইরে, নির্বাক অন্ধতার মধ্যে সে ঠেলে দিতে বাধ্য হয়েছে অপর কিছু প্রশ্নকে যেগুলি তার বিবেচনায় অন্তর্ঘাত-মূলক। তারা অনুত্থাপিত রয়ে গিয়েছে। নিজের মধ্যে অবদমনের সূত্রটিকে এভাবে কার্যকর করেই কেবল পাঠ্য নিজেকে গড়ে তুলতে পারে, এখানেই তার তাত্ত্বিক বদ্ধতা।

সাহসী নতুন পৃথিবীর আশ্চর্য সব মানুষের কল্পনায় উদ্দীপিত হয় মিরান্ডা। অথচ তার চোখের সামনে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তার মনোযোগের বাইরে, পড়ে থাকে ক্যালিব্যান। মিরান্ডার অর্থে না হলেও 'নতুন বিশ্ব'-এরই সন্তান সে। তথাপি, একলব্যের মতো, সে পরাভূত, তাই সার্বিক অবদমনের শিকার। টেম্পেস্ট নাটকটিকে তার প্রেক্ষিত থেকে সাজালে কী রূপ সে পেতে পারে, তার মুখ থেকে যে ভাষা কেড়ে নেওয়া হয়েছে[১১] কিভাবে তাকে তা ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে—প্রাক্-পাঠ্য থেকে এসব প্রশ্ন বিতাড়িত। এই মতাদর্শগত সচেতনতা তাগিদ দিয়ে গড়ে তোলে প্রতিলোম

উত্তর-পাঠ্যকে। পাঠ্য-পারম্পর্য বলে যাকে অভিহিত করা হয়েছে, সমর্থন, বর্জন ও পুনর্গঠন সহ, এভাবেই তা চলতে থাকে।[১২]

প্রতিটি পাঠ্যই যেহেতু উত্তর-পাঠ্য, এটা তাহলে দেখা গেল, তার মধ্যে, নীরব বা মুখর, অন্তর্লীন হয়ে থেকে যাচ্ছে পঠন এবং প্রাক্-পাঠ্যকে চিনিয়ে দিয়ে গড়ে তুলছে তার ওপর নির্ভরশীল উত্তর-পাঠ্যের ন্যায়। অন্য দিকে, এটা কিন্তু মাথায় আমাদের রাখতে হয় যে সাধারণভাবে তাকেই কেবল পঠন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে যা কোনো উত্তর-পাঠ্যের অন্তর্গত নয়; সে বহিরঙ্গ, উত্তর-পাঠ্যের বাইরে একটি স্বতন্ত্র অবস্থান ও অস্তিত্ব রয়েছে তার : সে নিছকই, কেবলই একটি পঠন। তাই নির্বাচিত একটি প্রাক্-পাঠ্যের সঙ্গে ব্যাপৃত হতে পেরেই সে চরিতার্থ— এমনকি তখনো, যখন ঐ পাঠ্যটির সচেতন বিরুদ্ধতায় সে নিজেকে উচ্চারিত করে। উত্তর-পাঠ্যের ভিতরে, তার সঙ্গে অন্তর্লীন হয়ে সে সক্রিয় নয়; তার অবস্থানটি বাইরে, সাংস্কৃতিক মেরুকরণে প্রাক্-পাঠ্যের দিকটি ঘেঁষে; তার সঙ্গে ব্যাপৃত হবার জন্য যথাশক্তি নিজেকে উজার করে দিতে পারলেই সে কৃতার্থ।

নবজাত পাঠ্যের মধ্যে লীন হয়ে যে পঠনটি রয়েছে, তার মুখটি ঘোরানো ভবিষ্যতের দিকে, কেননা আভ্যন্তরীণ ন্যায়টি জুগিয়ে উত্তর-পাঠ্যকে পুষ্ট করছে সে। কিন্তু সাধারণভাবে পঠন বলে যাকে অভিহিত করা হয়েছে, উত্তর-পাঠ্য থেকে দূরে তার বহিরঙ্গ সাংস্কৃতিক অবস্থান, তার বর্তমান তাকে তাগিদ জোগালেও সে প্রেরিত হচ্ছে অতীতে, প্রাক্-পাঠ্যের দিকে। তাই সৃষ্টিশীলতার সম্ভাবনা কোনো আগ্রহ জাগায় না তার প্রাক্-পাঠ্যের প্রতি উৎসর্গীকৃত চৈতন্যে। নিজের সীমাবদ্ধতার দায় মেনে নির্বাচিত গণ্ডিটুকুর মধ্যেই সে সক্রিয় থেকে যায়। সে কি সজাগ? পাঠ্য যখন যখন এবং যেখানে যেখানে, নিশ্চুপ, তার ইশারাগুলি কি সাড়া জাগাচ্ছে তার উৎকর্ণ বিবেকে? পাঠ্যের প্রায়ান্ধকার বা অন্ধকারকে যে সে ভেদ করবে, তার অন্তর্দৃষ্টি কি ক্লান্তিহীন-ভাবে এতটা অনুসন্ধিৎসু? তার ধ্যানের মধ্যে কি রূপ পাচ্ছে পাঠ্যের সামগ্রিক? তা যদি হয়, তবেই সে চরিতার্থ। বলা বাহুল্য, সামগ্রিকের এই নির্দিষ্ট ধ্যানটি যে এককভাবে বৈধ, এমন কোনো অহংকৃত দাবি সে রাখছে না কিন্তু। বস্তুত সে সন্দেহ-পিশাচ, তাই বিশ্বজনীনতা ওরফে বৈজ্ঞানিকতার প্রতি তার ঘোর অবিশ্বাস।

সৃষ্টিশীল যে সে নয়, তা দেখা গেল। কিন্তু সে বিনয়ী; ব্যাপৃত, তাই নিরলস; বস্তুবিবেক এবং তন্নিষ্ঠা তার মধ্যে ক্লান্তিহীনভাবে সক্রিয়, তাই সে মূলত সৎ। সর্বোপরি, চূড়ান্ত পরিণতির মুহূর্তে, যখন সে চরিতার্থ, তাই নিজের অন্বিষ্ট যখন তার ধ্যানের অঙ্গীভূত হয়েছে, সে আর দৃশ্যমান থাকে না— অন্তত থাকবে যে না, নিজের ওপর এই দাবি সে রাখে। তা সে রাখতে বাধ্য কারণ সে হয়ে উঠতে চায় সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ এবং অনাবিল। তার মধ্যে যা দৃশ্যমান হয়ে উঠছে তা তার অনচ্ছ, স্ফীত অহং নয়, পাঠ্য স্বয়ং। তাই তার দিকে মনোযোগ দেবার সময়টিতে, তাকে নয়, বস্তুত তার নিরহংকার আত্মোৎসর্গের সূত্র ধরে, তাকে পেরিয়ে আমরা দেখি,

অন্তত দেখবার কথা, পাঠ্যকে। এভাবেই, তার মধ্যে কার্যকর অভিপ্রায়ের পরিণতির মুহূর্তে দৃশ্যত অন্তর্হিত হচ্ছে পঠন ; এবং তার তিরোধানের এলাকাটিতে, ঐ অন্তর্ধান-পটে, এসে উক্ত হচ্ছে দূর থেকে আবির্ভূত পাঠ্য, বিশেষ করে তার তাৎপর্য। সুতরাং যা উক্ত হল, তার দাবি শুধু এইটুকু, তা পাঠ্যের দূরাগত অনুরণন মাত্র, নতুবা পঠন নিজে বোবা। বোবা, হ্যাঁ, তবে মনে রাখা প্রয়োজন, বধির সে নয়।

বাচাল পঠনও অবশ্য আছে— বাচাল এই কারণেই যে তা বধির। পাঠ্য কী বলছে, তা সে শুনতে পায় না, সে আগ্রহও তার নেই। প্রথমেই কিন্তু স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, আত্ম-বিলোপনের প্রায়-মর্ষকামী ঝোঁকটি সত্ত্বেও, এমন কোনো সৎ পঠন সত্যি নেই যা পুরোপুরি স্বচ্ছ ও নির্বাক, তাই নিজের অবস্থান থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ধুয়ে-মুছে অন্তর্হিত হতে যা পেরেছে। তার ঐতিহাসিকতা, তার মতাদর্শগত ঝোঁক ও তাত্ত্বিক ভর তাকে ন্যূনাধিক আবিল ও অনচ্ছ— অথবা, অন্য প্রেক্ষিত থেকে দেখলে, বর্ণাঢ্য ও প্রোজ্জ্বল— করে তোলে। সুপরিণত হবার মুহূর্তে সে যে আর দৃশ্যমান থাকে না, তা যে থাকবার কথা নয় তার— এটা তার সাফল্যের চূড়ান্ত তাত্ত্বিক সীমা, তাই বাস্তবে সম্পূর্ণ প্রাপণীয় হয়তো নয়। তবে এই তাত্ত্বিক সীমাটিকেই আদর্শ হিসেবে মাথায় রেখে প্রতিটি তন্নিষ্ঠ পঠন ব্যাপৃত করে নিজেকে ; আগেই যেমন বলা হয়েছে, নিজের ওপর এই তার চূড়ান্ত দাবি।

এদের ঠিক বিপরীত মেরুতেই কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে সেইসব পঠন যাদের বধির তাই বাচাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আত্ম-কেন্দ্রিকতা এদের কোনোটিকে বিশ্বস্ত হতে দেবে না পাঠ্যের প্রতি, এদের যে কোনোটির দ্বারা গ্রস্ত পাঠ্য ফলে নিজেই তার দৃশ্যমানতা হারায়। এই অহংকৃত পঠন সোচ্চার ও সশব্দ, তাই তার কাছে এসে কান পাতলে, কী যুক্তি মেনে পাঠ্য কী বলছে তা শোনবার উপায় থাকছে না কোনো। পঠন থেকে গায়েব পাঠ্য এক্ষেত্রে অদৃশ্য ও নির্বাক ; এবং তাকে ও তার তাৎপর্যসমূহকে গ্রাস, অন্তত আড়াল, ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে দখলদার বাচালটিকে। এ যতটা স-শব্দ ঠিক ততটাই কালা, তাই অজিজ্ঞাসু। এই ঔপনিবেশিক পঠনের বাস্তবতাকে মেনে যে আমাদের নিতে হয় তা এই সহজ কারণেই যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে পটু এই পঠনটি বাচাল, তাই মনোযোগ দিই বা না দিই এর উচ্চ-গ্রাম ঢক্কা-নিনাদ শুনতে আমরা কার্যত বাধ্য। এসব পঠন যে বিদ্যমান তার যুক্তিকে তারা সংগ্রহ করে নেয় নিজেদের চিৎকৃত সাংস্কৃতিক উপস্থিতি থেকে ; তারা আছে, এটাই তাদের থাকবার একমাত্র যুক্তি।

এতক্ষণ যে গোত্রের পঠনের কথা বলা হল, প্রতিলোম উত্তর-পাঠ্যের সঙ্গে তাদের গুলিয়ে ফেললে বড় একটা ভুল হয়ে যাবে। প্রাক্-পাঠ্য থেকে দূরে নিজের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে গড়ে ওঠে প্রতিলোম উত্তর-পাঠ্য। প্রাক্-পাঠ্যের নাম সে জপে না ; এই দাবিটিও সে রাখে না, অহংকৃত বাচালটি যা রাখতে বাধ্য, যে তার বাঙ্ময়তার দ্বারা উক্ত হচ্ছে প্রাক্-পাঠ্য। প্রাক্-পাঠ্যের দ্বারা সে আশ্লিষ্ট নয়, তাতে লীন হবার ব্যাপারেও কোনো

মাথাব্যথা নেই তার। তার ঐতিহাসিক উত্থান-ভূমি যে স্বতন্ত্র, সে তা জানে, তবে এই স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও সে উৎকর্ণ ; তাই স্বচ্ছতার অভাব থেকে নয়, প্রাক্-পাঠ্যের তাত্ত্বিক বদ্ধতা বিষয়ে সজাগ অন্তর্দৃষ্টি রয়ে গিয়েছে বলেই তার সচেতন বিরুদ্ধতায় নিজেকে গড়ে তোলবার প্রয়োজন সে অনুভব করে। এই যুক্তি মেনেই নিজেকে সে বিন্যস্ত করে, অর্থাৎ হয়ে ওঠে।

ঠিক এই স্বচ্ছতা এবং আদর্শবোধের অভাবেই কিন্তু অনচ্ছতার আড়াল দিয়ে প্রাক্-পাঠ্যকে ঘিরে অথচ মুখে তার নাম জপতে জপতে, মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যাকে এখানে অভিহিত করা হল দখলদার ঔপনিবেশিক পঠন বলে। সে যে বিশ্বস্ত, সৎ, সে যে আদর্শনিষ্ঠ— এই নির্লজ্জ দাবিতেই সে উচ্ছেদ করে পাঠ্যের দাবিকে, তারপর অবলীলায় দখল করে তাকে। এটা কেন ঘটে তা বোঝা কঠিন নয় : এক দিকে সক্রিয় তার ঔপনিবেশিক লালসা, তার আগ্রাসন ; অন্য দিকে, তাকে পঙ্গু করে রাখে তার তাত্ত্বিক আলস্য। এই নিষ্ক্রিয়তার বাবদে সে চলচ্ছক্তিরহিত তাই পাঠ্যকে তন্ন তন্ন করে অনুধাবন ক'রে ব্যাপৃত হবার জন্য উদ্যোগ নেবার ব্যাপারে না রয়েছে তার ক্ষমতা, না সেই সদিচ্ছা। প'ড়ে, বা না-প'ড়ে, পাওয়া পাঠ্য তার উপনিবেশ মাত্র, যদিও এই বকধার্মিকটির পক্ষে মুখে তা স্বীকার করা সম্ভব নয়। তাত্ত্বিক নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের সমবায়ই সুতরাং গড়ে তোলে দখলদার পঠনকে।

নিরলস, বিনয়ী, সৎ পঠন, তাহলে বোঝা গেল, স্বচ্ছতা অর্জন করবার ব্যাপারটিতে কেবল সচেষ্ট : ঐ তার চরিতার্থতার তাত্ত্বিক সীমা। এই যে পাঠ্যের সঙ্গে ব্যাপৃত হতে গিয়ে সে লীন হচ্ছে তার তাৎপর্যে— অন্তত সে ব্যাপারে তার যে এই আন্তরিক মুমূর্ষা— তার সাংস্কৃতিক ফলাফলটি একটু লক্ষ করবার মতো। দেখা যাক কিভাবে তার এই বিনীত অ-মুখরতা বাচন-ক্ষেত্রটিকেই ঘনত্ব ও সংবদ্ধতা দেয়।

মেনে নিতে বাধা নেই যে পঠনের তরফে এই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত আত্মোৎসর্গটি না ঘটলে, যত না কেন সমৃদ্ধ হোক তার তাৎপর্য, নিজের বাইরে নিজের সাংস্কৃতিক অনুপস্থিতির দ্বারা সীমাবদ্ধ থেকে যেত পাঠ্য। অন্য দিকে, দেশে, কালে ও লোকে, ভিন্ন ভিন্ন নিরহংকার কিন্তু মেধাবী পঠন যেমন যেমন তাদের দৃশ্যমানতা হারাচ্ছে, তার তার অবস্থানে আবির্ভূত হয়ে তেমন তেমন উক্ত হচ্ছে পাঠ্য ; এবং ঐ ঐ অবস্থান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন নির্বাণোন্মুখ পঠনের ক্ষীয়মাণ বর্ণাঢ্যতার দ্বারা রঞ্জিত, তার তাৎপর্যের নানা-মাত্রিকতা : যা ছিল এক, সাংস্কৃতিক উপস্থিতির বিস্তারবশত তা হয়ে উঠছে বহু ; যা লৌকিক, তা হচ্ছে বিভু। তাৎপর্যের উদ্বৃত্ত ব'লে আগেই যাকে অভিহিত করা হয়েছে এই যে তার উপচয়, বা বৃদ্ধি, ঘটল, তা পাঠ্যকে দিচ্ছে বিস্তৃতি ও গভীরতা, ফলত সাংস্কৃতিক ঘনত্ব। নব নব মেধাবী পঠনের সহায়তায় এই ঘনত্ব পাঠ্যকে আমরা দেব কি না, দিলে তা কোন্ পাঠ্যকে, কেন, এগুলি জরুরি প্রশ্ন। অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নিয়ে হলেও, এ বিষয়ে দু-একটি ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করা যাক।

ধরা যাক সম্রাট বাধা দিলেন না ; ব্রুন্ডিসিউসে আনীত কবির মৃত্যুকালীন ইচ্ছানুসারে ভস্মীভূত করা হল তাঁর মহাকাব্যটি। সেক্ষেত্রে বিশ্বসাহিত্য থেকে শুধু যে ঈনীড লুপ্ত হত তা তো নয় ; তার উদ্ভব-মুহূর্তেই লুপ্ত হত লাতিন স্বর্ণযুগের উজ্জ্বলতম রত্নটি ; এবং হারিয়ে যেত— বলা ভাল, অগঠিত থেকে যেত— সেই ব্যক্তি-প্রতীকটি, যাঁর মধ্যে মূর্ত হয়েছিল আবহমানতার যুক্তি মেনে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যৌগপদ্যের শৃঙ্খলাটি।[১৩] কেননা, মধ্য যুগের সংস্কৃতি এবং ধর্মবিশ্বাসের প্রেক্ষিত থেকে দেখলে, কবি ভার্জিল ও তাঁর কাব্য ছিল সামগ্রিকভাবে সেই যোজক যার দ্বারা, দুদিক থেকে এসে, যুক্ত হচ্ছে প্রতীচীর মানসলোকে যা যা খ্রীষ্টপূর্ব এবং যা যা খ্রীষ্টোত্তর। সন্ত পল না কি নেপলসে তাঁর সমাধিতে কবিশ্রেষ্ঠ বলে তাঁকে সম্বোধন করে অশ্রুপাত করেছিলেন। ভিত্তিহীন হলেও এই ঐতিহ্যটির মধ্যে দ্যোতিত হচ্ছে আত্মিক যৌগ-পদ্যের ঐ প্রতীকী তাৎপর্যটি। মহাকাব্যটি টিকে না থাকলে, আরো যা বড় কথা, বিন্যাসের অপর কোনো ন্যায়কে আশ্রয় ক'রে দান্তেকে রচনা করতে হত তাঁর মহাকাব্যটি। স্বর্গদ্বারে— তবে অবশ্য ঐ পর্যন্তই— শরণাগতকে যিনি আনয়ন করলেন, পৌত্তলিক হলেও তিনি নেতা। ঘটনা-বিরুদ্ধ তাই অলস জল্পনা হলেও প্রশ্নটা এই : এই আত্মিক নেতৃত্বের মহিমায় স্বদেশবাসী আর কোন্ পৌত্তলিক কবিকে বৃত করা সম্ভব ছিল উত্তরসূরী খ্রীষ্টান মহাকবির পক্ষে ? নিশ্চয় ওভিড বা কাটুল্লুসকে নয়, এমনকি হয়তো হোরেসকেও নয়।

টেনিসনের ভার্জিল-প্রীতিকে খুব সংগত কারণেই আমরা সন্দেহের চোখে দেখি। তবে তাঁর ঐ বাস্তবিকই অক্ষম অনুকারকের মতো ভার্জিলও কি নিছকই স্বেদাক্ত রীতি-সর্বস্বতার কবি ? শস্ত্রের গান তিনি গাইছেন, মানুষেরও কি নয় ? কেবলই কীর্তি ও বিজিগীষার কবি তিনি, বিহত প্রেমেরও কি নন ? সাম্রাজ্য বিস্তারের কবি বলে কি তাঁকে বাতিল করা সম্ভব ছিল, অন্তত মধ্যযুগ ও রেনেসাঁসের পক্ষে ? সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, আন্তরিক নিসর্গ প্রেমেরও কবি তিনি, ফলত প্যাস্টোরালের। ভুল, ভিত্তিহীন পঠন ঠিকই, কিন্তু চতুর্থ একলগের ধর্মীয় অনুষঙ্গকে কে অস্বীকার করবে ? প্রথম চার্লস থেকে রাবলের প্যানার্জ পর্যন্ত, স্মরণ করুন সোর্টিজ ভার্জিলিয়ানিকে ঘিরে গড়ে ওঠা ঐতিহ্যগুলির বিস্ময়কর বিস্তার ও বৈচিত্র্য। মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসে মন্ত্রদ্রষ্টা ও জাদুকর হিসেবে যে সাংস্কৃতিক উপস্থিতি তিনি অর্জন করেছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন উত্তর-পাঠ্য ও পঠন যে ঘনত্ব দিয়েছিল ঐ উপস্থিতিকে, ঈনীডের অবলুপ্তিতে বা তা যদি অজ্ঞাত কোনো কারণে উপেক্ষিত হয়ে প'ড়ে থাকত পাঠ্য-সংসারের কিনারায়, তা তো অগঠিত থেকে যেত। উদাহরণ স্বরূপ, পাঠ্য-পারম্পর্যে আমাদের দিকটি ঘেঁষে, সেক্ষেত্রে অলিখিত থেকে যেত বর্তমান শতাব্দীর একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস : ভার্জিলের প্রয়াণ।

আরো কী হারাত— বা অগঠিত থেকে যেত— পাণ্ডিত্যের অভাবে সে বিষয়ে বিশদ কোনো কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাও যে উদাহরণটি দিলাম তা শুধু সংক্ষেপে

এই বক্তব্যটি স্পষ্ট করবার জন্য যে তার কাব্যের মতাদর্শগত মূল্য যা-ই হোক না কেন, সমান লয়ে না হলেও, দু-হাজার বছর ব্যেপে অনেকটা এদেশে রামায়ণের মতো, প্রতীচ্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রটিতে ঈনীডের উপস্থিতির ঘনত্বকে অস্বীকার করার কোনোই জো নেই। আরো যা বড় কথা, নিজ তাৎপর্য-পরিধির মধ্যে কাব্যটি নিছক নিজে যা, উপস্থিতির কেন্দ্রস্থতাবশত তার সাংস্কৃতিক প্রক্ষেপ তাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল বহুগুণে। সুতরাং বক্তব্য দাঁড়াল এই যে পাঠ্য অনেক, তারা তর-তম ; পাঠক্রিয়ার তাগিদে তাদের উপস্থিতির তার-তম্য শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায় সেটা কিন্তু একেবারেই আলাদা বিচার। ভার্জিল পঠিত হন, টাসিটস উপেক্ষিত থেকে যান ; দৃশ্যপট জুড়ে ছায়া ফেলে একজনের সাংস্কৃতিক উপস্থিতি, মনোযোগের কেন্দ্রে আসবার জন্য দ্বিতীয় জনকে অপেক্ষা করতে হয় প্রায় দেড় হাজার বছর।

ঘুরিয়ে তাই হয়তো এভাবেও বলা চলে যে অনীহাবশত আড়ে বসে থাকলে চলে না পাঠ্যের, ঐ বৈরাগ্য অন্তত তাকে মানায় না।[১৪] পাঠক্রিয়ার আশ্লেষকে আন্তরিকভাবে কামনা করতে সে ন্যায়ত বাধ্য— ভুল তাৎপর্য তার ওপর আরোপিত হবে, এমনকি এই ঝুঁকি মাথায় নিয়েও। ইতিহাসের রোদজল থেকে গা বাঁচাতে চাইলে, তা যদি সে সত্যি চাইত, বিবিক্ত থেকে যেত পাঠ্য। বিভিন্ন পঠনের সহায়তায় উপচে উঠে যা গ'ড়ে তোলে তাৎপর্যের উদ্বৃত্তকে, তা উপচিত হত না ; পাঠ্যের চার দেয়ালের মধ্যে, শুদ্ধান্তে, শিলীভূত থেকে যেত তাৎপর্য। সেক্ষেত্রে নিজের মধ্যে অন্তরীন হয়ে পড়ে রইত পাঠ্য নিজেও ; গুরুত্বের তার-তম্য অনুসারে তার মধ্যে বীজাকারে থেকে গিয়েছিল সাংস্কৃতিক ঘনত্বের যে সম্ভাবনা, ইতিহাস থেকে দূরে, বিমনোযোগে, তা আর বাস্তবায়িত হত না।

সুখের কথা, পাঠ্য উদাসীন নয়, কেননা তার বিবক্ষাই তাকে গড়ে তুলেছে। তাও যদি আড়ে বসে থাকতে দেখা যায় তাকে, তার অর্থ হল এটাই যে সে নয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিজে তার প্রতি উদাসীন। তবে নানা ঐতিহাসিক তাগিদে সাংস্কৃতিক মনোযোগের ভরটি স'রে স'রে যায়, তখন বিকেন্দ্রিত পাঠ্যকেও নিজের গোচরে আনতে বাধ্য হয়[১৫] সে : এমনকি মার্গ পাঠ্যের ধারণাটি পাল্টায়, ফলে এতকাল যা উপেক্ষিত ছিল— যেমন ধরা যাক লালন ফকিরের পদাবলী— তা অঙ্গীভূত হয় মার্গ সাহিত্যে ; যাকে মনে করা হত সংসার-ছুট, উদাসীন, পাঠক্রিয়া তাকে টেনে আনে ইতিহাসের রোদেজলে। তারপর কেন্দ্রীয় যদি সে হয়ে ওঠে— প্রথমাবধি কেন্দ্রীয় থেকে গেলে তো কোনো কথাই নেই— উত্তর-পাঠ্য এবং পঠনের পরম্পরাকে বেয়ে, ভিন্ন ভিন্ন বিরুদ্ধ মতাদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে, সকল তির্যগতা সহ, সে ধরা দেয় ভিন্ন ভিন্ন পঠনে ; তাৎপর্যের নব নব উপলেপে ক্রমে স্ফীত হয় সে।

এই ঐতিহাসিক বিক্রিয়ার জের যখন পাঠ্যের ওপর এসে পড়েনি, ঠিক কী ছিল তার অনাহত, আদিম তাৎপর্যটি— বাইরে নয়, উদ্ভব-মুহূর্তে, একমাত্র নিজের অবরোধের মধ্যেই যখন হাজির ছিল বিশুদ্ধ পাঠ্য— তা বড় জোর একটি তুমুল কিন্তু নিষ্ফল বিতর্কের বিষয় হতে পারে। কারণ পঠন-জনিত স্ফীতিকে ডিঙিয়ে, পাঠ্যের ওপর

যাবতীয় ঐতিহাসিক বিক্রিয়ার জেরকে সর্বাংশে নাকচ করে, বাইরে থেকে উপচে পড়া বহিঃপাঠ্যের জেরকে সম্পূর্ণরূপে ধুয়ে মুছে, একটি নেতৃস্থানীয় পঠনের সহায়তায় এবং কেবল তারই মধ্যে পাঠ্যের সর্বকালীন বিশুদ্ধ সারাৎসারকে উন্মূল করা সম্ভব বলে মনে হয় না। কেন, তা একটু ভেবে দেখা যাক।

এক হিসেবে প্রচেষ্টাটি নিজেই কিন্তু নিজের ব্যর্থতার একটি বড় নিদর্শন। তাৎপর্যের একমাত্র বিশ্বস্ত, তাই বৈধ, পঠন সে— এই দাবি নিয়ে নবজাত পঠনটি বাজারে এসে পৌঁছয়, হয়তো তাৎক্ষণিক একটি সাড়াও সে ফেলে। তবে টের পেতে দেরি হয় না যে সে আসলে পঠন-পরম্পরার সাম্প্রতিকতম প্রতিনিধি, তাই বড় জোর অনেকের মধ্যে আরেকটি : খুব বেশি হলে, প্রিমাস ইন্টার পারেস, সমকক্ষদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান। ইতিমধ্যে, সে যেহেতু অহংকৃত, বিশ্বজনীনতার দাবিটি সক্রিয় থেকে যায় তার চৈতন্যে। ইতিহাস যে পিচ্ছিল ; তার নানা-রোখ তাগিদ যে, বিবিধ বিরোধী প্রেক্ষিত থেকে, বিবিধ আভ্যন্তরীণ তির্যগতা সহ, পাঠক্রিয়াকে বারে বারে প্রেরিত করে পাঠের দিকে ; এবং, সর্বোপরি, পাঠ্য নিজেও যে সান্দ্র, সরন্ধ্র, ভেদ-চিহ্নিত, তাই নিজের সঙ্গে পুরোপুরি অন্বিত বা সম-বিস্তৃত, নয় ; তা যে ক্রমাবিষ্কৃত, ফলে নিজেকে তা যে ক্রমেই ছাপিয়ে উঠছে— এসব সে খেয়ালেই রাখে না। এই তাত্ত্বিক অশিক্ষা সত্ত্বেও, খুঁটির জোর থাকলে, কমবেশি, কায়েমি স্বার্থের মদতে সে স্থগিতাদেশ জারি করে অন্যান্য পঠনের ওপর এবং, যেমন আগেই বলা হয়েছে, কেড়ে নেবার চেষ্টা করে তাদের বৈধতা। ফ্রেজার, এবং পরে এলিয়ট কথিত 'পূত অরণ্য'-এর পূজারির মতো শেষ পর্যন্ত তা সে পারে না বটে, কিন্তু ততদিন যতটুকু যা জুলুম খাটানো সম্ভব, তা সে খাটায়।

পাঠ্যকে একটি নিচ্ছিদ্র, নিশ্চেষ্ট গোটা একক হিসেবে দেখবার এবং দেখাবার চেষ্টা হয়েছে বারেবারে। বলা হয়েছে, সে আত্ম-দীর্ণ নয়, তাই নির্দ্বিধ এবং নির্দ্বন্দ্ব। পাঠ্য প্রবঞ্চক নয়, তাকে বুঝে নেবার সব সূত্রাবলী সে সাজিয়ে বসে রয়েছে ; সংগঠক যুক্তিকে বেছে তাকে তাই বোঝা সহজ। তার অকপটতা সম্পর্কে এই বিশ্বাস থেকে, যা নিজে ততটা অকপট হয়তো নয়, উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল ইত্যাদি সাতটি লিঙ্গ বা চিহ্ন দিয়ে নির্বাচন ক'রে স্থাণু পাঠ্যের মধ্যে জব্দ তার তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন মীমাংসকেরা। মজার কথা, তাঁরাও কিন্তু লক্ষ করেছেন যে পাঠ্যের মধ্যে কিছুটা যেন তাৎপর্যের উদ্‌বৃত্ত ধরা দিচ্ছে, আভ্যন্তরীণ হয়েও যা পাঠ্যের অঙ্গীভূত নয়, কেননা তা তার মূল যুক্তির সঙ্গে অসংগত। মীমাংসকদের মতে, তা যেন অনেকটা পাঠ্যের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে ঢুকে পড়া বহিঃপাঠ্যের জের। একে তারা অর্থবাদ বলে চিহ্নিত করেছেন এবং পাঠ্যের তাৎপর্য থেকে উৎখাত করে পত্রপাঠ বিদায় দেবার বিধান দিয়েছেন।[১৬]

কিন্তু তাও একটি মুশকিল থেকে যাচ্ছে না কি ? কোন্‌টি অর্থবাদ, তার নির্ণায়ক কে ? তাকে চিনিয়ে দেবার যুক্তি পাঠক নিজেই যে বাইরে থেকে পাঠ্যের মধ্যে পাচার করছেন না, সেই নিশ্চয়তা কোথায় ? এটা ঠিক যে কোনো কোনো পাঠ্য তাকে চিনিয়ে

দেয় ; বস্তুত অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল ইত্যাদি লিঙ্গের সেটাই হল কাজ। কিন্তু সব পাঠ্য তো বলে দেয় না, এটা এটা তার অন্তর্বস্তু, ওটা ওটা বহিঃপাঠ্যের আগন্তুক জের। সেক্ষেত্রে, এরকম সন্দেহ করা কি অযথা হবে যে পাঠ্যের আত্মদীর্ণতার সূচক উপাদান-গুলিকে বাতিল করা হচ্ছে সেই যুক্তি দিয়ে যা, নিজের অজ্ঞাতসারে হলেও, বাইরে থেকে পাঠ্যের মধ্যে আমদানি করছেন পাঠক স্বয়ং ? অর্থবাদ ব'লে একবার যখন এভাবে তাদের পাঠ্য থেকে উপড়ে বাইরে ফেলে দেওয়া সম্ভব হল, কর্তিত পাঠ্য তখন হয়ে উঠল নির্দ্বন্দ্ব ও নিরাপদ। ফলে পাঠক এবার তাহলে নিতান্ত অকপটভাবেই এই দাবিটি রাখতে পারছেন যে পাঠ্যের মধ্যে কোনো দ্বিধা বা ফাটল নেই ; এবং তাঁর নিজের পঠনে ধরা পড়েছে যে তাৎপর্যটি, তর্কাতীতভাবে তা-ই হল পাঠ্যের শাশ্বত নির্যাস !

পঠন সুতরাং দেখা যাচ্ছে চতুর— অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত তার সংগঠক যুক্তি অসমস্যায়িত, অর্থাৎ নিজের অ-গোচর, ফলে নিজের বোধের অনায়ত্ত, থেকে যাচ্ছে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত বিজিগীষা নিশ্চিতভাবেই তাকে দেখা যায় ঠেলে দিচ্ছে সাফল্যের পর সাফল্যে। তা মনে হয় সে দেবেই দেবে !

সমস্যাটিকে নিকটবর্তী তবে ভিন্ন একটি প্রেক্ষিত থেকেও দেখা যেতে পারে। কোনো পাঠক্রিয়াই একেবারে তাজা ও আনকোরা, তাই তাত্ত্বিক অর্থে গো-বেচারা, অর্থাৎ অ-কপট, নয় ; প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাংস্কৃতিক অতীতে প্রোথিত, তাই অভিজ্ঞ। তার তার অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতা-লব্ধ শিক্ষা গড়ে তুলছে পাঠ্য বিষয়ে তার তার সংস্কার। নিজের অভিমুখ যখন তাকে পাঠ্যের দিকে ঠেলছে, বিশেষ পাঠক্রিয়াটির মধ্যে তার আগে থেকেই কার্যকর থেকে যাচ্ছে পাঠ্য কী বা কী নয়, কী সে বলতে পারে বা কী তার বলা উচিত, সে বিষয়ে ঐ সংস্কার-জাত অগ্রিম কোনো না কোনো প্রত্যাশা। পাঠ্য যেমন সংরচিত, পাঠক্রিয়াও তা-ই। ব্যক্তি-ইতিহাসের সূত্র ধরে খুব পিছিয়ে গেলেও এমন কোনো না-বালক পাঠক্রিয়ার খোঁজ মিলবে না যা পাঠক্রিয়া হলেও এতটাই আদিম যে, অনভিজ্ঞ, তাই অভিজ্ঞতা-লব্ধ সংস্কার থেকে সর্বাংশে মুক্ত। অন্য দিকে, কোনো পরিণত পাঠক্রিয়ার পক্ষে আবার নিজের চৈতন্যের তল থেকে আশ্রয়ী সংস্কারটিকে পুরোপুরি উন্মূল করা সম্ভব নয়, কেননা সেক্ষেত্রে তার সংগঠনের কাঠামোটাই তো— বানচাল যদি না-ও হয়— নড়বড়ে হয়ে পড়বে। আর কদাচিৎ উন্মূল করা যদি সম্ভবও হয়, সংস্কারের পুরনো পরিকাঠামোটা যেমন বর্জিত হল, তল থেকে তেমনি দেখা যাবে জেগে উঠছে তার নবীনতর একটি রূপ। তখন নবোদ্ভূত সংস্কারের নবীনতর ন্যায়টিকে আবার নতুন করে বুঝে নেবার প্রয়োজন দেখা দেবে। নতুবা পাটিগণিতের সেই হতভাগ্য বাঁদরের মতো তা পুনর্বার পা পিছলে পড়ে যাবে অসমস্যায়িত সংস্কারের থাকে। পৌনঃপুনিকতার প্রক্রিয়াটিকে মেনে বারেবারে সমস্যায়িত হয়ে ওঠার চেষ্টা তাই চালিয়ে যেতে হয় তাকে।

কিন্তু প্রক্রিয়াটি টিকিয়ে রাখা কঠিন। এর ফলে, যত না কেন তন্নিষ্ঠ সে হোক,

কিছুটা তির্যগতা বা অ-নিরপেক্ষতা তার পঠনে আসতে বাধ্য। যখন সে পড়ছে, একটা নির্বাচনের যুক্তি কাজ করছে তার মাথায়। কোন্ যুক্তি মেনে পাঠ্যের উপাদান-গুলিকে সে বেছে নেবে, কতটা কী আপেক্ষিক গুরুত্ব তাদের দেওয়া তার উচিত হবে এবং, সর্বোপরি, বিন্যাসের কোন্ ন্যায় মেনে তাদের সে সাজিয়ে নেবে— পাঠক্রিয়াকে এসব বলে দেবে কে? তা নিশ্চয় তাঁর তাত্ত্বিক প্রস্তুতি, যা অনেকাংশে তার অভিজ্ঞতা-লব্ধ। কিন্তু ঐ প্রস্তুতির মধ্যেই তো, সর্ষের মধ্যে ভূতের মতো, থেকে গিয়েছে অনিরপেক্ষতা, অর্থাৎ সায়- অথবা আপত্তি-সূচক মূল্যায়নের নিয়ামক তির্যগতা। এটাই যেহেতু তার সংস্কার, সেইসব উপাদানগুলিকেই তো তাৎপর্যমণ্ডিত বলে বেছে নেবার ঝোঁকটি কাজ করে পাঠক্রিয়ার মধ্যে যা আগে থেকেই তার প্রত্যাশা এবং সংস্কারের সঙ্গে সংগতি-পূর্ণ ; এবং চক্রবৎ,[১৭] তারাই আবার ফিরে গিয়ে পুষ্টি জোগায় তার সংস্কারকে : ক্রমে তা আরো দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে।[১৮] পরিস্থিতিটা অনেকটা এরকম দাঁড়াল যে ভোট দেবার অধিকার দেওয়া হল একমাত্র তাদেরই, শাসক দলের সমর্থনে যারা আগে থেকেই হাত তুলে বসে আছে।

পাঠক্রিয়ার এই রকমফেরটিকে কি খুব পরিচিত ঠেকছে? যদি হয় তো তা খুব সহজ কারণে। সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উপস্থিতির ব্যাপ্তিবশত মার্ক্সবাদী পঠনের যে ধারাগুলি আমাদের বেশি পরিচিত, লক্ষ করলে দেখা যাবে, সযত্ন অনুশীলন বা উৎকর্ণ বিবেক নয়— অনেক সময়ে তা একেবারেই নয়— তাদের যতটা সক্রিয় করে নিজেদের অভ্রান্ততা সম্পর্কে স্বতঃসিদ্ধ জেদ, চূড়ান্ত পরাভবের মুহূর্তেও এই অবিসংবাদী এবং নিশ্চিন্ত আত্মপ্রসাদ যে জিতে তারা বসেই আছে। মেডুসার দিকে তাকালে অশ্মীভূত হত ডাইনীটিকে যে দেখল , মার্ক্সবাদী পাঠক্রিয়ার বিজিগীষু প্রজ্ঞা যে সমস্যাটির ওপর তার তন্দ্রালস নজর ফেলে— পূর্ব ইউরোপ, চীন, কাম্পুচিয়া— পরমুহূর্তে তা দূরীকৃত, অর্থাৎ ন-স্যাৎ, হয়। এই তা-হলে তার বিজিগীষা-প্রসূত আত্মশ্লাঘা। বলা হয়েছিল বিজিগীষা চতুর। তবে কি তা অবিমৃশ্যকারী, তাই নৈরাশ্যের কালবেলাতেও এতটা আত্ম-সন্তুষ্ট ?

এটাই তাহলে পাঠক্রিয়ার বিজিগীষা— তার উইল টু পাওয়ার। ক্ষেত্রবিশেষে অবিমৃশ্যকারী হলেও মূলত সে চতুর। লা রশফুকো-র অনুকরণে একথা কি বলা যায় যে তার আমুর প্রপ্র বা আত্মরতি তাকে চতুর করে তুলেছে ? নিজেকে সে এতটাই ভক্তিশ্রদ্ধা করে যে, জ্ঞাতসারে না হলেও, সতর্ক চাতুর্যের সঙ্গে সদাই নিজেকে জিতিয়ে দিতে সে বদ্ধপরিকর। তাই নিজের ন্যায়কে সে আগে থেকেই এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছে যে, যত না কেন সে অজিজ্ঞাসু হোক— জিজ্ঞাসার অভাব তাত্ত্বিক গোঁ-কে তো আবার দুঃসাহসও জোগায়! —এটা নিশ্চিত যে সাফল্য সে অর্জন করবেই করবে। কোনো পাঠ্যই তার কাছে সমস্যায়িত নয়, কেননা পাঠ্যের সঙ্গে ব্যাপৃত হবার আগেই, ঐ চাতুর্যের সতর্ক তত্ত্বাবধানে, সমস্যাটিকে সে তো পাঠ্য থেকে উৎপাটিত ক'রে বসেই আছে। নিঃসন্দেহে প্রবণতাটি বিশেষ করে সক্রিয় থাকছে যতক্ষণ পর্যন্ত না পাঠক্রিয়া

৩

নিজের কাছে সমস্যায়িত হয়ে উঠছে, ফলে নিজের সংগঠনের ন্যায়টিকে সে চিনে ও বুঝে না নিচ্ছে।

আমাদের অবস্থান তাহলে এরকম দাঁড়াল যে পাঠক্রিয়া মাত্রই না কি অনপনেয় আপেক্ষিকতা দোষে দুষ্ট, তার হাত থেকে নিস্তার নেই। এটাই যদি তার অবধারিত পরিণাম হয়, সেক্ষেত্রে এই আপত্তিটা উঠতে বাধ্য যে তার বস্তুবিবেক সক্রিয় কি না বা কত দূর পর্যন্ত তা তন্নিষ্ঠ, শেষ বিচারে এসব প্রশ্ন অবান্তর। ফেল করাটাই যদি সবার অনিবার্য ভবিতব্য হয়, অযথা খেটে কে আর পরীক্ষায় বসবে? তাছাড়া, সত্যিই তো, পাশ-ফেল কার কী করা উচিত, সে ব্যাপারে যে বিচারকটি রায় দেবেন তিনিই বা কী এমন স্থিতপ্রজ্ঞ? তিনি যে সমদর্শী অথবা যে নিরিখ বা তৌলে মাপজোখ হচ্ছে তা যে অপক্ষপাতী, অর্থাৎ নিরপেক্ষ, তারই বা নিশ্চয়তা কতটা?
কিন্তু এভাবে আপত্তিটা উঠলে অসুবিধা এই দাঁড়ায় যে পাঠক্রিয়ার আপেক্ষিকতা নিজেই যে আপেক্ষিক, সেই জরুরি সত্যটা দেখা যায় আমরা ভুলে বসেছি; এর ফলে একটি তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি তৈরি হয় তার চরিত্র বিষয়ে। আপেক্ষিকতা বলতে পাঠক্রিয়ার তির্যগতাকে যদি নির্দেশ করা হয়, তা কোনো পরম বা ধ্রুবকল্প নয়। তার দ্বারা দুষ্ট হবার অর্থ এরকম আদৌ নয়— বিভ্রান্তিটি এই জায়গায়— যে সব পঠনই সমান আপেক্ষিক কেননা তারা পাঠ্য-তাৎপর্যের কেন্দ্র থেকে সমান ব্যবধানে, তাই যেন তাকে ঘিরে একটি সুদূর পরিধি বরাবর, অবস্থিত, তাই তার দুরূহ, লুক্কায়িত সত্য থেকে সমপরিমাণে বিচ্যুত! যেন ঐ পরিধি বরাবর পঠন-পরম্পরার মধ্যে চলছে সমানই অফলপ্রসূ উতোরচাপান; আর তাদের সবার নাগালের বাইরে, পাঠ্য-তন্মাত্রের কেন্দ্রে, পড়ে রয়েছে, তার কূটস্থ, অনুদ্‌ঘাটিত তাৎপর্যটি— কোলাহল থেকে দূরে যা তার অনাহত তাৎপর্যতন্মাত্র।
প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে, নির্বোধ বা ধূর্ত, অব্যাপৃত পাঠক্রিয়া আছেই— আপেক্ষিকতার দোহাই দিয়ে তাদের বৈধতা দেওয়া যাচ্ছে না কিন্তু। তারা পাঠক্রিয়া নয় কারণ তারা পাঠ্যের সঙ্গে আদৌ ব্যাপৃত হচ্ছে না, তাই তাকে তারা পড়ছে না। আবার এটাও ঠিক যে সংখ্যায় এরা নগণ্য নয়। এদের নিয়ে নয়, কেবল তন্নিষ্ঠ এবং ব্যাপৃত পাঠক্রিয়ার চরিত্র নিয়েই, সংখ্যা তাদের যাই হোক, আপেক্ষিকতার প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিকতা পাচ্ছে। বুঝে ওঠার চেষ্টা করা যাক কী অর্থে তাদের মধ্যে আপেক্ষিকতা অর্থাৎ কিছুটা যেন অনিশ্চিতি থেকে যেতে বাধ্য এবং কী অর্থে এই আপেক্ষিকতা নিজেই আপেক্ষিক; তাই— এটাও বুঝতে হবে— ব্যাপৃত হবার এবং নিরলসভাবে তা থেকে যাবার দায়িত্বকে নাকচ কিছুতেই করা যাচ্ছে না।
সৃষ্টিকর্ম, অর্থাৎ পাঠ্য-তন্মাত্র, থেকে পাঠ্য যেমন যেমন সরে এল পাঠকের দিকে— আমরা দেখেছি, বার্তের মতে পাঠ্য হয়ে উঠবার প্রাক্-শর্তই হল তা-ই— বিকেন্দ্রিত হল তাৎপর্য; দেখা গেল, সেও সরে এসে সংলগ্ন হয়েছে যাকে ব্যাপৃতির উভমুখ বলা

হয়েছে তার সঙ্গে। ফলে কূটস্থ নয় আর, সে এখন বরং পাঠক্রিয়া-সাপেক্ষ হয়ে উঠেছে। এরপর ভিন্ন ভিন্ন পঠনে ধরা দেবার প্রক্রিয়ায় তার যে ন্যূনাধিক মতাদর্শগত প্রতিসরণ ঘটছে, তা কতটুকু এবং কেন, আপেক্ষিকতার প্রশ্নটি গুরুত্ব অর্জন করছে এই জায়গায় এসে।

ধরা যাক, পঠন-উত্তীর্ণ তাৎপর্যের অনাহত ও অবিকল রূপ একটি আছে। তবে পাঠক্রিয়ার বিক্রিয়ার জের এসে পড়বার আগে তাৎপর্য নিজের মধ্যে নিজে যা, আমরা জানি, তার এই তন্মাত্রকে কোনো মতেই উদ্ধার করা সম্ভব নয় ; তবে পাঠ্যে নিবিষ্ট পাঠক্রিয়া অতটা ভেবে ওঠবার সময় পায়নি এখনো। তাই তাৎপর্যকে যে পাঠ্যের অন্দর থেকে টেনে এনে পঠনের সদরে উত্তোলিত করা সম্ভব, এই জেদই আভিমুখ্য জুগিয়ে পাঠক্রিয়াকে ব্যাপৃত করছে পাঠ্যের সঙ্গে— এটাই হল তার মধ্যে সক্রিয় নৈতিকতার তাগিদ। পাঠ্য এবং তার তাৎপর্য বিষয়ে সে যে সজাগ ও পরিশ্রমী, তার কারণ তাহলে তার এই স্বাস্থ্যকর কুসংস্কার।

উপরন্তু এটাও ঠিক যে পাঠ্য কোনো অতিবস্তু, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় পরাবস্তু, নয়। সুতরাং এই মরমিয়া দাবিটি মেনে নেওয়া গেল না, অজ্ঞাবাদ তার যুক্তি সংগ্রহ করে যে অপরীক্ষিত সংস্কার থেকে, যে বাঙমনের সে অগোচর। পাঠ্যের মধ্যে হয়তো দ্বিভাজন রয়েছে, অর্থদ্বৈধ রয়েছে, সে আত্ম-দীর্ণ, তাই দুরূহ —এসবই ঠিক। কিন্তু সে অবিতর্ক্য বা বোধাতীত নয়। কোন্ কোন্‌টি বস্তু, কোন্ কোন্‌টি অবস্তু, পাঠ্যের প্রায়ান্ধকারে কোন্ কোন্ অনুপুঙ্খ উপস্থিত, কোন্ কোন্‌টি নয়— বিশেষজ্ঞানসাধক এই বিচারশীলতা বা বিবেককেই বস্তুবিবেক বলা হচ্ছে। পাঠ্যের বস্তুসত্তা আছে, সে একটি 'তৎ'। এই কারণেই পাঠক্রিয়াকে তৎ-নিষ্ঠ হতে হয় ; এখানেই কার্যকর হয় তার তদাত্ম্য, তার বস্তুবিবেক।

কিন্তু বস্তু থেকে বিশ্লিষ্ট বিশুষ্ক বুদ্ধির সঙ্গে এই বিচারশীলতাকে গুলিয়ে ফেললে বা এক করে দেখলে চলবে না ; অন্যদিকে, মাপজোখের যেসব পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য প্রকৃতি বিজ্ঞানকে তার নিজস্ব চরিত্র দিয়েছে, এখানে তাদের কোনোই প্রযোজ্যতা নেই। পাঠ্যে প্রযুক্ত এই বিচারশীলতাকে কি পাঠ্যবোধ বলব ? না কি তা সহৃদয় তাৎপর্য-গ্রাহিতা, উৎকর্ণ অন্তর্দৃষ্টি, পাঠক্রিয়ার সজাগ ঘ্রাণশক্তি ? যদি ধরে নিই এসবের সমবায়ে গড়ে উঠেছে পাঠ্যবিবেক, তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, এক দিকে, সামগ্রিকের ধ্যান এবং, অন্য দিকে, আপাত দৃষ্টিতে যা খুবই মামুলি সেই কাণ্ডজ্ঞান। সমালোচককে তথ্যনিপুণ হতে হবে, এলিয়টের এই দাবি যদি সমালোচকের নৈপুণ্যের ঊর্ধ্বসীমা হত, তাতে মিস্টার গ্র্যাডগ্রাইন্ড খুব খুশি হতেন। তবে কবি-সমালোচক নিজে তা হতেন কি ? তথ্যনৈপুণ্য তাঁর পারদর্শিতার অধঃসীমা মাত্র।

উৎকর্ণ অন্তর্দৃষ্টি এবং তথ্যনিষ্ঠা যতটা যা তার থাকুক না কেন, পাঠক্রিয়ার মধ্যে আপেক্ষিকতার যাকে বলা চলে আপেক্ষিক একটি জের এসে পড়ে, যেমন আগেই নির্দেশ করা হয়েছে, এর কারণ হল তার উদ্ভবের ঐতিহাসিকতা। মতাদর্শগত

তাগিদের তির্যগতা বা তাত্ত্বিক সংস্কার, যে নামেই একে ডাকি, এ হল তার বা, সামনের দিকে, পঠনের অসমস্যায়িত অবিবেচনা, তার অন্ধতা, হয়তো গোঁ। পাঠক্রিয়ার পক্ষে বিবেচক হয়ে ওঠার অর্থ হল— অনেক ভারি অর্থে বিজ্ঞানের ইতিহাসে তুলনীয় ঘটনাটিকে বাশেলার হয়তো বলবেন জ্ঞানতাত্ত্বিক ছেদ—নিজের এই অন্ধতাকে দেখতে শেখা, পুনর্বিবেচনা সহ নিজের তত্ত্ব-কাঠামোর পুনর্নির্মাণ। এজন্য নিজের উদ্ভবের প্রাগিতিহাসকে টেনে আনতে হয় তাত্ত্বিক মনোযোগ বা সমস্যাপটের মধ্যে ; প্রায়ান্ধকারে যা অলিখিত, ঠাওর করে পড়তে হয় তাকে। এটা সম্ভব হলে তাত্ত্বিক যে উদ্গতিটি ঘটে, পাঠক্রিয়াকে তা সাবালক করে তোলে।

তবে মুশকিল এখানেই যে এই সাবালকত্ব কোনো চিরকালীন এবং অক্ষয় তাত্ত্বিক বয়ঃপ্রাপ্তি নয় ; এই ধাপ থেকে বারেবারে পিছলে নেমে আসাটাই হল পাঠক্রিয়ার ধারাবাহিক ভবিতব্য। নিজের তাত্ত্বিক সংস্কারকে, তার প্রাক্-শর্ত এবং কাঠামোকে চিনে নেবার ব্যাপারটিকেই যদি তার সাবালকত্ব অর্জন করা বলা চলে, সেক্ষেত্রে এরকম একেবারেই নয় যে পাঠক্রিয়ার আত্ম-সমীক্ষণের সমস্যাটি ঐখানেই চিরকালের মতো চুকে গেল, এরপর সামনে তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে প্রলম্বিত তাত্ত্বিক বিশ্রান্তি। প্রক্রিয়াটিতে কেন ইতি টানা যায় না, সে ব্যাপারে ছোট করে একটি ইঙ্গিত দেওয়া যাক।

জ্ঞানতাত্ত্বিক যে উদ্গতিকে তাত্ত্বিক বয়ঃপ্রাপ্তি বলে উল্লেখ করা হল, তার নিজের মধ্যে সক্রিয় তাত্ত্বিক সংস্কারটি এখনো পর্যন্ত পড়ে রয়েছে তার অবচৈতন্যে। যেহেতু মতা-দর্শগত তির্যগতা সহ নয়া কিসিমের একটি তাত্ত্বিক গোঁ তাকে ঠেলে তুলছে পুরাতন সংস্কার থেকে উপরের থাকে, উদ্গত পাঠক্রিয়াটি, পুনর্মূষিক-বৎ, দেখা যাবে ধরা দিয়েছে নবার্জিত সংস্কারের দুর্জ্ঞেয়তর আলিঙ্গনে ; তাই পুনর্বার সে চ্যুত হতে বাধ্য তার অধীত আত্মোপলব্ধি, তাই তার বিজ্ঞাপিত বয়ঃপ্রাপ্তি থেকে। একটি জৈব উপমানের সাহায্য নিয়ে এভাবে হয়তো বলা চলে : নির্মোক উন্মোচনের এই কাজটি বারেবারে ঘটছে কি না, একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কতটা কী সজীব তা নির্ভর করছে নিজের তাত্ত্বিক অন্ধতাকে এইভাবে বারেবারে ডিঙিয়ে দেখবার সাহস, ইচ্ছা ও ক্ষমতার ওপর।

নিজ নিজ উদ্ভবের তির্যগতা এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রিয়াকে আপেক্ষিক করে তুলছে ; কিন্তু এই আপেক্ষিকতা সংযত, তৎ-নিষ্ঠ ; তাই সে কোনো লাগাম-ছুট বেপরোয়া পরম বা কোনো ধ্রুবকল্প নয় ; সে নিজেই আপেক্ষিক। পাঠ্য যখন সাংস্কৃতিক মনোযোগ পাচ্ছে, তাই অর্জন করছে কেন্দ্রীয় উপস্থিতি, আপেক্ষিতার এই বিনয়ী আত্মোপলব্ধির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান সেক্ষেত্রে হল তার, অর্থাৎ পাঠ্যের, সাংস্কৃতিক স্ফীতি ও উপচয়—পাঠক্রিয়াসমূহের নানামাত্রিক ঐতিহাসিকতা, তাদের আপেক্ষিকতাই তাকে তা দিচ্ছে। দেখা যাক কিভাবে তা ঘটছে।

ভিন্ন ভিন্ন মেধাবী পাঠক্রিয়া ব্যাপৃত হচ্ছে কোনো একটি পাঠ্যের সঙ্গে। তা হবার

সময়ে, ঐ পাঠ্যে ব্যাপৃত অন্যান্য পাঠক্রিয়া এবং পঠনের অন্তর্গত সংস্কারকে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে পড়তে ও বুঝতে বাধ্য হচ্ছে তারা। গ্রহণ ও বর্জনের এই মতাদর্শগত ব্যাপৃতির ফলে তাৎপর্য-ক্ষেত্রটিতে এসে জমা পড়ছে নব নব আবিষ্ক্রিয়া ও উপলব্ধির উপলেপ ; এই সঞ্চয় থেকে কালে গড়ে উঠছে যাকে তাৎপর্যের উদ্বৃত্ত বলে অভিহিত করা হয়েছে আগে। ভিন্ন ভিন্ন পঠনের দ্বারা উক্ত হবার ফলে পাঠ্য অর্জন করছে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি ; এইভাবে, নিজের বাইরে নিজের উপস্থিতির দ্বারা যা ছিল এক, তা হয়ে উঠছে বহু। শুধু ব্যাপ্তি নয়, নানা স্তরে পরিস্রুত তাৎপর্য পাঠ্যকে দিচ্ছে তার জমাট সাংস্কৃতিক ঘনত্ব।

প্রক্রিয়াটি এখানেই থামছে না। মূল্যবান পাঠ্য তো একটি নয়, অনেক। ঐতিহ্যের বিরুদ্ধ-প্রত্যয় বা গাফিলতিতে যদি তাদের কয়েকটি উপেক্ষিত থেকেও যায়, অনেক-গুলিই কিন্তু প্রবেশ করছে সাংস্কৃতিক মনোযোগের মধ্যে ; ফলে, কমবেশি, তারা অর্জন করছে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক উপস্থিতি। ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রিয়া ব্যাপৃত হচ্ছে এদের প্রতিটির সঙ্গে ; প্রতিটি একক পাঠ্যই আলাদা করে হয়ে উঠছে বহু। উপস্থিতির ব্যাপ্তি ও পরিস্রুতিবশত তাৎপর্যের যে ঘনত্বের কথা বলা হয়েছে, কোনো একটির তাৎপর্য-ক্ষেত্রে তা সীমাবদ্ধ থাকছে না, পাঠ্যসমূহে তার জের এসে পড়ছে ; ফলে পারিপার্শ্বিকে তাদের এই স্ফীত পরস্পরকে যুক্ত ক'রে একটি জমাট অখণ্ড-প্রায় সামগ্রিক চরিত্র দিচ্ছে পাঠ্যসমূহকে। অন্তর্লীন এবং বহিরঙ্গ পঠন-পরম্পরার দ্বারা এক পাঠ্য যুক্ত হচ্ছে অন্য পাঠ্যের সঙ্গে ; প্রতিটি পাঠ্যের আগুপিছু ও পাশাপাশি, অনুক্রম এবং সমক্রমের অক্ষ বরাবর, ভেদরেখাগুলি প্রায় লুপ্ত করে গড়ে উঠছে পাঠ্যসন্ততি, অর্থাৎ অন্তঃপাঠ্য। সামগ্রিকভাবে বাচনক্ষেত্রটি পাচ্ছে নিরবকাশ, গাঢ়তা ও সংহতি ; আপাত দৃষ্টিতে ভরাট হয়ে উঠছে তার জমি।

মতাদর্শগত আধিপত্যের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করেই অবশ্য সাংস্কৃতিক বাচনক্ষেত্রটির চরিত্রকে নিরূপিত করে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে, শেষ বিচারে, তার এই আত্ম-সংহতি বড় জোর একটি আদর্শায়িত প্রবণতা মাত্র। অনুক্রমের অক্ষ বরাবর, আগুপিছু, এবং সমক্রমের অক্ষ বরাবর, চারপাশে, যে ক্ষেত্রটি নিরেট ও নিরবকাশ, তাই নিজের সঙ্গে ছেদহীনভাবে অন্বিত, এরকম একটি দাবিকে চূড়ান্ত অর্থে তাত্ত্বিক স্বীকৃতি দেওয়া চলে না। কেননা এটা নিশ্চিত যে আভ্যন্তরীণ তাগিদ যদি প্রায়-বাস্তবায়িত করেও তোলে তার আত্ম-সংহতিকে, সবাক ও নির্বাক, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য, প্রতিরোধ আছেই, তারা নানা চরিত্রের এবং নানা লয়ের ; এবং অতীতে যেমন বারেবারে ছেদ ও উদ্গতি ঘটেছে, ভবিষ্যতেও তা ঘটবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না ছেদটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থে সামগ্রিক চরিত্র অর্জন করছে, বাচনক্ষেত্রটি নিজেকে মোটের ওপর সংহতি দিতে পারছে ; এবং প্রতিরোধকে অনেকাংশে বশীভূত, এমনকি আত্তীকৃত, করে ভরাট করে তুলছে নিজের বুননের ফাঁকফোকর, নিজের গঠনের খাঁজভাঁজকে।

পাঠক্রিয়ার সামগ্রিক ব্যাপৃতিকে কি সাংস্কৃতিক আত্ম-বীক্ষণ বা আত্ম-সমীক্ষণ বলে ধরে নেওয়া যায় ? সেক্ষেত্রে, বাচনক্ষেত্রে তার নিজের প্রয়োগের এলাকাটিতে তার ভূমিকা কী, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল একটি সীমাবদ্ধ প্রেক্ষিত থেকে সেদিকে মনোযোগ রাখা ॥ ☐

---

(১) পৃষ্ঠা—৬ (···টেনে আনা হয়েছে ঘটনা ক্রমের) :

ঘটনা ক্রম হল পাঠ্যে ঢেলে সাজাবার আগে পরপর যেমন যা যা ঘটছে ঘটনার সেই ক্রমিক পরম্পরা : ক খ গ ঘ ঙ। পাঠ্যে ঢেলে সাজাবার সময়ে, একটি অন্তর্বর্তী ঘটনা বিন্দুতে, হয়তো গ বা ঘ-তে, তাহলে শুরু হচ্ছে কাহিনী। এই সূচনা-মুহূর্তের পিছনে যা পড়ে রইল, নির্বাচিত চরিত্র বা কথকের স্মৃতি-বাহিত হয়ে, একযোগে বা ভেঙে ভেঙে, তা এসে যুক্ত হচ্ছে কাহিনীতে। নির্মাণ ক্রম বলে যাকে অভিহিত করা হল, এভাবেই তা গড়ে উঠছে।

(২) পৃষ্ঠা—৬ (···পাঠ্য মাত্রই লেখকজন্ম) :

ওয়র্ক, বা সৃষ্টিকর্ম, এবং টেক্সট, বা পাঠ্য, এই দুটি সংজ্ঞায় বিভাজিত করে রলাঁ বার্ত নিরূপিত করতে চেয়েছেন আমরা যাকে পাঠ্য-ব্যাপৃতি বলছি তার চরিত্রকে। স্বভাবতই সৃষ্টিকর্ম যে লেখক-জন্য তা স্বীকার করে নিচ্ছেন তিনি। তবে পাঠ্য বিষয়ে তাঁর বক্তব্য হল, যেহেতু তা পাঠক্রিয়াসাপেক্ষ, কিছুটা যেন পিচ্ছিলতা অর্জন করে লেখক-কর্তৃত্বের রাশ থেকে বেরিয়ে তা সরে আসছে পাঠকের দিকে। তাকে পাঠ করবার আগে, নিজের অবরোধের মধ্যে বন্দী নিঃসঙ্গ সৃষ্টিকর্মের বিশুদ্ধ স্বরূপ কী ছিল, যাকে পাঠ্য-তন্মাত্র বলা চলতে পারে, যেমন আমরা পরে দেখব, তা বড় জোর নিষ্ফল কৌতূহলের বিষয় হতে পারে। কারণ যে মুহূর্তে পাঠক তার সঙ্গে ব্যাপৃত হচ্ছেন, অর্থাৎ তাকে পড়ছেন, ঐ পাঠক্রিয়াই লেখকের সৃষ্ট তন্মাত্রকে পরিণত করছে পাঠ্যে ; নুমেনাল অবরোধকে ডিঙিয়ে সে অন্তঃপাতী হচ্ছে অন্তঃপাঠ্যের নানারোখ বুননের মধ্যে।
তবে বার্ত প্রেয়োবাদী। ব্যাপৃতি তাঁর কাছে তাই হয়ে উঠছে যেন এক পাঠ্যলীলা বা পাঠ্যরতি। এর ফলে কি তার নৈতিক ভারবত্তা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না ? পাঠক্রিয়াকে যাঁরা কেবল বৌদ্ধিক তপশ্চর্যা হিসেবে দেখেন তাঁরা ভুরু কুঁচকাবেন জেনেও বলছি :

বিশুষ্ক শ্রেয়োবোধ থেকে যে পাঠাভ্যাস করা যায় না তা একেবারেই না, কিন্তু তার পিছনে হ্লাদিনী শক্তির সমর্থন থাকলে ক্ষতি কী ?

কর্তব্য করবার সময়ে ঔচিত্য বোধের মধ্যে ভাবাবেগের মিশেল দেওয়া চলবে না, এটাই ছিল দার্শনিক কান্টের প্রতিপাদ্য। তাঁর একটি কবিতায় এই নৈতিক কাঠিন্যবাদ বিষয়ে শিলার সূক্ষ্ম একটি ঠাট্টা করেছেন। কান্টের ভক্ত তবে উদ্বিগ্ন একজন গৃহস্বামী বন্ধুদের বলছেন, তাঁদের অভ্যর্থনা করতে পেরে আজ তিনি আহ্লাদিত। তবে আহ্লাদিত বলেই তিনি আবার যারপরনাই উদ্বিগ্ন। বিশুষ্ক কর্তব্যবোধ থেকে, যথোচিত মানসিক স্থৈর্য সহকারে যা তাঁর করা উচিত ছিল, তার মধ্যে ভাবাবেগের এই মিশ্রণ ঘটাটা উচিত ছিল না নিশ্চয়। কারণ করতে ভাল লাগলে, করাটা তো নিস্পৃহ কর্তব্য মাত্র থাকে না। এতে করে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে কোনো ত্রুটি ঘটল না তো ? পাঠাভ্যাসী রামগরুড়ের ছানারা সমস্যাটিকে আশা করি একটু বিবেচনা করে দেখবেন।

(৩) পৃষ্ঠা—৭ (…**হয় তাঁর উদ্যোগ**) :

কাজটুকুর গুরুত্ব তা বলে কম কিছু নয়, কেননা বারেবারে দেখাও গিয়েছে যে সার-ভাগ নয়, পাঠ্যের সং-টুকু বেছে নিয়েই সহৃদয় সামাজিক মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন।

(৪) পৃষ্ঠা—১০ (…**অতীত থেকে প্রবহমান অভিপ্রায়সমূহ**) :

গ্রীক ধাতু নিষ্পন্ন 'পোয়েম' ও 'পোয়েট্রি' শব্দদুটির মধ্যে গড়ে তোলা বা তৈরি করার অভিধাটি কার্যকর ; কাব্য বা সাহিত্য এই বিচারে লেখক-জন্য। লাতিন ধাতু নিষ্পন্ন টেক্সট আবার তন্তুবিস্তার বা বুননের তাৎপর্যটি বহন করে। তন্তু-সন্ততির নানারোখ ঝোঁকগুলির কথা মাথায় রেখে, আমরা দেখেছি, সৃষ্টিকর্ম থেকে পাঠ্যকে আলাদা করে বার্ত তাকে টেনে আনলেন পাঠকের কাছে। তা বলে এরকম আদৌ নয় যে সৃষ্টিকর্ম যেমন যেমন পাঠ্য হয়ে উঠছে তার মধ্যে ধৃত লেখকের অভিপ্রায়সমূহ ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। শুধু লেখকই নয়, তার সচেতন ব্যাপৃতির তল দিয়ে, গোল্ডমান যাকে বলছেন ব্যক্তি-অতিক্রমী বিষয়ী, অর্থাৎ গোষ্ঠী চৈতন্য, সে-ও তো প্রবিষ্ট হয়েছিল সৃষ্টিকর্মে ; সুতরাং পাঠ্যে তার জের এসে পড়তে এবং থেকে যেতে বাধ্য।

যা পড়ছি তা পড়া সম্ভব এই কারণে যে তা লেখা হয়েছে, ব্যক্তি-পরিচয়ে লেখক কে বা কী এটা এক্ষেত্রে বড় কথা নয়। যাঁরা লিপিকার, লেখক কে, কী তাঁর অভিপ্রায়, না জেনেও এটা মেনে নেন যে লেখার মধ্যে ধৃত হয়ে রয়েছে একটি আদিম অভিপ্রায়-জনিত সত্য ; তার ওপর স্থূলহস্তাবলেপের অধিকার তাঁদের নেই। এই বিশ্বাস থেকেই তাঁরা লেখেন, যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্। তা যদি না হত, নৈয়ায়িকরা যে আকস্মিকতাকে বলেন ঘুণাক্ষরন্যায়, ঘুণ পোকা কেটেছে বলে মানবিক অভিপ্রায়-বর্জিত কিন্তু অক্ষর-সদৃশ চিহ্নাবলী, তাকেও তো পড়ে নেওয়া যেত। তা কিন্তু সম্ভব নয়।

একথা ঠিক যে আকস্মিকতা থেকেও পাঠ্য জন্ম নিতে পারে। এ প্রসঙ্গে পাঠকের

হয়তো ফরাসি জাতীয় সংগীতের কথা মনে পড়তে পারে। কিন্তু সেই আকস্মিকতা মানবিক তাৎপর্যের দ্বারা বিদ্ধ, তাই অভিপ্রায়-জন্য।

(৫) পৃষ্ঠা—১১ (…অবস্থানকে যে তাত্ত্বিক স্বেচ্ছাচারিতার দায়ে):

তাত্ত্বিক স্বেচ্ছাচারিতার যুক্তিটিকে যেদিক দিয়ে উপস্থাপিত করা হল, তাতে করে পাঠক এই আপত্তিটি তুলতেই পারেন যে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির বড়বাজারে সাম্প্রতিক কালে নব নব পঠনের এই ক্রমবর্ধমান জোগানটা কেন ঘটছে, উপরের ব্যাখ্যানে তার সদুত্তর কিন্তু পাওয়া গেল না। সরবরাহের এই স্ফীতি তাত্ত্বিক স্বেচ্ছাচারিতা থেকে তার বৈধতা জোগাড় করে নিচ্ছে, সেটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু এই স্ফীতি কেন? একে চাগিয়ে তুলছে চাহিদার যে তিমিঙ্গিল-সদৃশ মুখব্যাদান, এটা নিশ্চিত যে সাংস্কৃতিক পণ্যায়ন, ফলত পণ্যরতি, ফলত লাগাম-হীন উপভোগবাদ, ব্যতীত এটা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। সাংস্কৃতিক বস্তুবাদকে এই সমস্যাটি নিয়ে বিশেষ করে ভাবিত হতে হবে।

(৬) পৃষ্ঠা—১২ (…তাৎপর্যের শাশ্বত সারাৎসার):

মার্ক্সবাদের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধিত্বের দাবি নিয়ে স্ট্যালিনবাদ ঠিক এইভাবেই মাথা চাড়া দিয়েছিল। যে সোভিয়েট মার্ক্সবাদের তা চূড়ান্ত পরিণতি-বিন্দু তা যে ধ্রুববাদের দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়েছিল, গ্রামশির তা নজর এড়ায়নি। অন্য যে কোনো পঠনই ছিল স্ট্যালিনবাদের চোখে অবৈধ এবং তাকে নির্মমভাবে উচ্ছেদ করাই ছিল, মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের মতো, তার বৈধতার একটি প্রাথমিক শর্ত। যেসব কারণ একে আপোসহীনভাবে নৃশংস করে তুলেছিল তাদের প্রধানটি নিঃসন্দেহে মতাদর্শগত আধিপত্য অর্থাৎ হেগিমোনির অভাব থেকে জাত তাত্ত্বিক উদ্বেগ।

(৭) পৃষ্ঠা—১৪ (…একমাত্র তার : সোঽহং):

লক্ষ করুন, স্ট্যালিনবাদের দাবি ছিল এটাই যে মার্ক্সবাদের তাৎপর্য নির্যাস সমীকৃত হয়েছে তাঁর চিন্তায়। স্ট্যালিনবাদকে নাকচ করা যেহেতু মাওবাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, নিজের সার্বভৌমত্বের সমর্থনে যুক্তিটাও তাকে পাল্টাতে হল : কালোচিত্যের দোহাই দিয়ে বলতে হল, এ যুগের মার্ক্সবাদ হল মাওবাদ। যুগটা অতিক্রান্ত হয়েছে কি না, ফলে সমীকরণটি এখনো চালু কি না, সে খবর অবশ্য মাওবাদীরাই ভাল রাখেন।

(৮) পৃষ্ঠা—১৪ (…পাঠক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান):

'তাকে দেখছি' এই বাক্যটিতে কর্তা ঊহ্য। বলা হয়েছে, বাক্যের স্তরে শাব্দবোধকে সম্পূর্ণতা দেয় আকাঙ্ক্ষা, নৈঃশব্দ্যের আড়াল ভেঙে আমাদের অধ্যাহার করে নিতে সাহায্য করে কোন্ পদটি ঊহ্য, কী হবে তার রূপ। আমরা বুঝি, এক্ষেত্রে যা ঊহ বা ঊহ্য তা হল 'আমি' বা 'আমরা'। বাক্যটি যদি সংস্কৃত হত, ধরা যাক ক্রিয়াপদটি 'পশ্যামি', তার মধ্যে যেহেতু কর্তার বচনটি নির্দেশ করা আছে, তা 'অহম্' বা 'বয়ম্' তা নিয়ে দ্বিধার কোনো অবকাশ থাকত না, বাঙলায় যা থাকছে।

পাঠ্যের স্তরে আকাঙ্ক্ষার সূত্রটিকে উন্নীত করার অর্থ এটা হতে পারে না যে সামগ্রিকভাবে পাঠ্যের অনন্য কোনো ব্যাকরণ তৈরি করা সম্ভব। তা কোনো মতেই নয়। প্রাথমিক উৎসাহ সত্ত্বেও তোদোরভ যে পাঠ্য সম্পর্কে এ জাতের সংগঠনবাদী তত্ত্বপ্রকল্পের দিকে পিছন ফিরেছিলেন, তা এই উপলব্ধি থেকে। বৈয়াকরণ অনন্যতার দাবি ছেড়ে দিতে রাজি থাকলে, একটি তাত্ত্বিক আদর্শ হিসেবে আকাঙ্ক্ষার সূত্রটি যে অন্তত কিছুদূর পর্যন্ত মূল্যবান তা হয়তো মেনে নেওয়া যায়। ভেবে দেখা যাক কেন।

পঠনের মধ্যে অনেক সময়েই নিজেকে উজার করে ঢেলে দেয় না পাঠ্য ; সে সসংকোচ, পুরোপুরি নিজের উদ্ঘাটক নয়। তার নৈঃশব্দ্যের মধ্যে, হয়তো তার নিশ্চেতনে, সেক্ষেত্রে যা আবৃত থেকে গেল, তাকে পড়ে নেব কিভাবে ? নিদানতত্ত্ব জানা থাকলে লক্ষণ মিলিয়ে রোগ নির্ণয় সম্ভব। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন শারীরবৃত্তের জ্ঞান। এই লাক্ষণিক পাঠক্রিয়ায় সম্ভাবনাকে জোরালো করে তুলছে আকাঙ্ক্ষার ধারণাটি, যা ভিতর থেকেই ধরে রেখেছে পাঠ্যশরীরকে।

এই অর্থে, আকাঙ্ক্ষা পাঠ্যের ধারণা-শক্তি ; অনাবৃতকে সে ধরে রেখেছে যা আবৃত, পাঠ্যের প্রায়ান্ধকারে যা ঊহ্য, তার সঙ্গে। তন্তুসন্ততির নানামুখ বিস্তারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে পাঠ্যকে। সে বদ্ধ নয়, বলি-চিহ্নিত, আত্ম-বিভাজিত। তা বলে সে তো খানখান হয়ে ভেঙে পড়ছে না। অন্তর্নিহিত বহু-রোখ ঝোঁক সত্ত্বেও এই বিচারে পাঠ্য একটি স্বাবলম্বী তাৎপর্য-স্কন্ধ। সেক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষা হল সেই অবলম্বন-সূত্র, সেই আভ্যন্তরীণ ন্যায়, যা সকল ভঙ্গ-প্রবণতা, সকল অনির্দিষ্টতা সত্ত্বেও ভিতর থেকেই পাঠ্যকে ধরে ও বেঁধে রেখেছে ; সে যে দুটি বা তিনটি নয়, একটি পাঠ্য-ব্যক্তি, সম্ভব করে তুলছে তার এই সাংস্কৃতিক পরিচিতি।

(৯) পৃষ্ঠা—১৭ (···বর্গে সাজিয়ে নেওয়া যায়) :

পাঠ্য-পরম্পরা, আমরা যেমন পরে দেখব, গড়ে তুলছে অন্তঃপাঠ্য। অনুলোম এবং প্রতিলোম ভেদে যে দুটি— বা হয়তো তিনটি— বর্গে তাদের সাজিয়ে নেওয়া হল, তা এক অর্থে একটি আদর্শায়িত উপস্থাপনা। ভেদরেখাগুলি স্থির বা নিশ্চিত নয়, ফলে তাদের ক্রমাগত অতিক্রম করে পরস্পরের কাছে বা পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে পাঠ্য। এ বিষয়ে সংক্ষেপে দু-একটি মন্তব্য করা যাক।

পাপিয়সী নারী, বিশেষত কুলটাদের নিয়ে সাহিত্যিক কুলপতিদের উদ্বেগের অন্ত নেই। মডেল ভগিনী-তে এই উদ্বেগ রূপ নিয়েছে জুগুপ্সিত ক্রোধে, মল ফ্লান্ডার্স-এ তার পরিবর্তে দেখা দিচ্ছে প্রতিবেদকের কৌতূহল ; তেমনি আনাতোল ফ্রাঁসের তাই-তে যদি মুখ্য হয়ে ওঠে ভূয়োদর্শী লেখকের নির্লিপ্ত কৌতুক, মরিয়াকের তেরেস-এ বড় হয়ে ওঠে সুগভীর অনুকম্পা। খলনায়ক বা নায়িকা যার প্রেক্ষিত থেকেই দেখি, রেস্টোরেশন নাটক থেকে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীতে ব্যাভিচারকে যুক্ত করা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক রুচির সঙ্গে, অবদমিত হচ্ছে নৈতিকতার প্রশ্নটি।

কিন্তু ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। বহু দশক আগে একজন ফরাসি পণ্ডিত এরকম একটি বক্তব্য রেখেছিলেন যে সাহিত্যে রূপায়িত প্রেম যখন অসামাজিক অথচ নিখাদ ও সাঁচ্চা অথবা, যেমন মানোঁ লেস্কোতে, অনিরূপিত, তাই রহস্যময়, তার বিবিক্তি তাকে ঘন এবং আর্দ্র করে তোলে। উদাহরণ : কৃষ্ণ ও রাধা, অথবা ট্রিস্ট্রাম ও ইজল্ট। অবশ্যই এগুলি কোনো পাঠ্য নয়, কিন্তু নানা পাঠ্যে এসব প্রেম কাহিনী যখন রূপায়িত হয়েছে, অনেক সময়েই বিষণ্ণ তীব্রতা তার একটি প্রধান উপাদান থেকে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে দান্তের মহাকাব্যের নরক বিভাগের পঞ্চম সর্গে বর্ণিত পাওলো ও ফ্রাঞ্চেস্কার কথা পাঠকের হয়তো মনে পড়বে।

কিন্তু আধুনিক উপন্যাসে যখন সমস্যাটি নিয়ে ভাবিত হচ্ছেন লেখক— যে উপন্যাস এখন হয়তো ততটা আর আধুনিক নয়— তার চরিত্র ফ্লবেয়ার, স্তাঁদাল বা বালজাকে যা, টলস্টয়ে আদৌ তা নয় ; ঘরের কাছে, বঙ্কিমচন্দ্রে যে রূপ তা পাচ্ছে, ভিন্নতা সহ রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রে তা নয়। অনুলোম বা প্রতিলোম যে বর্গ দিয়েই এদের ভাবি না কেন, পাঠ্য-সংসারের দুটি প্রান্তে শক্ত, নিরেট জমিতে অনড়ভাবে দাঁড় করিয়ে তাদের নিরূপিত করা চলবে না।

তাহলেও বর্গভেদটির পিছনে যুক্তি একটি আছেই। স্মরণ করুন ইংরেজি এবং বাঙলায় লিখিত দুটি উপন্যাস : কিম ও গোরা। প্রয়াত সুবীর রায়চৌধুরী লক্ষ করেছিলেন, কিমের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী অন্তঃপঠন ব্যতীত গোরা-র যুক্তি অসংগঠিত থেকে যেত। অনুলোমের অক্ষ বরাবর উপন্যাসটিকে যদি আমরা ফেলিক্স হোল্ট-এর সঙ্গে যুক্ত করি— অবশ্য তহবিল তছরুপের দায়ে রবীন্দ্রনাথকে দায়রায় সোপর্দ না করে— প্রতিলোম অক্ষটি বরাবর এতে এমন একটি মেধাবী প্রতিবাদী যুক্তি প্রবেশ করছে, যাকে উপেক্ষা করা হবে কফিহাউস-শোভন বামপন্থী বালখিল্যতার একটি সর্বোত্তম উদাহরণ। ভারতে লালিত দুটি আইরিশ যুবকই ভারতবর্ষকে খুঁজছে, কিন্তু এই অন্বেষণ কোথায় তাদের পৌঁছে দিচ্ছে ? সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে যে ভারতবর্ষের ঠিকানা, গোরার বিশ্বাস, পরেশবাবু রাখেন, তার জাতীয়তাবাদী এবং ভাববাদী সীমাবদ্ধতা কোথায় তা আমরা হয়তো জানি। কিন্তু শতাব্দীর এই কদর্য শেষ দশকে তাকে উপেক্ষা করার অধিকার কি আমাদের আছে ?

অনুপাঠ্য এবং প্রতিপাঠ্য—অর্থাৎ অনুলোম পাঠ্য এবং প্রতিলোম পাঠ্য— হিসেবে অন্তঃপাঠ্যের টানাপোড়েন বা বুননের মধ্যে স্থাপিত করে গোরা-কে দেখলে, সুতরাং, বিবেচনার একটি সামগ্রিক কাঠামো তৈরি হয় ; অন্তঃপাঠ্যের যে দো-মোহনায় উপন্যাসটির অবস্থান, সহজ হয় তার স্থানাঙ্ক নির্ণয়।

ঐ একই কারণে আবার মনোযোগের অসংহতিবশত বুননের একটি অক্ষ যদি আমাদের বিবেচনার বাইরে সরে যায়, ফলে উপন্যাসটিকে যদি কেবল একটি অনুপাঠ্য বা শুধু একটি প্রতিপাঠ্য হিসেবে দেখতে বাধ্য হই আমরা, আমাদের পঠনের মধ্যে এসে পড়ে

তাত্ত্বিক একপেশেমি, হয়তো অসহিষ্ণু অবুঝপনা। এক্ষেত্রে আরো যা বড় কথা, নিছক অনুপাঠ্য হিসেবে গোরা কী, তাকে ছাপিয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে প্রতিপাঠ্য হিসেবে তার পরিচয়। ইংল্যান্ডে দ্বিতীয় রিফর্ম বিলের সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় লেখা একটি উপন্যাসের নিছক একটি অনুপাঠ্য অথবা, সরাসরি, কুম্ভীলক-বৃত্তির উদাহরণ হিসেবে দেখলে, অভিযোগের ভুল-ঠিকের প্রশ্নটি ছাড়াও, আমাদের মনোযোগের বাইরে চলে যায় প্রতিবাদী অন্তঃপঠনের সেই অবলম্বন-সূত্রটি যা বেয়ে গড়ে উঠেছে উপন্যাসটি।

এতে অবশ্য সমালোচকের আত্ম-প্রসাদের কোনো হেরফের ঘটে না। নির্বোধ বিগ্রহ-পূজার বিরুদ্ধে সাড়া-জাগানো এবং, তাঁর বিচারে, প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ তো একটি করা হল!

(১০) পৃষ্ঠা—২৫ (...নব নব আদল দেয়, অতীতকে) :

ব্যাসকূটটি নিয়ে একটু ভেবে দেখা যাক।

কোনো সমাজ বা যুগ বিষয়ে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে যখন কোনো ইতিহাস রচনা করা হয়, সকল খুঁটিনাটি সহ, অবিকল, তার নিখাদ সামগ্রিক রূপটি যে গবেষণা কর্মে তুলে নেওয়া সম্ভব, ইতিহাস রচনার চূড়ান্ত আদর্শ বিষয়ে এটাই ছিল রাঙ্কের নিশ্চিন্ত দৃষ্টবাদী দাবি। ব্রদেল-এর হাতে পুষ্ট সার্বিক ইতিহাসের প্রবল উপস্থিতি সত্ত্বেও দৃষ্টবাদী ঐতিহাসিক দাবিটি নিঃসন্দেহে পরিত্যক্ত হয়েছে। সংখ্যাতীত তথ্যের মধ্যে কোন্‌গুলিকে বেছে নেওয়া হবে সে প্রশ্নটি ছাড়াও, এটা নিশ্চিত যে কোনো ইতিহাসই, অথাৎ কোনো ঐতিহাসিক পঠনই, তার উদ্ভবের ঐতিহাসিকতা, ফলত মতাদর্শগত তির্যগতা, থেকে মুক্ত নয়। সামনে, ইতিহাসের দিকে সে যেমন যেমন মনোযোগ দিচ্ছে, পিছন থেকে উদ্ভবের যুক্তি মেনে তার ভিতরে গড়ে উঠছে তার তত্ত্বাদর্শ। ফলে আপ্রাণ তন্নিষ্ঠা সত্ত্বেও তাত্ত্বিক আপেক্ষিকতা থেকে সর্বাংশে সে মুক্ত নয়।

এ তো গেল সমস্যার একটি দিক। সাংস্কৃতিক গবেষণাকর্মের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে অপর একটি বৈশিষ্ট্য : একে তার চক্রগামিতা বলা যাক। সংস্কৃতি বিষয়ক যে কোনো একটি পাঠ্য লেখবার আগে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা থাকে, লেখবার পরে, যতটা সামান্যই হোক, তার চরিত্র কিছুটা পাল্টায়, কেননা ঐ ঐতিহ্যটির অঙ্গীভূত হয় পাঠ্যটি নিজেই। বিষয় হিসেবে যেদিকে মনোযোগটি নিবদ্ধ করা হয়েছিল, বিষয়ী পঠন হয়ে উঠল তার তাত্ত্বিক সম্প্রসারণ মাত্র। এই অঙ্গাঙ্গিভাবের ফলে পাঠ্যটি হয়ে উঠছে অঙ্গী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, উদাহরণ স্বরূপ, ভৌত রসায়নের কোনো পাঠ্য বা এমনকি অর্থনীতির কোনো পাঠ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু এই অঙ্গাঙ্গিভাব বা চক্রগামিতার সম্পর্কটি উপস্থিত নয়।

এটা ঘটছে এই কারণে যে অনেক দূর পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিজেই একটি বাচন-ক্ষেত্র, ভৌত রসায়নের জগৎ বা অর্থনীতির জগৎ যা নয়। তাদের ক্ষেত্রেও নিজ নিজ

বাচন গড়ে উঠছে, যাদের গুরুত্ব অপরিসীম ; কিন্তু তার তার বাচনক্ষেত্রটির সঙ্গে তাকে তাকে গুলিয়ে ফেলাটা হবে তাত্ত্বিক উদ্ভ্রান্তির লক্ষণ : বর্গ ভ্রম। তাই নিজের বাচনক্ষেত্রটি যত যা গুরুত্ব অর্জন করুক না কেন, অর্থনৈতিক জগৎ পড়ে রয়েছে তার বাইরে ; প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কথাটা নিশ্চয় আরো বেশি করে সত্য। অন্য দিকে সংস্কৃতি লোকটি তার বাচন ক্ষেত্রের দ্বারা অনেক বেশি দূর পর্যন্ত অন্তঃপ্রবিষ্ট, এবং ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক পাঠ্য নিজেরা ঐ বাচনক্ষেত্রটির এক একটি সংগঠক উপাদান। এই কারণে একটি সাংস্কৃতিক লোক থেকে যদি সবকটি সংস্কৃতি বিষয়ক পাঠ্য কেড়ে নেওয়া হয়, তদ্-বিষয়ক বাচনক্ষেত্রটির সঙ্গে সাংস্কৃতিক লোকটির তদাত্ম্য এত গভীর, এত অবিচ্ছেদ্য, যে শুধু বাচনক্ষেত্রটি নয়, সেক্ষেত্রে সংকুচিত হয়ে পড়বে সামগ্রিক-ভাবে সাংস্কৃতিক জগৎটি।

আরো বড় কথা হল, এই অঙ্গাঙ্গিভাব জড়বৎ বা নিশ্চেষ্ট নয়। এর মধ্যে যে চলিষ্ণু সচেষ্টতার চরিত্র এসে পড়ে তা-ই হল তার চক্রগামিতা। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে ভিন্ন ভিন্ন পোষ্য পঠন ; যেমন, চক্রবৎ, তারাই আবার পোষক সংস্কৃতিকে নব নব সংজ্ঞা ও মাত্রা, নব নব তাত্ত্বিক নির্দিষ্টতা দেয় ; ফলে পুষ্টি পায় পোষক ঐতিহ্যটি নিজেও। ইংরেজি সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে গত পঞ্চাশ বছরে গড়ে ওঠা মার্ক্সবাদী পঠনের কথা স্মরণ করুন : হিল থেকে টম্পসন, উইলিয়ামস, নেয়ার্ন, ইগলটন, এলেন মিক্সিন্‌স উডের পাঠ্যগুলি কি নিশ্চেষ্টভাবে বাচনক্ষেত্রের অঙ্গীভূত হচ্ছে? না কি তাদের সাঙ্গীকরণের ব্যাপারটি, সাংস্কৃতিক চক্রগামিতার দরুণ, বাচনক্ষেত্রটিকে নব নব আদলও দিচ্ছে? তা যখন দিচ্ছে, তখন কাসিরের-এর একটি পদবন্ধকে একটু পরিবর্তিত ক'রে, সাংস্কৃতিক পাঠক্রিয়ার এই অবিরত আগু-পিছু গমনাগমনকে, তার চক্রগামিতাকে, পশ্চাদ্-মুখী সম্মুখগামিতা বলে অভিহিত করা যাক না কেন।

(১১) পৃষ্ঠা—২৫ (...যে ভাষা কেড়ে নেওয়া হয়েছে) :

কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন আজ পাঁচশ বছর হল। উক্ত বছরেই, ১৪৯২ সালে, লিখিত হয় আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা-সমূহের প্রথম ব্যাকরণটি : গ্রামাটিকা। লেখক আন্তোনিও দে নেব্রিহা রাণী ইজাবেলাকে মনে করিয়ে দেন যে ব্যাকরণ হল রাজ্য শাসনের সহকর্মী ও মিত্র। শাস্ত্রটি যে শাসনের একটি হাতিয়ার, আভিলার বিশপও রাণীকে তা বোঝান। দুই যোদ্ধাই যে একই সময়ে এই সত্যটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তার কারণ মনে হয় হিস্পানী সাম্রাজ্যের ত্বরান্বিত ভৌগোলিক স্ফীতি।

তা বলে যোগসূত্রটি যে এর আগে আবিষ্কৃত হয়নি, তা কিন্তু নয়। এর দু-হাজার বছর আগে কনফুসিয়াস এবং দেড় হাজার বছর আগে সিসেরো সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করে-ছিলেন : দ্বিতীয়োক্ত মণীষীর দে ওরাটোরে বা বাগ্মিতা বিষয়ক প্রস্তাব হল অনেকাংশে

ঐ উপলব্ধির ফলশ্রুতি। আমাদের দেশের শাস্ত্রজ্ঞরাও জানতেন, শুধু শস্ত্র নয়, শাসনের জন্য প্রয়োজন শাস্ত্রেরও ; এবং ভাষাজ্ঞান ব্যতীত শাস্ত্রচর্চা অসম্ভব। এজন্য এমনকি উচ্চারণকেও নির্ভুল করা প্রয়োজন, নতুবা 'ইন্দ্রশত্রু' পদটির ভুল উচ্চারণের জন্য বৃত্রের ভাগ্যে যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তা ঘটাও অসম্ভব নয় !

অত্যুচ্চ-শিক্ষিতদের হিসেবের বাইরে রেখেই বলছি, এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে ব্রাত্য বা দাসের কানে খবরটা এসে পৌঁছয়নি। তাই প্রভুর ভাষা যখন যে শেখে, ক্যালিব্যানের মতো প্রতিরোধে যদি সে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ হয়, তা সে শেখে, না, মন্ত্রোচ্চারণ নয়, ঘৃণা সহ প্রভুকে অভিসম্পাত দেবার জন্য। কিন্তু তা যে সে শিখতে বাধ্য হচ্ছে তা তো এই কারণেই যে তার মুখ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার নিজের ভাষা। ভেবে দেখা যাক কিভাবে তা ঘটছে।

রোমান শাসকরা এটা লক্ষ করেছিল যে হাতিয়ার বা যন্ত্র তিন কিসিমের : এক, যা নিঃশব্দ, যেমন কুমোরের চাক বা ছুতোরের তুরপুন ; দুই, যা শব্দ করে, যেমন গরু বা ঘোড়া ; এবং তিন, যা কথা কয়, যেমন দাস। কিন্তু আভ্যন্তরীণ আগ্রাসন নয়, বহিরাক্রমণ যখন মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় বিজেতা ও বিজিতকে, বিজিগীষা ও জাতিদর্পের সঙ্গে বিজেতার চৈতন্যে এসে যুক্ত হয় সাংস্কৃতিক অপরিচিতি থেকে জাত সন্দেহ ও তাচ্ছিল্যবোধ। সাংস্কৃতিক বর্বরতা অর্জন ক'রে তার পক্ষে তখন ভেবে নেওয়া সম্ভব হয় যে বিজিত হল নির্বাক, তাই অবমানব। স্টিফেন গ্রীনব্ল্যাট দেখিয়েছেন যে পরাভূত এবং অধিকৃত দক্ষিণ আমেরিকাতে ঠিক এটাই ঘটেছিল, তাই ক্যালিব্যান হয়ে উঠেছিল ভাষা থেকে বঞ্চিত 'নির্বাক অবমানবদের' প্রতিনিধি— এই অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে মঁতেন, বিশেষ করে লাস কাসাস-এর সাহসী প্রতিবাদ সত্ত্বেও।

আমাদের শাস্ত্রকাররা বলেন, আমরা ভাষা শিখি বৃদ্ধ ব্যবহার থেকে। অভিনব কুমার শোনে 'গামানয়', দেখে গরুটিকে আনা হল। 'গাম্' এবং 'আনয়' এ দুটি পদকে মনে মনে গরুটিকে আনবার ব্যাপারটির সঙ্গে সে যুক্ত করে। সস্যুর না মানলেও ভাষার এই বস্তু- এবং ব্যবহার-নির্দেশের ক্ষমতাকে এদেশের ভাষাচার্যরা সংগত কারণেই মানতেন। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে সামাজিক আদান-প্রদানের সদর থেকে তিরোহিত-প্রায় ভাষার স্মৃতিকে টিকিয়ে রাখতে বাধ্য হয় নিপীড়িত মানুষ। তাই মার্কেসের নৈঃশব্দ্যের এক শতক-এ দেখি লাতিন আমেরিকায় কিয়দংশে ঐ ক্যালিব্যানের উত্তর-পুরুষকে লিখে রাখতে হচ্ছে : 'ইহা হয় গরু' বা 'ইহা হয় বৃক্ষ'।

এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ তা বলে থেমে থাকছে না। এমে সেজারের বা আরো অনেকের উদাহরণ টেনে এডোয়ার্ড সাইড যেমন দেখাচ্ছেন, এ ব্যাপারে কেন্দ্রস্থতা অর্জন করছে শেক্সপীয়রের নাটকটি ; তাই অনেকাংশে প্রতিবাদ দানা বাঁধছে ক্যালিব্যানের প্রতীকী তাৎপর্যকে ঘিরে।

(১২) পৃষ্ঠা—২৬ (…তা চলতে থাকে) :

এই প্রসঙ্গে, হাল্কা মেজাজের হলেও, প্রতিবাদী পঠনের সর্বাপেক্ষা মজার গল্পটি সম্ভবত আউট অব আফ্রিকা-তে বর্ণিত সেই ঘটনাটি। দা মার্চেন্ট অব ভেনিস-এর কাহিনীসূত্র শুনে ফারা, ব্লিক্সেন-এর সোমালি ভৃত্যটি, গল্পটিকে ভাবা শুরু করল শাইলকের দিক থেকে, কিভাবে আইন মোতাবেক প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব ছিল তার পক্ষে। এই নাটকটির মঞ্চায়নই কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক চরিত্র অর্জন করেছে আজকে, টেল আভিভে, যখন শতকরা একশ জন ইহুদি দর্শকের সামনে বিশেষভাবে জিঘাংসু রূপ দিয়ে হাজির করা হচ্ছে শাইলককে, তাঁদের মনে করিয়ে দিতে যে যত না অবদমিত, তার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের বাবদে ইহুদি জাতিসত্তা তার চাইতে অনেক বেশি করে আগ্রাসী হয়ে উঠেছে আজ।

এরকম কোনো পঠন দিয়ে নাথান দা ওয়াইজ-কে সমসাময়িক তাৎপর্য দেওয়া যায় কি না তা নিয়ে ভেবে দেখা যেতে পারে।

(১৩) পৃষ্ঠা—২৯ (…সাংস্কৃতিক যোগপত্রের শৃঙ্খলাটি) :

তুলনীয়ভাবে, কাফকার কথা বলা যেতে পারে ; অথবা, ঘরের কাছে, জীবনানন্দের বাক্সবন্দী পান্ডুলিপিগুলির কথা। তবে, লক্ষ করুন, এঁরা কেউই সাম্রাজ্য-মহিমার আদিপুরুষ কোনো ধর্মনিষ্ঠ আইনেয়ুসকে নিয়ে লিখছেন না, লিখছেন মহিমা-চ্যুত প্রান্তিক জনের কথা। পাঠ্যসংসার থেকে কাফকার পাঠ্যগুলি অবলুপ্ত হলে বা, জীবনানন্দের ক্ষেত্রে, তার কিনারায় তারা অপেক্ষা করে থাকলে, কতটা আমরা হারাতাম তা ভাবাও কঠিন। স্টার্নারের বক্তব্যের জের টেনে বলা যেতে পারে, ডস্টয়েভস্কি থেকে শুরু হলেও, কাফকার সাহিত্যে পৌঁছে তবেই কেবল যে বিকেন্দ্রিত সে অর্জন করল কেন্দ্রস্থতা ; ফলে, আধুনিকতার জন্মলগ্নেই, অন্তেবাসীকে ঘিরে গড়ে উঠল আমাদের মনোযোগ। পাঠ্যের অনুপস্থিতিতে এই ধারাবাহিকতার ন্যায়টা আমাদের মনোযোগের বাইরে থেকে যেত, তার জের এসে পড়ত জীবনানন্দেও। তা বলে ব্রাত্য যে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থেকে যেত তা হয়তো নয়। কেননা কুন্দেরা দেখিয়েছেন যে ঐ প্রাগ নগরেই, কাফকার একজন সমসাময়িকেরই হাতে, সৃষ্ট হচ্ছে ছোট মানুষ সোয়াইগ, যে জোসেফ কে-র হয়তো একমাত্র বিকল্প অহং। তবে সে প্রতিবাদী, জোসেফ কে, মাল্যবান বা বাঘারু যা নয়। তাত্ত্বিক গভীরতা দিয়ে ঐ প্রতিবাদের সূত্রেই আবার তাকে বেছে নিচ্ছেন ব্রেশ্‌ট।

(১৪) পৃষ্ঠা—৩০ (…অন্তত তাকে মানায় না) :

দার্শনিক বুবের একজন রেবাই-এর কথা লিখেছিলেন, লোকসমাজ ঈশ্বরের কথা শুনতে চায় না বলে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে যিনি চলে গিয়েছিলেন, মরুকান্তারে। ঈশ্বর কিন্তু তাঁর মুখে তাঁর ভক্তিগাথা শুনতে নারাজ ; বললেন, 'না, তুমি ফিরে যাও সংসারে। শুনতে

না চাইলেও সংসারকে উদ্দেশ করেই উচ্চারিত হোক তোমার যাবতীয় প্রার্থনা। লোক-সমাজের বধিরতার মধ্যেই আমি পেতে রেখেছি আমার কান।'

একথা ঠিক যে পাঠক যখন উৎকর্ণ, পাঠ্যের বিবক্ষা তখনই কেবল সার্থক হয়ে ওঠে। কিন্তু ততক্ষণ, বুবেরের ঈশ্বরের মতো, পাঠকের বধিরতার মধ্যেই সে তার সোচ্চারতা নিয়ে নিঃশব্দে অপেক্ষা করে।

(১৫) পৃষ্ঠা—৩০ (…গোচরে আনতে বাধ্য হয় সে):

সাংস্কৃতিক মূল্যায়নের পালাবদল ছাড়াও, অন্য প্রেক্ষিত থেকে আগেও যেমন লক্ষ করা হয়েছে, অপর একটি কারণে তা ঘটছে এবং আরো বেশি করে তা ঘটবে : এটি হল সংস্কৃতি শিল্পায়নের অন্তর্নিহিত ক্রমবিস্তারের ঝোঁক। সম্ভব হলে মার্গ সাহিত্যের চৌহদ্দির মধ্যে, নিতান্ত না হলে তার বাইরে, নতুন নতুন পঠনের সম্ভাবনাকে উৎপাদন না করে নিলে সাংস্কৃতিক পণ্যের জোগানে যেমন ঘাটতি পড়বে, তেমনি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়বে গবেষণা কেন্দ্রগুলির পক্ষে। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তাত্ত্বিক অবস্থানের মধ্যে না গিয়েও তাই বলা যায় যে প্রাণধারণের তাগিদই বাধ্য করছে পঠনের— ফলত পাঠ্যেরও— ক্রমপ্রসারণ।

যে নিঃস্বার্থ বৌদ্ধিক চর্চার প্রশংসায় পঞ্চমুখ লিবেরাল বিবেক, তা এতটা কামগন্ধহীন নয় তবে আর!

(১৬) পৃষ্ঠা—৩১ (… বিদায় দেবার বিধান দিয়েছেন):

যা পড়া যায় তাই পাঠ্য। আমেরিকার সংবিধানকে যদি একটি পাঠ্য বলে মেনে নেওয়া যায়, গুরুত্ব অনেক কম হলেও বিচারকের রায়ও সে দাবি রাখতে পারে। সেক্ষেত্রে, ওকালতি পরিভাষায় যাকে অবিটার ডিক্টাম বা ডিক্টা বলা হয়ে থাকে, রায়ের মূল প্রতিপাদ্যের সঙ্গে যা নিঃসম্পর্ক, টিলক তাকে অর্থবাদের সঙ্গে তুলিত করেছেন।

(১৭) পৃষ্ঠা—৩৩ (…এবং চক্রবৎ):

তুলনীয় একটি প্রক্রিয়াকেই নির্দেশ করছে হারমেনিউটিক চক্র। তবে সেখানে জোরটা এসে পড়ছে পাঠ্যের সামগ্রিকের সঙ্গে টুকরো টুকরো করে নির্বাচিত তার ভিন্ন ভিন্ন অনুপুঙ্খ ও উপাদানগুলির সম্পর্কের ওপর। পাঠ্য সম্পর্কে সামগ্রিক একটা প্রত্যাশা নিয়ে তার সঙ্গে ব্যাপৃত হচ্ছে পাঠক্রিয়া ; অতঃপর বেছে নেওয়া হচ্ছে মূলত সেই সব উপাদানগুলিকে যারা, চক্রবৎ, পরিপুষ্ট করছে সামগ্রিকের ঐ ধারণাটিকেই। এইভাবে হারমেনিউটিক চক্রের অনিবার্য মদতে প্রতীতি পঠন জানছে সে অভ্রান্ত। পাঠক্রিয়ার পিছন দিকে, ব্যক্তিসংস্কারে এর ফলে যে মনস্তাত্ত্বিক অন্ধতা জন্মাচ্ছে, এবং ঐ অন্ধতা-জনিত আত্মপ্রসাদ ও আত্মশ্লাঘা, এবং তাদের সমবেত বিক্রিয়ায় পুষ্ট হচ্ছে যে বিজিগীষা, এখানে আমার উদ্দেশ্য হল সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

(১৮) পৃষ্ঠা—৩৩ (...আরো দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে) :

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে সমালোচক এত বেশি করে অজিজ্ঞাসু এবং অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, তার কারণ কি এই অসমস্যায়িত সংস্কারের মেদবৃদ্ধি ? ফলে তার তাত্ত্বিক স্ক্লেরোসিস ? □

মিখাইল বাখতিন : উপন্যাসের সমস্যা

শিবাজীপ্রতিম বসু

একটি স্বপ্নের প্রস্তাবনা

'হ য ব র ল'র নেড়ার বিচারের গল্পটা একটু অন্যভাবে সাজানো যাক: সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার চলেছে—কাব্য ও গদ্যের মধ্যে। তবে এই সভায় কাব্যপক্ষ একাধারে বিচারপ্রার্থী ও উকিল। শামলা গায়ে জোর গলায় তারা প্রতিপক্ষকে তুলোধুনো করে দিচ্ছে— জোরালো তাদের সওয়াল।

অন্যদিকে, গদ্যপক্ষ নেড়ার মতো নার্ভাস হাসছে। সে যেন বুঝেই ফেলেছে এই বিচারের ফলাফল। আর বিচারকবেশী সাহিত্য-সমালোচক কলম হাতে ঢুলছে, মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়ছে। কাব্যপক্ষ (অর্থাৎ, কবির দল) আরিস্ততল, কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করে বুঝিয়ে দিচ্ছে কারা শ্রেষ্ঠত্বের হকদার। কখনো ঠোঁটে তাচ্ছিল্য নিয়ে তারা শোনাচ্ছে: সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। বিচারক মাথা নাড়ছে। কখনো বা সদম্ভে বলছে: তুমি গদ্যের সভায় যাবে যাও··· যেন লোকে বলে রাজা এসেছিল।

বিচার শেষ হতে চলেছে। আসামি চিহ্নিত। বিচারক নেড়া-গদ্যের তিনমাস জেল আর সাতদিনের ফাঁসির হুকুম লেখার জন্য নড়েচড়ে বসেছেন…
এমন সময় কোথা থেকে— আমাদের স্বপ্ন-কাঠামোর বাইরে থেকে, চেনা বিশ্বের অন্যপার থেকে, এসে দাঁড়ালেন মিখাইল বাখতিন। শ্লেষে/দম্ভে বিচলিত না হয়ে বিশ্লেষণের গভীরতায় সাজাতে লাগলেন গদ্যসাহিত্যের পক্ষে যুক্তির এক একটি ক্রম এবং সবশেষে সমালোচনার তীরটি ঘুরিয়ে দিলেন এ-তাবৎ শিরোপার দাবিদার কাব্য-পক্ষের দিকে। তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, উপস্থাপনায় এমন এক অভিনবত্ব ছিল যে স্বয়ং বিচারক হাততালি দিয়ে উঠল। সভা ভেঙে গেল।

সাহিত্যতত্ত্ব : 'তাহাদের' কথা : এক

বলা বাহুল্য, মিখাইল বাখতিন গদ্যের তত্ত্বকার বা বলা ভালো, তিনি উপন্যাসের তত্ত্বকার ও তার গরিমা-গায়ক। কিন্তু তাঁর তত্ত্ব, অবদান ও উত্তরাধিকার আলোচনার আগে একটা পুরনো প্রসঙ্গ ঝালিয়ে নেওয়া দরকার।
তা হল, 'সাহিত্য' কী এবং কীভাবে তা সম্ভব হয়? এই প্রশ্নের উত্তর দুভাবে দেওয়া চলে। এক, সাহিত্যকৃতিকে একজন সাহিত্যিকের সৃষ্টি বলে বিবেচনা করা, অর্থাৎ মনে করা যে একজন সাহিত্যিকের কিছু বক্তব্য/অনুভূতি ইত্যাদি আছে, যা সে নিজের মতো করে অন্যদের বলতে চাইছে : এই প্রয়োজন থেকেই সাহিত্যের সৃষ্টি। অতএব, সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আবশ্যক হল, সাহিত্যস্রষ্টার অনুভূতি / বক্তব্য এবং তার পেছনে যে মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব বর্তমান তা খুঁজে বের করা। অর্থাৎ লেখকের জীবন ও জগতের নানা রহস্য উন্মোচন করা, তবেই পাওয়া যাবে সাহিত্যমূল্য/অর্থের হদিশ। কারণ, সাহিত্যকর্মের নিয়ন্ত্রক বা বিধাতা হলেন স্বয়ং লেখক।
কিন্তু ওপরের যুক্তিশৃঙ্খল একটি প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে না, তা হল, **কীভাবে** কোনো বক্তব্য বা অনুভূতি সাহিত্য' হয়ে ওঠে? অথবা কোন্ উপায়ে কিছু বক্তব্য সাহিত্যপদবাচ্য হয়, আর কিছু বক্তব্য দৈনন্দিন গৌণ কথাবার্তায় পর্যবসিত হয়? এই পার্থক্য নির্দেশ করার সম্ভাব্য উত্তর হল : সাহিত্যস্রষ্টা এমন কিছু **বিশেষ চেহারায়** বা কাঠামোয় তাঁর বক্তব্য/অনুভূতি উপস্থাপন করেন, যা সাধারণ কথাবার্তার ধরন বা রূপের চেয়ে বহুলাংশে ভিন্ন। অর্থাৎ সাহিত্য তাহলে হল, বক্তব্য। অনুভূতি প্রকাশের একটি বা অগুণতি বিশেষ রূপ বা ফর্ম। এখান থেকেই সাহিত্য-সম্পর্কিত দ্বিতীয় মতটি যাত্রা শুরু করে— যা লেখকের চেয়ে **লেখার** ওপরে, বিষয়ের চেয়ে রূপের ওপরে, তার কলাকৌশলের ওপরে জোর দিয়ে থাকে।
প্রথম মতটির ঐতিহ্য খুব পাকা। বিশেষত, বিদ্যায়তনিক চর্চায়, যথা ক্লাসরুম শিক্ষণে, সাহিত্যের 'ইতিহাস' চর্চায়, টেক্সট এবং নোটবুকের পরম্পরায়, এমনকি সাধারণ মানুষের বিশ্বাসে প্রথম ধারণাটি প্রোথিত 'পরমধন'।
দ্বিতীয় মতটি অর্বাচীন। গত শতকের শেষদিকে তার তাত্ত্বিক আভাস, এই শতকের

গোড়ার দিকে ইয়োরোপের কয়েকটি দেশে কিছু মনস্ক গোষ্ঠীর অনাড়ম্বর আলোচনা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মুখ্যত ফ্রান্স ও আমেরিকার সাহিত্য সমালোচনা এবং সর্বোপরি ছয়ের দশক থেকে এ-তাবৎ 'সবচেয়ে প্রভাবশালী' বৌদ্ধিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, যা বিশ্বের [পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত] চিন্তাশীল মানুষের নজর কেড়েছে।

সাহিত্য সমালোচনায় মিখাইল বাখতিনের অবদান/গুরুত্বের আলোচনার ক্ষেত্রে এই দুটি মতের কথাই (বিশেষত তাদের অন্তর্নিহিত টেনশনের কথা) আমাদের কমবেশি মনে রাখতে হবে, যদিও [বর্জনে-গ্রহণে] দ্বিতীয় মতধারাটির সংগেই চলেছে বাখতিন ও তাঁর পদ্ধতির দ্বন্দ্ব বা [বাখতিনের ভাষায়] 'ডায়ালগ'।

মুখ্যত ইয়োরোপীয় উৎসের সমালোচনার এই ঘরানার অনুপ্রেরণার কেন্দ্রস্থল ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুরের ভাষাতত্ত্বচর্চা, যা কোনো ভাষার ঐতিহাসিক আলোচনার (diachrony) পরিবর্তে তাকে একটি নির্দিষ্ট সমাজ-সংস্কৃতিতে অর্থবহ 'স্বেচ্ছাচারী' (arbitrary) চিহ্নের (sign) বিজ্ঞান (যার পদ্ধতিগত নাম—synchrony) হিসেবে দেখতে চায়। সস্যুর অবশ্য ভাষাকে ব্যাকরণবদ্ধ আনুষ্ঠানিক ভাষা (langue) এবং ব্যবহৃত বা কথিতভাষা (parole)— এই দুইভাগে ভেঙে, আনুষ্ঠানিক ভাষার ওপরেই চিহ্ন বিজ্ঞানকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। এছাড়া ভাষা ব্যতীত সমাজ সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্র যেখানে ধারণা ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও অর্থবহ হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক-সাংস্কৃতিক চিহ্নের দ্বারা— সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই চিহ্নবিজ্ঞান গড়ে তোলা সম্ভব মনে করতেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রের চিহ্নবিজ্ঞান নিয়েই গড়ে উঠবে 'চিহ্নতত্ত্ব'(Semiology)। সস্যুরের ভাষাতাত্ত্বিক ধ্যানধারণার প্রবল প্রভাব পড়েছিল পরবর্তীকালের সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞান চর্চায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে, বিশেষত ছয়ের দশকের গোড়া থেকেই লেভি স্ট্রসের নৃতত্ত্ব, রলাঁ বার্থের সাহিত্য সমালোচনা বা আলথুসারের মার্কসের রচনা 'পাঠে'— যা স্ট্রাকচারালিস্ট আন্দোলন হিসেবে জগতে পরিচিত হয়— যার আরো পরিণত/নব রূপ (যা বাজারে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম নামে বিদিত) লাকাঁ ও ফুকোর তত্ত্বে পুষ্ট হয়ে জাক দেরিদার 'অবিনির্মাণে' (Deconstruction) তুঙ্গে গিয়ে পেঁাছেছে। গত এক দশক ধরে এই বিষয়ে [ইংরেজি এমনকি বাঙলা ভাষায়] এত প্রবন্ধ রচিত হয়েছে যে বিদগ্ধ পাঠককুলের প্রায় সকলেরই তা জানা।

কিন্তু কিছুদিন আগেও এমনকি পশ্চিমী পণ্ডিতকুলেরও অনেকের অজানা ছিল যে, ফরাসি স্ট্রাকচারালিজমের বহুপূর্বে একদল মানুষ নীরবে বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সস্যুরের ভাষাতত্ত্বের প্রভাবে [গ্রহণে এমনকি বর্জনে] সাহিত্য সমালোচনার 'বিজ্ঞান' গড়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। ১৯৫৮ সালে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সেমিনারে রোমান জ্যাকবসনের বক্তৃতার আগে বহু শ্রেষ্ঠ ঈঙ্গ-মার্কিন বুদ্ধিজীবীরা জানতেই পারেনি 'অচ্ছুত' রাশিয়ার ফর্মালিস্টদের কথা! যদিও ফরাসি স্ট্রাকচারালিস্ট সমালোচনা-ধারা গড়ে ওঠার পেছনে এই সব রুশ পণ্ডিতদের অবদানও ছিল কম নয়।

সাহিত্যতত্ত্ব : 'তাহাদের' কথা : দুই

সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে স্ট্রাকচারালিস্ট ঘরানার অন্যতম পথিকৃৎ রলাঁ বার্থ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে লেখকের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। কারণ, একটি রচনা কেবলমাত্র কিছু শব্দের কয়েকটি লাইন নয়, যার একটিমাত্র 'ঈশ্বরীয়' (বা পবিত্র) অর্থ আছে, বরং তা হল এমন একটি বহুমাত্রিক ভূমি যেখানে বিভিন্ন রচনা (যার কোনোটিই মৌলিক নয়) পরস্পরের সঙ্গে মিলিত ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। কিন্তু সর্বশক্তিমান 'লেখকের' অস্তিত্বে বিশ্বাসী সুপ্রাচীন ধারণাটি ধরেই নেয় যে, লেখকের অস্তিত্ব 'রচনার' **পূর্বেই** সিদ্ধ হয়েছে এবং রচনা সবসময়েই বিরাজ করে লেখকের **পরে**— অর্থাৎ, লেখক : জনক/নিয়ন্তা, রচনা : লেখকের সন্তানবৎ/তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং বার্থের মতে, এই প্রাচীন ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য প্রয়োজন— 'লেখকের' (ধারণার) মৃত্যু এবং আধুনিক 'লিপিকারের' (scriptor) জন্ম, যে লিপিকারের অস্তিত্ব থাকবে কেবল রচনা লিপিবদ্ধ করার কালেই।

যদি বার্থের ওপরের ঘোষণাটি অস্বস্তিকর মনে হয়, তবে আমাদের চূড়ান্ত বিমূঢ় করবে সাহিত্য সমালোচনার দোর্দণ্ড অবিনির্মাণী তত্ত্ব। সাহিত্যকে 'লেখকের নির্মাণ' হিসেবে না দেখে বার্থ এবং তাঁর প্রশিষ্যগণ সাহিত্যরচনাসহ বহুধ্বনিময় বক্তব্য/মতামতসমূহ (অর্থাৎ বিভিন্ন ডিসকোর্স) বিভিন্ন চিহ্নজ্ঞাপনকারী দ্যোতক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অতি [উত্তর] আধুনিক অবিনির্মাণ তত্ত্ব কোনো রচনা বা ডিসকোর্স 'বিশ্লেষণে' বিশ্বাসী নয়। তার মতে, এ এক **অসম্ভব** প্রকল্প। কারণ, কোনো রচনা কাঠামো নতুন করে ভাঙার প্রয়োজন নেই— তারা রচনার সময়েই **ভগ্নপ্রাপ্ত** হয়েছে, কারণ, ভাষার চরিত্রই এমন যে, কোনো রচনা একটিমাত্র নির্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপনের দাবি পরিত্যাগ করতে বাধ্য। সুতরাং নতুন করে কাঠামো বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। বরং বিশ্লেষণ প্রয়োজন সেই **সমস্যাসমূহের**, যা রচনার একটি নির্দিষ্ট অর্থ গড়ে তোলার পথে ক্রমাগত ও অনন্ত বাধা (ডিফারেন্স এবং ডেফারেন্সের সাহায্যে) দিয়ে থাকে। অর্থাৎ একটি রচনা/ডিসকোর্সের আছে অনন্ত অর্থ-সম্ভাবনা এবং স্ট্যানলি ফিশের মতে, এই অনন্ত অর্থসমূহের ওপর একমাত্র [স্বৈরাচারী] নিয়ন্ত্রণ আছে একটি বিশ্লেষণ গোষ্ঠীর— আকাদেমিক সাহিত্য-সমালোচকগণের।

এইভাবে অবিনির্মাণ পাঠককুলকে (তথা সমালোচকদলকে) এক অদ্ভুত দোলাচলের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। ইতিপূর্বেই [স্ট্রাকচারালিস্ট আক্রমণে] 'লেখকের' মৃত্যু ঘটেছে, অর্থাৎ স্রষ্টা/লেখক-নিরপেক্ষ রচনা লিপিবদ্ধ হচ্ছে— পাঠক/সমালোচকের কাজ তার 'পাঠ' করা। কিন্তু 'অনন্ত অর্থসম্ভাবনা' কোনো নির্দিষ্ট অর্থে পাঠের সম্ভাবনাই বাতিল করে দিচ্ছে।

সাহিত্যতত্ত্ব : 'তাহাদের' কথা : তিন

অবিনির্মাণ যদি আমাদের এক তাত্ত্বিক অসম্ভাব্যতার দিকে ঠেলে দেয়, তাহলে রুশ

ফর্মালিস্ট ঘরানা নিশ্চয়ই সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে আমাদের নতুন করে উৎসাহ দেবে। বাখতিনকে অনেকে যদিও 'পোস্ট ফর্মালিস্ট' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু ফর্মালিজমের সঙ্গে তাঁর চিন্তা ও পদ্ধতির অমিলের দিকটিই প্রবল। তবুও বাখতিনের ওপর কোনো আলোচনাই ফর্মালিস্ট পরম্পরাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না। সেই প্রসঙ্গে দু-চার কথা।

অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত আগে ও পরে রাশিয়ার 'প্রগতিশীল' সাহিত্যচর্চার অনেকগুলি ধারা বইছিল, যেমন, জঙ্গি বিপ্লবী মানসিকতার 'প্রোলেটকাল্ট', সামাজিক বাস্তবতা তথা ঐতিহাসিক পরিস্থিতি নির্ভর গোর্কিপন্থী সাহিত্য (যা অচিরেই সরকারি অনুমোদন লাভ করেছিল), এছাড়া মায়াকভস্কির মতো সাহিত্যিকদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা 'ফিউচারিস্ট' আন্দোলন —যা, সাহিত্যকে 'বিজ্ঞানের বিকল্প' বা বিপ্লবী সেন্টিমেন্টের ধারক হিসেবে গণ্য না করে, তার রূপ ও কলাকৌশল আমূল পাল্টে অভিজ্ঞার পরিচিত পথে চমক ও আঘাত দিয়ে চেনা বাস্তবকে অন্যভাবে দেখার মাধ্যম বলে মনে করত। যদিও ফর্মালিস্টদের সঙ্গে ফিউচারিস্টদের অনেক অমিল ছিল, কিন্তু (ব্যক্তিগত পর্যায়ে) পারস্পরিক আদানপ্রদান ও চিন্তায় এমন কিছু মৌলিক ঐক্য ছিল, যে অনেকে ফিউচারিস্ট সাহিত্যকে ফর্মালিস্ট সাহিত্যতত্ত্বের প্রয়োগ বলে মনে করেছেন।

প্রধানত মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবার্গে গড়ে ওঠা ফর্মালিস্টদের ওপরে সস্যুরের ভাষাতত্ত্বের প্রভাব থাকলেও, তাঁরা সাহিত্যকে (স্ট্রাকচারালিস্টদের মতো) 'ভাষার' [অর্থাৎ ভাষা কর্তৃক] একটি নির্মাণ বলে মেনে নেননি— বরং তাঁদের মতে সাহিত্য হল ভাষার **ওপর** একটি নির্মাণ। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট একটি ভাষা-কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করলেও সাহিত্যকৃতির [প্রায়] স্বাধীন অস্তিত্ব ও তার কারণ অনুসন্ধানেই ছিল তাঁদের মূল আগ্রহ এবং এই প্রসঙ্গে সাহিত্যরচনা পাঠের চেয়ে ফর্মালিস্টদের মুখ্য আকর্ষণ হল, **কীভাবে** একটি নির্দিষ্ট ভাষা কাঠামোয় কিছু প্রয়োগ সাধারণ/দৈনন্দিন ভাষা ও অন্যগুলি 'সাহিত্য' হয়ে ওঠে ? ভিক্টর শকলোভস্কি, রোমান জ্যাকবসন প্রমুখ বিভিন্ন গোষ্ঠীর ফর্মালিস্টদের এটাই প্রধান জিজ্ঞাস্য। সুতরাং সাহিত্যরচনার চেয়ে জোর পড়ল 'সাহিত্যগুণের' (literariness) ওপর, অর্থাৎ যার ফলে কোনো রচনা সাহিত্যপদবাচ্য হয়।

এখন, এই 'সাহিত্যগুণ' কীভাবে গড়ে ওঠে ? এই বিষয়ে ফর্মালিস্টরা যে উপাদানটির কথা বলেছেন তাকে বিশ্বের বহু কবি-সাহিত্যিক (আমাদের রবীন্দ্রনাথও) তাঁদের অভিজ্ঞতায় সত্য বলে মেনেছেন। একটু খটমটে শোনালেও উপাদানটিকে এইসব রুশ তাত্ত্বিক 'অপরিচিতকরণ' (defamiliarization) বলে উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ এমনভাবে তথ্য, ভাব, অনুভূতি প্রভৃতির প্রকাশ যাতে চেনা বিশ্বটিও অন্য/নতুন/অপরিচিতভাবে আমাদের কাছে হাজির হয়। শকলোভস্কির কথায়, একটি ঘটনা বা অভিজ্ঞতা যা বারংবার দেখতে দেখতে আর দৃষ্ট হয় না [অর্থাৎ অস্তিত্বের নিত্যতায় যা প্রায় অনস্তিত্বে পেঁছয়]— তা যখন নতুন আলোয় বা অন্ধকারে আবার আমাদের

অভিজ্ঞতায় ফিরে আসে— তখনই আর্টের সৃষ্টি ও সার্থকতা। বোঝাই যাচ্ছে, এই বিন্দুতেই ফর্মালিজম ও ফিউচারিস্ট সাহিত্য সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছিল।

কিন্তু সাহিত্যরচনা কাকে 'অপরিচিত' করে? ফর্মালিস্টদের মতে সাহিত্য হল একটি ভাষা কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত বিশেষ রূপ বা প্রয়োগ। সুতরাং সে পাল্টে দেয়/'অপরিচিত' করে ঐ কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত সাহিত্য ব্যতীত [অথবা গৌণ/অপ্রধান সাহিত্য ভিত্তিক] অন্যান্য সাংস্কৃতিক রূপগুলি থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা/অনুভূতি। যেমন 'ব্রাদারস কারমাজোভ' উপন্যাসে দস্তয়েভস্কি জনপ্রিয় রুশ রহস্যকাহিনীর ছক, কলাকৌশলকে পাল্টে নতুনরূপে উপস্থাপন করেছিলেন, বা আধুনিক কোনো লেখক পুরনো পরিচিত কোনো অ/সাহিত্যিক রচনার ওপর নতুনভাবে সাহিত্য নির্মাণ করতে পারেন। কিন্তু এই অবস্থান ফর্মালিস্টদের ঠেলে দেয় আপেক্ষিকতা ও শেষবিচারে ইতিহাস-নির্ভরতার দিকে। কারণ, সাহিত্যের ক্রিয়া (function) হল **বর্তমানে পরিচিত** সাংস্কৃতিক রূপগুলি পরিবর্তন করা। আবার বর্তমানের 'সাহিত্য' যখন অতিমাত্রায় 'পরিচিত' হয়ে যাবে, তখন তার ওপরে নির্মিত হবে ভবিষ্যতের রচনা। অর্থাৎ, আজ যা 'পরিচিত' অতীতে তাই ছিল অপরিচিত (যেমন উনিশ শতকী রোমান্টিকতা) আবার আজকের 'অপরিচিত' / 'নতুন' হবে ভবিষ্যতে পরিচিত। সুতরাং এই পরিচয়/অপরিচয় নির্ভর করবে তাদের **ঐতিহাসিক** অবস্থানের ওপর, এইভাবে, সসুরীয় প্রভাবে যদিও ফর্মালিস্টগণ একদিকে সাহিত্যরচনার কোনো উৎস খোঁজার চেয়ে রচনাটিকে একটি স্বাধীন/স্থির অস্তিত্ব বলে মনে করেছেন, অন্যদিকে সাহিত্যক্রিয়ার ওপর জোর দিয়ে তাঁরাই অপ্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যবিচারকে ইতিহাস-নির্ভর করে তোলেন।

বাখতিন ও সম্প্রদায়

ফর্মালিস্টরা যখন নিজেদেরই সৃষ্ট তত্ত্বসমস্যার আবর্তে কিছুটা বিভ্রান্ত তখন বাখতিন ও সম্প্রদায় (বিশেষত পি এন মেডভেডেভ ও ভি ভলোসিনভ) ফর্মালিজমের সসুরীয় উত্তরাধিকার অতিক্রম/অস্বীকার করে সাহিত্য ও ভাষাকে 'সামাজিক' অনুষঙ্গমূলক বিষয় হিসেবে বিচার করছিলেন এবং ফর্মালিস্টদের মতো বাখতিন গোষ্ঠীরও দাবি : সাহিত্যরচনার **বিজ্ঞান** আবিষ্কার করা। তবে সাহিত্যতত্ত্বের আগেই প্রকাশিত হয়েছিল 'ভাষা' সম্পর্কে এই গোষ্ঠীর অভিমত— যার মধ্যেই লুকিয়ে আছে [ফর্মালিস্ট/স্ট্রাকচারালিস্টদের মতোই] বাখতিন পন্থীদের সাহিত্যতত্ত্বের প্রধান চাবিকাঠি।

তবে সে আলোচনা বিস্তারিত করার আগে বলে রাখা ভালো, বাখতিন তাঁর আশি বছরের (১৮৯৫-১৯৭৫) দীর্ঘজীবনে হাতে গোনা কয়েকটি গ্রন্থ স্বনামে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত হয়েছে আরো কিছু গ্রন্থ/প্রবন্ধ, যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মেডভেডেভের *The Formal Method in Literary Scholarship* (1928) ও ভলোসিনভের *Marxism and the Philosophy of Language*

(1929)। এর মধ্যে শেষোক্তটি, বাখতিন-গবেষকদের ধারণা, বহুলাংশে বাখতিনের নিজেরই লেখা। ভলোসিনভের গ্রন্থটি মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষাতত্ত্ব গড়ে তোলার পথিকৃৎ প্রচেষ্টা— যা সস্যুরীয় ঘরানার বিপরীতে শব্দকে একটি ব্যাকরণবদ্ধ দ্বিমুখী চিহ্নের (দ্যোতক/দ্যোতিত) শৃঙ্খল হিসেবে না দেখে, তাকে একটি **দ্বিমুখী ক্রিয়া** হিসেবে উপস্থাপন করেছিল— যা একই সঙ্গে নির্ধারিত হয় যিনি শব্দটি উচ্চারণ করলেন অর্থাৎ সম্ভাষকের (addresser) দ্বারা এবং যার জন্য ঐ সম্ভাষণ উচ্চারিত হল, অর্থাৎ সম্ভাষিতের (addressee) দ্বারা, শব্দ/ভাষার এই চরিত্রটি 'সংলাপমূলক' (dialogical), ভাষাকে [সস্যুরীয় অর্থে] একটি স্বাধীন চিহ্নব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টাকে যা ব্যাহত করে। কারণ প্রতিটি শব্দকেই বুঝতে হবে তার নির্দিষ্ট-বাস্তব উচ্চারণের দ্বারা এবং যে উচ্চারণ নির্ধারিত হয় অবশ্যই নির্দিষ্ট **সামাজিক** প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে।

ভলোসিনভ/বাখতিনের গ্রন্থটি পরবর্তীকালের [রুশ] মার্কসীয় ভাষাতত্ত্বের প্রারম্ভিক বিন্দু হয়ে উঠেছিল— বিশেষত সস্যুরীয় synchrony-র বদলে ভাষাচর্চায় diachrony-কে [যার সরলার্থ, অনেকের কাছে, দ্বান্দ্বিক/ঐতিহাসিক বস্তুবাদ] পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু মার্কসীয় ফ্লেবারের পাশাপাশি এই গ্রন্থেই গড়ে উঠেছিল ভাষা/সাহিত্যচর্চার এমন কিছু মৌলিক ধারণা যা পরবর্তীকালে [রূপকার্থে হলেও] এমন কিছু প্রশ্ন তুলেছিল যেগুলি তদানীন্তন মার্কসীয় [অর্থাৎ স্তালিনীয়] শাসকদেরও অস্বস্তিতে ফেলেছিল। সংঘাতের বীজ ছিল [স্বনামে] বাখতিন রচিত প্রথম এবং এ-যাবৎ সবচেয়ে পরিচিত গ্রন্থেই (*Problems of Dostoevsky's Art* 1929—বহুদিন পরে অবশ্য বইটি কিছু পরিবর্তনসহ *Problems of Dostoevsky's Poetics* নামে আত্মপ্রকাশ করে)— যা ঐ একই বছরে প্রকাশিত ভলোসিনভের পূর্বোক্ত গ্রন্থের তাত্ত্বিক প্রসার ঘটিয়ে সাহিত্য/গদ্য/উপন্যাস আলোচনায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল। পরবর্তী-কালের বাখতিনীয় বহুমুখী তাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডের [যার পূর্ণ আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের সীমা বহির্ভূত] ভিত্তিও গড়ে উঠেছিল এই গ্রন্থেই। বাখতিন গ্রেপ্তার হলেন, তাঁকে পাঠানো হল কাজাখস্তানের নির্বাসনে, কিছুদিন পর অবশ্য তাঁকে মস্কোর নিকটবর্তী এক প্রাদেশিক শহরে বাস করার অনুমতি দেওয়া হল।

গোটা তিরিশের দশক বাখতিনের কেটেছে প্রকাশনা জগতের বাইরে শিক্ষকতায় ও অন্যান্য কাজে, কিন্তু পাদপ্রদীপের আড়ালে এই সময় তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন এক অতি দুঃসাহসিক কাজে : নতুন চিন্তায়/দৃষ্টিতে পশ্চিম ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসের পুনর্লেখনের প্রচেষ্টায়। এই সময়ে রচিত [পরবর্তীকালে প্রকাশিত] বিভিন্ন সাহিত্য-তাত্ত্বিক প্রবন্ধে তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এর পাশাপাশি চলতে থাকে ষোড়শ শতকের ফরাসি ব্যঙ্গ/হাস্য লেখক রাবেলাইকে (Rabelais) নিয়ে তাঁর অতিবৃহৎ গবেষণা— যা তাঁর সাহিত্যতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠভূমি। কী করে বাখতিন তিরিশের দশকের সরকারি দমনমূলক কার্যসূচীকে এড়িয়ে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে

রেখেছিলেন— সে বিষয়ে বাখতিন গবেষক/জীবনীকারগণ ঈষৎ বিস্ময় প্রকাশ করেন। যাই হোক, ১৯৪৫ সালে তাঁর গবেষণাপত্র পেশ করার অনুমতি মেলে।
উত্তর-স্তালিন যুগে তিনি ধীরে ধীরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেন বিশেষত ছয় ও সাতের দশকে। তাঁর গবেষণাপত্রটিও এইসময়ে (*Rabelais and His World*, 1966) প্রকাশিত হয়, কিছু কিছু পুরনো কাজেরও প্রকাশ/অনুবাদ শুরু হয়। ১৯৬১ সালে তিনি অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন এবং ১৯৬৯ সালে তাঁকে মস্কোয় বসবাস করার অনুমতি দেওয়া হয়। এই পর্যায়ে সাহিত্য-সমালোচনার জগতে তাঁর খ্যাতি প্রায় তুঙ্গে ওঠে (যদিও অধিকাংশ পশ্চিমী পণ্ডিতই এইসময় তাঁর নামও শোনেননি)। ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

মিখাইল বাখতিন : উপন্যাস তত্ত্ব : এক

বাখতিনের বহুবিস্তৃত তত্ত্ব-প্রচেষ্টার সবকিছুর বিবরণ [এমনকি তার আভাস দেওয়া] একটি প্রবন্ধে সম্ভব নয় [এবং কাম্যও নয়]। এখানে আমরা তাঁর উপন্যাস-তত্ত্বকেই (যা তাঁর সাহিত্যচিন্তার কেন্দ্রভূমি) আলোচনার জন্য বেছে নিলাম।
আমরা জানি, বাখতিনের মতে, ভাষা হল একটি দ্বিমুখী বা সংলাপমূলক (সম্ভাষক— সম্ভাষিত) সামাজিক ক্রিয়া। যেমন, একটি জীবন্ত কথোপকথনে 'শব্দ' প্রত্যক্ষভাবে, অসংকোচে অগ্রসর হয় একটি ভবিষ্যত উত্তরের/শব্দের দিকে— তাকে উস্কে দেয়, তাকে আগাম আন্দাজ করার চেষ্টা করে এবং নিজেকেও ভবিষ্যত উত্তরমুখী করে গড়ে তোলে। বোঝাই যাচ্ছে, এই সংজ্ঞায় বাখতিন সস্যুর বর্ণিত আনুষ্ঠানিক 'স্বেচ্ছাচারী' ভাষা-কাঠামোর (langue) বদলে জোর দিতে চাইছেন প্রত্যক্ষ বা কথিত ভাষার (parole) ওপর।

অন্য কথায়, এর অর্থ হল, কেবল *langue* দ্বারা আমরা *parole*-কে ব্যাখ্যা করতে পারি না। তাকে বুঝতে হবে সম্ভাষক—সম্ভাষিত-প্রসঙ্গের আন্তঃসম্পর্কের দ্বারা, এবং সাহিত্যের মধ্যে, বিশেষত গদ্য সাহিত্যের মধ্যে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, কীভাবে এই সংলাপমূলক ভাষা কাজ করে।

এইভাবে বাখতিন একটি নতুন বিন্দু থেকে [পশ্চিমী] সাহিত্যের শ্রেণীকরণ শুরু করেন, তা হল—'কথা' বা ভাষণের (Speech) দিক থেকে সাহিত্যের বিচার। অর্থাৎ, **কে** কথা বলছে বা **কার** কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে ? —এই দিক থেকেই, বাখতিনের মতে, সাহিত্যের শ্রেণী/শৈলী নির্ধারণের চেষ্টা করতে হবে।

অবশ্য 'speech' এর দিক থেকে সাহিত্যবিচার বাখতিনের 'মৌলিক' আবিষ্কার নয়। পশ্চিমী নন্দনতত্ত্বের জনক প্লেটো বহু পূর্বেই [মহা] কাব্যে দু-ধরনের কণ্ঠস্বর চিহ্নিত করেছিলেন— প্রথমটি, কবি লেখকের নিজের কণ্ঠ [অর্থাৎ লেখনীর যে অংশে লেখক সরাসরি তার বক্তব্য/মতাদর্শ/বিবরণ পেশ করছে] বা 'diegesis' এবং অন্যটি হল কাব্য/সাহিত্যস্থিত বিভিন্ন চরিত্রের [অনুকরণ করা] কণ্ঠস্বর বা 'mimesis'। প্রথমটির

(diegesis) 'বিশুদ্ধ' প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায় বর্ণনাধর্মী বিভিন্ন মন্ত্রোচ্চারণে (hymns) এবং দ্বিতীয়টির (mimesis) 'বিশুদ্ধরূপ' হল নাটক। প্লেটোর মতে, মহাকাব্য হল এই দুইধরনের স্বরের মিশ্ররূপ— অর্থাৎ যেখানে লেখকের বিবরণ, প্রতিবেদন, সংক্ষিপ্তকরণ ও মন্তব্যপ্রকাশ এবং চরিত্রগুলি উদ্ধৃত প্রত্যক্ষভাষণ/কথা মিলে মিশে যায়। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, অধিকাংশ মানুষই 'সংলাপ' বা 'ডায়ালগ' বলতে প্লেটো বর্ণিত এই 'mimesis'-কেই বোঝেন। [যদিও বাখতিনের আলোচনায় 'ডায়ালগ' কথাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে]।

মিখাইল বাখতিন : উপন্যাস তত্ত্ব : দুই

বাখতিন প্লেটোর বিন্যাসকে আরো সূক্ষ্ম, তাৎপর্যপূর্ণ এবং নতুন চেহারায় হাজির করলেন। গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি প্রধান তিনটি স্পীচ/ডিসকোর্স চিহ্নিত করলেন। প্রথমত, **লেখকের প্রত্যক্ষ ভাষণ**, অর্থাৎ লেখকের রচনাবদ্ধ, 'তথ্যানুগ' বিশ্বাসযোগ্য ও বর্ণনাধর্মী ভাষণ —অনেকটা প্লেটোর diegesis-এর মতো।

বহু উপন্যাসের সূত্রপাত হয় লেখকের এই প্রত্যক্ষ বর্ণনাধর্মী ভাষণের মধ্য দিয়ে। এই ভাষণের মুখ্য দুটি ক্রিয়া : প্রথমটি, একজন সর্বস্থানে/কালে উপস্থিত সর্বজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণনা, এবং দ্বিতীয়টি তার **ব্যাখ্যা**। এই বর্ণনা/ব্যাখ্যা দুভাবে সম্ভব— বর্ণনাকারীকে **অদৃশ্য** ব্যক্তি মনে করে, অর্থাৎ যখন তার কোনো পৃথক চরিত্রগত অস্তিত্ব নেই— তখন 'লেখক'— বর্ণনাকারী **একটি সত্তা** হিসেবে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়। এই ধরনের রচনায় ব্যাখ্যার পাশাপাশি প্রত্যক্ষভাষণে লেখকের নিজস্ব অভিমত/দর্শন ফুটে ওঠে অতিসহজেই —যদিও লেখকের ডিসকোর্সের সমস্যাবলী বাখতিন 'প্রথম' বিভাগের চেয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগেই বেশি আলোচনা করেছেন।

আবার অনেক সময় (ইয়োরোপে অষ্টাদশ শতক থেকে এই প্রবণতা দেখা গেছে, এমনকি উনিশ শতকের বাঙলা উপন্যাসেও আমরা এই শৈলীর প্রভাব লক্ষ করেছি) বর্ণনাকারী/গণ (narrator/s) নিজেই উপন্যাসের চরিত্র। তখন সমস্যা দেখা দেয়— অর্থাৎ এক বা একাধিক বর্ণনাকারীর কণ্ঠস্বরের পাশাপাশি শোনা যায় **লেখকের** নিজস্ব ডিসকোর্স/অভিমত —হয়তো তা বর্ণনাকারীর জবানী বা অন্য কোনো চরিত্রের কথায় প্রকাশ পায়— কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে কর্তৃত্ববাচক অভিমতটি স্বয়ং লেখকের। যদিও বাখতিনের মতে একটি সার্থক উপন্যাসে কখনোই লেখকের বক্তব্য অন্য অভিমত-গুলিকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করতে পারে না— তবে সে আলোচনা অন্যত্র। এখানে কয়েকটা উদাহরণের সাহায্যে আমরা ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করব।

যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম দুটি লাইন :

'৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।'

ওপরের দুটি লাইনই লেখকের প্রত্যক্ষভাষণের নমুনা বা প্লেটো কথিত diegesis। তবে প্রথম লাইনটি একটি ঘটনার **বিবরণ** দিচ্ছে এবং দ্বিতীয় লাইনটি বিবরণের সঙ্গে একটি ক্রিয়ার ব্যাখ্যাও করছে : 'দ্রুত অশ্ব সঞ্চালনে'র কারণ সূর্যের ['দিনমণি'] 'অস্তাচলগমনোদ্যোগ'। বোঝাই যাচ্ছে, এই শৈলীতে নির্মিত উপন্যাসে লেখক-বর্ণনাকারীর অস্তিত্ব একাকার হয়ে গেছে। ফলে এখানে প্রত্যক্ষভাষণের মধ্যেই লেখকের অভিমত/মূল্যায়ন প্রকাশ করার অসুবিধা নেই। যেমন, পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষের কয়েক ছত্র :

'পুরবাসী ও অপরাপর লোকের এইরূপ প্রতীতি ছিল যে, অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্রসিংহের দীক্ষাগুরু; বীরেন্দ্রসিংহ তাঁহাকে যেরূপ সম্মান ও আদর করিতেন, তাহাতে সেইরূপই সম্ভাবনা। এমন কি, সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য অভিরাম স্বামীর পরামর্শ ব্যতীত করিতেন না ও গুরুদত্ত পরামর্শও প্রায় সতত সফল হইত। বস্তুতঃ অভিরাম স্বামী বহুদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন; আরও নিজ ব্রতধর্ম্মে, সাংসারিক অধিকাংশ বিষয়ে রিপু সংযত করা অভ্যাস করিয়াছিলেন; প্রয়োজনমতে রাগক্ষোভাদি দমন করিয়া স্থির চিত্তে বিষয়ালোচনা করিতে পারিতেন। সে স্থলে যে অধীর দাম্ভিক বীরেন্দ্রসিংহের অভিসন্ধি অপেক্ষা তাঁহার পরামর্শ ফলপ্রদ হইবে, আশ্চর্য্য কি ?'

প্রত্যক্ষভাষণে বর্ণিত এই অংশে বর্ণনা/ব্যাখ্যার সঙ্গে লেখকের মূল্যায়নও প্রকাশ পেয়েছে —বিশেষত, শেষ লাইনে, যেখানে 'সংযত' অভিরাম স্বামীর বিপরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বীরেন্দ্রসিংহ তাঁর বিশেষণ দুটি ['অধীর দাম্ভিক'] সমেত— যা বস্তুতপক্ষে লেখকের মূল্যায়ন।

বর্ণনা/ব্যাখ্যা যে কেবল লেখকের প্রত্যক্ষভাষণের দ্বারাই হয় তা নয়, অনেক সময় উপন্যাসের এক বা একাধিক চরিত্রের উদ্ধৃতিমূলক ভাষণ বা ভাবনার দ্বারাও প্রকাশিত হয়। বিশেষত, [আঠারো-উনিশ শতকে গড়ে ওঠা আত্মকথা বা স্বীকারোক্তিমূলক শৈলী অনুযায়ী] যেখানে বর্ণনাকারী [গণ] নিজে [রাই] চরিত্র। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী', রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' বা সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি'। এর মধ্যে প্রথমটির ক্ষেত্রে একাধিক বর্ণনাকারী : রজনী, অমরনাথ, শচীন্দ্র; দ্বিতীয়টিতে একটি চরিত্র [শ্রীবিলাস] কর্তৃক অন্যান্য চরিত্র [নিজ চরিত্রসহ] ও তাদের কেন্দ্র করে ঘটা ঘটনার বিবরণ; আবার তৃতীয়টিতে সবটাই নায়ক সুখেনের বিবৃতি। এদিক থেকে দেখলে এই শৈলী হল mimesis বা চরিত্রগুলির অনুকরণ করা কণ্ঠস্বর। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই mimesis-এর আড়ালে কাজ করে চলে 'diegesis' অর্থাৎ কাহিনী বর্ণন ও ব্যাখ্যার ক্রিয়া।

বাখতিন বর্ণিত উপন্যাসে স্পীচের দ্বিতীয় বিভাগটি হল— চরিত্রগুলির [অনুকরণ করা] কণ্ঠস্বরসমূহ —অনেকটা প্লেটোর mimesis-এর মতো— যার আদর্শ উদাহরণ হল নাটক, কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ উভয়ভাবেই এই ধরনের স্পীচ প্রকাশিত হতে পারে। উনিশ শতকের বাঙলা উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে অনেক সময়

এই mimesis এমনভাবে চরিত্রের প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই উদ্ধৃতিমালায় লেখক-বর্ণনাকারী তাঁর প্রত্যক্ষভাষণের হস্তক্ষেপ এত কম করেছেন যে অংশবিশেষের পাঠে ভ্রম হতে পারে যে রচনাটি/গুলি উপন্যাস নয়, নাটক। যেমন, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের সেই বিখ্যাত ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, যেখানে শৈবলিনী ও প্রতাপ জলে ডুবে আত্মঘাতী হতে চলেছে :

'প্রতাপ ডাকিল, "শৈবলিনী—শৈ !"

শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল—হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাহাকে "শৈ" বা "সই" বলিয়া ডাকিত। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিল। কতকাল পরে! বৎসরে কি কালের মাপ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ। শৈবলিনী যতবৎসর সই শব্দ শুনে নাই, শৈবলিনীর সেই এক মন্বন্তর। এখন শুনিয়া শৈবলিনী সেই অনন্ত জলরাশিমধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্রতারাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল, "প্রতাপ! আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?"

প্রতাপ বলিল, "চাঁদের? না। সূর্য্য উঠিয়াছে। —শৈ! আর ভয় নাই। কেহ তাড়াইয়া আসিতেছে না।"

শৈ। তবে চল তীরে উঠি।

প্র। শৈ!

শৈ। কি?

প্র। মনে পড়ে?

শৈ। কি?

প্র। আর এক দিন এমনই সাঁতার দিয়াছিলাম।

শৈবলিনী উত্তর দিল না। এক খণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠ ভাসিয়া যাইতেছিল ; শৈবলিনী তাহা ধরিল। প্রতাপকে বলিল, "ধর, ভর সহিবে। বিশ্রাম কর।" প্রতাপ কাষ্ঠ ধরিল, বলিল, "মনে পড়ে? তুমি ডুবিতে পারিলে না—আমি ডুবিলাম?"

শৈবলিনী বলিল, "মনে পড়ে। তুমি যদি আবার সেই নাম ধরিয়া আজ না ডাকিতে, তবে আজ তার শোধ দিতাম। কেন ডাকিলে?"

প্র। তবে মনে আছে যে, আমি মনে করিলে ডুবিতে পারি?

শৈবলিনী শঙ্কিতা হইয়া বলিল, "কেন প্রতাপ? চল তীরে উঠি।"

প্র। আমি উঠিব না। আজি মরিব।

প্রতাপ কাষ্ঠ ছাড়িল।'

এখানে মাঝে মাঝে কিছু ভাব, অতীত ঘটনা বা বর্তমান ক্রিয়ার বর্ণনা ছাড়া লেখকের প্রত্যক্ষভাষণ নেই— বাদবাকি নাটকীয় সংলাপের মতো বাখতিন বর্ণিত স্পীচের দ্বিতীয় রূপটি ফুটে উঠেছে। কিন্তু অন্যভাবেও চরিত্রসমূহের কণ্ঠস্বর/অভিমত/মনোভাব

প্রকাশ পেতে পারে— লেখকের প্রত্যক্ষভাষণের দ্বারা। যেমন, অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে, যেখানে তিতাসের প্রতিবেশী নদী বিজয়ের তীরবর্তী দুই অনাহার-পীড়িত ভাইয়ের চিন্তাভাবনা ব্যক্ত হয়েছে বর্ণনারপাশাপাশি প্রত্যক্ষভাষণে : 'উঠানের একদিকে একটা ডালিম গাছ। পাতা শুখাইয়া গিয়াছে। গৌরাঙ্গসুন্দরের বউ লাগাইয়াছিল। বউ যৌবন থাকিতেই শুখাইয়া গিয়াছিল। গাল বসিয়া, বুক দড়ির মত সরু হইয়া গিয়াছিল, বুকের স্তন দুটি বুকেই বসিয়া গিয়াছিল তার। তারপর একদিন সে মরিয়া গিয়াছিল। সে মরিয়া গিয়া গৌরাঙ্গকে বাঁচাইয়াছে। তার কথা গৌরাঙ্গসুন্দরের আর মনে পড়ে না। তারই মত শুখাইয়া-যাওয়া তারই হাতের ডালিমগাছটা চোখে পড়িতে আজ মনে পড়িয়া গেল। উঃ বউটা মরিয়া কি ভালই না করিয়াছে। থাকিলে আজ তার অবস্থা হইত ঠিক নিত্যানন্দ দাদার মত। নিত্যানন্দ থাকে উত্তরের ঘরে। তার বউ আছে। আর আছে একটি ছেলে, একটি মেয়ে। নিত্যানন্দ-পরিবারের দিকে চাহিয়া গৌরাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে! এক পেটের ভাবনা নিয়াই বাঁচিনা, দাদা চারিটা পেটের ভাবনা মাথায় করিয়া কেমন তামাক খাইতেছে। তার যেন কোন ভাবনাই নাই।
সত্যি নিত্যানন্দের আর কোন ভাবনা নাই। যতই ভাবিয়াছে, দেখিয়াছে কোন কূল-কিনারা পাওয়া যায় না।...'
বলা বাহুল্য, ওপরে উদ্ধৃত অংশের 'সে মরিয়া গিয়া গৌরাঙ্গকে বাঁচাইয়াছে' —লেখকের উপলব্ধিমূলক ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গেরও উপলব্ধি/চিন্তা। এর পরের দুটি লাইনে তার নিজস্ব চিন্তা ('উঃ বউটা মরিয়া...নিত্যানন্দ দাদার মত।') প্রকাশ পেয়েছে —যদিও এই উপলব্ধি/চিন্তা গৌরাঙ্গর প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতির মধ্যেও রাখা যেত। শেষ লাইনটিও নিত্যানন্দের নিজস্ব উপলব্ধি।
তবে ভাষণক্রিয়ার উল্লেখিত দুটি বিভাগের চেয়ে বাখতিন অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তৃতীয়টির ওপর— যাকে তিনি বলেছেন : 'দ্বিমুখী ভাষণ' (doubly oriented speech)—যা উপন্যাসতত্ত্বে বাখতিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হল সেইসব উচ্চারণ/ভাষণ যা কেবল উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক কাঠামোর মধ্যেই আটকে না থেকে শৈলী / মতাদর্শের দিক থেকে উপন্যাস বহির্ভূত চিন্তা/শৈলী প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। এই বিভাগের চারটি উপভাগ আছে : শৈলীকরণ (stylization), গ্রাম্য-লৌকিক ছড়াগানের প্রভাব (রাশিয়ায় যা *Skaz* নামে পরিচিত), ব্যঙ্গাত্মক বা শ্লেষাত্মক অনুকরণ (parody) এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—'সুপ্ত মতদ্বন্দ্ব' (hidden polemic)।
'শৈলীকরণ' বলতে বোঝায় যখন একটি রচনায় অন্য কোনো কথিত বা লিখিত শৈলীর অনুকরণ করা হয়— যা লেখকের নিজস্ব শৈলীর চেয়ে ভিন্ন। এক্ষেত্রে লেখক 'অন্য' শৈলী ব্যবহার করেন তার আদি ব্যবহারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে— [অবশ্যাই] সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে কিন্তু মূলপ্রয়োগের বিশেষ বিকৃতি না ঘটিয়ে। বিশেষ করে লেখক

ও বর্ণনাকারী যখন দুটি পৃথক অস্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত— যেমন আত্মকথামূলক 'আমি-রূপী' কথকের ক্ষেত্রে— তখন এই শৈলীকরণের প্রয়োগ ঘটতে পারে। যেমন সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' উপন্যাসে সুখেন চরিত্রটির ভাষা। এক অসুখী/অসুস্থ পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা প্রবৃত্তির দাস—গল্পের এই [অ্যান্টি] হিরোটি যেমন সমাজের প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধকে তোয়াক্কা করে না, তেমনি সমাজের তথাকথিত অভিভাবকদের চরিত্রের বড়াইকেও ক্রমাগত চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করায় এবং উপন্যাসের বর্ণনার ভাষা (diegesis) হল ছয়ের দশকের 'রকে বসা' 'বখে যাওয়া' ছেলেদের 'খিস্তি মেশানো ভাষা' যার মধ্যে মিশেছে অপরাধ জগতের সাংকেতিক ভাষা। একটা নমুনা : 'যশোদাবাবুটিও তাই। তবে তিনি তো আমার দাদা নন। তাই মস্তানি করতে হল, সে দলে থাকাই আমার ভাল। কিন্তু ও লোকটারও একটা আশ্চর্য, একেবারে গালাগাল দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, খচ্চরটার ন'টা ছেলেমেয়ে। মাইরি! স্সাহ্, রাগের চোটেই করেছে, নাকি সেই প্যানতাখ্যাচা বউটাকে লেকচার দিতে দিতেই এই কাণ্ড করেছে, কে জানে। ন'টা ছেলেমেয়ে! সেই পাঁউরুটিমার্কা ফুলো ফুলো মুখে বাঁধানো দাঁতে কুমির মতন শাদা রক্তশূন্য চোখে দলাদলির প্যাঁচ-পয়জার কষে, আর কী করে সম্ভব!'

এখানে একটি বিশিষ্ট কথিত ভাষার শৈলী প্রায় অবিকৃতভাবে তুলে দেওয়া হয়েছে— গোটা বইটি এই শৈলীতে লেখা। একই জাতীয় ['আমি-কথক' কথিত] পুরনো উপন্যাস 'রজনী'তে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরনের শৈলীকরণ করেননি। সেখানে রজনী থেকে অমরনাথ, শচীন্দ্র এমনকি দুর্বৃত্ত হীরালাল অবধি একই ভাষায় কথা বলে— বঙ্কিমী অলঙ্কারযুক্ত সাধু গদ্যে।

অন্য দিকে গ্রাম্য-লৌকিক ছড়াগানের (*skaz*) প্রভাবে বাঙলা ভাষায় বেশ কিছু উপন্যাস রচিত হয়েছে। *skaz*-ও আসলে শৈলীকরণ— তবে সেই শৈলী গড়ে ওঠে লোকায়ত বিভিন্ন রসমিশ্রিত ছড়াগানের প্রভাবে। যেমন প্রায় দু-দশক আগে প্রকাশিত শংকর বসুর 'শৈশব'-এর প্রতিটি অধ্যায় রচিত হয়েছে পূর্ববাঙলায় প্রচলিত লোক গান-ছড়াকে কেন্দ্র করে। একটি অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে এইভাবে :

'প্যাট হৈল জলন্তর

তার জন্য হই দ্যাশান্তর ॥

'আবার বর্ণনা, যাতে এই ছড়া গড়ে উঠতে থাকে, ক্রমে মূর্ত এবং শরীর পেয়ে যায়। এমন-কি প্রাণ-প্রতিষ্ঠাও ঘটে দীর্ঘশ্বাস সহযোগে। তখন অন্নর সামনে অনড় এক প্রাচীন খুঁটি বা থাম, যা ধারণ করেছে আংশিক এই মাটকোটার ওজন। ঐ থামে পুরাতন পারিবারিকতা আছে।... এমন নয় যে অন্ন ঐ কথা, ছড়া, কেবল খুঁটি সাক্ষী রেখে বলে চলেছে, যেমন সে প্রায়ই বলে। কারণ, ভিন্ন শব্দ ছিল।...

'...দুঃখের ধান্ধায় ফিকিরে শরীর আউল হয়...পাথইরা মনডাও পোড়ায়...দ্যাশ যে দ্যাশ... প্যাটের জ্বালায় মাইনষে সেই চোদ্দ পুরুষের ভিটা ছাইড়া...ছুটে, ছুটে...ছুটে...।

'তখন কোথাও চীৎকার : পলাই না, পলাইনারে…। তখন কাদা অন্ধকারে ভাঙে মানুষের যূথবদ্ধ পা। কোথাও পুঁটুলি, সেই জনসমষ্টির হাতে-হাতে হাত-শিকল, ছুটছে। মাঝ নদীতে অনড় এক জলযান, ষ্টিমার গাঁ গাঁ করে ডেকে তাদের ভয়, তাদের শৈথিল্য, তাদের আড়ষ্টতা ছিন্ন করে।…নদীর ওপারে যে জলছবি বাঁশপাতা ও হিল্লোলিত ধানে নত, যেখানে লতানে গাছ ছড়ায় অন্ধকার, ভেজা ভেজা গন্ধ, বাইর-বাড়ি চণ্ডীমণ্ডপ দানশা চোরার গপ্‌পো সমেত সেই দেশ থেকে ক্রমে তারা সরে যেতে থাকে…পলায়…

'সমগ্র বর্ণনার আগু-পেছু ঐ সংক্ষিপ্ত ছড়া থাকে। আর এভাবে তত্ত্বটা তৈরি হতে থাকে বলে বারংবার ছেদ।…'

দ্বিমুখী ভাষণের তৃতীয় উপভাগটি হল প্যারোডি। শৈলীকরণের সঙ্গে প্যারোডির পার্থক্য এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে যখন প্রায় অবিকৃত ভাবে 'অন্য' লিখিত/কথিত শৈলী অনুকরণ করা হয় তখন প্যারোডি শ্লেষাত্মক/ব্যঙ্গাত্মক উদ্দেশ্যে এই শৈলী বিকৃত/ব্যবহার করে। ইয়োরোপীয় উপন্যাসের ঘরানায় প্যারোডির ঐতিহ্য অতি প্রবল। তুলনায় বাঙলা সাহিত্যে এই দিকটি তত সবল নয়। তবু কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস'-এর প্যারোডি— যদিও এই প্যারোডি মূলত রচনার আঙ্গিককে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসটি বিভিন্ন অধ্যায়ে রামায়ণের শৈলীতে 'আদিকাণ্ড', 'বালকাণ্ড' প্রভৃতি সাত 'কাণ্ডে' বিভক্ত। একেকটি 'কাণ্ডের' মধ্যে আবার নানা 'বৃত্তান্ত', 'উপাখ্যান' এবং প্রায় প্রতি পাতায় বিভিন্ন শব্দ/প্রবচন বা রামচরিতের শ্লোক সম্বন্ধীয় ফুটনোট রচনাটির আঙ্গিকে ধর্মগ্রন্থের গাম্ভীর্য এনেছে। আঙ্গিক ছাড়াও অবশ্য রচনার মধ্যে বর্ণনা-ব্যাখ্যা ও চরিত্রদের অভিমতের পাশাপাশি ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যে তুলসীদাসী শ্লোক ব্যবহার করা হয়েছে খুব নিরীহভাবে,

"এই বোকাগুলোর কথায় ঢোঁড়াই মনে মনে হাসে, আরে এইটুকু বুঝিস না রাস্তা খারাপ না হলে তোদের রোজগার চলবে কী করে। আর এই গাড়িতেই তো ধান আসে জিরানিয়া বাজারে। ধান না হলে খেতিস কী? সত্যি ধাঙড়গুলো বোকা। তবে একথা ঠিক যে চেরমেন সাহেব আর কলস্টর সাহেব ইচ্ছা করলে তাৎমা ধাঙড়দের অনেক কিছু ভাল করতে পারে। এই তো ধান চাল এত শস্তা করে দিয়েছে। এই সঙ্গে যদি বাবু ভাইয়াদের উপর হুকুম করে দিত, তাৎমাদের রোজ ঘরামির কাজ দিতে, তাহলেই হত বেশ। কিন্তু রামজীর মর্জি ছাড়া তো কিছু হওয়ার উপায় নেই। কখন না কখন গরীবদের কথা তাঁর মনে পড়বেই।

'গই বহোর গরীব নেবাজু
সরল সবল সাহিব রঘুরাজু।'

তিনি ছাড়া আর গরীবকে দেখার কে আছে?…"

রামায়ণের আঙ্গিকে ও অনেক পরিভাষা ব্যবহার করে উপন্যাসটি শেষ হয়—'উত্তরকাণ্ডে

'নয়, 'হতাশাকাণ্ডে'। সতীনাথ ভাদুড়ী ছাড়া সুকুমার রায় বা পরশুরামের (রাজশেখর বসুর) বিভিন্ন রচনায় হাস্যরসাত্মক প্যারোডির ছোঁওয়া পাওয়া যায়। হাল আমলে, নকশালবাড়ি আন্দোলন চলার সময় উনিশ শতকের বিভিন্ন 'নকশা' শৈলীর প্যারোডি হয়েছে।

তবে দ্বিমুখী ভাষণের মধ্যে বাখতিন সবচেয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন 'সুপ্ত মতদ্বন্দ্ব' (hidden polemic)-কে। 'সংলাপ' বা 'ডায়ালগ' বলতে বাখতিন এক অর্থে রচনার অভ্যন্তরস্থ এই 'hidden polemic'-কেই বুঝিয়েছেন— যা এমন কোনো মতাদর্শ/অভিমতের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় যা আপাতদৃষ্টিতে একটি উপন্যাস কাঠামোর ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। যেমন, 'রজনী'তে প্রথমে সন্ন্যাসীর অলৌকিক/গুপ্তবিদ্যা সম্পর্কে শচীনের সন্দেহ ও সন্ন্যাসীর উত্তর এবং শেষভাগে ঐ বিদ্যা (যা কোনো হাসপাতালের সাহায্য ছাড়া রজনীর চোখ ভাল করে দিল) সম্বন্ধীয় অমরনাথের বিস্ময় এবং শচীন্দ্রের উত্তর কেবল 'বিদ্যা'টির যাথার্থ্য প্রদান করেই সন্তুষ্ট থাকেনি— নিজে থেকে লিপ্ত হয়েছে উপন্যাস কাঠামোর বাইরে— অবস্থিত একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্বাসের সঙ্গে দ্বন্দ্বে : যা কিছু পশ্চিমী তা-ই শ্রেষ্ঠ।

'আমি আর থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "রজনি, এখন তুমি কি দেখিতে পাও?" রজনী মুখ নত করিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হাঁ",। আমি বিস্মিত হইয়া শচীন্দ্রের মুখপানে চাহিলাম। শচীন্দ্র বলিলেন, "আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় না হইতে পারে এমন কি আছে? আমাদিগের ভারতবর্ষে চিকিৎসা সম্বন্ধে কতগুলি অতি আশ্চর্য্য প্রকরণ ছিল—সে সকল তত্ত্ব ইউরোপীয়েরা বহুকাল পরিশ্রম করিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। চিকিৎসাবিদ্যা কেন, সকল বিদ্যাতেই এইরূপ। কিন্তু সে সকল এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কেবল দুই একজন সন্ন্যাসী উদাসীন প্রভৃতির কাছে সে সকল লুপ্ত বিদ্যার কিয়দংশ অতি গুহ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদের বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী কখন কখন যাতায়াত করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে ভালবাসিতেন, তিনি যখন শুনিলেন, আমি রজনীকে বিবাহ করিব, তখন বলিলেন, 'শুভদৃষ্টি হইবে কি প্রকারে? কন্যা যে অন্ধ।' আমি রহস্য করিয়া বলিলাম, 'আপনি অন্ধত্ব আরোগ্য করুন', তিনি বলিলেন, 'করিব—এক মাসে।' ঔষধ দিয়া তিনি এক মাসে রজনীর চক্ষের দৃষ্টি সৃজন করিলেন।

আমি আরও বিস্মিত হইলাম ; বলিলাম, "না দেখিলে আমি ইহা বিশ্বাস করিতাম না। ইউরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র অনুযায়ী ইহা অসাধ্য।"'

বঙ্কিম রচনারই আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে। ব্রহ্মানন্দ ও হরলাল রায়ের কথোপকথনের অংশ :

'হর। আজি বিকালে লেখাপড়া হবে? তুমি লিখিবে?

ব্র। তা কি করব ভাই। কর্ত্তা বলিলে ত "না" বলিতে পারি না।

হর। ভাল, তাতে তোমার দোষ কি? এখন কিছু রোজগার করিবে?

ব্র। কিলটে চড়টা? তা ভাই, মার না কেন?
হর। তা নয়; হাজার টাকা।
ব্র। বিধবা বিয়ে করো নাকি?
হর। তাই।'

বোঝাই যাচ্ছে, আক্রমণের লক্ষ্য প্রথমত বিধবাবিবাহতত্ত্ব এবং দ্বিতীয়ত 'বিধবা বিবাহ করলে পারিতোষিক পাওয়া যায়', এই প্রচলিত ধারণা— যদিও দ্বিতীয় ধারণাটির সঙ্গে উপন্যাসটির আপাতদৃষ্টিতে যোগ নেই।

আরেকটি উদাহরণ 'তিতাস একটি নদীর নাম' থেকে। যেখানে লেখক মালোপাড়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে সহসা ধনাঢ্য ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে তাদের প্রভেদ নিয়ে শ্লেষাত্মক ছত্র রচনা করেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে ধনাঢ্যজীবন বর্ণনা রচনার ঐ অংশে প্রাসঙ্গিক ছিল না।

'ওরা কারা? ওরা মালোদের ছেলেরা। আর মালোদের মেয়েরা। ওরা তারা নয় যাদের দেয়াল ঘেরা বাড়ি, সামনে আছে পুষ্করিণী, পাশে কুয়া, যাদের আঙিনার পার থেকেই শুরু হইয়াছে পথ— সে-পথ গিয়াছে শহরের দিকে, পাশের গাঁ গুলিতে এক একটা শাখাপথ ঢুকাইয়া দিয়া। সে পথে ঘোড়ার গাড়ি চলে।'

অথবা, ধরা যাক শংকর বসুর পূর্বে উল্লেখিত উপন্যাটির কথা। স্বাধীনতা পরবর্তী-কালে এক ব্রাত্যকলোনীতে বেড়ে ওঠা 'শৈশব' কেন্দ্রিক এই উপন্যাস প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছে অব্যবহিত অতীতের ঘটনা: যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ প্রভৃতির সঙ্গে —যা কালগত দিক থেকে উপন্যাস-বহির্ভূত বিষয়:

'অন্ন, এখুনি এসে যাবে, এসে গেল প্রায়, আর অন্ন এসে গেলেই সেই বৃত্তটি সম্পূর্ণ। সে, সরি এবং অন্ন দীর্ঘকাল পরস্পরে সীমাবদ্ধ। অভ্যস্ত। কেমন অখণ্ড মনে হয়। যাতে সে ভাবে আদিতেও যেন এই তিনটি প্রাণী ছিল চরাচরে। ...তারা মন্বন্তরে মরে নি, কোনোদিন মরবে না। সদুকে পদ্য মুখস্থ করতে করতে ভাবতে হয়: তা হলে মন্বন্তরে কারা মরেছিল? কারা বেঁচেছিল? কেউ কি মরেছিল? তারা কারা? তারা কেন মরেছিল? মন্বন্তরে!...

'মা! অমা!
কী?
যোগেন্দ্র, মহেন্দ্র, হরেন্দ্র চক্রবর্তী ...
কী কস হাবিজাবি, পূর্বপুরুষের নামে ঈশ্বর বসাইতে লাগে।
আচ্ছা ওরা সবাই মন্বন্তরে মরেছে না?'

মিখাইল বাখতিন: উপন্যাসতত্ত্ব: তিন

যেমন ব্যাকরণবদ্ধ ভাষা (langue) ও বিভিন্ন নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে বহু অর্থবোধক

কথিত ভাষার (parole) মধ্যে পার্থক্য আছে, তেমনি, বাখতিনের মতে, সাহিত্যের মধ্যেও দুটি ঘরানা (genre) আছে— একটি হল, কেবলমাত্র একজন লেখকের চিন্তা/শৈলী নিয়ে গড়ে ওঠা ধ্রুপদী [আনুষ্ঠানিক নিয়মবদ্ধ] সাহিত্য— যার প্রকাশ সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় 'কাব্যে' : মহাকাব্যে, ট্র্যাজেডি বা গীতি কবিতায় (lyric) —অর্থাৎ যা গড়ে উঠছে একটিমাত্র শৈলী বা বিশ্ববীক্ষার ওপর ভিত্তি করে। সাহিত্যের এই ঘরানাটিই (যা বাখতিনের আক্রমণের বিষয়) হল, বাখতিনের মতে, 'একালাপমূলক' বা 'monologic', এই ঘরানার সাহিত্যে, বিশেষ করে মহাকাব্যে, যদিও অনেক সময় বহুচরিত্রের ভাষণের প্রতিফলন ঘটে, তবুও তাকে একটি নির্দিষ্ট [লেখকের প্রাধান্য মতো] শৈলীতে বা মতাদর্শে বেঁধে ফেলার চেষ্টা হয়।

অন্যদিকে, উপন্যাস চরিত্রগতভাবেই সংলাপমূলক (dialogical) বা অন্য পরিভাষায় বাখতিন যাকে বলেছেন 'বহুধ্বনিময়' (polyphonic) যার মধ্যে 'বহু' ভাষণের [যা লিখিত ও কথিত ভাষার থেকে উৎকলিত] সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায় —যার ফলেই কেবলমাত্র লেখকের ডিসকোর্স [শত চেষ্টা করেও] কোনো উপন্যাসের একমাত্র বা প্রধান ডিসকোর্স হয়ে উঠতে পারে না। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই অনেকে আধুনিক কবিতার বহুধ্বনিময়তা ও দ্বন্দ্বের দিকটির উল্লেখ করতে পারেন, কিন্তু বাখতিনের মতে, এগুলি হয় 'নভেলের যুগে' [অর্থাৎ আধুনিক যুগে] লিখিত কাব্য— যার ওপর উপন্যাস/গদ্য শৈলীর প্রবল প্রভাব পড়েছে— অথবা তা পুরনো অ-ধ্রুপদী হাস্য-ব্যঙ্গের লোকায়ত পরম্পরায় প্রভাবিত।

কিন্তু কী করে এই উপন্যাসের উদ্ভব হল ? এক্ষেত্রে বাখতিনের চিন্তায় একটি ক্রম-বিকাশ লক্ষ করা যায়। প্রথমে তিনি মনে করেছেন, দস্তয়েভস্কিই হলেন সেই প্রথম সাহিত্যিক যার উপন্যাসে আমরা এই 'বহু' ডিসকোর্স — বহুধ্বনির লীলা দেখতে পাই, সুতরাং উপন্যাসে সংলাপমূলক শৈলীর জনক হলেন দস্তয়েভস্কি। তাঁর আগে উপন্যাস সার্থকভাবে বহুধ্বনির সংলাপময় ছিল না। যদিও উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের প্রত্যক্ষভাষণের ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে বহুপূর্বেই — কিন্তু সেই সকল চরিত্রের সংলাপ/অভিমত শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে লেখকের নিজস্ব ভাষণ/ মতাদর্শের দ্বারা— যেমন বাঙলায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে। রাশিয়ায় তলস্তয়ের উপন্যাসগুলিতে যদিও বিভিন্ন চরিত্র প্রত্যক্ষভাষণে (এমনকি কথ্য ভাষার দ্বারা) যোগ দিয়েছে, কিন্তু তবুও তা শেষঅবধি নিয়ন্ত্রিত/নির্ধারিত হয়েছে লেখকের ভাষণ/ বিশ্ববীক্ষার দ্বারা— তাই চরিত্রসমূহের প্রত্যক্ষ/কথ্য ভাষণ ব্যবহার করলেও, বাখতিনের মতে তলস্তয়ের উপন্যাস একালাপধর্মী (monologic)।

অন্যদিকে, দস্তয়েভস্কি, যিনি তলস্তয়ের মতো এত বিচিত্র চারিত্রিক ভাষণ ব্যবহার করেননি— ফলে তাঁর লেখনশৈলী অনেকের কাছেই 'একঘেয়ে' [তলস্তয়ও দস্তয়েভস্কি সম্পর্কে একই অভিযোগ করেছেন) —তবুও তাঁর উপন্যাসে আমরা [পরোক্ষ ভাষণের মধ্যেই] চরিত্রসমূহের এত বেশি স্বাধীন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী কণ্ঠস্বর/জীবন দর্শন

শুনতে পাই যে লেখকের মুঠি ক্রমশ আল্‌গা হতে শুরু করে এবং তাঁর রচনা হয়ে ওঠে প্রকৃত অর্থে বহুধ্বনিময় বা সংলাপমূলক, বলা বাহুল্য, নিয়মবদ্ধ আনুষ্ঠানিক একক শৈলী/ভাষণ/ভাষা ব্যবস্থা, যা অন্যসব কণ্ঠস্বর/চিন্তা/অভিমতের ওপর নিজের প্রাধান্য কায়েম করে— তা বাখতিনের আক্রমণের লক্ষ্য। স্পষ্টতই বোঝা যায়, রাজনৈতিক দিক থেকে দেখলে এই তত্ত্ব তদানীন্তন রুশ শাসকদের খুশি করতে পারে না।

যাই হোক, প্রথমদিকে বাখতিন দস্তয়েভস্কিকেই আধুনিক [সংলাপমূলক] উপন্যাসের জনক হিসেবে গণ্য করলেও, পরবর্তীকালে আরো মনস্কপাঠে একথা বুঝতে পারেন যে, কেবল দস্তয়েভস্কির নয়, সমস্ত উপন্যাসই প্রকৃতভাবে 'সংলাপমূলক'। এমনকি উনিশ শতকী বাস্তববাদী সাহিত্যের মধ্যেও আমরা এই মতদ্বন্দ্বমূলক বহুধ্বনিময় কণ্ঠস্বর শুনতে পাই— অনেক কৌশল ও পরিকল্পনা করেও লেখক যার রাশ সম্পূর্ণ টেনে ধরতে পারে না। এই শতকের বাঙলা উপন্যাসে অনেক ক্ষেত্রেই চরিত্রদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বময় মতাদর্শ/কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেছে। যেমন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলিতে এই প্রবণতা খুব বেশি। অনেক সময়, যেমন 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য়, এই কণ্ঠস্বরগুলি লেখক/বর্ণনাকারীর চূড়ান্ত রূপ গড়ে উঠতে দেয়নি।

যদিও উপন্যাসের এই বহুধ্বনিময়তার প্রয়োগ ঘটতে অনেক সময় লেগেছে, তবুও প্রাক্-উপন্যাস লেখনীর মধ্যেও [আনুষ্ঠানিক ধ্রুপদী সাহিত্যের পাশাপাশি] একধরনের হাস্য-ব্যঙ্গাত্মক ধ্রুপদী এবং মুক্ত লোকায়ত বহুমতাদর্শময় ধারাও (Carnivalsque) লক্ষ করা গেছে — যেমন রাশিয়ার *Skaz*-এ অথবা এ দেশে কবির লড়াই বা সঙ-জাতীয় পরম্পরায়। ইয়োরোপে প্রাক্-উপন্যাস যুগে এই হাস্য-ব্যঙ্গধারার অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন রাবেলাই। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর রচনাশৈলী বাখতিনকে আকর্ষণ করেছে।

বাখতিনের মতে, এই জাতীয় বহুধ্বনিময়, চিত্রবৎ, স্বীকারোক্তিমূলক সাহিত্যধারার থেকেই আধুনিক উপন্যাসের জন্ম হয় উনিশ শতকে— যখন বর্ণনাকারীর ভাষণ ও চরিত্রগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী ভাষণগুলির মধ্যে একটা মিথস্ক্রিয়া এবং উদ্ধৃত/অনুদ্ধৃত শৈলীর মধ্যে পারস্পরিক অপূর্ব মেলবন্ধন গড়ে উঠল— যখন 'উপন্যাসই' অন্য সব সাহিত্য-রূপের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠল।

এইভাবে বাখতিন এ-তাবৎকাল সাহিত্যতত্ত্বের প্রান্তে অবস্থিত একটি রূপকে [অর্থাৎ উপন্যাসকে] পাদপ্রদীপের কেন্দ্রীয় বৃত্তে দাঁড় করালেন। এমনিতে দেখতে গেলে আনুষ্ঠানিক ভাষা হল নিস্তরঙ্গ, যান্ত্রিক ও ক্লিশে। এখন এই ভাষা বহুধ্বনিময়, বিচিত্র ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে কেবল তার **ব্যবহারের** দ্বারা —অর্থাৎ শ্লেষাত্মক অনুকরণ, অতিকথন, অন্য শৈলী নকল বা প্যারোডি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। এই জীবন্ত কথিত নানা ভাষণের সার্থক ব্যবহার ও মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সার্থক উপন্যাসের জন্ম হয়। এই কারণেই সস্যুরের বিপরীতে ভাষাতত্ত্ব হল *parole* এর ভাষাতত্ত্ব।

বাখতিন তত্ত্বের সমস্যা :

অতএব, মিখাইল বাখতিন আমাদের সামনে হাজির হচ্ছেন এক বিকল্প ভাষাতাত্ত্বিক সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে— যা প্রথানুগ [সরলীকৃত/সংকোচনবাদী] মার্কসবাদী ও স্বয়ংসৃষ্ট তাত্ত্বিক গোলকধাঁধায় দিশেহারা দেরিদীয় সাহিত্যতত্ত্বের পাশাপাশি একটি স্পষ্ট অ-সরলীকৃত/অ-সংকোচনবাদী কিন্তু বোধগম্য ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে— যাকে কাজে লাগিয়ে আমরা যে কোনো উপন্যাস ও তার ডিসকোর্সসমূহকে নতুনরূপে চিনে নিতে পারি।

তবে প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক ডেভিড লজ আমাদের বাখতিন তত্ত্বের বহুমুখী ব্যাখ্যা/ব্যবহারের সম্ভাবনা ও তার বিপদের প্রতি সতর্ক করে দিয়েছেন। যেমন, সস্যুরের ভাষাতত্ত্বের বিপরীতে মার্কসবাদকে সামনে রেখে সামাজিক অনুষঙ্গমূলক diachrony-কে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাথমিক বিচারে বাখতিনকে (১) আপাদমস্তক মার্কসবাদী, (২) নব্য প্লেটোবাদী এবং (৩) স্ট্রাকচারালিজম/ফর্মালিজমের তীব্র বিরোধী মনে হতে পারে।

কিন্তু এই 'ভাবমূর্তি' বাখতিনকে যত না চেনায়, আড়াল করে তার চেয়ে বেশি। কারণ, বাখতিন কোনোমতেই 'সরকারি' মার্কসবাদ গ্রহণ করেননি। সাহিত্যে 'একালাপী' শৈলী মতাদর্শকে আক্রমণ করে তিনি [রূপকার্থে] আক্রমণ করেছেন একটি সর্বাত্মবাদী [স্তালিন নিয়ন্ত্রিত] ব্যবস্থাকে, তৎকালীন সরকারি নীতির বিপরীতে তিনি নিরন্তর গবেষণা চালিয়েছেন এমন এক সাহিত্যকৃতির [দস্তয়েভস্কির] ওপর, যাকে স্তালিনপন্থীরা 'অবক্ষয়ের' [অতএব ঘৃণ্য] সাহিত্যের তকমা দিয়ে প্রায় নির্বাসিত করেছে। দ্বিতীয়ত, ফর্মালিজমের সঙ্গে বাখতিনের চলেছে ঘৃণা-প্রেমের এক দীর্ঘ 'ডায়ালগ' — বাখতিন তার বিপুল কর্মকাণ্ডে ফিরিয়ে এনেছেন সাহিত্য 'ব্যাখ্যা' করার পক্ষে ফর্মালিস্টদের পুরনো ইচ্ছা/অঙ্গীকার — মনে রাখতে হবে, রুশ ফর্মালিস্টদের অন্যতম পথিকৃৎ রোমান জ্যাকবসন বাখতিনের বিভিন্ন বিশ্লেষণের অনুরাগী ছিলেন এবং পশ্চিমী পণ্ডিত/পাঠক সমাজে [যাদের হাত ঘুরে বাখতিনের 'আলো' এই পোড়া কলোনিতেও এসে পেঁছেছে] বাখতিনকে পরিচিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। এছাড়া, ফর্মালিস্ট/স্ট্রাকচারালিস্টদের মতো বাখতিনও ব্যবহার করেছেন বহু পরস্পর সম্পৃক্ত [binary] শব্দযুগল : একালাপী/সংলাপী, কাব্য/গদ্য, আনুষ্ঠানিক রীতিসিদ্ধ/লোকায়ত উৎসবমূলক প্রভৃতি। এবং শেষ বিচারে, এই শব্দযুগলগুলিও বিপরীতধর্মী ফর্ম ও স্টাইলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। সস্যুরীয় ঘরানায়ও আমরা দেখেছি অনুরূপ binary পরিভাষার ছড়াছড়ি, যেমন সস্যুরের 'ব্যাকরণগত ভাষা' (langue)/ 'কথিত ভাষা' (parole); জ্যাকবসনের 'রূপক' (metaphor) / 'বাস্তবসম্বন্ধীয়' (metonymy) বা রলাঁ বার্থের 'পাঠযোগ্য' (lisible) ও 'লিপিযোগ্য' (scriptible) প্রভৃতি।

রূপ ও শৈলীকে নিয়ে বিপরীতমুখী শব্দযুগল গড়ে তুললে কোনো একটির ওপর অধিক গুরুত্ব/গৌরব আরোপ করার প্রবণতা থাকে। যেমন সস্যুরের ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত-ভাষা গুরুত্ব পেয়েছে বা বার্থের ক্ষেত্রে 'পাঠযোগ্য' রচনার চেয়ে 'লিপিযোগ্য' রচনার গুরুত্ব বেশি। বাখতিন সস্যুরীয় ক্রম ঘুরিয়ে দিলেন। তাঁর মতে, **ভাষা চরিত্রগতভাবে সংলাপমূলক**। এবং 'একালাপী' ও 'সংলাপী' সাহিত্যের মধ্যে তাঁর পছন্দ দ্বিতীয়টি।

কিন্তু এখানেই একটা প্রশ্ন থেকে যায়—যার সদুত্তর বাখতিনের প্রধান রচনাগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। তা হল, যদি ভাষা চরিত্রগতভাবে সংলাপমূলক' (dialogic) হবে, তবে তার মধ্যে আদৌ কীভাবে 'একালাপী' সাহিত্যিক ডিসকোর্স গড়ে উঠবে? অথচ বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে এই একালাপ/সংলাপের পার্থক্যের ওপর। মনে হয়, বাখতিন নিজেও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন না। পরবর্তীকালে দীর্ঘ দু-বছর ব্যাপী (১৯৫৯-৬১) লেখা এক প্রবন্ধে তিনি যেন তাঁর পূর্বধারণার সঙ্গে সংলাপরত। সেখানে তিনি প্রশ্ন করেন, সাহিত্যে কতটা পরিমাণে 'বিশুদ্ধ' একক স্বরযুক্ত এবং কোনো ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ডিসকোর্স চলতে পারে? এমনকি কোনো ডিসকোর্স চলতে পারে, যেখানে লেখক তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পান না? সুতরাং (একালাপী অথবা সংলাপী) যে কোনো সাহিত্যিক ঘরানাই শৈলীর দিক থেকে সম্পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বীহীন বা স্ববিরোধশূন্য হতে পারে না। প্রত্যেক লেখক (এমনকি বিশুদ্ধ গীতিকবিও) কি আসলে একজন 'নাট্যকার' নন— যিনি রচনার সমস্ত বক্তব্য/অভিমতগুলি বিভিন্ন অপরিচিত কণ্ঠস্বরের মধ্যে (যার মধ্যে 'লেখকের' নিজস্ব ও ছদ্ম ভাবমূর্তিগুলিও আছে) বিতরণ করেন।

'পরিণত' বাখতিনের এই উপলব্ধি কি তাঁর পূর্বরচিত তত্ত্বকে (অর্থাৎ একালাপী/সংলাপী পার্থক্যকে) সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে? একটু বড় দৃষ্টিতে দেখলে, তা করে না। কারণ, 'বিশুদ্ধ' একালাপ/সংলাপ বলতে যদিও কিছু নেই (যা বাখতিন পরিণত বয়সে স্বীকার করেছেন) —তবু প্রবণতা/প্রাধান্যের দিক থেকে দুটি শৈলীকে পৃথক করা যায় বৈকি। তবে মনে রাখতে হবে, এই পার্থক্য 'চূড়ান্ত' বা 'বিশুদ্ধ' নয়।

হিসেব-নিকেশ :

বাখতিন-আলোচনার এই পর্যায়ে কোনো গুরুগম্ভীর আকাদেমিক ব্যক্তি বা কফি হাউসের কোনো উঠতি আঁতেল স্বভাবতই জানতে চাইবেন : মোদ্দা ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? অতএব, [অনেক মান্যবরের কাছে এই প্রয়াসটা ক্লিশে/আকাদেমিক মনে হলেও] এবার হিসেব-নিকেশের পালা।

এটা অত্যন্ত জরুরি, বিশেষত যখন আমাদের 'আকাদেমিক' তথা 'আধা আকাদেমিক' মহল স্ট্রাকচারালিজমের ঘোর কাটিয়ে দেরিদা-জ্বরে আক্রান্ত—তখন একটি নতুন সাহিত্যতত্ত্ব গ্রহণ করার 'দ্বিমুখী' সমস্যা আছে। হয়, আমরা নতুন তত্ত্বটিকে উদ্বাহু বরণ করব— তার 'লক, স্টক এবং ব্যারেল' সমেত (যেমনটা আমরা করেছি অস্তিত্ববাদ/

স্ট্রাকচারালিজম বা অবিনির্মাণের ক্ষেত্রে), নতুবা, পুরনো প্রোথিত ধারণাটিকে আগলে আগন্তুক-তত্ত্বটিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেব।

বিশেষ করে, সাহিত্য/নন্দন তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিগত এক শতাব্দী ধরে এদেশে এমনটাই ঘটে এসেছে। পশ্চিমী আদর্শে গঠিত হলেও উনিশ শতকী [বাঙলা] সাহিত্য অচিরেই 'আমাদের' [অবশ্যই শ্রেষ্ঠবর্গীয় 'আমাদের'] হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের বিশ্ব মানচিত্রে এই সময়কার বাঙলা সাহিত্যের স্থানও মোটামুটি চিহ্নিত হয়ে গেছে। কিন্তু এ তো শুধু [সাহিত্য] প্রয়োগের দিক।

অন্যদিকে সাহিত্যতত্ত্ব/সমালোচনার ক্ষেত্রে এখনও চলেছে 'তাহাদের' [অর্থাৎ 'পশ্চিমী'] যুগ। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সাহিত্যতত্ত্ব/সমালোচনার বিশ্ব-মানচিত্রে 'আমাদের' যোগদান প্রায় শূন্য। তার মধ্যে এদেশের অধিকাংশ আকাদেমিক/জনপ্রিয় গদ্য সাহিত্য সমালোচক কেবল ব্যক্তিগত নীতিবাগিশতা/পছন্দ অনুযায়ী কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরে সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন করেন অথবা একদল 'বুদ্ধিমান' সমালোচক সাহিত্য সমালোচনায় সেই [পশ্চিমী] ঘরানা আত্মস্থ করেন—যাকে ক্যাথারিন বেলসি 'expressive realism' আখ্যা দিয়েছেন —যা সাহিত্যকৃতিকে লেখকের বিশ্ববীক্ষা ও তার চারপাশের জগতের বাস্তবতার প্রায় বিশ্বস্ত প্রতিনিধিত্ব বলে মনে করে— এবং [ফলে] সাহিত্যের ব্যাখ্যার জন্যে লেখকের জীবন হাতড়ে বেড়ান। কাব্যের ক্ষেত্রে তবুও শৈলী/ছন্দ বা রূপক, 'শব্দবন্ধ' প্রভৃতি রচনা-অন্তর্গত উপাদানগুলির আলোচনা প্রাধান্য পায়, কিন্তু গদ্যের ক্ষেত্রেই ছকটা পালটে যায়।

আর যারা 'সহজিয়া' পন্থায় বিশ্বাসী নন, তারা আরও বেশিমাত্রায় চাতকপাখির মতো চেয়ে থাকেন তত্ত্বের 'পশ্চিমী' আকাশের দিকে। ফলে [গদ্য] সাহিত্যের তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এদেশের অবস্থা হল : 'আমাদের' সাহিত্য—'তাহাদের' তত্ত্ব।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাখতিন আমাদের নতুন করে কোন্ কাজে লাগবেন —এমন প্রশ্ন অস্বাভাবিক নয়। তবে এই প্রসঙ্গে বলা যায়, আমাদের পুরনো ধারণা, এমনকি অবিনির্মাণের প্রতি দুর্বলতা সত্ত্বেও আমরা বাখতিনের তত্ত্ব-উপহারকে কাজে লাগাতে পারি, গদ্য সমালোচনার ক্ষেত্রে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে স্ট্রাকচারালিজম/অবিনির্মাণের সঙ্গে বাখতিন তত্ত্বের মিলন অসম্ভব মনে হয়, তবুও আমরা জানি বাখতিনও, শেষ বিচারে, স্ট্রাকচারালিস্ট/ফর্মালিস্টদের মতোই শৈলী এবং রূপ [তা যতই আনুষ্ঠানিক হোক না কেন] অনুযায়ী নতুন দৃষ্টিতে সাহিত্যের ঘরানা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে তিনি যেমন ভাষাতত্ত্বে synchronyর বদলে diachronyর ওপর জোর দিয়েছেন, তেমনি শব্দকে সামাজিক অনুষঙ্গমূলক/সংলাপমূলক প্রেক্ষাপট নির্ধারিত মনে করেছেন। যার অর্থ, একটি নির্দিষ্ট *langue*-এর কাঠামোয় কোনো শব্দের একটি মাত্র fixed অর্থ থাকতে পারে না —যেহেতু প্রেক্ষাপট বিভিন্ন তাই একটি শব্দের অর্থও বিভিন্ন হবে। এইভাবে বাখতিন সস্যুরকে অতিক্রম করেন। পরে দেরিদাও আরো জটিল পদ্ধতিতে সস্যুরীয় synchrony-কে অতিক্রম করেন এবং দেখান যে একটি শব্দের

আছে 'context'-নির্ভর অনন্ত অর্থ-সম্ভাবনা। তফাৎটা এই যে, বাখ্‌তিন 'context' বলতে একটি নির্দিষ্ট শব্দের পূর্বে উচ্চারিত অন্য শব্দ ও পরে উচ্চারণসম্ভব একটি ভবিষ্যৎ শব্দের নির্ধারণ বুঝিয়েছেন, তখন দেরিদার কাছে এই context-ও বহুমাত্রিক ও অনন্ত।

আবার, বাখ্‌তিনের মতে যেহেতু ব্যাকরণবদ্ধ ভাষা-কাঠামোর দ্বারা সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দকে চেনা যাবে না, তাকে বুঝতে হবে নির্দিষ্ট উচ্চারণের দ্বারা —তখন স্বাভাবিক-ভাবেই গুরুত্ব পায় উচ্চারিত / কথিত ভাষা বা *parole*— এই উচ্চারণমূলক কণ্ঠস্বর/মতবাদ/অভিব্যক্তিকেই বাখ্‌তিন সাহিত্য রচনার অন্তর্গত 'ডিসকোর্স' বলে আখ্যা দিয়েছেন— যে 'ডিসকোর্স' বিশ্লেষণ আধুনিক ভাষা / নন্দন তথা সমাজবিজ্ঞান তত্ত্বের একটি প্রিয় / গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। অথচ তত্ত্বচর্চার এই আধুনিক প্রবণতার বহু আগেই লিপিবদ্ধ হয়েছে বাখ্‌তিনের রচনা।

এছাড়া, যখন বার্থের মতো বুদ্ধিজীবী 'লেখকের' [সর্বশক্তিমান] অস্তিত্বের জনপ্রিয় ধারণার বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে লেখক-ধারণারই মৃত্যু ঘটান, তখন বাখ্‌তিন অসরলীকৃত পথে লেখকের ডিসকোর্সকে দ্বন্দ্বে লিপ্ত করেন অন্য ডিসকোর্সগুলির সঙ্গে। অর্থাৎ, তাঁর মতে, যদিও কোনো সাহিত্যরচনাই কেবলমাত্র লেখকের ডিসকোর্স বহন করে না এবং বহু সাহিত্যরচনায় লেখকের মতের চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে অন্যান্য অভিমত/ কণ্ঠস্বর— তবুও লেখকের ভূমিকা ও অস্তিত্বকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না। তাঁর ভাষায়, লেখক হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি জানেন কীভাবে ভাষাকে ব্যবহার করতে হয় অথচ নিজেকে তার [অর্থাৎ ব্যবহৃত ভাষার] বাইরে রাখতে হয়, লেখক তিনিই যাঁর পরোক্ষ ভাষণে বিশেষ দক্ষতা আছে।

এইভাবে মিখাইল বাখ্‌তিন [গদ্য] সাহিত্য বিশ্লেষণের একটি স্পষ্ট, বোধগম্য, অসংকোচনবাদী পথনির্দেশ দেন— যা সস্যুর-পন্থাকে অস্বীকার করলেও কখনোই 'expressive realism'এর 'সহজ' পথে ফিরে যায় না। তার মানে এই নয় যে বাখ্‌তিন 'অকাট্য' বা তার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে, কেবল বাখ্‌তিন কেন, কোনো তত্ত্বই অকাট্য-অভ্রান্ত নয়। ['আমাদের'] সাহিত্য রচনা বিশ্লেষণ/সমালোচনার সময় বাখ্‌তিন সহ অন্যান্য [পশ্চিমী] সাহিত্যতত্ত্বের নানা ফাঁক-ফোকর, ফাটল বেরিয়ে পড়বে— আরো গভীর অনুশীলনে যেগুলি ক্রমে পরিণত হবে বৃহৎ গহ্বরে। তখনই পশ্চিমী তত্ত্বগুলির সংকটের মুহূর্ত এবং শুরু হবে 'আমাদের' পালা। আমরা আমাদের অনুশীলন, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি দিয়ে ভরিয়ে দিতে থাকব ঐ গহ্বরগুলিকে এবং একটা সময় আসবে যখন সাহিত্যতত্ত্ব আর পুরোপুরি 'derivative' থাকবে না— সাহিত্যরচনার মতোই তা হয়ে উঠবে 'তাহাদের'—'আমাদের' তত্ত্ব। তখন শুরু হবে এক নতুন গল্প— এক 'অন্য' স্বপ্নের গল্প। সেই স্বপ্নের ঘোর লাগুক আগামী দিনের সাহিত্য-সমালোচকের চোখে। ☐

আমাদের আধুনিকতা

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

[গত ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪, সেণ্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটা-র সভাকক্ষে 'শ্রীজ্ঞান হালদার স্মারক বক্তৃতা' হিসাবে লেখক রচনাটি পাঠ করেন। এখানে তা মুদ্রিত হল। —সম্পাদক।]

আজকের সভায় যে আমার বক্তৃতা করতে হচ্ছে, এই ঘটনার মধ্যে কয়েকটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেছি। প্রথমত, যে-শ্রেণীর বক্তাদের সচরাচর এই ধরনের আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা করতে ডাকা হয়, প্রাজ্ঞতা, প্রাচীনতা এবং মুরুব্বিয়ানায় আমি যে নিজের অজান্তেই সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি, এটা আবিষ্কার করে খুবই চমকে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয়ত, আমার ছাত্র এবং অনুজপ্রতিম শ্রীজ্ঞান হালদারের স্মরণে আমি বক্তৃতা করছি, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কিছুই হতে পারে না। বরং আমার স্মরণে শ্রীজ্ঞান বক্তৃতা করছে, এমন হলেই তা প্রাকৃতিক নিয়ম আর সামাজিক প্রথা, দুই-এর সঙ্গেই সংগতিপূর্ণ হত। তৃতীয়ত, বাল্যকাল থেকে দুরারোগ্য ব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধ করে তার সংক্ষিপ্ত কিন্তু নাটকীয় জীবন, আর ততোধিক নাটকীয় মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে দেশ-কাল-

সমাজ সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহল, নিজের বিচারবুদ্ধি আর বিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠা এবং জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসার যে সাক্ষ্য সে রেখে গেছে, তার প্রতি সুবিচার করার মতো ভাষা অথবা চিন্তা আমার নেই— এ-কথাটা তেমন অদ্ভুত হয়ত না-ও হতে পারে, কিন্তু শ্রীজ্ঞানের স্মৃতির কাছে আমার এই দৈন্য স্বীকার না করে আমি আমার বক্তৃতা শুরু করতে পারছি না।

এক

আমার আলোচ্য বিষয় 'আধুনিকতা', কিন্তু বিশেষ করে 'আমাদের আধুনিকতা'। এই তফাৎটা করার ভেতর দিয়ে নিশ্চয় এটাই বোঝাতে চাইছি যে সবরকমের আধুনিকতা আমাদের নয়, কিংবা আমাদের আধুনিকতার মধ্যে কিছু একটা বিশেষত্ব আছে। হয়ত এমনও হতে পারে, অন্যেরা যা আধুনিক বলে মনে করে, আমরা তা গ্রহণ করিনি, আবার আমরা যাকে আধুনিকতার অঙ্গ বলে সযত্নে লালন করেছি, অন্যেরা তাকে আধুনিক বলেই গ্রাহ্য করে না। এই ভিন্নতার জন্য আমরা গর্বিত হব, না হীনমন্যতায় ভুগব, সে-প্রশ্ন পরে তুলব। আপাতত দেখা যাক, আধুনিকতা বলতে আমরা কী বুঝেছি।

১৮৭৩ সালে রাজনারায়ণ বসু 'সে কাল আর এ কাল'-এর মধ্যে একটা তুলনামূলক বিচার করার চেষ্টা করেছিলেন। 'সে কাল' আর 'এ কাল' বলতে ইংরেজি শিক্ষা রীতিমতো প্রচলন হওয়ার আগের আর পরের সময়। এখন আমরা যে-অর্থে 'আধুনিক' শব্দটা ব্যবহার করি, উনিশ শতকে তা প্রচলিত ছিল না। তখন বলা হত 'নব্য', এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা আর ভাবধারার সঙ্গেই তাকে একান্তভাবে যুক্ত করে দেখা হত। সেই-সঙ্গে, আরো একটা কথা খুব প্রচলিত ছিল— 'উন্নতি'— 'উনিশ শতকের ইয়োরোপীয় সমাজদর্শনের ভাষায় 'ইমপ্রুভমেন্ট' বা 'প্রোগ্রেস', এখন আমরা যাকে সাধারণত বলি 'প্রগতি'। রাজনারায়ণবাবু বলা বাহুল্য, নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত, সংস্কারপন্থী, আধুনিক ভাবধারার পক্ষপাতী। সেকাল আর একালের তুলনা করতে গিয়ে তিনি সাতটি বিষয়ে উন্নতি অথবা অবনতির আলোচনা করেছিলেন। সাতটি বিষয় হল— শরীর, বিদ্যাশিক্ষা, উপজীবিকা, সমাজ, চরিত্র, রাজ্য, ধর্ম। সবকটি বিষয়ের আলোচনাতেই কিছু কিছু সুপরিচিত প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। যেমন, সেকালে লোকে ধর্মভীরু, সরল, স্নেহশীল, দয়াশীল ছিল। একালে ধর্ম বলতে আমোদ-উৎসব, আলঙ্কারিক সৌন্দর্যের দিকেই লোকের ঝোঁক বেশি। খলতা, প্রতারণা, স্বার্থপরতা, অকৃতজ্ঞতা অনেক বেড়ে গিয়েছে। 'এখন লোকের সঙ্গে কথা কহিয়া শীঘ্র বুঝিবার যো নাই যে, তাহার মনের ভাব কি ?··· পূর্বে বাটীতে লোক আইলে তিনি যাহাতে অধিক দিন থাকেন, লোকে এমন আগ্রহ প্রকাশ করিত, পূর্বে ঘটি বাঁধা দিয়া লোকে অতিথিসেবার ব্যয় নির্বাহ করিত, এক্ষণে অতিথি বাটী হইতে বেরুতে পারিলে বাঁচে।' সামাজিকতার রীতিনীতি পরিবর্তনের এ-জাতীয় আরো অনেক উদাহরণ দিয়েছেন।

কিন্তু সেকাল আর একালের তুলনায় রাজনারায়ণ সবচেয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যে-বিষয়টি নিয়ে, সেটি হল শরীর। প্রসঙ্গটি একটু বিশদভাবে এখানে উপস্থিত করতে চাই, কারণ এর মধ্যে আমাদের আধুনিকতার একটা কৌতূহলজনক দিক লুকিয়ে আছে।

'প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলবেন, আমার পিতা ও পিতামহ বড় বলবান ছিলেন। সেকালের লোকের সহিত তুলনা করিলে বর্ত্তমান লোকদিগের কিছুই বল নাই বলিলে হয়।... এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল লোক জীবিত ছিলেন, তাঁহারা যদি ফিরিয়া আইসেন তাহা হইলে আমাদিগকে খর্বকায় দেখিয়া আশ্চর্য হয়েন, সন্দেহ নাই। ছেলেবেলা সে কালের স্ত্রীলোক কর্তৃক ডাকাইত তাড়ানোর গল্প সকল শুনা গিয়াছিল। এক্ষণে স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, পুরুষের এরূপ সাহসের কার্য্য শুনা যায়না।

'এক্ষণকার পুরুষেরা একটা শিয়াল তাড়াইতেও সক্ষম নহে।'

মোটের ওপর একালের লোক— রাজনারায়ণ এখানে যোগ করছেন, 'বিশেষত ভদ্রলোক' —ক্ষীণ, রুগ্ন এবং অল্পায়ু হয়ে পড়েছে।

এক মুহূর্ত ভেবে দেখা যাক, কথাটার মানে কী। 'এ কাল' বলতে যদি বুঝতে হয় আধুনিক যুগ, ইংরেজ প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থায় বেড়ে ওঠা নব্যসভ্যতার যুগ, তাহলে সেই আধুনিকতার ফল মানুষের স্বাস্থ্যহানি? সামাজিকতা, নীতিবোধ, ধর্মভাব ইত্যাদি নিয়ে না-হয় তর্ক উঠতে পারে। কিন্তু নিতান্ত জাগতিক বিষয়গুলোর মধ্যেও যা সবচেয়ে মৌলিক, সেই জৈবিক অস্তিত্বের ক্ষেত্রে সেকালের তুলনায় একালের মানুষ দুর্বল এবং ক্ষীণজীবী হয়ে পড়েছে, একথা আদৌ কারো মনে হতে পারে?

আমার ঐতিহাসিক বন্ধুরা সতর্ক থাকলে অবশ্য এক্ষুনি আপত্তি তুলবেন: কিন্তু এ তো ১৮৭৩-এর কথা! আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা তো তখনো পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতে ইয়োরোপীয় সম্প্রদায় আর সেনাবাহিনীর সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর জনসমষ্টির দিকে এগোতেই শুরু করেনি। বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে আশ্চর্য অগ্রগতি, ১৮৭৩-এ রাজনারায়ণ তা দেখবেন কী করে?

এই যদি আপত্তি হয়, তাহলে আরো দু-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১৯১২ সালে অল-ইন্ডিয়া স্যানিটারি কনফারেন্সে বক্তৃতা করতে গিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য মতিলাল ঘোষ বলছেন, ষাট বছর আগে তাঁর ছেলেবেলায় অর্থাৎ মোটামুটি রাজনারারণ বসু-র 'এ কালে', যশোর জেলার গ্রামাঞ্চল প্রায় সম্পূর্ণ রোগমুক্ত ছিল। সামান্য জ্বরজারি হত। কিন্তু উপযুক্ত পথ্য দিলেই তা দু-চার দিনের মধ্যে সেরে যেত। টাইফয়েড খুব সামান্যই হত, কলেরার নামও কেউ শোনেনি। বসন্তরোগ হত, কিন্তু টীকাদাররা তাদের চিরাচরিত পদ্ধতিতে রুগিদের অনায়াসেই সারিয়ে তুলত। পরিষ্কার পানীয় জলের অভাব ছিল না। লোকের শরীর-মন স্বাস্থ্য, উৎসাহ আর আনন্দে ভরপুর ছিল। সারাদিন তারা নানা ধরনের স্বাস্থ্যকর খেলাধুলায় ব্যাপৃত

থাকত। আরো সাম্প্রতিক উদাহরণ দিতে পারি। এই সেদিনের কথা, ১৯৮২ সালে মণিকুন্তলা সেন তাঁর বরিশালের ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে লিখছেন, 'এখন কান্না পায়! হায় আল্লা, এমন যন্ত্রসভ্যতা তুমি আমাদের কেন দিলে? বেশ তো ছিলাম ভাতে-ডালে মাছে-দুধে। এখন শুনছি সেই বরিশালের ইলিশ নেই।' আর একেবারে হালের লেখিকা কল্যাণী দত্ত ১৯৯৩-এ প্রকাশিত 'থোড় বড়ি খাড়া' বই-এ তাঁর ছোটবেলায় দেখা অন্দরমহলের কথা বলতে গিয়ে এতরকমের খাওয়ার গল্প বলেছেন যে রাজনারায়ণ বসু-র 'সে কালের' লোকেরা পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের উত্তর কলকাতায় বেশ বহাল তবিয়তেই বিরাজমান ছিলেন বলে মনে হয়। 'ভরপেট খাওয়ার পরও', কল্যাণী দত্ত বলছেন, 'তিরিশ-চল্লিশটা আম হামেশাই লোকে খেত।'

দৃষ্টান্ত অনেক বাড়ানো যায়; যে দু-চারটে হাতের কাছে পেলাম, তাই দিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, রাজনারায়ণের কথাগুলো প্রয়োজনীয় ঝাড়পোঁছ করে যদি আমি এখনকার কোনো লেখকের মন্তব্য বলে চালিয়ে দিতাম, আপনারা কেউ-ই আশ্চর্য হতেন না, কারণ এ-রকম কথা আমরা এখনো আকছার বলে এবং শুনে থাকি।

প্রশ্ন হল, সম্পূর্ণ তথ্যবিরোধী এরকম একটা ধারণা আমরা এত অনায়াসে গত একশো বছর ধরে পোষণ করে এসেছি কেন? না কি আসলে আমরা আমাদের আধুনিকতার এমন কোনো ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাইছি যা ঐ সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে ধরা পড়ছে না? তাহলে আসুন, দেখা যাক সেকালের তুলনায় একালে স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ খুঁজতে গিয়ে রাজনারায়ণ কী দেখতে পাচ্ছেন।

প্রথম কারণ, রাজনারায়ণ বলছেন, নৈসর্গিক প্রকৃতির পরিবর্তন। 'পূর্ব্বে লোকে কলিকাতা হইতে ত্রিবেণী, শান্তিপুর প্রভৃতি গ্রামে জলবায়ু পরিবর্ত্তন জন্য যাইত কিন্তু এক্ষণে ঐ সকল স্থান মেলেরিয়া অর্থাৎ দূষিত বাষ্পনিবন্ধন অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। ['দূষিত বাষ্প' বলতে miasma—সেসময় ম্যালেরিয়ার কারণ বোঝাতে ঐটেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ছিল।] ...নানা কারণে বোধ হইতেছে যে, ভারতবর্ষে একটি মহা নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন চলিতেছে। এরূপ পরিবর্ত্তন লোকের শারীরিক বলবীর্য্যের প্রতি স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিবে ইহার আশ্চর্য্য কি?

দ্বিতীয় কারণ, খাদ্য— পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, কৃত্রিম এবং অনিষ্টকর খাদ্যের ব্যবহার, মদ্যপানের প্রবলতা। 'পূর্ব্বকার লোকেরা বিলক্ষণ আহার করিতে পারিতেন, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। এক্ষণকার লোকে সেরূপ পারে না।' তৃতীয় কারণ, অতিশয় পরিশ্রম, অসময়ে পরিশ্রম এবং ব্যায়ামচর্চার হ্রাস।

> 'এতদ্দেশে ইংরাজী সভ্যতা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিশ্রম, অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইংরেজেরা যেরূপ পরিশ্রম করিতে পারেন, আমরা সেরূপ কখনই পারি না। কিন্তু ইংরাজেরা চাহেন যে, আমরা তাঁহাদের ন্যায় পরিশ্রম করি। ইংরাজী পরিশ্রম এ দেশের উপযুক্ত নহে।... এখনকার রাজপুরুষেরা

যে দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবার নিয়ম করিয়াছেন, ইহা এ দেশের পক্ষে কোনরূপে উপযোগী নহে।'

চতুর্থ কারণ, জীবনযাত্রার রীতি। সেকালের লোকের অভাব অল্প ছিল, তাই তাঁরা আনন্দে থাকতেন। এখনকার জীবনযাত্রায় দুর্ভাবনার শেষ নেই। 'এক্ষণে ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের দেশে এসে ঢুকেছে, সেই সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় অভাব, ইউরোপীয় প্রয়োজন ও ইউরোপীয় বিলাসিতা এসে ঢুকেছে, অথচ সেই সকল অভাব ও বিলাসেচ্ছা পূরণের ইউরোপীয় উপায় অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্য বিশিষ্টরূপে অবলম্বিত হইতেছে না' রাজনারায়ণ এখানে দুই বৃদ্ধের তুলনা করেছেন, একজন দেশি বা ভার্নাকুলার বৃদ্ধ, অন্যজন ইংরেজি-নবিশ বা অ্যাংলিসাইজড বৃদ্ধ।

'এংগ্লিসাইজ্ড বুড়ো অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই বুড়ো হইয়া পড়িয়াছেন। বর্ণ্যাকিউলর বুড়োর রাত্রি থাকিতে, নিদ্রাভঙ্গ হয়। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে বিছানাতে শুইয়া শুইয়া ধর্ম্ম-সঙ্গীত গান করেন— ইহা কেমন চিত্তপ্রফুল্লকর! তৎপরে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃস্নান করেন,— ইহাতে শরীর কেমন ভাল থাকে। তারপর স্নান করিয়া ফুলের বাগানে গিয়া ফুল তুলে আনেন— পুষ্পের সুগন্ধ শরীরের পক্ষে কেমন হিতকর। ফুল আহরণ করিয়া দেবপূজা করেন, —তাহা মনের প্রফুল্লতা সঞ্চার করিয়া শরীর মন উভয়ের বল সাধন করে। ...আর যিনি এংগ্লিসাইজ্ড বুড়ো, তিনি খানা খাইয়া ও ব্রান্ডি পান করিয়া অনেক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যান ; সূর্য্যোদয় কেমন করে হয়, তা কখন দেখেন নাই ও প্রাতঃকালে সুস্নিগ্ধ বায়ু কখন সেবন করেন নাই। অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলো, কিন্তু এমন সহজ কাজ যে, চক্ষু সম্পূর্ণরূপে খোলা, ইহাও তাঁহার পক্ষে দুষ্কর কার্য্য বোধ হয়। শারীরিক গ্লানি অত্যন্ত, খোঁমারি হইয়াছে, বিপদ উপস্থিত !! এইরূপে ইংরাজী আহার পানে ও অন্যান্য ইংরাজী রীতি পালনে এংগ্লিসাইজ্ড বুড়োর শরীর নানা রোগের আধার হয়।'

রাজনারায়ণ নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর এই দৃষ্টান্তে অতিশয়োক্তি আছে। কিন্তু পূর্বের তুলনায় বর্তমান যুগে স্বাস্থ্যের অবনতির যতগুলো কারণ তিনি দেখাচ্ছেন সবগুলোর ভেতরেই একটা অভিযোগ খুব স্পষ্ট। আধুনিক হওয়ার যে নির্দিষ্ট উপায়গুলো আমরা অবলম্বন করছি, তার প্রত্যেকটা আমাদের উপযুক্ত নয়। অথচ ইংরেজি আধুনিকতার নির্বিচার অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা ডেকে আনছি প্রাকৃতিক পরিবেশের অবনতি, খাদ্যাভাব, অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত স্বাস্থ্যহানি এবং এক অবিন্যস্ত, অসংযত জীবনযাত্রা। নির্বিচার ইংরেজ অনুকরণের অনেক দৃষ্টান্ত রাজনারায়ণ দিয়েছেন। যেমন, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব প্রসঙ্গে এই গল্পটি।

"এক বার উইলসনের হোটেলে দুই বাঙ্গালী বাবু আহার করিতে গিয়াছিলেন। এক বাবুর গোরু ভিন্ন চলে না, তিনি খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'Veal হ্যায় ?' খানসামা উত্তর করিল, 'নহি হ্যায় খোদাওন্দ'। বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা

করিলেন, Beefsteak হ্যায় ?' খানসামা উত্তর করিল, 'ও ভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।' বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'Ox tongue হ্যায় ? খানসামা উত্তর করিল, 'ও ভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।' বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'Calf's foot jelly হ্যায় ?' খানসামা উত্তর করিল, 'ও ভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।' বাবু বলিলেন, 'গোরুকা কুচ্ হ্যায় নহি ?' এই কথা শুনিয়া দ্বিতীয় বাবু, যিনি এত গোমাংসপ্রিয় ছিলেন না। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'ওরে ! বাবুর জন্য গোরুর আর কিছু না থাকে ত খানিকটা গোবোর এনে দে না ?"

যে-বক্তব্যের সূত্র ধরে এই গল্পটি, সেটি হল যে 'এ দেশের লোকের পক্ষে গোমাংস অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য ও অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য।' অথচ যেটি অনেক বেশি উপযুক্ত ও স্বাস্থ্যকর, সেই দুধ আর পাওয়া যায় না। ইংরাজ রাজপুরুষ, মুসলমান আর কয়েকজন গোখাদক বাঙালি 'গোরু খাইয়া উজাড় করিয়া ফেলিলেন, এই জন্য দুগ্ধ মহার্ঘ্য হইয়া উঠিয়াছে।' রাজনারায়ণের দেওয়া অনেকগুলো দৃষ্টান্ত এবং কারণই এখন আমাদের কাছে হাস্যকর মনে হবে। কিন্তু তাঁর মূল প্রচেষ্টাটির মধ্যে হাস্যকর কিছু নেই। সেটি হল, এমন একটি সিদ্ধান্ত প্রমাণ করা যে দেশ-কাল-পরিবেশ-সমাজ নির্বিশেষে কোনো এক রকমের আধুনিকতা হতে পারে না। পরিবেশ অনুযায়ী, সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী ভিন্ন-ভিন্ন দেশে আধুনিকতার রূপও ভিন্ন হতে হবে। এমনকি রাজনারায়ণের কথা-গুলো আর একটু দূর টেনে নিয়ে গিয়ে এমনও বলা যেতে পারে যে বিশেষ অবস্থা অনুসারে আধুনিকতার এই বিশিষ্ট রূপগুলি নির্ধারণ করতে পারা, যুক্তি-তর্ক-বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে আধুনিকতার কোন্ কোন্ প্রকরণগুলি আমাদের উপযুক্ত, তা নির্বাচন অথবা উদ্ভাবন করতে পারা, সেটাই যথার্থ আধুনিকতা। অর্থাৎ আধুনিকতার কোনো সর্বগ্রাহ্য বা সামান্য সংজ্ঞা যদি কিছু থাকে, তা হল এই যে যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এই সামান্য আধুনিকতা আমাদের নিজস্ব এবং বিশেষ আধুনিকতার স্বরূপটিকে চিনে নিতে সক্ষম করে।

দুই

নিজের বিচারক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজস্ব কর্মপন্থা স্থির করা যায় কীভাবে ? আসুন, পাশ্চাত্য আধুনিকতার নিজের জবানিতেই এই প্রশ্নের উত্তরটা শোনা যাক। ১৭৮৪ সালে ইমানুয়েল কান্ট একটি ছোট প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধের বিষয় 'আউফক্লারুং', ইংরেজিতে আমরা যাকে বলি 'এনলাইটেনমেন্ট', অর্থাৎ 'আলোকপ্রাপ্তি'। কান্ট-এর মতে 'আলোকপ্রাপ্তি' মানে মানুষের প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠা, অপরের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্বনির্ভর হওয়া। যে-অবস্থায় মানুষ আলোকপ্রাপ্ত নয়, সে-অবস্থায় তার নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করে সে অপরকে অভিভাবক হিসেবে মেনে নেয়, অপরের নির্দেশে চলে। বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে নিজস্ব জ্ঞান আহরণের কোনো প্রয়োজন সে অনুভব করে না, কারণ ধর্মগ্রন্থে সবই লেখা আছে। নিজে থেকে ন্যায়-অন্যায় বিচার করার

সে চেষ্টাও করে না। ধর্মযাজক যা উপদেশ দেন তাই সে মেনে চলে। এমন কি, সে কী খাবে না-খাবে, তার বিচারও সে চিকিৎসকের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে অধিকাংশ মানুষই এই অর্থে অপ্রাপ্তবয়স্ক। আর সমাজের যারা অভিভাবক, তারাও এটাই চেয়েছে যে বাকি সকলে তাদের তাঁবে থাকুক, স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা না করুক। বর্তমান যুগই প্রথম আলোকপ্রাপ্তির যুগ, যখন স্বনির্ভরতার প্রয়োজন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। আর এতদিনের এই স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়া পরমুখাপেক্ষার অবসানের প্রাথমিক শর্ত যে স্বাধীনতা, বিশেষ করে নাগরিক স্বাধীনতা, তাও এই বর্তমান যুগেই প্রথম স্বীকৃত। তার মানে এই নয় যে বর্তমান জগতে সকলেই আলোকপ্রাপ্ত, এমন নয় যে আমরা এক আলোকপ্রাপ্ত যুগে বাস করছি। বরং বলা উচিত, আমাদের যুগ আলোকপ্রাপ্তির যুগ।

কান্টের এই প্রবন্ধটি নিয়ে সম্প্রতিকালে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো। 'এনলাইটেনমেন্ট'-কে কান্ট যেভাবে বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে নতুনত্ব কোথায়? ফুকো বলেছেন, নতুনত্ব এইখানে যে এই প্রথম একজন দার্শনিক তাঁর দার্শনিক অনুসন্ধানকে নিজের যুগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন এবং এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে সমসাময়িক অবস্থা অনুকূল ছিল বলেই তাঁর সত্যের অনুসন্ধান সম্ভব হল। অর্থাৎ এই প্রথম একজন দার্শনিক বর্তমান যুগের স্বরূপকে দার্শনিক অনুসন্ধানের বিষয় করলেন, সমসাময়িক পরিবেশের ভেতরে থেকেই জ্ঞানচর্চার অনুকূল সামাজিক শর্তগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করলেন।

বর্তমানের স্বরূপ বোঝাতে যে-লক্ষণগুলি কান্ট দেখালেন, সেগুলি কেমন? ফুকো বলছেন, এখানেই নতুন চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য। বর্তমান যুগকে চিহ্নিত করতে গিয়ে কান্ট কোনো যুগান্তকারী বৈপ্লবিক ঘটনার কথা বলছেন না— বলছেন না অমুক ঘটনায় পূর্বতন যুগের অবসান ঘটল। বর্তমান বা আলোকপ্রাপ্তির যুগ শুরু হল। এমনও নয় যে বর্তমান যুগের বিশেষ চিহ্নগুলির মধ্যে কান্ট ভবিষ্যৎ কোনো বৈপ্লবিক ঘটনার পূর্বলক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন। এমনকি অতীত থেকে কোনো এক অনাগত ভবিষ্যৎ যুগের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে বিশেষ একটি পর্ব বা ঐতিহাসিক বিকাশের একটি স্তর হিসেবেও বর্তমানকে দেখছেন না কান্ট। ঐতিহাসিক যুগ হিসেবে বর্তমানকে বর্ণনা করার এই সবগুলি পদ্ধতিই ইয়োরোপীয় চিন্তায় কান্টের বহু আগে গ্রিক যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল, কান্টের পরেও তার প্রচলন কমেনি। কিন্তু ফুকোর মতে কান্টের বর্তমান যুগের লক্ষণ নির্ণয়ের বৈশিষ্ট্য হল যে লক্ষণগুলি একান্তভাবেই নেতিবাচক, নঞর্থক। আলোকপ্রাপ্তি মানে নিষ্ক্রমণ, বেরিয়ে আসা। কান্ট এখানে আলোকপ্রাপ্তির জন্মক্ষণেরও কথা বলছেন না। সূত্রপাতের কথা বলছেন না। আবার ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারার কথাও বলছেন না। কোনো ঐতিহাসিক পরিণামের কথা বলছেন না। বর্তমান যুগের স্বরূপ, তার বিশিষ্ট চরিত্রটি নিয়েই কেবল তিনি চিন্তিত। বর্তমান কোন্ অর্থে পৃথক, কোন্ অর্থে তা অতীতের তুলনায় একান্তভাবে

ভিন্ন, এটাই কান্টের প্রশ্ন। বর্তমানের ভিন্নতার মধ্যেই কান্ট 'এনলাইটেনমেন্ট', অথবা আরো ব্যাপক অর্থে আধুনিকতার সংজ্ঞা খুঁজেছেন।

কথাটায় একটা দাগ দিয়ে আপাতত একপাশে সরিয়ে রাখছি; পরে এই বর্তমানের ভিন্নতার প্রশ্নটিতে আমরা আবার ফিরে আসব। এখন চোখ ফেরানো যাক কান্টের প্রবন্ধের আর-একটি লক্ষণীয় প্রসঙ্গে। স্বনির্ভরতার প্রয়োজন না-হয় স্বীকৃত হল; স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রধান শর্ত যে চিন্তা আর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, তাও না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু চিন্তার স্বাধীনতা মানে তো আর এই নয় যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি কাজে, দৈনন্দিনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান, যে যেমন ইচ্ছে তাই করবে। তাহলে তো আর সমাজে নিয়মকানুন বলে কিছু থাকে না, পরিপূর্ণ নৈরাজ্যকেই কাম্য বলে মেনে নিতে হয়। 'আলোকপ্রাপ্তি'-র দার্শনিকেরা বলা বাহুল্য, মোটেই তা বলতে চাননি। ব্যক্তির স্বনির্ভরতা আর চিন্তার স্বাধীনতা দাবি করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের এই প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হয়েছে, ব্যক্তিজীবন আর সমাজজীবনের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বা অবস্থায় স্বাধীন চিন্তার অবকাশ থাকবে, আর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বা অবস্থায় ব্যক্তিগত মতামত নির্বিশেষে স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ বা নিয়ম মেনে চলতে হবে। 'আলোকপ্রাপ্তি' কাকে বলে?' প্রবন্ধে কান্ট-ও এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

তাঁর উত্তরের মূল পদ্ধতি হল, যুক্তি-ব্যবহারের দু-টি ক্ষেত্র পৃথক করে দেওয়া। একটিকে কান্ট বলছেন 'পাবলিক' যা সর্বসাধারণের আলোচনার বিষয়, যুক্তি যেখানে কোনো ব্যক্তিস্বার্থ বা বিশেষ কোনো সামাজিক অবস্থানকে পুষ্ট করে না। অন্যটি হল যুক্তির 'প্রাইভেট' ব্যবহার, যা ব্যক্তিগত এবং বিশেষ স্বার্থ বা অবস্থানকেই আশ্রয় করে। প্রথম ক্ষেত্রে চিন্তা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অপরিহার্য, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা মোটেই কাম্য নয়। উদাহরণ দিতে গিয়ে কান্ট বলছেন, দেশের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে 'পাবলিক' আলোচনার ক্ষেত্রে সে-বিষয়ে যাঁরা পণ্ডিত এবং অভিজ্ঞ, তাঁদের অবশ্যই, মত-প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। কিন্তু 'প্রাইভেট' ব্যক্তি হিসেবে আমি বলতে পারব না, আমি সরকারের রাজস্বনীতির সঙ্গে একমত নই অতএব আমি কর দেব না। সেনাবাহিনীর সংগঠন বা রণনীতি নিয়ে 'পাবলিক' আলোচনায় একজন সৈনিকও অংশ নিতে পারে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তার কাজ স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা নয়, আদেশ পালন করা। ধর্ম নিয়ে যেখানে 'পাবলিক' আলোচনা চলেছে, সেখানে ধর্মযাজক হয়েও আমি আমার নিজের ধর্মীয় সংগঠনের রীতিনীতি বা শাস্ত্রের সমালোচনা করতে পারি, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে যাজক হিসেবে আমার কাজ সংগঠনের স্বীকৃত মত প্রচার করা, স্বীকৃত রীতি পালন করা। 'প্রাইভেট' ক্ষেত্রে কোনো মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে পারে না।

'পাবলিক' আর 'প্রাইভেট' ধারণাদুটির এ-ধরনের ব্যবহার পরবর্তীকালে বিশেষ প্রচলিত হয়নি। বরং সাধারণভাবে লিবেরাল সমাজদর্শনের চালু মত হল যে 'প্রাইভেট' বা

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই বিশ্বাস, মতামত, আচারব্যবহারের অবাধ স্বাধীনতা থাকা উচিত। বরং 'পাবলিক' বা প্রকাশ্য সামাজিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রেই স্বীকৃত নিয়মকানুন মেনে চলা বাধ্যতামূলক। কিন্তু পাবলিক/প্রাইভেট-এর ব্যবহার যেমনই হোক না কেন, কান্টের বক্তব্যটি বুঝে নেওয়া খুব একটা কঠিন নয়। ব্যক্তি হিসেবে যেখানে আমি কোনো বৃহত্তর সামাজিক সংগঠন বা ব্যবস্থার অংশমাত্র, সমাজযন্ত্রের বিশেষ একটি যন্ত্রাংশ, সেখানে আমার কাজ স্বীকৃত নিয়ম মেনে চলা, স্বীকৃত আধিকারিকের নির্দেশ পালন করা। কিন্তু যুক্তিপ্রয়োগের অন্য একটি ক্ষেত্র আছে যা এই বিশেষ বা ব্যক্তিগত অবস্থানগুলি দিয়ে আবদ্ধ নয়, যা মুক্ত, সার্বজনীন। এটিই হল স্বাধীন চিন্তা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প চর্চা, এক কথায় 'আলোকপ্রাপ্তি'-র প্রকৃত স্থান।

লক্ষ করুন, স্বাধীন যুক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য বা জ্ঞানের অনুসন্ধানের এই যে সাধারণ ক্ষেত্র, কান্ট যাকে বলছেন 'পাবলিক', সেখানে কিন্তু ব্যক্তিই কর্তা। প্রকৃত আলোকপ্রাপ্তির শর্তই হল চিন্তার স্বাধীনতা। জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তি যেখানে তার বিশেষ সামাজিক অবস্থানের ঊর্ধ্বে উঠে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধারণ আলোচনার মঞ্চে অংশ নিচ্ছে, সেখানে তার চিন্তা এবং মত প্রকাশের অধিকার হতে হবে অবাধ। নিজের বিশ্বাস এবং মত নির্ধারণের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব, এবং সেই মতপ্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, হবে তার নিজের। এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কান্ট এখানে বাকস্বাধীনতার অবাধ অধিকার দাবি করছেন তাদের হয়েই যারা যুক্তির ব্যবহার এবং জ্ঞানচর্চার আলোচনায় অংশ নেওয়ার যোগ্য, যারা এই অধিকার দায়িত্বের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারবে। কান্টের প্রবন্ধটি আলোচনা করতে গিয়ে ফুকো অবশ্য এই বিষয়টি তোলেননি। যদিও তুলতেই পারতেন, কারণ ফুকোর নিজের ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্রে তা খুবই প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়। সেটি হল, আধুনিক সমাজে শিক্ষা এবং জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশাধিকার নীতির পাশাপাশি বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব এবং আধিপত্য বিস্তার। আমরা একদিকে যেমন বলি, ধর্মীয় বা অন্য সামাজিক অনুশাসন কিংবা সংস্কারের বশবর্তী হয়ে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানচর্চার অধিকারে বঞ্চিত করা একান্তই অনুচিত, তেমনই আবার অন্যদিকে বলি, অমুক বিষয়ে অমুকের মতটাই গ্রহণীয় কারণ ঐ বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ। অর্থাৎ একদিকে যেমন আলোকপ্রাপ্তি বলতে আমরা স্বাধীন যুক্তি-প্রয়োগের মাধ্যমে অবাধ আলোচনার আদর্শ গড়ে তুলেছি। একই সঙ্গে অন্যদিকে তৈরি করেছি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিন্যস্ত এক অধিকারভেদ। যার দরুণ কে কোন্ বিষয়ে কোন্‌খানে কতটা বলার অধিকারী তা নির্ণয় করার সুপরিচিত চিহ্ন হিসেবে ছড়িয়ে দিয়েছি পরীক্ষা, ডিগ্রি, উপাধি, তকমা। একবার শুধু ভেবে দেখুন, জন্ম থেকে, বস্তুত জন্মের আগে থেকে, মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি মৃত্যুর পরেও, আধুনিক মানুষকে তার প্রতিটি দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্রে কতরকমের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ শুনে চলতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে তো বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া চলা আইনবিরুদ্ধ। আমার যদি ডাক্তারি ডিগ্রি বা লাইসেন্স না থাকে, আমি তো ওষুধের দোকানে গিয়ে

বলতে পারি না, জ্ঞানচর্চায় সকলের অবাধ অধিকার, প্রয়োজনীয় ডাক্তারি বই আমার পড়া আছে, আমায় অমুক ওষুধটা দিন। যেসব দেশে সার্বজনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে, সেখানে বিশেষজ্ঞের দ্বারা স্বীকৃত বিধিবদ্ধ স্কুলে লেখাপড়া করা বাধ্যতামূলক; সেখানে আমি বলতে পারব না, আমার ছেলেমেয়েদের আমি বাড়িতে লেখাপড়া শেখাব। কে কোন্ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তার ভেদাভেদও স্পষ্ট। আজকের এই সভায় আমি ইতিহাস, সমাজদর্শন ইত্যাদি নিয়ে বক্তৃতা করছি। আপনারা আগ্রহের বশে অথবা নিছকই ভদ্রতা করে এসে শুনছেন। আমি যদি আজ আয়োনোস্ফিয়ারে রশ্মিবিচ্ছুরণ কিংবা ডি. এন. এ. মলিকিউল নিয়ে বক্তৃতা করব বলে ঘোষণা করতাম, তাহলে নিশ্চয় আমাকে ফাঁকা ঘরে বক্তৃতা করতে হত এবং আমার বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু দু-একজন হয়ত এতক্ষণে মানসিক রোগের চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করতে ছুটতেন।

বলা বাহুল্য, আধুনিক সমাজব্যবস্থায় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার রীতিনীতির সঙ্গে ক্ষমতা ব্যবহারের প্রকরণগুলির সম্পর্ক নিয়ে আমরা সম্প্রতিকালে মিশেল ফুকোর লেখাপত্র থেকে অনেক কিছুই নতুন করে দেখতে শিখেছি। 'আলোকপ্রাপ্তি কাকে বলে?' এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দু-শো বছর আগে কান্ট যা বলেছিলেন, আপাতদৃষ্টিতে তা আধুনিক সমাজদর্শনের অত্যন্ত মামুলি কথা বলে মনে হলেও, বাকস্বাধীনতা, চিন্তার মুক্তি, সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত যুক্তিনির্ভর আলোচনার ক্ষেত্র, এই সবের পাশাপাশি এখন আমরা তার মধ্যে দেখতে পাব আলোচনায় অংশ নেওয়ার অধিকারভেদ, বিশেষজ্ঞের কর্তৃত্ব, জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে ক্ষমতা ব্যবহারের প্রক্রিয়া। পশ্চিমের আলোকপ্রাপ্তির যুগের দার্শনিকদের লেখায় সার্বিক মুক্তিপ্রদায়ী এক আধুনিকতা নিয়ে যে সরল উচ্ছ্বাস লক্ষ করা যায়, গত দু-শো বছরে পৃথিবীর ইতিহাসের নানা বীভৎসতার সাক্ষী আমাদের কাছে সে উচ্ছ্বাস— মহাজ্ঞানী কান্টের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেই বলছি— আদৌ প্রাপ্তবয়স্ক মনে হয় না। আজ আধুনিকতার মাহাত্ম্য নিয়ে সংশয় বিশেষ চাপা নেই।

তিন

কিন্তু যে প্রশ্নটি উত্থাপন করে আলোচনা শুরু করেছিলাম, তার সদুত্তর কিন্তু এখনো আপনাদের দিতে পারিনি। গত একশো বছরের বেশি সময় ধরে, অর্থাৎ আমাদের আধুনিক যুগের শুরু থেকে আধুনিকতার ধারক-বাহক-প্রবক্তারাই সেকালের তুলনায় একালে অবনতির চিহ্নগুলি নিয়ে এত সরব কেন? রাজনারায়ণ বসু যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিকতা, নীতিবোধ, সব বিষয়েই উন্নতির চেয়ে অবনতি বেশি দেখেছিলেন, সেটা নিশ্চয় কোনো উত্তর-আধুনিক বিহ্বলতার বশবর্তী হয়ে দেখেননি। আমাদের আধুনিক হওয়ার প্রক্রিয়ার ভেতরেই তাহলে এমন একটা কিছু কাজ করছিল যার দরুণ আধুনিকতাকে গ্রহণ করেও তার মূল্য অথবা ফলাফল সম্বন্ধে বরাবর আমাদের সংশয় থেকে গিয়েছে।

আমার বক্তব্য, উপনিবেশের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের আধুনিকতার ইতিহাস যেভাবে

আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে, তাতে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে অবারিত মুক্তচিন্তার নন্দন-কাননের প্রতিশ্রুতি আমরা কখনোই সেভাবে বিশ্বাস করতে পারিনি। প্রায় গোড়া থেকেই আমরা আঁচ করেছিলাম, জ্ঞানচর্চার সঙ্গে ক্ষমতা বিস্তারের যে আধুনিক প্রক্রিয়া, তাতে বিশ্বজনীন আধুনিকতার আমরা কেবল গ্রহীতাই হতে পারব। স্রষ্টা হওয়ার সুযোগ কেউ আমাদের দেবে না। তাই গত দেড়শো বছর ধরে আমরা চেষ্টা করে এসেছি, বিশ্বজনীন আধুনিকতার মায়াজাল সরিয়ে সেই জায়গাটুকু খুঁজে বের করার যেখানে আমাদের আধুনিকতার আমরাই হব কর্তা।

ইতিহাস থেকেই দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এদেশে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার প্রথম বিদ্বৎসভাগুলির একটি ছিল সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অফ জেনেরাল নলেজ। প্রাক্তন ডিরোজিয়ানদের প্রতিষ্ঠা করা এই সমিতির বিষয়ে একটি ঘটনার কথা ইতিহাসের বইতে পাওয়া যায়। ১৮৪৩ সালে হিন্দু কলেজের সভাকক্ষে সমিতির এক অধিবেশনে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা এবং পুলিশ'-এর বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করা হচ্ছিল। হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডি. এল. রিচার্ডসন, যাঁর শেক্সপীয়র পড়ানো নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে, তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে রাগতস্বরে অভিযোগ করেন যে 'আলোকপ্রাপ্তির শহরে, সরকার নির্মিত সভাকক্ষে এই দেশ যাঁরা শাসন করছেন তাঁদের অত্যাচারী এবং লুণ্ঠনকারী বলে মুণ্ডপাত করার অর্থ রাজদ্রোহিতা। ...সরকার যদি ভারতবাসীর মানসিক উন্নতির বিষয়ে সচেষ্ট না হতেন এই কলেজেরও প্রতিষ্ঠা হত না। এই কলেজকে তিনি রাজদ্রোহিতার আখড়ায় পরিণত হতে দিতে পারেন না। ভবিষ্যতে এই ধরনের সভা কলেজে অনুষ্ঠিত হতে পারবে না।' সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, হিন্দু কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র। তিনি রিচার্ডসনকে তিরস্কার করে বললেন, 'আপনার ব্যবহারে আপনি সভার অপমান করছেন। আপনি যদি আপনার মন্তব্য প্রত্যাহার না করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, আমরা এই ঘটনাটিকে হিন্দু কলেজের কমিটি, এমনকি প্রয়োজন হলে সরকারেরও নজরে আনতে বাধ্য হব। আমরা কলেজের কমিটির কাছে নিয়মমতো আবেদন করে অনুমতি নিয়ে এই পাবলিক সভাকক্ষে সভা করেছি, আপনার ব্যক্তিগত দয়ায় সভা করছি না। আপনি এই সভায় অতিথিমাত্র। সমিতির সভ্যকে তাঁর মতামত ব্যক্ত করার সময় আপনি কোনোমতেই বাধা দিতে পারেন না।'

ইতিহাসের বইতে এই ঘটনাটিকে সাধারণত শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের উন্মেষের চিহ্ন হিসেবে দেখানো হয়। কথাটা যে ভুল, তা নয়। কিন্তু নেটিভ ছাত্র তার সাহেব মাস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করছে, এই সহজ নাটকীয়তার চাইতেও এখানে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হল যে পাবলিক আলোচনার ক্ষেত্রে অবাধ বাকস্বাধীনতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তারাচাঁদ চক্রবর্তী বলছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসরণ করা হচ্ছে, ততক্ষণ কোনো বিদ্বৎসমাজের সভ্যের মতামত প্রকাশের অধিকার, সে মত যতই সরকার-বিরোধী হোক না কেন, তা খর্ব করা

যায় না। বলা যেতে পারে, আলোকপ্রাপ্তির শর্তগুলোকে আপন করে নেওয়ার এ হল আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা। আধুনিকতার সেই প্রথম লগ্নে আমরা সত্যিই বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে জাতি-বর্ণের কোনো ভেদ নেই, আলোচ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যুৎপত্তির প্রমাণ দিতে পারলে সেখানে মত-প্রকাশের অবাধ অধিকার।

মোহভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগেনি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসেই দেখা গেল, বিভিন্ন বিষয়ে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান খোলা হতে শুরু করেছে। প্রথম যুগের বিদ্বৎসভাগুলি— এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে আরম্ভ করে সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অফ জেনেরাল নলেজ, বেটন সোসাইটি কিংবা বেঙ্গল সোসাইটি কিংবা বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন— তাদের সভ্যেরা ছিল ইয়োরোপীয় এবং ভারতীয় মেশানো। এবার গড়ে উঠতে লাগল একান্তভাবে ভারতীয় বিদ্যোৎসাহীদের প্রতিষ্ঠান, যার উদ্দেশ্য ভারতীয়দের জন্য, সম্ভব হলে ভারতীয় ভাষায়, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার প্রসার। উনিশ শতকে স্থাপিত এ-ধরনের জাতীয় বিদ্বৎসভার অনেকগুলিই সুপরিচিত— যেমন তত্ত্ববোধিনী সভা কিংবা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স কিংবা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। এগুলির উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক জ্ঞানচর্চার জাতীয়করণ; আধুনিক ভাবনাচিন্তার বিশ্বজনীন ক্ষেত্র থেকে কিছুটা সরে এসে এমন একটা জায়গা তৈরি করা যেখানে বিদ্যাচর্চা হবে আধুনিক, অথচ জাতীয়।

এ-প্রচেষ্টা এখনো চলেছে। তার সাফল্য এক-এক বিষয়ে এক-এক রকম। কিন্তু প্রচেষ্টাটি আদৌ সম্ভব বলে মনে হয়েছিল কেন এবং তার সাফল্যের সম্ভাবনাগুলো কোন্ কোন্ শর্তের ওপর নির্ভরশীল, তা বলতে না পারলে আমাদের আধুনিকতা নিয়ে যে-প্রশ্নটা আমি গোড়াতে তুলেছিলাম, তার উত্তর দেওয়া যাবে না। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে চর্চায় আমাদের গত দেড়শো বছরের যা অভিজ্ঞতা, তার যে-কোনো একটিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নিয়ে এ-আলোচনা করা যেতে পারে। যেহেতু শরীর-স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ ধরেই কথাটা তুলেছিলাম, তাই আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের গল্পটাই একবার শোনা যাক।

১৮৫১ সালে কলকাতার মেডিকাল কলেজে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা পড়াবার জন্য একটি বাঙলা বিভাগ খোলা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজি শিখে আসেনি, এমন ছাত্রদের ডাক্তারি পড়ার সুযোগ করে দেওয়া। মনে রাখা দরকার, তখনও উচ্চবর্ণ-সমাজে শবব্যবচ্ছেদ, মলমূত্র পরীক্ষা ইত্যাদি নিয়ে সংস্কার যথেষ্ট দৃঢ়, তাই পেশা হিসেবে ডাক্তারি তখনো পর্যন্ত ইংরেজি-শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে খুব একটা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। মেডিকাল কলেজের বাঙলা বিভাগের লাইসেন্সিয়েট এবং অ্যাপথিকারি পাঠক্রম কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ১৮৫১-র প্রথম বছরে এই বিভাগে মাত্র বাইশ জন ছাত্র ছিল। ১৮৬৪ সালে এর ছাত্রসংখ্যা ইংরেজি বিভাগকে ছাড়িয়ে

যায়। ১৮৭৩ সালে বাঙলা বিভাগে ৭৭২ জন ছাত্র ছিল, ইংরেজি বিভাগে ৪৪৫। কেবল ছাত্রদের প্রয়োজনেই ১৮৬৭ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে বাঙলা ভাষায় প্রায় সাতশো চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই প্রকাশিত হয়।

পাঠক্রমের জনপ্রিয়তা নিয়ে সন্দেহ ছিল না। ধরেই নেওয়া যেতে পারে সমাজের প্রয়োজনে এবং জীবিকার উপকরণ হিসেবে বাঙলা লাইসেন্সিয়েট ডিগ্রির চাহিদা ছিল। কিন্তু ১৮৭০ থেকেই ভারতীয় ভাষায় ডাক্তারি ছাত্রদের যোগ্যতা নিয়ে অভিযোগ উঠতে লাগল। ইংরেজি জানে না বলে তারা নাকি সরকারি হাসপাতালে ইয়োরোপীয় ডাক্তারদের সহকারী হিসেবে ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না। তারা প্রেসক্রিপশন পড়তে পারে না। প্রয়োজনীয় রিপোর্ট লিখতে পারে না। মনে রাখতে হবে, এই সময় থেকেই বাঙলার বিভিন্ন জেলায় সরকারি হাসপাতাল তৈরি হতে শুরু করেছে। লন্ডনের জেনেরাল মেডিকাল কাউন্সিল থেকে চিকিৎসকদের যোগ্যতা এবং পেশাদারি আচার-আচরণের ওপরেও নজর রাখা শুরু হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এসে হাসপাতাল ব্যবস্থা, মেডিকাল কাউন্সিল এবং পেটেন্ট-করা ওষুধপত্রের ব্যবহার যখন প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে গেল, মেডিকাল স্কুলের বাংলা বিভাগেরও নাভিশ্বাস উঠল। ১৯১৬ থেকে আমাদের দেশে কেবলমাত্র ইংরেজিতেই ডাক্তারি পড়া যায়।

গল্পের কিন্তু এখানে শেষ নয়। যে-সময় ভারতীয় ভাষায় পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ানোর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, ঠিক সেই সময় আবার আয়ুর্বেদ আর ইয়ুনানী চিকিৎসাকে আধুনিক বিদ্যাচর্চার আকারে ঢেলে সাজাবারও চেষ্টা চলেছে। নিখিল ভারত আয়ুর্বেদ মহাসম্মেলন, যা এখনো আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান, তৈরি হয় ১৯০৭ সালে। আয়ুর্বেদ আর ইয়ুনানী নিয়ে আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল নানা রকমের প্রচলিত চিকিৎসাপ্রণালীগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সুসংহত চেহারা দেওয়া, প্রাচীন এবং সাম্প্রতিক পুঁথির সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করা, প্রথাগত পারিবারিক বা গুরু-শিষ্য পরম্পরার বদলে আধুনিক স্কুল-কলেজ পদ্ধতিতে সিলেবাস, পাঠ্যপুস্তক, পরীক্ষা এবং ডিগ্রির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া। এবং আধুনিক শিল্পপদ্ধতিতে আয়ুর্বেদ এবং ইয়ুনানী ওষুধের বাণিজ্যিক উৎপাদনকে উৎসাহ দেওয়া। আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় পাশ্চাত্য প্রণালীর সাহায্য নেওয়া উচিত কিনা, তাই নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজন এবং সুবিধা অনুযায়ী সে-সাহায্য নেওয়া উচিত, এটাই মোটামুটিভাবে এখনকার স্বীকৃত মত।

অর্থাৎ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার বিশ্বজনীন একটা ক্ষেত্র আছে, তা এখানে স্বীকার করা হচ্ছে। কিন্তু দেশজ আয়ুর্বেদচর্চার একটা স্বতন্ত্র ধারা, স্বতন্ত্র প্রণালী আছে, তাও বলা হচ্ছে। সেই স্বতন্ত্র প্রণালীর আবার আধুনিকীকরণ করে পশ্চিমী বিজ্ঞানচর্চার রীতিনীতি অনুযায়ী ঢেলে সাজানোও হচ্ছে। এখানে কথাটা কিন্তু এই নয় যে আয়ুর্বেদ বা ইয়ুনানী চিকিৎসাপ্রণালীর মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা আধুনিক যুক্তিনির্ভর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কাছে গ্রহণযোগ্য। তা যদি হত তাহলে তো সেইসব প্রণালী পাশ্চাত্য

চিকিৎসাবিজ্ঞানের মধ্যে প্রয়োজনমতো অন্তর্ভুক্ত করে নিলেই চলত। কথাটা এমনও নয় যে কিছু কিছু অসুখ আছে যা ভারতবর্ষেই বেশি হয়, সেইসব অসুখের পক্ষে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাই উপযুক্ত। আধুনিক আয়ুর্বেদ চিকিৎসার লক্ষ্য এবং বিষয় কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার তুলনায় আলাদা কিছু নয়। কিন্তু দাবি হল যে তা একটি স্বতন্ত্র এবং বিকল্প চিকিৎসাবিজ্ঞান।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এরকম স্বতন্ত্র এবং বিকল্প আধুনিকতার অনেক প্রচেষ্টা আমরা দেখেছি। বলা যেতে পারে, জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক প্রকল্পটাই তাই— একটি বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র, জাতীয় আধুনিকতার জন্ম দেওয়া। কোন্ কোন্ উপাদানে আধুনিকতা থাকবে আর স্বাতন্ত্র্যের চিহ্নই বা কী হবে, বলা বাহুল্য, তার কোনো সাধারণ নিয়ম নেই। বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, এখনো হয়ে চলেছে। আমার বক্তব্য ছিল, এ-প্রচেষ্টা শুধু তথাকথিত সংস্কৃতিনির্ভর শিল্প-সাহিত্য-ধর্ম ইত্যাদি বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানচর্চার মতো আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বজনীন কাজেও এই স্বতন্ত্র আধুনিকতা খোঁজা হয়েছে। মনে রাখা দরকার, প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো বিজ্ঞানীও 'এ হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি' লেখা প্রয়োজন মনে করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর জীবনের শেষ দিকে যে-গবেষণায় হাত দিয়েছিলেন, তার উৎস ভারতীয় দর্শন এবং জীবনধারায় নিহিত রয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। বিশেষ করে ভারতীয় বিজ্ঞানীই এমন গবেষণা করতে পারেন, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। জগদীশচন্দ্রের সে-গবেষণা পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীমহলে বিশেষ স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু এমন প্রচেষ্টার কথা তাঁর আদৌ মনে হয়েছিল কেন, এই প্রশ্নটা করলে আমাদের আধুনিকতার মূল চালিকাশক্তির হদিশ পাওয়া যেতে পারে বলে আমার ধারণা।

চার

আলোকপ্রাপ্তির কথা মনে হলেই আমার মনে পড়ে যায় কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসের সেই অবিস্মরণীয় প্রথম ক-টি লাইন। 'আলো ক্রমে আসিতেছে। এ নভমণ্ডল মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিম নীলাভ। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনর্ব্বার আমরা, প্রাকৃতজনেরা, পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব। ক্রমে আলো আসিতেছে।'

আধুনিকতাই প্রথম সমাজদর্শন যা নিতান্ত সাধারণ মানুষের চেতনাতেও স্বাতন্ত্র্য আর কর্তৃত্বের স্বপ্নজাল সৃষ্টি করে। আধুনিক সমাজে ক্ষমতাপ্রয়োগের প্রক্রিয়াই এমন যে তা কোনো সার্বভৌম প্রভুর আজ্ঞা না হয়ে প্রতিটি ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব যুক্তিপ্রসূত অনুশাসন হিসেবেই কাজ করতে চায়। কিন্তু যুক্তির বুনুনি যতই ক্ষমতার বাস্তবতাকে আড়াল করার চেষ্টা করুক, স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের ইচ্ছা প্রতিনিয়তই ক্ষমতার বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড় করায়, তাকে প্রতিরোধ করে। মনে করে দেখুন, একসময় আধুনিকতাই ছিল ভারতবর্ষের পরাধীনতার সমর্থনে সবচেয়ে বড় যুক্তি ; ভারতবাসী আলোকপ্রাপ্ত হবে, তাই

নাকি বিদেশী শাসন প্রয়োজন। আবার ঐ আধুনিকতার যুক্তিতেই একদিন আমরা শিখলাম, সাম্রাজ্যবাদের শাসন অন্যায়। স্বাধীনতাই কাম্য। যুক্তির বোঝা, মুক্তির স্বপ্ন; ক্ষমতার স্পৃহা, ক্ষমতার প্রতিরোধ; এ-সবই আধুনিকতার অঙ্গ। ক্ষমতার তন্ত্রজালের বাইরে আধুনিকতার কোনো স্বর্গরাজ্য নেই। তাই এই অর্থে আধুনিকতার পক্ষে বা বিপক্ষে যাওয়া যায় না। কেবল আধুনিকতাকে ব্যবহার করার নানা ধরনের কৌশল উদ্ভাবন করা যায়। সে-কৌশল কখনো হিতকর, কখনো বিধ্বংসী, কখনো সহিষ্ণু, কখনো বা হিংস্র। আধুনিক এবং যুক্তিসিদ্ধ বলেই যে তা মঙ্গলময়, এমন সরল বিশ্বাস, আগেই বলেছি, আমরা বহুদিন হল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি।

কমলকুমারের উপন্যাসে দেখেছি, নিয়তির অনিবার্য নিয়মে কোটাল বান এসে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায় জড়বৎ হিন্দু সমাজ। সঙ্গে দোসর নিয়ে যায় যা সজীব, সুন্দর, স্নেহশীলা, দয়াময়ী। প্রাকৃতজন চণ্ডাল তাকে বাঁচাতে পারে না; যা শুচি, পবিত্র, তাকে স্পর্শ করার অধিকারে সে বঞ্চিত। 'একটি মাত্র চোখ, হেমলকে প্রতিবিম্বিত চক্ষুসদৃশ, তাঁহার দিকেই, মিলন অভিলাষিণী নববধূর দিকে চাহিয়াছিল, যে চক্ষু কাঠের, কারণ নৌকাগাত্রে অঙ্কিত, তাহা সিন্দুর অঙ্কিত এবং ক্রমাগত জলোচ্ছ্বাসে তাহা সিক্ত, অশ্রুপাতক্ষম, ফলে কোথাও এখনও মায়া রহিয়া গেল।'

আমাদের আধুনিকতার চালিকাশক্তি এই মায়া। একে পশ্চাৎমুখী পরিবর্তনবিমুখ বলে ভাবলে নিজেদের প্রতি অবিচার করা হবে। বরং বর্তমান যে পরিবর্তনের অপেক্ষা রাখে, তাকে পরিবর্তন করা যে আমাদের কর্তব্য, এই ইচ্ছার জন্ম দেয় হৃত অতীতের প্রতি মায়া। মনে রাখতে হবে, বিশ্বজনীন আধুনিকতার প্রাঙ্গণে আমরা ব্রাত্য, চণ্ডাল। আমাদের কাছে সে-আধুনিকতার মানে বিদেশী জিনিসের ফ্যান্সি মার্কেট। থরে থরে সাজানো রয়েছে পয়সা ফেল, কিনে নিয়ে যাও। আধুনিকতার উৎপাদক হিসাবে সেখানে কেউ আমাদের পোঁছে না। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে ভাবলে যা নিদারুণ ভাবে সত্য, তা হল আমাদের অধীনতা, আমাদের নিষ্ক্রিয়তা। কিন্তু আমরা আধুনিক হতে চাই বলেই আমাদের স্বাতন্ত্র্য জাহির করার ইচ্ছা, সৃজনশীল হওয়ার ইচ্ছা প্রক্ষিপ্ত হয়ে যায় অতীতে। এ-অতীতকে কাল্পনিক বলাটা বাহুল্য, কারণ অতীত সবসময়ই কাল্পনিক। একালের অসন্তোষ, অপূর্ণতা, অপ্রাপ্তির উল্টো প্রান্তে আমরা নির্মাণ করে নিই এমন এক সেকাল যা সুন্দর, কল্যাণময়, সুস্থ সামাজিকতার আবাসভূমি, এবং যা ছিল আমাদেরই সৃষ্টি, যেখানে আমরাই ছিলাম কর্তা। আমাদের এই সেকাল আদৌ কোনো ঐতিহাসিক অতীত নয়, বর্তমানের ভিন্নতা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই কেবল এর নির্মাণ। শুধু লক্ষণীয়, পাশ্চাত্য আধুনিকতার আদিকল্পে কান্ট যেখানে অতীতের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা বলেছেন, সে জায়গায় আমাদের কাছে বর্তমানের লক্ষণ-গুলোই হয়ে গেছে নেতিবাচক, নঞর্থক। এই আধুনিকতার গতিপ্রকৃতি, তার চালিকাশক্তি, পশ্চিমের আধুনিকতার ইতিহাসের তুলনায় একান্তভাবে ভিন্ন।

এ হল আমাদের, একদা-পরাধীনের আধুনিকতা। যে প্রক্রিয়ায় আমরা আধুনিক হয়েছি,

সেই একই প্রক্রিয়ায় আমরা আধুনিকতার শিকারও হয়েছি। আধুনিকতার প্রতি আমাদের মনোভাব তাই গভীরভাবে দ্ব্যর্থব্যঞ্জক না হয়ে পারে না। রাজনারায়ণ বসুর সময় থেকে গত দেড়শো বছরের অভিজ্ঞতা আমরা যেভাবে বর্ণনা করে এসেছি, এবং আজও করি, তাতে এ-কথা বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই দ্বিধাগ্রস্ত ভাব আধুনিকতার পক্ষে বা বিপক্ষে থাকা নিয়ে দ্বন্দ্ব থেকে আসছে না। দ্বিধা এইজন্য যে নিজেদের বিশিষ্ট আধুনিকতার রূপগুলি উদ্ভাবন করতে গেলে অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত আধুনিকতাকে সময় সময় বর্জন করার সাহস দেখাতে হয়। জাতীয়তাবাদের যুগে এ-ধরনের বহু প্রচেষ্টা হয়েছিল। সে-প্রচেষ্টার পেছনে সাহস ছিল, উদ্ভাবনী শক্তি ছিল, সাফল্য সবক্ষেত্রে সমান ছিল না। আজ গ্লোবালাইজশনের যুগে হয়ত নতুন করে সাহস দেখাবার সময় এসেছে। তাই 'আমাদের আধুনিকতা'-র সেকাল আর একাল নিয়েও বোধহয় এবার আমাদের ভাবনা শুরু করা উচিত। □

উৎপলকুমার বসুর পঁচিশটি সাম্প্রতিক কবিতা

[গত দু-এক বছরে লিখিত কিছু কবিতা এখানে আছে। প্রায় সবগুলিই অপ্রকাশিত। স্বতন্ত্র নামকরণের বদলে সংখ্যানুক্রমে লেখাগুলি সাজানো হল। —উৎপলকুমার বসু]

কবিতা, আমরা জানি, কোনও স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তু নয়।
কবিতা পাঠক এবং কবির মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া-
সৃষ্টিকারী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকেন্দ্রিক চরিত্রের জন্য
কবিতায় ব্যাকরণ, শৈলী এবং নশ্বরতা তৈরী
হয়েছে। অপরদিকে প্রতিক্রিয়ার জন্মদাত্রী
বলে কবিতায় প্রাণ আরোপিত হয়।
কবিতায় আমরা প্রায়শ শ্বসিত বস্তু
বা 'অরগানিক' অস্তিত্বের চিহ্ন দেখে থাকি।
এই দুই কেন্দ্র— অর্থাৎ বস্তু ও প্রাণ,
ব্যাকরণ ও বিদ্রোহ, শৈলী ও প্রথামুক্তিকে জুড়ে
রয়েছে এক সেতু যার নাম নশ্বরতা।
কবিতার মৃত্যু হয়। লুপ্ত হয় তার ভাষা, সংকেত,
উপদেশ ও কলাকৈবল্য···

—উৎপলকুমার বসু

১.

লিখিত অনুমতি এসেছিল
তরঙ্গসকাশে
চাঁদ তার টুকরোগুলি জলে নিয়ে ভাসে

দুই পাড় সামান্য রশির
বাঁধনে সংযত
স্থ প্রাণীদের মতো

যা-কিছু চেয়েছি আমি
ঋণপত্রে, প্রত্যয়িত চিঠির নকলে—
তারা চলেছে সকলে

জলে ভেসে— এক সার
অক্ষরের ক্রমে,

চাঁদহাঁস সবার প্রথমে

২.

কী চৈতন্যসুধা
আমি করেছিলাম পান
করেছিলাম ক্ষুধা
নিবৃত্তি ও গান
গেয়েছিলাম সুরহীনা
হীনমন্যতার—
সে এক পাহাড় !

বাঘের আঘ্রান
সব্জী ও ভাতে,
জ্বালানী আঘাতে
শিখা লেলিহান,
ছায়ার মতন দীনা
দৃশ্য ও দৃশ্যমান যার
এ মৌন আহার।

রেখো মা দাসীরে
মনে, শিরোমন,
কপোল প্লাবিত নীরে, এই ধন,
এ-ঐশ্বর্য, এ-সংসারতীরে
বহু ক্ষুধা-সমারোহ, বহু তাপ,
আগুনউল্কির ছাপ— যার
ক্রীড়া শুশ্বতার।

তাই গাই গান,
স্ফুট শব্দে—পাঠ-নিরন্তরে,
যদি বা কঠোরে
কোমলতা পায় স্থান,
তারার আলোর মত
এত দুর্গলিত ক্ষত— ভুলো না আমার
দেহ দেবতার।

৩.

উড়ন্ত ষাঁড়, গর্জাসিংহমুখ.
শিশুকঙ্কাল, সাগরে অনল,
ফলবান মাছ, কাপড়সারস,
পিয়াসী শস্য, মরুনৌযান.
জন্মবিজন তৃষামন্দির
ঐ দেখা যায়, এসো হাত পাতি,
কৃতকরপুট, বলো জল দাও,

—এইসব নিয়ে হাসির ফোয়ারা

৪.

একদিন আমরা এইখানে মৃতদেহ সমাধি দিলাম আর এই রাষ্ট্রে ফিরে এল
বসন্তকাল
বিস্ফারচোখ মেয়েরা আর ধাতবকণ্ঠ পুরুষেরা গান গাইল—
ওরা অভিশপ্ত বলেই ওদের গান গাইতে হয়,
ওদের গান শুনতে চায় আঁশ ও ঝিনুকের পাহাড়, প্রবালহাড় ও
জলে-ভেসে আসা নাবিকহীন, পরিত্যক্ত নৌকা—
কোথায় সে-সব লোকেদের মুখ
যারা ছিল অবিনশ্বর, একক এবং তুলনারহিত
আমরা যাঁকে নিবারণবাবু বলে ডাকছি উনি সে-ব্যক্তি নন,
শর্মিলাদি আমাদের দেখেও হাত নাড়ছেন না কারণ উনি
শর্মিলাদি নন,
হেয় বাতাসে ঝরে-পড়া পাতার সঙ্গে দলে দলে উড়ছে
সঙ্কেতবাহী পতঙ্গ,
তারা অক্ষর সৃষ্টি করে— উড়তে উড়তে তৈরী করে বাক্যবন্ধ
যা আমরা পাঠ করি,
পাঠান্তর হয়
উড়ন্ত অনেক সংজ্ঞা তৈরী হয় যারা পরস্পরকে নাকচ করে,
আমরা তাই নিয়ে তর্ক করি
সম্ভবত এতদিনে বুঝতে পেরেছি ওরা কারা
যারা আমাদের আগে আগে এগিয়ে চলেছে—
বনবাসী অভিনেতা···যক্ষীপাথর···পিতলের মানুষ···

৫.

এইখানে আমি—
অর্ধোন্মাদ, বজ্রকলঙ্কিত,

উলঙ্গের মুখোমুখি
আরেক বিবস্ত্রা : বলি,

ভালোবাসা, সেকি ভুল ?
লিখে রাখি দেহতাপ, প্রসারমালিনী
এই ফুলবনে শুয়েছিল,
লিখে রাখি ঘাস
আধিক্য পেয়েছে,
লিখে রাখি কীট
মিথ্যা বলে থাকে, আর

নশ্বরতা বজ্ররূপবান

৬.

শ্বাসকষ্ট উঠলেই বুঝতে পারি ফুলডুঙরি পাহাড় আর বেশি দূরে নয়
নইলে এমন হাঁপাচ্ছি কেন ? কেন অষুধে সারে না ?
ঐ পাহাড়ের মাথায় উঠলে এ-বছর কী দেখব কে জানে—
যে-পাথরে আমরা সবাই নাম লিখেছিলাম সে-টি হয়ত
নিচে গড়িয়ে পড়ে গেছে,
যে-জলস্রোত লাফিয়ে পার হয়েছিলাম তাকে ঘুরিয়ে
চাষজমির দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল—
যদি তাই হয়ে থাকে তবে আর তাকে আমি খুঁজে পাবো না,
এইসব ভাবি আর হাসপাতালের বিছানা শুকনো ডালপালায়,
ছেঁড়া কাগজে আর পরিত্যক্ত সাপের খোলসে ভরে ওঠে—
এত জঞ্জাল সরাবে কে ? আমি কি সময় করে উঠতে পারবো ?
আমি তো ফুলডুঙরি পাহাড়ে প্রায় পৌঁছে গেছি।
চেপারামের ঘরটা
এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। আরেকটু পা চালিয়ে
উঠে গেলেই হয়

৭.

জেগে উঠেছে বাতাস তার পূর্বাপর নিয়ে
যেন আমার ছেলেবেলার কুসুমপুরে বিয়ে

ন-মাসিমার। হে শুকতারা, হে হিমতারাসকল,
ছড়ায় থাকো, ছন্দে থাকো, রৌদ্রবাহী জল

সাঁকোর নিচে জীবিত থাকো, ট্যাঙরা মাছও প্রাণী,
বস্তু শুধু শ্বাশুরীমাতা, তাঁর পানের বাটাখানি

বস্তুবাচক। বয়েস হল অনেক, হল বয়েস,
মানুষ বুড়ো, বৃক্ষ বুড়ো, বুড়ো আমার দেশ,

সোলার মধ্যে আগুন, আর আগুনপোড়া খড়,
হেসে বলি ওরে জামাই আমরা যে তোর ঘর

ন-মাসিটি নামেই মাসি, বোনের মত পাজি,
স্বর্গে যাবে, নরকে যাবে, হায়— কুসুমপুরেও রাজি

জন্মমতো চলে যেতে, যাবেন শ্মশানঘাট দিয়ে
সেথা জেগে উঠেছে বাতাস তার পূর্বাপর নিয়ে

৮.

কেলা, কেলাসিত, কেলামঞ্জরী, জলকেলী, আমি একেলা, কারবাইট কেলা, মিলিয়ে ফেলা, কেলাবেচা, রথদেখা—

আজ ত্রিশ বছর জাতির সেবায় নিয়োজিতম্, ত্রিঙ্কোমালী বেকারীভ্যান, সনেট মাইক, রুটিওয়ালা ওয়া-ওয়াসিম, দর্গা রোড, বাবাবনেট, টায়ারতন্ত্র, গোপন গ্যারেজ, ঝুঁটিওয়ালা পাখপাখালি, রথবাজার, কাচের কাপ, কাপের প্লেট, গয়গবাক্ষ খাঁচার মধ্যে, ট্যাপের জলে কপোতাক্ষ, দাঁড়ে-বসানো কপোত আর চঞ্চুহীন বুড়ো সারস—

হায় স্ফটিক, বহুমাত্রিক, রৌদ্রকেলাস, রাসায়নিক স্বজনদ্রবন, নেতাজি সুভাষ, মাটির মানুষ, সুতোর জুতো, খড়ের চালে সূর্যকিরণ, বাঁদর খেলায় সহ্যভালুক—

তেমন করে আসতে বলেছিলে ?

যা-কিছু বলো বিকেলবেলায় স্বীকার যাই, মেঘের আলো, জলের যাঁতা, বৃষ্টিভেজা, রৌদ্রভেজা স্বচ্ছ থালে শুকোতে দেওয়া রক্তটুকু, জানলা-সিলে, আজও সরল, আলোতরল, না শুকোলে কে জানবে কোন্ বীজাণু, কোন্ চুম্বন, কোন্ কবিতা

৯.

উজ্জ্বল বালিশ আর মেঘে-ঢাকা লেপ
আঁধার গালিচা, ভৃঙ্গ গুগ্গুল রুপালি
আগুনে পুড়ছে, কোটা থেকে এসেছে পাথর,
ভূপালের লাল ইঁট, নিচু জমিতে ত্রিকোণ
গৃহ আজও অসমাপ্ত, গাছ নিম ও ডালিম,
ডুমুরপাতার ছায়া চমৎকার, বাড়ি কবে শেষ হবে ?

কান্নাহীন হাসিকান্না— এ নাকি উত্তর

১০.

সান্ধ্য উমাকীর্তিবাবুর চরণাশ্রিত সঙ্গীত
গাই, নৃপেননায়েব, নারায়ণ
নাথ, মধ্যপদ নামের যাহার, উমাচরণবাবুর বেয়াই
কীর্তি রায়, হালতুবাসী, বর্তমানে শ্রীকাশীধামে,
আখড়াধারী, বলেন 'এ-সব গান-ফানে আর ক'দিন যাবে ?
মূলাধারে যে-পদ্মটি আছে তাহার ব্যবস্থাদি
কেমন বুঝছো ?' 'আজ্ঞে, আপনি ঠিক যেমনটি-সে
রেখে গেছেন তেম্নি আছে, অসূর্যম্পশ্য,
নাকি ঐ-জাতীয় বিভেদকথা,'
বাবু, মানে কীর্তিবাবু, প্রীত হলেন, এ তো দোয়ারকিদের
ফাজলেমি নয়, হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে রাগ-য়ে বসলেন,
বাঁয়া-তবলায় এই শ্রীযুত, নৃপেন্দ্রনাথ, সারেঙ্গীতে
বেণ্টুপুরী অঘোরচন্দ্র বাবাজীবন, দীর্ঘজীবন,
হেতুবাদী, যন্ত্রে দড়, বাঈজীদের ভেড়ুয়া ছিলেন,
বছর দশেক আগের কথা, এখন ওনার স্বাধীনবৃত্তি,
মেটেবুরুজে জাহাজ নামান, নিজের বাড়ি,
উমাবাবুর গাড়ি ওঁকে পৌঁছে দেবে, আমি কিন্তু
হেঁটে ফিরব, কাছেই নিবাস, আকাশে ঐ অত তারার
ভিতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরব,
কারণ আমার কীর্তিবাবু জীবিত আছেন, উমাবাবুর অর্শকষ্ট,
তবে ও কিছু নয়

১১.

জিভ বের করে আমি দু-একটি বৃষ্টির ফোঁটা ধরে ফেলি।

সিকি ভাগ চামচে আমার পাচকপ্রতিম প্রাণ
ঐ ভাবে ঝোল টানে, বৃষ্টির সুরুয়া চাখে, বলে
আরেকটু হিঙ দিও, তারপর দমে রাখো, ততক্ষণে
কুসুমপুরের বনস্থলী অন্ধকার হয়ে যাক, কাঠকয়লার আঁচ
নিভে গিয়ে ছড়াক বিদ্যুত।

দূর মাঠে গ্রীষ্মসন্ধ্যা সরে গেলে, ভাবি
সেইসব সাপেরা কোথায় যারা শুধু জিভেই ছোবল কাটে

১২.

হ্যাল্লো, জে. ডি. ঘোষ, মাই ফ্রেন্ড, হাউ আর ইউ,
বাড়ির সব খবর, ছেলেপিলেরা, বৌমা,
এ-শর্মার কথা নাহয় উহ্য থাক, সল্ট লেকের
ও-সব ঠেকে যাচ্ছ-টাচ্ছ, হ্যাঁ, যা খরচ,
শালা গভরমেন্টের ইয়ে মারি, সিগ্রেটে ট্যাক্স,
লীকারে ট্যাক্স, সার-য়ে সাবসিডি, হাঃ, হাঃ,
গোবরে আবার ভর্তুকি কী হে, তা তুমি জে. ডি.
চেহারাখানা জবর রাখলে, এই বয়েসে, হবে না কেন,
কত বড় বাড়ির ছেলে, তোমার মেজদাবাবু
জার্মানিতেই রয়ে গেলেন, ছোট বোনটি কোন্ প্রদেশে,
টাটা-ভিলাই, নাতি হয়েছে, ভাবা যায় না,
সেই শ্যামলী, আমাদের সেই ছোট্ট শ্যামা, তবে তোমায়
খুলেই বলি, সেই বয়েসে, মানে সেই যেবার
নাসিক গেছি, শ্যামার সঙ্গে একটু ইয়ে,
না, না, প্রেম-ট্রেম নয়, সুন্দর চিঠি,
মনের কথা নীল কাগজে, দু-এক ফোঁটা কোলন-ছোঁয়া,
শেষ চিঠিটার জবাব দেয় নি, ভারী দেমাক,
আমিও কিছু কম যাই না, শ্যামার মতো সাত-দশটা
মেয়ে তখন পিছু নিয়েছে, পিতৃদেবের আলিপুরের
বাগানবাড়ি হাতে পেলুম, এয়ারলাইনস-য়ে নতুন চাকরি,
শ্যামার সঙ্গে দেখা হলে তবু আমার শেষ চিঠিটার
কথা তুলো, অবশ্যই সময় বুঝে,
ওটা কি হারিয়ে গেছে, নাকি পেঁছোছিল, জবাব দেয় নি,
গ্রীষ্মের এই নীল আকাশটুকু দেখলে কেবল মনে পড়ে,
ঐ-মতো নীল, হাল্কা কাগজ, বাঁয়ের দিকে বুটিকাটা

১৩.

এ-প্রাচীর বীজগণিতের, এ-কামান দুই সদৃশের
সমাহার, নিচে ব্যাসফসলের বৃত্ত, অশ্বী নদী,
আকাশে এখন যত মেঘ ভেসে যায়
তারা সমীকরণের মতো লঘু
ফটকের দু-পাশে কাঞ্চন লাবণ্যবন্ধনী
দেয়ালের উপরে জানালা, জয় হোক উদ্ভিদের,
আর সেই রমনীর যে-কিনা স্বয়ংক্রিয় লতার দ্বিতল
ডালপালা বেয়ে উর্ধ্বে উঠেছিল

১৪.

এ-দেহ সুন্দর নয়, মন তাকে সাজায় সমৃদ্ধে,
চন্দনাবিষয়ে আর সাবানের জলীয় ফেনায়,
ক্ষতমুখ মলমে ঢাকে, কালশিটে প্রসঙ্গে বরফ
কিনে আনে, মন ঐ মতো শরীরকে ভালোবাসে,
উহ্য রাখে কিছু তার বদমায়েসির গল্প, কিছু গোপনচারিতা,
গত একুশে এপ্রিল রাতে কোথায় সে ছিল আজ আমরা তো জানি,
মন বোকা সেজে থাকে, যেন সাতে-পাঁচে নেই,
খুন-দেখা প্রতিবেশীদের মতো, শরীর সমস্ত বোঝে, ঠাট্টা করে,
দু-হাত উঁচুতে ছুঁড়ে গান ধরে— ভোলা মন, ভোলা মন রে আমার

১৫.

নভ, প্রভূত কিরণ ও অটুট
ঝিল্লী, তুমি কর্ণিকার, চোখ, মর্ষ
ধাতুখণ্ড, জলধৌতী, পুণ্য

শ্লাঘা, নাম ও দুইটি বীজে
যোগাযোগ, ক্রিয়ারূপ দ্রব্যদণ্ড
গহ্বরখোদিত

ধায় উঁচু শব্দে বেজে-ওঠা, নিচু শব্দে গীতময়
পিতলঘণ্টা, ছুটে আসে ঘামঝরা পুরুষ ও
লম্ফমান দুধঝরা রমণী,

তোমাদের ত্বকের চেয়ে শুভ্র এই যে কাণ্ডবাহী রস
তোমাদের ঘামের চেয়ে বিষময় এই যে সুরাসার

কর্মফুল ঐ দেহতাড়িত গাছে

যখন এক আকাশ থেকে নামে শিশির এবং
আরেক আকাশ থেকে নামে আগুন
তখন আমরা সবাই ফুলের গন্ধ পেয়ে থাকি
আমি, হরিতকী ফল ও বৃদ্ধ গোসাপ

ঈর্ষাসবুজ এই কৃষিক্ষেত, অন্ধকার আতস কাচের বন ,
এরাই শস্য উৎপাদন করে, বৃষ্টি আনে, শীত চায়

১৬.

কথা-ভুলে-যাওয়া গানগুলি, তার মনে পড়ে সুর,
অশ্বধাবিত প্রস্তরপথে লোহার শব্দ, ছুটন্ত খুর,
রাত্রি বারোটা, শহরে মাতাল, পানের দোকান, সোডা ভাঙচুর,
আমি ভুলে গেছি কথা, সর্বজনীন এ-গান তাহলে স্মৃতিভারাতুর
উড়ন্ত ফুল

কোন্ কাননের ? লতা দোলনার ? জ্যৈষ্ঠরাতের ? সর্মান্তপুর
ছেড়ে গেল ট্রেন, ত্রিতল কামরা, স্বল্প আসন, যাত্রী সুদূর,
লিখে রাখি, প্রিয়, অন্য ভাষায়, লুপ্ত ছায়ায়, আলোকবাদুড়
ঠোঁটে নিয়ে আসে ঠোঙার কাগজ, ভাঙা পেন্সিল, শায়িত শিশুর
একমাথা চুল

শহরে শিখেছি যথার্থ গান, প্রতিটি সুরের অন্ধ বিধুর
শোকার্ত ঘর চিনেছি শহরে, গলি ও বাজার, কষিত আঙুর,
যামিনীচারিতা ; গ্রাম থেকে আমি কী-ই বা এনেছি, কথায় প্রচুর
পিছুটান ছাড়া এবং এনেছি স্মৃতিবিভ্রম ভাষা-বিন্দুর
এতগুলি ভুল

১৭.

এই যে তোমরা যারা লাউপাতা হয়ে জন্মেছ তোমাদের মধ্যে এক হিলহিলে সবুজ সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার হাঁকডাকে লোক জড়ো হয়েছে। ইঁট, লাঠি নিয়ে দৌড়ে এসেছে ওরা সাপটাকে মারবে বলে। আমি আঙুল তুলে স্পষ্ট তাদের দেখিয়ে দিচ্ছি ঐ যে চলে যাচ্ছে, দ্যাখো, লুকিয়ে পড়ল, আবার মাথা তুলছে, দু-একটি স্কুলের ছেলেমেয়েকে আমি এ-ও বোঝাতে সুরু করি, দেখতে পাচ্ছ, ঐ সাপ, লাউডগা, কেমন রঙে রঙ মিশিয়ে বেঁচে আছে, প্রকৃতির রহস্য। কিন্তু উপস্থিত সবাই হাসতে থাকে, দূর দূর, কোথায় লতাপাতা, কোথায় সাপ, ও তো গোপালদের বাড়ির লোকেরা, ঐ তো সারদা বাজার করে ফিরছে, জনার্দনবাবু কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন···

আশ্চর্য! আবার ভুল হল

১৮.

মৌলিক স্বাস্থ্যচর্চা করে যারা নাম কিনেছে তাদের সঙ্গে দু-এক বছর আমি হা-হা হি-হি করে বুঝেছি যে নতুন মেম্বারদের স্বেদবিন্দু বলে ডাকলে চটে যায় এবং বলে— রাখুন আপনাদের ও-সব ন্যাকা ন্যাকা বাংলা কথা, আমাদের সার বলুন, মাস্টার বলুন, ওদিকে কোচেন্দ্রমশাই শিখিয়ে দিয়েছেন ওদের ঘাটের মড়া বলে ডাকবি, প্যারালাল-বার ছুঁতে দিবি না আর নিজেদের জামাজুতোর দিকে সর্বদা নজর রাখবি, শালারা মহা হারামী, বাপ চোর, মা চোর, নিজেদের জন্মের ঠিক নেই, সবাই তো আর কেশববাবু নয়, (দু-হাত কপালে ছুঁইয়ে) রোজুবাবু নয়, আর এই আরেক শালা কাগের উৎপাতে, নতুন-কেনা গামছাটা পর্যন্ত তুলে নিয়ে গেল, সক্কালে বড় এক গ্লাস দুধে ছ-টা আস্ত মুরগির ডিম গুলে, বাপ্‌স, আর বলবেন না গুরু, শুনেই মনে হচ্ছে দেড়-শ কেজি লোহা তুলে ফেললুম, দূর ব্যাটা, ডিমে-দুধে থাকলে লেবুকুমার হবি, আলতা কাত্তিক হবি, এই ফেলা চাটুজ্জে হতে পারবি নে, ছ-মাস শুধু খালি হাতে ডন-বোর্ট্‌কি, আর দুলে-র মালিশ, তারপর তোর মা পর্যন্ত তোকে দেখে ঘোমটা টানবে যেন বাইরের কেউ এয়েচেন, আর আগ্রার দিকে যদি কখনো যাস তো আমাদের মেন অফিসে ছোট নেতাইয়ের ফটোখান দেখে আসিস, জাতে ছেল কৈবর্ত, পাইকেরেদের ঝুড়ি থেকে কড়ে আঙুল কান্‌কোয় ঢুকিয়ে বাইশ কেজি কাতলা তুলতে পারতো, তা সেই উঠতি বয়েসে উনি বাই ধরলেন তাজমহল দেখবেন, দ্যাখ্‌ তোর ঐতিহাসিক স্থান, সান্নিপাতিক, দু-দিনের মাথায়, যাকে বলে কিনা প্রবাসে দৈবের বশে, কার লেখা আঁচ কর দেখি, কার আবার, আমাদের রোববাবুর, কুস্তি শিখেছিলেন, উনি, মানে রবিবাবু, রেগুলার সাহিত্যচর্চা করতেন

১৯.

বন্ধু, তোমার হাতের উপর হাত রাখলেই আমি টের পাই তোমার বাজারে অনেক দেনা, ছেলেটা উচ্ছন্নে গেছে, মেয়ে রাত করে বাড়ি ফেরে, আজ যা-বলার আছে তুমি আমাকেই বলো, স্ত্রীর মুখরতার কথা বলো, সহকর্মীদের শঠতার কথা বলো, রাতে ঘুম হয় না সেই কথা বলো, আর যদি কাঁদতেই হয় তবে এই কাঁধে মাথা রেখে কাঁদো বন্ধু

২০.

যখন বিকেলবেলায় লোকে সিঙারা খায়, জিলিপি খায়, জলকচুরি খায়, চায়ের দোকানে ভিড় করে আর রোল-কর্নারে দাঁড়িয়ে পড়ে, যখন কফি-শপ-য়ে জল ফোটে, উষ্ণ নুডল ঝরে গরম তাওয়া থেকে, যখন ক্যাসেটের দোকানে ঝলমলে গান বেজে ওঠে, যখন চুলবাঁধা ফিতেটা দাঁতে চেপে মেজদি ছাদের আকাশের দিকে চেয়ে দ্যাখে— ওমা, ওঁরা সবাই এসে গেছেন, পড়ন্ত আলোর দেবতা, কমলেকামিনী, রাত্রির কিন্নর, বরাহ অবতার, রাক্ষসদল, অশ্বিনীকুমার দু-জন, তাঁদেরও আড়ালে মারাঙবুরু পাহাড়ের সিঁদুরমাখা পাথরখণ্ড, শিরিষগাছের ঝুলন্ত নরদেহ, গায়ে আগুনলাগা অসুরপত্নী— তখন এই পুণ্য শহর কলকাতার উপর, সবাইকে নমস্কার জানাতে জানাতে, ধীরে ধীরে, অন্ধকার নেমে আসে

২১.

নোটো পাখির ডাক তো শোনো নি, শুনলে বুঝতে— এইভাবে সে আমাকে ভয় দেখায়, আমিও ভয় পেতে ভালোবাসি— কামড়ে ধরে না ? তোমার ঐ পাখি ধারালো নখে আঁকড়ে ধরে না ? —কী বলছ, ও ভয়ঙ্কর পাখি ছিঁড়ে খায়, খুবলে নেয়, আঁচড়ে দেয়, মারাত্মক বিষ তার নখে, জিভে, ইয়ার্কি কোরো না, সামনে পড়লে বুঝতে— ক্রমে তার অন্ধকার ফিসফিসানি শেষ হয় এবং ঘুমের আগে আমি নিজেই নিজের ভয়-পাওয়ার মাত্রা বাড়িয়ে চলি, আহা একবার যদি ঐ পাখি কামড়ে ধরতো তবে আমার এই ভাঙা পা-টা বুঝি জোড়া লেগে যেত, আমার যকৃতের অম্লশূল তো সে-পাখির ঠোঁটের ছোঁয়া না লাগলে ভালোই হতে পারে না, আর এই ট্যারা চোখ দুটোকে কে সমান করবে ঐ পাখির রক্তাক্ত নখগুলো ছাড়া, কিন্তু আমার এই প্রকাণ্ড মাথা, তার হারামজাদা বুদ্ধিবৃত্তি, তার শুয়োরের-বাচ্চা বিবেচনাবোধ এ-সব নোটো পাখি ছুঁয়েও দেখবে না আমি জানি, সেগুলোর কোনও ব্যবস্থা করতে হলে আমাকে শেষ পর্যন্ত পকেটের পয়সায় ডাক্তার দেখাতে হবে, হয়ত ভেলোরেও যেতে হতে পারে দু-এক মাসের মধ্যে

২২.

ছোটো, চাকালাগানো, তেপায়া, ফোল্ডিং, হাল্কামতো, টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, ঘরে ঘরে, বারান্দায়, বেডসাইডে, ট্রলি জাতীয়, মাঝারি মাপে, একটু বড়, দাম বেশী, খুলে ব্যাগেও ভরে নেওয়া যেতে পারে, ঐভাবে আসে, দোকানে বা ডাকযোগে, নিজেদের জুড়ে নিতে হয়, দক্ষতার প্রয়োজন নেই, একটা ছোট রেঞ্জ হলেই হল, মেয়েরাও পারে, বাস-য়ে পায়ের কাছে নামিয়ে রাখা যায়, মানে ঐ কার্টন, বাড়িতে এনে খোলা এবং জোড়া, গায়ে দাম ও সাইজ লেখা, রঙ নীল ও সাদা, (লালটা বাজারে আসে নি, এসে যাবে) একটি মেয়ের ছবি, হাসিমুখ, কোথায় যেন দেখেছি, লিরিল কি, জুড়ে ফেলেছে, দু-হাত উপরে তুলে আনন্দ প্রকাশ করছে, মেয়েটি, ঐ বাক্সের, ছবি, উল্টালে ফলঝুড়ি, আনারস, কালো আঙুর, একগুচ্ছ দানাদার শস্য, ছবি আরকি, উপচে পড়ছে, পাশেই সুরাপাত্র ভৃঙ্গার হাফ চুমুক সাকীগেলাস, সরবত কি, আশ্চর্য, রোগীর মাথার কাছে, আরেকটি ছবি, অষুধ, নাইটল্যাম্প, অ্যালার্মঘড়ি, বাক্সের আরেক পিঠে, একটু বেঁকে, ওরলি (বোম্বে), খুকি কেমন সুন্দর লেখাপড়া করছে, খাতা-বই-রুলার, অঙ্ক কষছে, বাহবা, উত্তর মিলেছে, ঐ ছবিতে এবং আরেকটু ঘোরালেই, অর্থাৎ চতুর্থ দিকে, ঐ বাক্সে, প্রস্তুতকারক বাবাসাহেব অরোরা-র গোঁফে তা দেওয়া রেখাচিত্র, ধর্মভীরু ওম্ এনটারপ্রাইজ, বোম্বে (ওরলি) প্রথম ভারতীয় প্ল্যাস্টিক আসবাবের জনক, ঐ বাবা, কিনে ফেলি তাহলে, রক্ষে করো বাবা, এইটুকু ফ্ল্যাটে আবার একটা টেবিল, আমরা কি সাহেব

২৩.

বৃষ্টি নামল আর আমিও এক আশ্চর্য সত্যকে আবিষ্কার করলুম, দেখলুম, এই লাইনটানা পাতার উপর বড় বড় ফোঁটায় জল ঝরছে, গত মাসের মুদীর হিসেবের সঙ্গে আমার ছোট ছেলের ক্লাস-পরীক্ষার নম্বর বেমালুম মিশে গেল, পাটনা যাতায়াতের ট্রেনভাড়ার অঙ্ক কালো সুতোর রেখায় ভেসে চলেছে, গৌতমের টেলিফোন নম্বর আর কি কেউ পড়তে পারবে, ও-টি এখন এক নীল পুষ্করিণী, আমার অবচেতন মন যা যা চেয়েছিল তার প্রতিটি রহস্য দেখছি এই গ্রীষ্মশেষের বৃষ্টি কোনও এক কৌশলে জেনে ফেলেছে, সে এর চেয়ে বেশি কিছু জানে কিনা ভাবতেও ভয় হয়

২৪

আমিষ, তুমি প্রশংসনীয়
ফল, তুমি লোকায়তিক
বচসা, তুমি বিদ্যুতবাহী
আমি গীতময় এক সৃষ্ট জগত

চঞ্চলতার নামগানে ভাসি
কৃষিকাজ আমি নিভৃতে জেনেছি
নিরামিশাষীর মুখোমুখি এই
উদ্ভিদপ্রাণ রটনা গাছটি

নটেশাক, তুমি অকূলপাথার
বুনো ওল, তুমি আমাকে বলো
সত্যবাদিতা কেমন আধার
মাটির নিচের শিকড়বাকড়

ছোটোভাবে হাসি, নিজেকে বোঝাই
'তুমি দেহাতীত, কূটভাবনার
প্রাকারসন্ধ্যা, বিরতযুদ্ধ,
দুর্গ অটুট, অস্ত্র অটুট,

তুমি পাখিপ্রাণ, তুমি উদ্ভিদ,
কৌশল আর কুশলতা টিয়া
নাও, খুঁটে খাও পূর্বপিতাদের
হাতে-ধরা ফল রক্তঠোকরে।'

২৫.

ওঠো প্রাণ, জেগে ওঠো প্রত্যন্তপ্রদেশে,
খোলামেলা হাসিগানে, কালীপ্রসন্নের শ্লেষে,

জেগে রও দিনমান কর্মে ও ভাষায়
বৃষ্টিনাশা ধানক্ষেতে যতদূর চোখ যায়

কাঁঠাল ছায়ায় জন্মে, কাঁঠালছায়ায়
বঙ্কিমের প্রেতবিশ্ব লুটোপুটি যায়

দীনবন্ধু সৌধে চড়ে, হরিশে মধুপ
ঈশ্বর চেনালে ভাষা, আলোড়িত কূপ

শিবনাথে নমস্কার, প্রণাম ভগিনী
জোড়াসাঁকো ধূলিকণা স্বর্ণতৌলে কিনি

রয়েছেন এঁরা সব প্রাতঃস্মরণীয়,
পিতৃকুল মাতৃকুল পরম্পরাপ্রিয়,

গেয়েছি সামান্য গান, হয়েছি উদ্বেল
পাঠান্তে দান্তে-কবি, আর্নো দানিয়েল

শত নাম উহ্য থাকে স্মরণসকাশে
শ্রেয়োতর অন্তমিল সহজে না আসে

জাগো প্রাণ, তুষ্ট হও, যদি চাও আরো
কঠিন বিচারে এই বিহগে বিচারো

রেখেছে শারদশশী নৌকা ভাসমান
বিচারান্তে নিয়ে যাবে পশ্চিম মশান

□ Space Donated By A Well Wisher □

তক্কাতক্কি আর গুলতানি

ঢিলেঢালা আড্ডা হবে এরকমই কথা ছিল, কেন্দ্রে উৎপলকুমার বসু। আড্ডাধারীরা অনেকেই সে শর্ত ভুলে মেরে দিয়েছিলেন, ফলে কিছু গুরুগম্ভীর কথা, প্রশ্নও উঠেছে।

আড্ডাধারীরা: উৎপলকুমার বসু, অজিত চৌধুরী, উপল দত্তগুপ্ত, বিনয় ঘোষ, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া হাজির ছিলেন সঞ্জয় চক্রবর্তী, মানস বসু, অসীম রক্ষিত, কল্যাণ ভট্টাচার্য, শ্যামলী সুর ও ভাস্কর রায়। ১৮.৬.৯৪ তারিখে টি জি ২/২৯ তেঘরিয়ায় (কলকাতা-৭০০০৫৯) এই আড্ডা চলে প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক।

রাঘব : উৎপলদা, আপনি যখন কবিতা লেখা শুরু করেছেন, কলকাতায় আপনারা কাব্য-আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন, সেটা ছিল কমিউনিস্ট মতাদর্শের যুগ। তা সত্ত্বেও এ ধরনের কোনো মতাদর্শের সঙ্গে নিজেকে জড়ানোর চেষ্টা না করে অন্য রাস্তায় গেলেন কেন? অন্যান্য সকলেই যখন তাই করছিল তখন এটা একটু অস্বাভাবিক ঠেকে। আপনারা অন্য ধরনের কবিতা— অন্য ভাষা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। কী কাজ করেছিল এর পিছনে? বিশেষত, আপনার লেখায় বাংলা কবিতার ট্র্যাডিশনের বাইরে যাওয়ার একটা চেষ্টা ছিল— সেটা যে কষ্ট করে করা তাও নয়।

উৎপল : তথাকথিত রাজনৈতিক সচেতনতা আমাদের একেবারেই ছিল না। দুটো বড় ঘটনার সন্তান আমরা, এক— দেশ স্বাধীন হওয়া এবং দুই— দেশ ভাগ হওয়া। দলগত মতাদর্শ বা তাত্ত্বিক পড়াশোনার বিশেষ সুযোগ হয়নি তখন। ১৯৫৯-৬০ সালে, কলকাতা শহর উদ্বাস্তুতে ছেয়ে গেছে। শিয়ালদা স্টেশনে দলে দলে উদ্বাস্তুর ভিড়। যোগেন চৌধুরীর মতো আঁকিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে বসে ছবি আঁকছেন, সন্দীপনের লেখায় শিয়ালদা স্টেশনের উল্লেখ থাকছে, সবই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। ওই ছিন্নমূল বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে একজন মেয়ে প্রসাধন সারছে, পরিচ্ছন্ন হচ্ছে— শারীরিক যাবতীয় প্রক্রিয়া, যৌনতা, জন্ম-মৃত্যু সবই চলেছে ওর মধ্যে। একটা জগত তৈরি হচ্ছে আস্তে আস্তে। চোখের সামনে— হাতের কাছে এগুলো ছিল বলে এতেই বেশি উৎসাহিত হয়ে পড়ি আমরা। তথাকথিত তাত্ত্বিক পড়াশোনা, 'শ্রেণী'কে বোঝার জন্য বই-পড়া— এসব আমাদের তত বেশি ছিল না। বামপন্থী সাহিত্য তখন বেশি পড়া হয়নি। উল্টে-পাল্টে দেখেছি বিখ্যাত সেই বই— *History of Communist Party of Soviet Union*. *What is Communism* ধরনের বই এসময়ে পড়িনি।

অজিত : এই সময় আর একটা জিনিসও তখনকার লোকেদের মনে আসত ; গ্রাম ভেঙে পড়ছে, শহর গড়ে উঠছে, প্ল্যানিং ইত্যাদি হচ্ছে, ইনজিনিয়াররা চাকরি-টাকরি পাচ্ছে। 'আগেকার মতো আর গ্রাম্য থাকব না, আরবান গদ্য, কবিতা লিখব' এই ধরনের কোনো মেজাজ কি আপনাদের মধ্যে আসত?

উৎপল : ততটা নয়। আসলে, পরিবার বা যে পরিবেশ থেকেই ব্যক্তি উঠে আসছে সেটাই ছিল প্রত্যক্ষ এবং যে কোনো তত্ত্বকথার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। আমাদের আগের প্রজন্মের বিখ্যাত কবিদের কথা ধরা যাক। তাঁরা সকলেই প্রায় ছিলেন সাহিত্যের অধ্যাপক— বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ। আমাদের সময়ে কিন্তু অদ্ভুত একটা জিনিস দেখা গেল। যেমন, সন্দীপন— কর্পোরেশনে কাজ করে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়— একটা একটা আধা মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ হবার চেষ্টা করেছে, আমিও খানিকটা

তাই করেছি। সুনীল দায়সারা গোছের টিউশন ইত্যাদি করে চালাত, শরৎ মুখুজ্যে ছিল চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। এই যে এক-একটা দিক থেকে এক-একটা লোকের নানা পার্টিকউলারিটিজ নিয়ে আসা— একটা যে আনইভেননেস— একে একটা ছাতার তলায় জায়গা করে দেবার জন্য এক ধরনের সাংগঠনিক প্রতিভার প্রয়োজন ছিল। যেটা কৃত্তিবাস-এ ছিল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছিল। এছাড়া পৃথ্বীশ ছিল, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ছিল— খ্যাতি-অখ্যাতির কথা নয়, নানা ধরনের লোকের সমাগম হয়েছিল— সেটাই বোঝাতে চাইছি।

রাঘব : সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের এখানে যে 'কুলীন-প্রথা' ছিল— সেটা আপনাদের সময়ে এসে ভেঙে গেল। এখানে প্রশ্ন— অনেকটা সহজাত প্রবণতা থেকেই আমরা অনেক সময়ে অনেক কিছু করি, সবটা আগে থেকে ভাবা থাকে না। পরবর্তীকালে যেটাকে একটা তাত্ত্বিক চেহারা দেবার ঝোঁক দেখা যায়। যেমন সন্দীপন এখনকার লেখালিখিতে এটাকে থিয়োরাইজ করার চেষ্টা করেন : আমরা একটা রক কালচার তৈরি করার চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ আমি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কথা বলি না, অতটা ব্রাহ্ম নই, আমার ভাষা খোলা, ভাষা একটা জ্যান্ত ব্যাপার সুতরাং রাস্তার কথা— দরকার হলে গালাগালিও সাহিত্যে আসবে, তাহলেই সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ হবে। আমার কথা আমি যেভাবে বলতে চাই তার জন্য এই স্বাধীনতা নিতে হবে। এই সচেতনভাবে স্টিরিও-টাইপ ভাঙার ব্যাপারটা কি ছিল ?

উৎপল : সচেতনভাবে ছিল, তবে এটা তো অত তুচ্ছ জিনিসে ভাঙে না, এটা লেখার— কবিতার ফর্ম-এ ভাঙে, তার ইমেজারি, মেটাফর ইত্যাদির ফর্ম-এ ভাঙে যা আবার সবই দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত (interaction) থেকে জাত। আসলে, তাত্ত্বিক ভাবে, ডিসিপ্লিনড ওয়ে-তে পড়াশোনা বলতে যা বোঝায় তা আমাদের মধ্যে কেউ-ই সেভাবে করেনি। শঙ্খ ঘোষ ছিলেন কৃত্তিবাস-এর একটু আগে। একটা সময়ে ওঁর সম্পর্কে আমি লিখেছিলাম 'আমাদের ভোরের কোকিল'। আর শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার এঁরা কেউই অতটা দলের ছিলেন না। এঁদের অন্যান্য কাগজপত্র ছিল। এছাড়া, আমাদের ক্ষেত্রে আর একটা ব্যাপার ঘটেছিল। পরিবার বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ মা-বাবা-ভাই-বোন— এদের সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি হতে শুরু করেছিল। আমরা বন্ধুরা, যাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিদিনই দেখা হত, একটা যেন নিজেদের তৈরি করা পরিবারের মতো কাঠামোয় এসে পড়লাম। বাড়ির লোকেদের মূল্যবোধের সঙ্গে বনছিল না বলেই হয়ত, চুপিসারে, যাদের সঙ্গে বনে তাদের মধ্যে একটা ঐক্য গড়ে উঠছিল।

রাঘব : বিরোধের পয়েন্টগুলো কী ছিল ?

উৎপল : একটু সেনসিটিভ যে কেউ বড় হয়ে উঠে পরিবারের মধ্যে প্রথম যেটা লক্ষ

করে তা হল হিপোক্রিসি। কোনো ব্যাপারে বাবা-মা মিথ্যে বলেছে— এটা জানার মধ্যেই থাকে প্রথম দুঃখবোধ। একজন সেনসিটিভ ছেলের কাছে এটা জগত উল্টে ফেলার মতো ব্যাপার। বা, যে দিদি বা মাসিকে যতটা নিষ্কলুষ ভাবতাম তিনি ততটা সচ্চরিত্র নন। এই ইলিউশন-ভাঙাগুলো ভয়ঙ্কর। আবার, খুব ছোটবেলায় যাঁদের দেখেছি, পরে যদি ওঁদের খুব কষ্ট পেতে দেখি, তবে নিজের কষ্টটাও দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। এটাও ওই ইলিউশন ভাঙার ব্যাপার। 'গ্রামের স্কুল-মাস্টারমশাই খুব কষ্ট পাচ্ছে'— এটা যে-ভাবে বহু লেখকদেরই লেখার বিষয় হয়ে ওঠে।

অজিত : এইখানেই আপনাদের সঙ্গে আজকের ছেলেদের ফারাক। আপনারা ইনোসেন্ট ছিলেন— ভাগ্যবান ছিলেন, আপনাদের ইনোসেন্স ভেঙেছে। আজ যারা জন্মাচ্ছে, জন্ম থেকে তারা আর ইনোসেন্ট থাকার সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে 'ইনোসেন্স ভেঙে যাচ্ছে' বলে দুঃখ পাওয়ার যে বিলাসিতা, সেটাও ওদের নেই। আরবানাইজেশন ইত্যাদির জায়গা থেকে আপনাদের ইনোসেন্স ভেঙেছে, সচেতনভাবে সেটা হয়ত বোঝেননি, দেখেছেন চারপাশে নানা হিপোক্রিসি চলেছে। এখন লোকে বলবে : তাতে কী ?

উৎপল : হ্যাঁ ঠিকই, এটা লোকে বলে, কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা খুব ঘরের কাছে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোনো জেনেরালাইজেশন করা ঠিক নয় যে কোন্ প্রজন্ম এটা কীভাবে নেবে। আমার বড়দিকে, 'লাইনে দাঁড়িয়েছে' বলতে যা বোঝায়, যদি সে অবস্থায় দেখি তাহলে আমি কীভাবে আহত হব এটা কোনো তত্ত্বকথা দিয়ে বোঝানো যায় না—

রাঘব : আমাদের যদিও 'সোনার বাংলা ছিল'— এই গল্প শুনে বড় হয়েছি তবু জানি 'সোনার বাংলা' কোনোদিনই ছিল কম না। সবই গল্পগাথা। হয়ত একটা সময়ে ইরোসন-টা বেশি করে আমাদের চোখে পড়েছে কিন্তু ভাঙন বরাবরই ছিল। উৎপলদা-দের কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে যাবার সময়ে বাবা-র মিথ্যে কথা ধরে ফেলা, সতীত্ব-সংক্রান্ত মূল্যবোধে আঘাত লাগা— ঠিক এভাবে না হলেও আগের প্রজন্মের লোকেরাও তো এই ভাঙনের মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু তখন তো এই প্রতিক্রিয়া হয়নি। এটা কেন ? কোথাও একটা তফাত নিশ্চয়ই আছে। যে কোনো লেখা বা সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যেই টাইম-স্পেস-এর ছাপ থেকে যায়। আদর্শগত ভাবে বামপন্থী যাঁরা, এ ব্যাপারে তাঁরা বাড়তি ভাবে সচেতন থাকার চেষ্টা করেন ফলে লেখায় আড়ষ্টতা ও মেসেজ-এর একটা বাড়াবাড়ি চলে আসে। যাঁরা সেই গোত্রভুক্ত নন, মনে করেন সাহিত্য জিনিসটা আলাদা, যা মনে হয় সেটাই লিখি, ভাবের প্রকাশ, ইত্যাদি— তাদের ক্ষেত্রেও এই ছাপ থাকে অনেক সূক্ষ্মভাবে, প্রচ্ছন্নভাবে। এটাও তো হতে পারে, যে যতক্ষণ দেশ স্বাধীন ছিল না ততক্ষণ

পর্যন্ত আমার সামনে একটা শত্রু ছিল। হঠাৎ দেখলাম, স্বাধীন হয়েছি, সামনে কোনো শত্রু নেই— এ অবস্থায় দৃষ্টিটা ঘরের দিকে গিয়ে পড়েছে— 'এই তো আমার লোকজন'। আপনাদের সময়ে এ সুবিধেটা আপনারা পেয়েছেন— নিজেদের স্বজনদের দিকে ফিরে তাকানোর সুযোগ— যারা স্বাধীনতা পেল তারা কি এটা পাওয়ার যোগ্য— এর প্রতি তারা কী সুবিচার করছে— পেয়ে তারা কী করতে চলেছে—

অজিত : স্বাধীনতার আগে একটা নেগেটিভ আইডেনটিটি ছিল— স্বাধীনতা পাওয়ার পরে সেটাও ভেঙে গেল, তখন আর একটা আইডেনটিটি-র প্রশ্ন।

উৎপল : দুটো বা তিনটে ঘটনা আমাদের উপর দিয়ে যায়। প্রথমত, দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে বহুরকম হিপোক্রিসির ডালা খুলে গেল। দেশ স্বাধীন ঠিক হল না, ভণ্ডামির একটা ট্রাঙ্ক খুলে গেল যেন। দু-নম্বর হচ্ছে : দেশভাগ। এটার অভিঘাত (implication) যে কী সাংঘাতিক, সাইকি (psyche)-র জগতে কত বড় একটা ঘটনা —এখনও তার জের চলেছে। এটা কোনো যুদ্ধজনিত দেশভাগ নয়, আয়ারল্যান্ড বা আরবজগত যেভাবে ভাগ হয়েছে তেমন কিছু নয়, এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ঘটে যাওয়া অদ্ভুত একটা ঘটনা। তখনই রাজনৈতিক নেতাদের স্বরূপ খানিকটা উদ্ঘাটিত হল। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা— এমনকি পাঞ্জাবিতে নানাভাবে জিনিসটাকে মেনে নেওয়ার যুক্তি খোঁজা হয়েছে, কিন্তু এগুলোর সেনসিটিভিটি বাংলায় ছিল। চল্লিশ-এর লেখকরা মার্কসীয় ব্যাখ্যায় জিনিসটাকে ক্লাস-কলোনিয়ালিজম-ইম্পিরিয়ালিজম-এর দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। এসব তত্ত্বকথা ঠিক আছে। কিন্তু আমরা প্রথমেই ওই তত্ত্বকথাগুলোকে সন্দেহ করতে শুরু করি ; মনে হয়েছিল, এরা বোধহয় প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারে না, অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে।

উপল : সন্দেহ করার কারণটা কী ?

উৎপল : একজন লেখকের নাম আমি করছি— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম লেখা **'ইতিহাস'**, তারপরে 'উপনিবেশ'। ছোটবেলায় ওঁর লেখা বেশ পড়তাম। উনি জলপাইগুড়ির লোক আর আমার ছেলেবেলা কেটেছে দিনহাটায়, সেজন্য একটু পাড়াতুতো দুর্বলতাও ছিল। এঁর লেখাতেই দেশভাগ ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো সোস্যালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত হতে দেখি। অনেকে বলেন তারাশঙ্করের লেখাতেও এই বৈশিষ্ট্য আছে। আমার মতে তারাশঙ্করের লেখায় ক্লাস-অ্যানালিসিস ওইভাবে ছিল না। ওঁর লেখায় জমিদারি-প্রথার ভাঙন— নতুন প্রথা তৈরি হচ্ছে— এ জিনিসটা আছে। কিন্তু নারায়ণবাবুর লেখায় ওই প্রবণতা ছিল, যেমন ছিল মাণিকবাবুর লেখায়। কিন্তু আমাদের কেমন একটা সন্দেহ হত যে বোধহয় এই জিনিসগুলো ঠিক

নয়, দেয়ার ইজ সামথিং এলস্। এগুলোকে এত সুপারফিসিয়াল লেভেল-এ মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না— ওই যেমন বলছিলাম— দেশভাগের সাইকিক ইমপ্লিকেশনস-এর ভয়ঙ্করতার কথা। সম্পত্তি-হস্তান্তর হলেও একটু সম্পন্ন যারা তারাও বুঝতে পারল যে আজ থেকে সব আলাদা হয়ে গেল। আমাদের সময়ে এমন মিথ-ও চালু হয়েছিল যে কলকাতাও ভাগ হয়ে যাবে।

কতগুলো পরিবর্তনকে ভিসুয়ালি দেখা যায়, আর কতগুলো থাকে অদৃশ্য, সেগুলোকে বোঝা বেশ কঠিন।

রাঘব : তাহলে বলতে হয় এমন একটা সময়ে আপনারা লেখা শুরু করলেন যখন আপনাদের সামনে কোনো দিশা নেই অথচ প্রশ্ন আছে অনেক। কিছু বামপন্থীদের আপনারা দেখলেন, যাদের সঙ্গে আপনাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও নেই তেমন। আগে স্বদেশিদের যেমন ভাবমূর্তি ছিল, বামপন্থীদের তেমন কোনো ভাবমূর্তিও আপনাদের সামনে নেই। তাদের সম্পর্কে দ্বিধা আছে, প্রশ্ন আছে, কিন্তু সংযোগটা নেই। স্বাধীনতা-পরবর্তী জীবনে যে আর্থিক-সামাজিক সঙ্কট দেখা দিল তাতে কোনো প্রমিসড্ ল্যান্ড-ও আপনারা দেখতে পাননি, দেখলেন একটা নষ্ট হয়ে যাওয়া হিন্টারল্যান্ড-কে। একে ভাষায় ধরার প্রশ্নে আপনাদের কোথায় কী সমস্যা/সঙ্কট হল এবং সাহিত্যের ভাষা বা কবিতার ভাষা বলে যা পূর্বঘোষিত হয়ে আছে তার সঙ্গে মোকাবিলা করলেন কীভাবে?

উৎপল : অন্যদের কথা বলতে পারবনা, আমি আমার কথাই বলব। আমি দিনহাটায় মানুষ হয়েছি, স্কুল-ফাইনাল পাশ করেছি ওখানেই। জায়গাটা ছিল একটা গঞ্জের মতো। কোনো সাংস্কৃতিক চর্চা সাধারণভাবে ছিল না সেখানে। হয়ত পুজোর সময়ে একটু থিয়েটার হল। এটা বলা প্রয়োজন এ জন্যই যে আজকে, ইন রেট্রোস্পেকট্— ওই মেকানিজম— যা-যা ঘটেছিল তার অনেকটা বুঝতে পারি। যদিও 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা'র অভিনয় হতনা, কিন্তু ঈদের সময় মুসলমানদের উৎসব হত। আর সেখানে গান গাইতে আসতেন আব্বাসউদ্দীন। উনি দিনহাটার লোক। আমরা স্টেশনে ওঁকে আনতে যেতাম। আমাদের কৈশোরের কৃষ্ণ— বিরাট ভক্ত ছিলাম ওঁর। খুব বাবু লোক ছিলেন। ১৯৪৪-৪৫ সাল হবে, ওখানে একটা দোকানে ওঁর একটা রেকর্ড গোল্ডেন ডিস্ক অ্যাওয়ার্ড পায়। সারা পৃথিবীতে ওই রেকর্ডটা ওই বিশেষ দোকান থেকে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছিল। বিলেতের এইচ এম ভি-র অফিস থেকে বিরাট একটা শীল্ড আসে। সেটা খোলা হল আমাদের সামনে। বিলিতি জিনিস, তার গন্ধ আলাদা, তার রূপ আলাদা। প্যাকেট খোলা হলে আমরা যে যার মতো একটু খড়, কাপড়, একটু সুতো, দড়ি ইত্যাদি সব নিলাম। বিলিতি জিনিস তো!

আব্বাসউদ্দীনের সেই রেকর্ডের গানটা ছিল : 'আল্লা মেঘ দে, পানি দে'। কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত বাড়িতে ওঁর গানের খুব একটা চল ছিল না। রেকর্ড কিনতে হলে আমরা শচীন দেবের রেকর্ডই কিনতাম। এঁদের দুজনেরই চরিত্র হচ্ছে— ৪০-৫০-এর একেবারে এক্সট্রিম ক্যারেকটার। 'আল্লা মেঘ দে', 'বাজান, চল যাই চল মাঠে লাঙল বাইতে' এগুলো ছিল আমাদের ছেলেবেলার মেঠো গান। আব্বাসউদ্দীন আবার এগুলো শিখেছিলেন রাস্তার এক ভিখারিনীর কাছ থেকে। আর একটু বড় হয়ে, যখন বলা যায় যৌন সচেতনতা তৈরি হল, তখন শুনতে আরম্ভ করলাম— 'শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে', 'আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়' এই সব গান। এখন শুনলে হয়ত আপনারা হাসবেন— এক কথা, এক সুর। কিন্তু জগন্ময়, নজরুল, শচীন এসবই ছিল আমার কিশোর জীবনের গান, রবীন্দ্রসংগীত এসেছে তার অনেক পরে। গান কিন্তু বাঙালির একটা বিরাট সাংস্কৃতিক উপাদান— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একভাবে বলা যায়, গানই আমাদের গাইড করে। আমার কিন্তু এখনও থিয়োরি হচ্ছে ওই 'শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে' এটা বাঙালির র নার্ভ (raw nerve)-কে দারুণভাবে টাচ্ করে। এটা আমি বিদেশেও দেখেছি, বাঙালি অনেকেই বলে উঠেছে : ও গান শুনিয়ো না। প্রত্যেক জাতিরই এমন একটা র নার্ভ থাকে।

রাঘব : তাহলে, আমাদের একটা স্বাভাবিক পরিমণ্ডল ছিল যেখান থেকে আমি পুষ্টি নিতাম তা থেকেই আমার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠত— আমার জীবনচর্যার সঙ্গে যা সম্পর্কিত। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তরকালে একটা রবীন্দ্র-সংস্কৃতি চালু হল, তার জনপ্রিয়করণ ঘটল। কিছুটা ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি, তার সঙ্গে ভারতীয় জিনিসের কিছুটা মেলবন্ধন, শিক্ষাদীক্ষা মিলিয়ে দেশজ চেহারা দেবার একটা চেষ্টা, একটা সিনথেসিস— যা রবীন্দ্রনাথে সুন্দরভাবে আছে বলেই আমার ধারণা— সেটা ধীরে ধীরে চাপতে থাকল। আমার যে সোর্সেস (sources)— তার থেকে ক্রমশ দূরে হটতে থাকলাম। আসলে বিচ্ছিন্নতাই ঘটল— এটা একটা দেখবার জায়গা নয় কি ?

উৎপল : এটাও ওই যে মূল্যবোধের ভাঙন (বাবার মিথ্যে বলা ইত্যাদি) সেই ধরনের একটা স্বপ্নভঙ্গের ব্যাপার। রবীন্দ্রসংগীত কিন্তু আমাদের প্রজন্ম থেকে স্বপ্নভঙ্গের মতোই এসেছে। কেননা, আমরা— অন্তত আমি ঠিক রবীন্দ্র-কালচারে বড় হইনি। আমি বড় হয়েছি সেই ধরনের কালচারে যেখানে সন্ধেবেলায় হারমোনিয়াম নিয়ে বসে গান গাইত কোনো মেয়ে— সে প্রস্তুত হচ্ছে বিয়ের জন্যে, তাকে দেখতে আসবে, তখন এ গান গাইতে হবে। কুচবিহার-জলপাইগুড়ির নিম্ন মধ্যবিত্ত একটা জগত আছে। কাঠের খুঁটির উপরে ঘর, বর্ষায় তিনমাস জলে ভেসে থাকে, খাটের তলায় আলু রাখা থাকে

আর বস্তাভরা চাল, কখনও-সখনও চ্যাং মাছ-টাছ ধরে খাওয়া হয়। বর্ষার সেই অদ্ভুত জগত সকলকে সেলফ-সাফিসিয়েন্ট করে তুলত। বর্ষা যেন দেয়ালের মতো চারপাশ থেকে চেপে ধরত, তিনমাসের এক অবরোধ। তখন কিন্তু বহু কিছু জিনিস চোখে পড়ত। অবরুদ্ধ অবস্থায় একটা লোকের মানসিকতা অন্য-রকম হয়ে যায়, হাতের কাছের প্রতিটি জিনিসের ওপর নজর গিয়ে পড়ে—অব-রোধের পারসেপশন-টাই এরকম। প্রকৃতির এই অবরোধের প্রসঙ্গ আমার লেখায় আছে : 'স্মৃতি : শুকনো পাতা ঝরে যায় কবে/সুরু (সুধীরলাল) বাংলায়/বিলেতে অনেক আগে···'। এই সূত্রে বলি যে উক্ত কবিতায় শেলী-র দুটো লাইন লুকানো আছে—উড়ন্ত ঝরাপাতার বর্ণনা শেলী-তে এইরকম '···hectic red, pestilence—striken multitudes···' এবং আমার লেখায় '···হেমন্তের ফেলে দেওয়া পাতা ডাল/উড়ে চলে সন্ত্রাসভীত যেন/উন্মাদিনী লাল···'

রাঘব : উৎপলদা, একটা প্রশ্ন আবার চলে আসছে। আপনাদের সময়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে, 'কুলীন প্রথা' ভেঙে, যাঁরা সাহিত্য করতে এসেছেন, যাঁদের কোনো পেডিগ্রি নেই, যে বাপ-দাদা অমুক-তমুক, বা লেখক অধ্যাপনা করেন এবং সাহিত্য করেন, তাঁদের উল্টোদিকে ছিল রবীন্দ্রনাথ এবং এক ধরনের ব্রাহ্ম সংস্কৃতির একটা জগত যেটা খানিকটা প্রগতিশীল সংস্কৃতির (progressive culture) মধ্যেও ছিল। দুয়ের মধ্যে খানিকটা মেলবন্ধন ঘটেছিল। একটা ধরনের চিন্তা— আমি বলব— খানিকটা একই কথা বিভিন্ন লোক নানাভাবে বলার চেষ্টা করছে— আর একদিকে আপনাদের মতো লেখকরা— যাদের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই অথচ সাহিত্য করতে এসেছেন। এমন একটা অবস্থা যখন রবীন্দ্রনাথের গান গ্রাম অবধি পেঁছে যাচ্ছে, রবীন্দ্র সংস্কৃতি বা পরিশীলিত, মার্জিত সংস্কৃতি পেঁছে যাচ্ছে। এই যে— এক ধরনের সংস্কৃতি হবে, তাতে শিষ্টাচার থাকবে, ভব্য সভ্য হবে তার ভাষা অথচ সব কিছু নিয়ম মেনেই গভীর কোনো কথা বলার চেষ্টা করা হবে— মানে এক ধরনের বামুনেপনা যা আপনাদের সময়তেই আসতে শুরু করেছে— এই অদ্ভুত অবস্থায় আপনারা ঠিক কী ফিল করেছিলেন ?

উৎপল : সত্যি কথা বলতে কী, অনেক সোস্যালিস্ট চিন্তার প্রয়োগে এই বামুনেপনা এসেছে। প্যারালাল দুটো যে কালচার— দুটোকেই ঘোর অবিশ্বাস করা ছাড়া, স্যাটায়ার করা ছাড়া উপায় ছিল না। আমার লেখাতেই আছে : 'যতদিন কালুবাবু জীবিত আছেন চিন্তা নেই বুঝে নেব রক্তকরবী'···সাংস্কৃতিক কালুবাবুরা তখন বাজারে এসে গেছেন বেশ ধুতি-টুতি পরে, প্রত্যেকদিনই সন্ধেবেলায় গানের আসর, সভাসমিতি বসছে। একটা 'বেম্মো/রাজনৈতিক' কালচার। আসলে কোনোটাই আমাদের শেষ পর্যন্ত টাচ্ করেনি। মার্ক্সিস্ট বা সোস্যালিস্ট বিশ্লেষণের মধ্যে অ্যানালিটিকাল যে অংশ তা বোঝার জন্য

প্রভৃত পড়াশোনা করা দরকার— অ্যানালিটিকাল মাইন্ড থাকা দরকার— সে মাইন্ডটা আমাদের ছিল না। থাকলেও, তেমন গুরুত্ব দিইনি। যার জন্য ভালো লেখাপড়া জানা ছেলেদের নিয়ে হাসাহাসি করেছি। আমাদের সময়ে সুনীল দাশ নামে একজন স্কুল ফাইনালে প্রথম হয়েছিল, তাকে তো যাচ্ছেতাই গালাগাল— কোনো কারণ নেই— তার অপরাধ— সে প্রথম হয়েছে, সব বিষয়ে ৯৯-এর উপরে নম্বর পেয়েছে। লেখাপড়ার যে গুরুত্ব, ক্রমশই তার হাস্যকরতা প্রমাণ হতে আরম্ভ করল। দেখা গেল কেউ নাম ভাঁড়িয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে, কেউ জাল সার্টিফিকেট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অমুক স্যারের কাছে নিজে না গিয়ে বোনকে পাঠানো ভাল। শোনা যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষবাবুর ছেলে যেবার পরীক্ষা দেন সেবার যার প্রথম হবার সম্ভাবনা ছিল সে ড্রপ্ করে যায়, কেননা আশুবাবুর ছেলে প্রথম হবেনই। এগুলো জানার পর বিদ্যাশিক্ষার নিউট্রালিটির উপরে লোকে কী করে বিশ্বাস রাখবে? লেখাপড়াকে সমীহ করা, রাবীন্দ্রিক কালচারকে শ্রদ্ধা করা— এসব আমাদের ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে মার্ক্সিস্ট অ্যানালিটিকাল কালচার-কে শ্রদ্ধা করা— এইসব এক বানের জলে ভেসে গেছিল।

রাঘব : সত্তর-এও লেখাপড়ার আখড়াগুলোকে আমরা বললাম বুর্জোয়াদের সদর দপ্তর এবং এখানে তোতাপাখি তৈরি করা হয়, এমন কিছু লোক তৈরি করা হয় যারা শোষক হিসাবে কাজ করবে, শোষকের হাত শক্ত করবে— এই চিন্তার সঙ্গে তো আপনাদের একাত্ম বোধ করার কথা—

উৎপল : কিন্তু থিয়োরাইজেশনগুলো করাতে আমরা আর ইন্টারেস্টেড ছিলাম না—

রাঘব : না, তখন আপনাদের রিঅ্যাকশন-টা কী হল?

উৎপল : সত্তর-এ, প্রথমত, আমি এখানে ছিলাম না, বিদেশে শুনেছি। প্রতিটি ভালো ছেলে তৈরি হওয়ার পিছনে যে একটা দুর্নীতি কাজ করছে— এ বিষয়ে ছাত্র বয়স থেকেই আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার ব্যাপারে গভীর অনীহা ছিল আমাদের। এখন আক্ষেপ হয়, কিছু কিছু ডিসিপ্লিনড পড়াশোনা করা হয়ত উচিত ছিল। কিছু না হোক শরৎ সাহিত্যে নারী প্রসঙ্গে তো আজ দু-চারটে মেঠো বক্তৃতা দিতে পারতাম।

অজিত : আচ্ছা এই সময় কুলীন যেসব কবিরা ছিলেন, যেমন সমর সেন, বিষ্ণু দে —এদের দেখে কীভাবে রিঅ্যাক্ট করতেন?

উৎপল : অ্যাপ্রোচ্যাবিলিটি-র দিক থেকে?

অজিত : অ্যাপ্রোচ, ব্যবহার, কবিতার ফর্ম, কবিতাটা ওভাররেটেড কিনা— এইসব ভাবনাচিন্তা যা হয়ত বন্ধুদের মধ্যেই আলোচিত হল, বাইরে বলা নয়—

উৎপল : আমার প্রসঙ্গে একটু বলি। আমি আসলে ছেলেবেলা থেকেই লেখালিখির লাইনের লোক ঠিক নই। আর লেখালিখি যে আমার মূল ক্রিয়েটিভিটি-র

অঙ্গ— তাও নয়। ছেলেবেলা থেকে আমি যাতে ভাল ছিলুম সেটা হচ্ছে হাতের কাজ। পরে বিদেশেও নানারকম কাজ করেছি। আজকাল গৌরবার্থে যাকে ক্রাফট্ বলে সেই ক্রাফট্-এর কাজে আমার উৎসাহ ছিল। ছাপা, ডিজাইন করা, নক্সা করা ইত্যাদি বহু জিনিস শিখেছিলাম। আর একটা জিনিস আমি ভালো চালাতে পারতাম, সেটা হচ্ছে 'ফ্রেট স' (Fret Saw), পায়ে চালানো করাত আর কি! আমরা আদি মণিমেলার সদস্য ছিলাম, সেখানে প্লাই-উড কেটে রামকৃষ্ণ-রবীন্দ্রনাথ এঁদের ছবি পেস্ট করতাম। বিক্রি হত। প্রথম বিস্ময়কর একটা জিনিস জীবনে দেখলাম, সেটা হচ্ছে প্লাস্টার অফ প্যারিস। এসব বিস্ময়ের কোনো তুলনা নেই, এর কাছে অ্যানালিটিকাল পড়াশোনা, বই-টই কিছু আসে না। নামটা শুনে প্রথমে ভাবলাম এটা বোধহয় প্যারিস থেকে আসা কোনো জিনিস। তারপর ভাবলাম, বোধহয় কারবাইড। দেখলাম, তাও নয়, জলে গুলে দিলে পরে শক্ত হয়ে যায়, নানারকম মূর্তি ইত্যাদি গড়া যায়। এটা নিয়ে খুব মাতামাতি শুরু হল তখন। কংগ্রেসি মেলায় আমি রাজাগোপালাচারীর মূর্তি বানালাম— অনেকটা ডানা-কাটা পরীর ভঙ্গিতে। উনি খুব রেগে গেলেন। এই জাতীয় জিনিস এবং পারিবারিক সূত্রে শেখা কিছু হাতের কাজে আমার প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল। আমার মা নিজে অনেক হাতের কাজ জানতেন— যেমন চামড়ায় পাঞ্চিং মেশিন ব্যবহার করে ব্যাগ তৈরি-করা, পুঁতির মালা, স্টোনের দুল বানানো ইত্যাদি। এমনকি বাড়ির জুতো-টুতো পরিষ্কার করার দায়িত্বও আমার উপরে ছিল। ঘরদোর পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখতাম— গৃহকর্মে নিপুণ ছিলাম, বলা যায়—

রাঘব : লোচনদাস কারিগর-এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ?

উৎপল : তা কিছুটা আছে। এর থেকে আমি খানিকটা লেখার ক্রাফট্ শিখেছি। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলা ট্র্যাডিশনাল কবিতা পড়ে আমি লেখার ক্রাফট্ শিখিনি। এটা শিখেছি দৃশ্য ও বস্তু জগত থেকে, ভিসুয়াল এবং ট্যাক্‌টাইল (tactile) জগত যাকে বলে। এখানে এগুলোকে ছোটলোকামির কাজ হিসাবে দেখা হয়, কিন্তু আমি বিদেশে গিয়ে দেখলাম ওনারা এসব জিনিসকে প্রচণ্ড গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এসব কাজ যারা জানে তাদের মাথায় করে রাখা হয়। ইংল্যান্ডে একজন আর্কিটেক্ট-এর কাছে পার্ট-টাইম কাজও করেছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছিলাম। ইন্টারভিউ-তে, লন্ডন শহরে তখন যেসব প্রদর্শনী চলছিল তার মধ্যে কোন্‌টা কোন্‌টা আমি দেখেছি জানতে চাওয়া হল আর তাদের উপরে মন্তব্য করতে বলা হল। আমি জানালাম যে লন্ডনে কোনো প্রদর্শনী দেখিনি তবে এডিনবরায় রেনে ম্যাকিনটশ নামে একজনের রেট্রোস্পেকট্— প্রদর্শনী দেখেছি। উনি

ম্যাকিনটশের বিরাট ভক্ত, শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ম্যাকিনটশ এই শতকের শুরুতে জাপানে গিয়ে টোটাল ডিজাইন ধারণাটা শিখে আসেন। লোকে যখন বাড়ি করবে তখন— বাড়ি থেকে শুরু করে জামা-জুতো-চটি-টেবিল-কাঁটা-চামচ-ছুরি সব কিছু এক ডিজাইনের হবে, দেয়ার শুড বি এ কাইন্ড অফ টোটাল ডিজাইন হারমনি —এটাই উনি জাপান থেকে শিখে আসেন। এডিনবরার প্রদর্শনী দেখে নিমাইকে (চ্যাটার্জী) বললাম : নিমাই, এটা দেখে রথী ঠাকুরের শান্তিনিকেতনের বাড়ির কথা মনে পড়ছে না ? নিমাই বলল : হ্যাঁ। ম্যাকিনটশের একটা বিখ্যাত ডিজাইন হচ্ছে— মেট্রো ডিজাইন— ওই মেট্রো সিনেমা হলের মতো খাঁজকাটা স্থাপত্য। তখনকার দিনে মেয়েদের গহনাতেও ওই ডিজাইনের প্রভাব দেখা যেত। মনে পড়ে, সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের বই আসত আমাদের বাড়িতে, তাই দেখে বিয়ে-অন্নপ্রাশনে, ডাকে, গহনার অর্ডার হত। ওই শিল্পী সম্ভবত 'ম্যাকিনটশ' বর্ষাতিরও আবিষ্কারক। বিপ্লবের পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯২০ নাগাদ ডিজাইনের জগতেও একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়। ওখানে নামকরা ছিল 'ট্যাটলিন ডিজাইন'। ট্যাটলিন টাওয়ার হচ্ছে বিখ্যাত, স্বল্প খরচে তৈরি বিশাল চিত্রিত কারুকার্যময় মোবাইল স্তম্ভ। এই যে ডিজাইন, নকসা ভিস্যুয়ালাইজ করার মানসিকতা— এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে কমলদার (মজুমদার) মিল দেখেছিলাম। উনি শাঁখার কাজ, গালার গহনা, সোলার নক্সা— এসবে উৎসাহী ছিলেন। আমি লেখা-তে এসেছি এই ক্রাফট-এর ব্যাকগ্রাউন্ড এর থেকেই— সাহিত্যের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে নয়।

উপল : আপনি বললেন ক্রাফট্ আপনার লেখাকে প্রভাবিত করেছিল। ক্রাফট্-এ যেমন ফর্ম-এর দিকটাই বড়, বা ধরুন ফর্ম এবং কনটেন্ট এই দুটো দিক থেকেই বলছি— আপনার লেখায় এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটা কীভাবে স্থাপন করেন ?

উৎপল : আমার লেখায়— আপনি দেখবেন— যে কনটেন্ট-সচেতনতার চেয়ে ফর্ম-সচেতনতাটা বেশি। আমি ফর্মকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছি। সেটা হয়ত এ কারণেই যে লেখায় আমি কনটেন্ট-এর দিক থেকে আসিনি, এসেছি ফর্ম-এর দিক থেকে। যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা লেখাকে আমি ভিস্যুয়ালাইজ করতে পারি যে পাতায় কেমন দেখাবে, ছাপায় কেমন দেখাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার নিজের পক্ষে লেখা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। এখন যেমন ক'দিন ধরে আপনাদের 'যোগসূত্র' উল্টে-পাল্টে দেখছি, 'পঁচিশটি কবিতা' কীভাবে ছাপা হবে সে নিয়ে কিছু আলোচনাও হয়েছে। আই ট্রাই মাই বেস্ট টু ভিস্যুয়ালাইজ— সেটা ওই ক্রাফট্-এর চিন্তা থেকেই। এখন, অতটা শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায় কিনা সেটা আপনাদের বিচার। এর ফলে ক্লাসিসিজম-এর

প্রতি একটা টান স্বতই আসে। ক্লাসিকাল চিন্তাও মূলত ফর্মের প্রাধান্য— লেখায় যদি অবশ্য ফর্ম এবং কনটেন্ট-কে আলাদা করা যায়। যায় কিনা আমি না— সন্দেহ আছে— এবং এই ফর্ম-কনটেন্ট-কে আলাদা করার পিছনে নানা পলিটিকস্‌ও আছে। যাই হোক, যদি ফর্ম-কনটেন্ট কে আলাদা করা সম্ভব হয়, তাহলে দেখা যাবে আমার অনেক লেখাতেই কনটেন্ট অত্যন্ত মান্‌ডেন (mundane)— মানে গদ্যের মতো— না হলেও চলে, গুরুত্ব নেই কোনো— ও জিনিস হাজার লোকে হাজার বার লিখেছে। এই ফর্ম-এর সেনসিটিভিটি কীভাবে আসে? ওই যে 'শাওন রাতে যদি/স্মরণে আসে মোরে' — এটা গাইলে বাঙালির মনোজগতে (psyche) এর প্রতিক্রিয়ার কথা যদি ভাবেন তাহলে ইউ আর থিংকিং ইন টার্মস অফ ফর্ম, নট ইন টার্মস অফ কনটেন্ট। কনটেন্ট-ওয়াইজ এ জিনিসটা অত্যন্ত বাজে— রাবিশ।

রাঘব : ধরা যাক, একটি 'কালচারড' পরিবার, তাতে একটি ছেলে জন্মেছে যে ঠিক সময়ে রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায় ইত্যাদি পড়েছে— পড়ে একটা সময়ে সে সাহিত্য করবে বলে ঠিক করেছে। তাহলে তার একটা সাহিত্যের ডিসিপ্লিন তৈরি হয়েছে— সে একরকম ভাবে জিনিসটা বুঝেছে। আপনার ইতিহাস কিন্তু তা নয়।

উৎপল : সম্পূর্ণ উল্টো — হাঃ-হাঃ —

রাঘব : হ্যাঁ, সম্পূর্ণ উল্টো। আপনি কিছু গান শুনেছেন বা লোকসংস্কৃতির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক হয়েছে। এসব গানে কথাবার্তাগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়— খুবই 'পাতি' কথা, কিন্তু ওই 'পাতি' কথাটাই এমনভাবে গাওয়া হচ্ছে, এমনভাবে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে যে সেটা একেবারে মনে গিয়ে বিঁধছে। এই সোর্স-টার— এই ঝোঁকটার সবটাই প্রধান হচ্ছে ফর্ম-এর দিক থেকে। অর্থাৎ কীভাবে আমি পৌঁছব— কীভাবে অনুভূতিটা সৃষ্টি হতে পারে। চিন্তার চেয়ে অনুভূতিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যা আমি কমিউনিকেট করতে চাই। পরে আপনার কবিতায় দেখেছি যে অনুভূতি চিন্তার আকার নিচ্ছে, আপনি যতই পরিণত হয়ে উঠছেন— অনুভূতি আর চিন্তার মাঝখানে যে দেওয়াল, সেটা সরে যাচ্ছে। অনুভূতি থেকে আপনি চিন্তায় পৌঁছচ্ছেন। আমাদের এখানকার যে পরিশীলিত সাহিত্য, যেটা 'কুলীন' সাহিত্য, সেটা যেন একটা সাজানো বাগান। আর আপনাদের ক্ষেত্র হল আর একটা বাগান যা আপনিই হয়েছে, যেমন একটা প্রাকৃতিক অরণ্য। আর এখন চলছে সোস্যাল ফরেস্ট্রি— যার গাছগুলো জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যদি বলা হয় শিল্প-সাহিত্যের উপযোগিতা কী— তাহলে বলব এটা প্রয়োজনের সীমার বাইরে যে প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রের ব্যাপার। তাই যদি হয় তবে এর কোনো কনক্রিট শেপ থাকতে পারে না। এতে আমাদের অনেকানেক অনুভূতির

রঙ মিশে থাকে। একজন লোক যেমন মাতাল অবস্থায় এমন কিছু কথা বলে যা সে স্বাভাবিক অবস্থায় বলে না। সাহিত্যে যেমন ইনটক্সিকেটেড ইমাজিনেশন। এই যে প্রমত্ততা, এটা আর আমাদের সাহিত্যে নেই। আপনার কবিতায় দেখেছি এই প্রমত্তাকে বাগে আনার একটা চেষ্টা, সেটা বোধহয় আপনার ওই ক্রাফট্-এর জোর।

উৎপল : একটা কথা বলার আছে। ইফ ইউ গো অ্যালং পারস্যুইং দ্যাট লাইন অফ আরগুমেন্ট, ইউ উইল এন্ড আপ ইন রোমান্টিক পোয়েটস। রোমান্টিক কবিরা হয়ত এটা আরগু (argue) করবে। সোজা কথা হচ্ছে — ইয়োর ফার্স্ট ফিলিং অ্যাবাউট এনিথিং ইজ ইয়োর গাট্ ফিলিং। কোনো সন্দেহ নেই এতে। বিপ্লব হোক, ক্ষুধা হোক সব ক্ষেত্রেই ফার্স্ট ফিলিং ইজ গাট্ ফিলিং, ফার্স্ট ফিলিং হচ্ছে ইনটুইটিভ ফিলিং, ইমোশনাল ফিলিং। পরে, হয়ত মানুষ র‍্যাশনালাইজ করার চেষ্টা করে।

রাঘব : কিন্তু র‍্যাশনালিটি-কে আজ অত শ্রদ্ধার চোখে দেখি না। মনে করি যে র‍্যাশনালিটি অনেক সময় অনেক কিছুকে ধ্বংস করে রাজত্ব করেছে এবং ইর‍্যাশনাল জোন যেটা, সেটা র‍্যাশনালিটি-র থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত শিল্প সাহিত্যে।

[সামান্য ছেদ, গ্লাসে মদ ঢালা, হাতে হাতে তুলে দেওয়া ইত্যাদি।]

উৎপল : 'র নার্ভ' বলতে আমি যা বোঝাতে চেয়েছি সেটা বিরাট একটা অ্যাসোসিয়েশনাল ব্যাপার। প্রথমত বাঙালি সাইকি-র একটা অংগ হচ্ছে বর্ষার গান, আর একটা, যেমন মধ্যযুগের কবিতা। আমাদের ভিতরে পদাবলী, রাধার অভিসার, যমুনা নদী— এই ডার্ক ফোর্সেস (dark forces)-গুলো কাজ করে। যারা ক্রিয়েটিভ জাতি হয় তাদের মধ্যে এগুলো সহজে বিকাশ পায়— তাদের ক্রিয়েটিভিটির মধ্য দিয়ে। অন্যদের হয়ত সাইন্স-এ পায়, আমি ঠিক জানি না। এ প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট কাহিনী বলি। বিদেশে যখন ছিলাম, প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগত, নিঃসংগ বোধ করতাম। সন্ধেবেলা একটা বার-এ গিয়ে বসতাম ; ওখানে একটা দল আসত, তাতে খানিকটা প্রাণসঞ্চার হত। একদিন হয়েছে কী— গিয়ে দেখি, কেউ আসেনি, আমি একা। আমাদের মধ্যে বলাই ছিল, একা থাকলে অন্য কোনো দলে দলে গিয়ে যেন না পড়ি, কেন না নানারকম ঝামেলা, ড্রাগ ইত্যাদি চলত সেখানে। মাঝে-মাঝে পুলিশ রেইড করত। সে দিন একা বসে আছি, একটা ছেলে বিয়ারের বোতল নিয়ে আমার টেবিলে বসল ; বলল : তুমি ইন্ডিয়ান ? আমি বললাম : হ্যাঁ, তুমি ? বলল : আমি আইরিশ। পেইন্টার। ঘরবাড়ি রং করে। অর্থাৎ রাজমিস্ত্রি।

এইভাবে গল্প শুরু হল। দেখলাম, গান্ধী-টান্ধী দু-চারটে জিনিস ছাড়া ইন্ডিয়া সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না। আমাকে বলল : তুমি কী কর ? বললাম : লিখি। ও বলল : তোমাদের দেশে কোনোদিন বিপ্লব হয়েছে ? আমি বললাম : না, সেরকম কিছু হয়নি। বলল : তাহলে লেখ কী করে ? আমি দেখলাম, বেশ জটিল প্রশ্ন করেছে, তখন 'বার' বন্ধ হবার সময়। বললাম : আমি মনে করি লেখার সোর্স নানা জায়গায় হতে পারে, এমনকি প্রেজুডিস্‌ থেকেও লেখা হতে পারে। ও দেখল যে যেমন ভাবা গিয়েছিল তেমন নয়, এ হচ্ছে অনেক গভীর জলের মাছ। বগলে একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে আমাকে বলল : চল— আমার বাড়িতে। মনে পড়ে গেল, আমার স্যাঙাতরা কারো বাড়িতে যেতে বারণ করেছিল। তবু লোকটাকে দেখে অনুমান হল হার্মলেস আর আমারই মতো হাইট এবং চেহারা— খুব বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। খানিক দূরে গিয়ে ওর বাড়ি। দোতলায় উঠে দরজা খুলল— দেখলাম দুটো ঘর, তাতে চার-পাঁচটা খাট আর প্রতিটা খাটে অন্তত একটা করে বাচ্চা। বাচ্চাগুলো তো সব 'ড্যাডি এসেছে' বলে লাফিয়ে উঠল আর বউ ওকে দেখেই 'ইউ বাসটার্ড', এত রাতে ফিরেছ, আবার নিশ্চয়ই কোনো মাতাল বন্ধু নিয়ে এসেছ'—এইসব বলতে আরম্ভ করল। ও বিশেষ আমল না দিয়ে একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে আমাকে নিয়ে বসল। যেখানেই হাত দেয় দেখি একটা মদের বোতল বেরিয়ে পড়ে। পাক্কা আইরিশ চরিত্র। তর্ক তখনও চলেছে। আমি বললাম : তুমি উদাহরণ দেখাও যে সার্থক কোনো কিছু রেভোলিউশন-এর সময় হয়েছে, প্রি-রেভোলিউশনারি পিরিয়ড-এ হয়। বিপ্লব যখন হব-হব— তখন হয়— রাশিয়াতে যেমন হয়েছে। দেখলাম, মানতে রাজি নয়। রাত্রি প্রায় একটা। তর্ক জমে উঠেছে। দুজনেরই বেশ নেশা হয়েছে। আমাকে বলল : একটা গান শুনবে ? ছোট্ট একটা রেকর্ড প্লেয়ার বার করে জোর ভল্যুমে চালিয়ে দিল। ঘুমন্ত বাচ্চারা সব জেগে উঠল। আবার বউয়ের গালাগালি। মিনিট তিনেকের ছোট্ট একটা গান— একটা বাচ্চা মেয়েকে বলা হচ্ছে : তুমি ঘুমোও, চিন্তার কিছু নেই, কেননা তোমার মাথার কাছে 'কারমেলিটা' আছে। গান শোনার পর ওকে বললাম : বিশেষ কিছু তো পেলাম না, এটা তো ঘুমপাড়ানি (lullaby type-এর) একটা গান। ও বলল : তুমি বুঝতে পারনি, 'কারমেলিটা' হচ্ছে মেশিনগান ; বলা হচ্ছে এই মেশিনগান তোমাকে রক্ষা করবে আর তুমি শান্তিতে ঘুমোবে কারমেলাইট এক খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনী। আইরিশ লিবারেশন আর্মি-র বিবিধ বন্দুক-পিস্তলের এ প্রকার ধর্মীয় নাম দেওয়া হয়েছে। বুঝলাম এ বড় কঠিন ঠাঁই, এ জিনিস আমাদের মধ্যে নেই। যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম —এক এক জাত এই ডার্ক ফোর্সেস পারসিভ করে। আর আইরিশদের

এগুলো থেকে— বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যাপার, পাদরী, নান্, ইত্যাদি থেকে বেরুবার কোনো উপায় নেই। ইট ইজ এ পার্ট অফ দেয়ার সাইকিক ওয়ার্ল্ড।

রাঘব : ডার্ক ফোর্সেস বলতে কী বোঝাতে চাইছেন ?

উৎপল : ডার্ক ফোর্সেস বলছি কারণ এটা সাবটেরানিয়ান, আন্ডারগ্রাউন্ড, এ-জিনিস চট্ করে কেউ প্রকাশ করবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলছি, বাঙালি মনো-জগতের অঙ্গ যেমন যমুনা নদী ; সেটা যে বিশাল যমুনা নদী, তা নয়। এটা গাঁয়ের, রাধাকৃষ্ণ—

রাঘব : সেকি এখনও আছে ?

উৎপল : 'যমুনা' সাইকি এখনও আমাদের আছে।

রাঘব : এখনকার ছেলেপুলেদের মধ্যে ?

উৎপল : এখনকার ছেলেপুলে বলতে যারা শহুরে তারা হয়ত হারিয়ে ফেলেছে এটা।

রাঘব : গ্রামও তো বিকৃত অর্থে শহর হয়েছে।

উৎপল : তাহলেও আমার মনে হয় না এইসব ফোর্সেসগুলো অত সহজে যায়। এগুলো এক-একটা সিম্বল, যমুনা নদী একটা জাতি প্রতীক। ধরুন, সাপের গল্প। বাঙালির আড্ডায় সাপের গল্প আসবেই। প্রত্যেক বাঙালির একটা করে নিজস্ব সাপের গল্প আছে। সাপ হচ্ছে আমাদের মনোজগতের, আমাদের সাইকিক ওয়ার্ল্ড-এর ওই ডার্ক ফোর্স-এর একটা অঙ্গ। সাপ, যমুনা-নদী, বর্ষাকাল—

রাঘব : এই ডার্ক ফোর্স-টা আর একটু ব্যাখ্যা করুন।

উৎপল : ডার্ক শব্দটা মর‍্যাল বা গুড-ইভল প্রসঙ্গে ব্যবহার করছি না। যেটা বলতে চাইছি সেটা হল— এটা আমাদের গভীরে সাব-কনসাস মাইন্ড-এর ভিতরে রয়েছে, নানারকম কিউ (cue)-এ, বা যোগাযোগের ফলে সেটা বেরিয়ে পড়ে, নানা অন্য অ্যাকটিভিটিতেও বেরিয়ে পড়ে। সেদিন কমল (চক্রবর্তী) আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে গদ্যের বইয়ের কভারটা কীরকম হবে ? আমি বলেছিলাম : বাড়িতে যে জেঠিমা সারাবছর রান্না করে আসছে সে অষ্টমীর দিন ঠাকুর দেখতে ঠিক যেটুকু সেজে-গুজে বের হয়, বইটাও ততখানি সাজানো-গোছানো হবে। বলা মাত্রই ও বুঝে ফেলল। তার মানে, কমন একটা জগত আমরা শেয়ার করছি। একটা মিথের সহোদর আমরা।

রাঘব : তাহলে বাংলা সংস্কৃতির মধ্যে একটা 'বাঙালি' আছে আর একটা 'ইয়োরোপ' আছে।

উৎপল : আমাদের ইয়োরোপ নেই।

রাঘব : আপনার বইটা যেভাবে প্রকাশ করতে চাইলেন সেটা 'বাঙালি' একটা প্রোডাকশন। আর একটা ইয়োরোপীয় প্রোডাকশন আছে—স্মার্টলি প্রোডিউস করাই তার লক্ষ্য। বাঙালি প্রৌঢ়া মহিলার অষ্টমীর দিনের ঠাকুর দেখার

আর্টপেপারে সাজ —এভাবে সে প্রচ্ছদের কথা ভাবে না। আজকের দিনে আপনার কি খুব খারাপ লাগবে উৎপলদা, যদি আপনার কোনো কবিতার বই প্রচুর কপি বিক্রি হয়— ধরুন, তসলিমা নাসরিনের মতো—

উৎপল : আমি খুব অপমানিত হব। এটা সম্ভব নয়। এরকম কল্পনা করাও সম্ভব নয়। যেন 'কাল দশলাখ টাকা পেলে কী করবেন'—এরকম একটা প্রশ্ন। কেন আমাকে এভাবে উত্যক্ত করা ?

রাঘব : আপনি উত্যক্ত হতেও চান না ?

উৎপল : না-না, যা আমার কথা নয় তা জোর করে আমার মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া— বিষাক্ত সব জিনিস— হাঃ-হাঃ, তারপরে রি-অ্যাকশন দেখা কুকুরটা কতক্ষণ বাঁচে, বা এর লোম পড়ে যায় কিনা— হাঃ-হাঃ—

রাঘব : কিন্তু আপনার সহযাত্রীরা অনেকেই অসম্ভব রকমের বাজার-সচেতন। আপনি এখনও পর্যন্ত আপনার কবিতা সম্পর্কে গুটিকয়েক লোক কী ভাবে এটা নিয়েই কনসার্নড, লক্ষ লক্ষ লোক কী ভাবছে সে বিষয়ে উদাসীন। এটা কেন ? সাহিত্যের বাজার বুঝলেন না কেন ? আপনি কি উদার— মহান চরিত্রের কোনো লোক ? কোটি টাকার বই বিক্রি হলে আপনিও অনেক টাকা পাবেন— কোনো লোভ নেই আপনার ?

উৎপল : শুনেছি, কোটি কোটি বই যাদের বিক্রি হয় তারাও ঠিকমতো টাকা পায় না। অনেক খারাপ অবস্থায় থাকে।

অজিত : আমার কথা হল, আপনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো সাকসেসফুল নন। কিন্তু একটু অন্য জায়গা থেকে বলি। যদি এক হিসাবে কেউ মনে করে যে সুনীল বেশ আরবান ছিল, যতটা ভাবছি ততটা খারাপ নয় ?

উৎপল : হ্যাঁ, সুনীল আরবান ছিল ; আমি নিজেকে রুর‍্যাল, আরবান, ঘোর বাঙালি বা ইয়োরোপীয় এর কোনোটা হিসেবেই ক্লেইম করি না। কেন না সবসময় একটা দোলাচল, এটা থেকে ওটার মধ্যে আমি শিফট্ করেছি। যে বলছে, সে নিজেই 'আরবানিটি' বলতে কী বোঝে, 'ইয়োরোপ', 'স্মার্টনেস' বলতে কী বোঝে, এগুলো নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে অনেক। ইয়োরোপ যেমন আমাদের ভুল বুঝে থাকে, আমরাও তেমন ইয়োরোপকে ভুল বুঝে থাকি। ইয়োরোপের বহু কিছু জিনিস আছে যার খবর আমরা পাই না খালি ওইসব চকচকে বই দেখার ফলেই। ওখানেও বহু লোক রাস্তায় শুয়ে থাকে, বহু লোক লিট্‌ল ম্যাগাজিন বের করে— অনেক কিছুই এখানকার মতো। সামগ্রিকভাবে ইয়োরোপকে ধরা খুব কঠিন যেমন, ষাট-সত্তর-এ প্যারিসকে মার্কেট প্লেস অব আইডিয়াজ বলা হত। প্রত্যেকদিন নতুন নতুন বিষয়ে নতুন তর্ক— তাকে চ্যালেঞ্জ করা, নাকচ করা এইসব চলত। গোটা ফিল্ম-আন্দোলনে ষাট এর শুরুতে কিছু এথনোগ্রাফিক ফিল্ম দেখানো হয়।

সমাজতাত্ত্বিকরা আফ্রিকায় গিয়ে এইসব ছবি তুলেছিলেন। ছোট ছোট এই ছবিগুলো হলে মর্নিং শো-তে দেখানো হত। ছবি দেখে ফরাসি দেশে একটা নতুন আন্দোলন শুরু হল। 'নুভেল ভাগ' —নতুন ঢেউ। গোদার, রোব-গ্রীয়ে, ত্রুফো এঁরা সবাই ওই এথনোগ্রাফিক ফিল্ম-এর সন্তান। এর পরে পিটার ব্রুক আফ্রিকার একটা উপজাতির মধ্যে রিচুয়ালস এর মতো নাটক ধরনের একটা জিনিস দেখলেন —কনফারেন্স অব দি ক্রোজ— কাকেদের সম্মেলন। উনি এটা নিয়ে নাটক করলেন। এটা আমি স্টেজে দেখেছি অভিনীত হতে, কোনো কথা নেই, শুধু অভিব্যক্তি, দু-ঘণ্টা ধরে কালো পোশাক পরে কাকেদের মতো ঘোরাফেরা, ভঙ্গি ইত্যাদি। মহাভারত করার সময়ে পিটার ব্রুক এদেশে এসেছিলেন এবং ছৌ-নাচ দেখেছিলেন। এর প্রচুর মুভমেন্ট উনি ব্যবহার করেছেন। ওঁর মহাভারতে ভীমের প্রবেশ যেভাবে দেখানো হয় তা বিস্ময়কর। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে ভীমের মার-প্যাঁচ-বীরত্বের নানা কলাকৌশলের প্রদর্শন চলে। আমাদের এখানে তো এভাবে দেখানো হয় না। সেই কথাই বলি— ইয়োরোপ যে রকমভাবে আমাদের বোঝে, আমরা সেভাবে বুঝি না, আমরাও তেমন একভাবে ইয়োরোপকে বুঝে থাকি— ভুল-ঠিকের কথা আলাদা।

আইরিশদের সঙ্গে আমাদের একটা চরিত্রগত মিল আছে। কথা বলা আর সাহিত্য ছাড়া ছবি, গান ইত্যাদি ওদের নেই। আমাদেরও একই সম্বল, বাঙালির ছবি নেই, নাচ নেই, একেবারে শূন্য— মানে 'কুড হ্যাভ বিন বেটার' —এরকমও বলা যাবে না। অথচ পাশের রাজ্য উড়িষ্যা—সেখানে লোকেদের নাচ, স্থাপত্য ইত্যাদিতে দারুণ পারদর্শিতা। কী করে হয় এটা? কিছু কিছু কারণ আমি অনুমান করতে পারি। আমরা, বাঙালিরা হচ্ছি ভয়ঙ্কর-ভাবে মিশ্র— সংকর জাতি। সংকর জাতির যা-যা চরিত্র সবই আমাদের মধ্যে রয়েছে। হট-টেম্পারড, হাইলি ইমোশনাল, কোনো কিছুতে স্টিক না করা, ডেসট্রাক্টিভ ভ্যান্ডালিজম— সুন্দর জিনিসকে নষ্ট করে ফেলা— এসব আমাদের বৈশিষ্ট্য।

মন্দির না থাকলে নৃত্য হয় না, আবার স্পেস না থাকলে মন্দির হয় না। অন্যান্য অনেক রাজ্যেই বিস্তৃত স্পেস রয়েছে, যেমন উড়িষ্যায়, পাহাড় পাবেন, সমুদ্র পাবেন, যেটা ভৌগোলিকভাবে এদিকে, বাংলায়, ততটা নেই। ভৌগোলিক কারণ ছাড়াও, হিউম্যান সেটল্‌মেন্ট-এর প্যাটার্ন-টাও দেখতে হবে। এখানে বসবাসের ধরন ছিল অনেকটাই ট্র্যানজিটরি···

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তীর একটা তত্ত্ব আছে। তাঁর মতে, গোটা উপকূলবর্তী অঞ্চল জুড়ে বাঙালির সামুদ্রিক বাণিজ্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অথচ আমাদের লেখালিখিতে সমুদ্র

সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। চাঁদ-সদাগর ইত্যাদি যা আছে তা লৌকিক গল্প মাত্র। এর কারণ আমার জানা নেই।

এইসব বিষয় নতুন প্রজন্মের গবেষকদের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

রাঘব : রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে বাংলা সাহিত্যের কথা ধরা যাক। দুটো ধারা— একটা লোকায়ত আর একটা সংস্কৃত সাহিত্যকে উৎস ধরে এক ধরনের গদ্যচর্চা। রবীন্দ্রনাথ আসায় বাংলা 'আধুনিক' হল। তাতে আমাদের ভাষা কি তার সহজ, স্বাভাবিক পরিক্রমা-অন্তে আধুনিক হয়েছে নাকি বড় মাপের প্রতিভার চাপে আকস্মিকভাবে প্রায় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর মতোই বাংলা ভাষা আধুনিক হয়ে উঠল ? ফলে আমাদের গদ্য ভাষায় যে নানারকম প্রকাশভঙ্গি ছিল সেটা এমনভাবে স্ট্রিমলাইনড্ হয়ে গেল যে সব কথা আর সেভাবে বলাই যায় না ?

উৎপল : এটা খুব বড় একটা ক্যানভাস। প্রথমত ভাবার আছে— রবীন্দ্রনাথে একটা যুগের শেষ ও আর একটা যুগের শুরু। সমান্তরাল একটা প্রসঙ্গ উদাহরণ-স্বরূপ বলি। আপনারা জানেন, ইয়োরোপে খ্রিস্ট-ধর্ম যাওয়ার আগে, যিশুর জন্মের ২০০-৩০০ বছর পরে, বহু প্যাগান ধর্মাচারের প্রচলন ছিল। এইসব ধর্মের একটা বিরাট অংশ জুড়ে ছিল শরীর (Body)— শরীর-কেন্দ্রিকতা (Body-oriented)। এই সময়ে (৩৪০-৩৫০ খ্রি.) উত্তর আফ্রিকার কার্থেজ থেকে অগাস্টিন নামে এক কিশোর রোমে এসে, খ্রিস্ট-ধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি সময়কালে ডকট্রিন, ডগ্মা, রিচুয়ালস্—ইত্যাদি তৈরি করলেন। বাইশ ভল্যুমে সেই গ্রন্থাবলীর নাম 'সিটি অফ গডস'। শুরু হল হেরেসি— যারা অগাস্টিনিয়ান মতবাদে বিশ্বাস করে না তারা হেরেটিক—তাদের জন্য শারীরিক অত্যাচারের বিধান দেওয়া হল। সেন্ট অগাস্টিন আত্মার পরিশুদ্ধির (soul-কে refine করা) কথা বললেন। এর আগে গ্রিক ধর্মচর্চায় শরীরের প্রাধান্য ছিল, সৌন্দর্যবোধের কেন্দ্র ছিল শরীর। এমনকি শরীর-সংক্রান্ত ভাবনা এমন জায়গায় পেঁছেছিল যে হোমো সেক্সুয়ালিটি, লেস্বিয়ান লাভ ওয়াজ অ্যাকসেপ্টেড। উনি সমস্ত জিনিস একেবারে গোড়া থেকে কেটে দিলেন। রোমে এসে তিনি কৈশোরে দেখেছিলেন লোকেরা সব মনে মনে পড়ে। উনি এতে অবাক হলেন। উনি জানতেন জোরে পড়াটাই একমাত্র রীতি। তখন উনি এক নতুন সত্যকে আবিষ্কার করলেন— তাহলে মানুষের মনকে স্পর্শ করার কোনো একটা নীরব উপায় রয়েছে। এটা অনেকটা ওর‍্যাল থেকে রিটেন্ কালচারে আসার মতো বৈপ্লবিক ঘটনা। কিন্তু প্যাগান, অখ্রিস্টান দেহবাদীরা তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়, অনেকটা আমাদের তান্ত্রিকদের মতো। ভূত-প্রেত ডাইনিতন্ত্র ইত্যাদি নানা অকাল্ট (occult) জিনিসে তারা আশ্রয় নিল। ৪০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গোটা ইয়োরোপের

ইতিহাসটাই হচ্ছে বিধর্মীদের উপরে নির্মম অত্যাচারের ইতিহাস— তাদের খ্রিস্টান মতাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা, দেহবাদীদের কৃচ্ছ্রসাধনের পথে নিয়ে আসার চেষ্টার ইতিহাস। ১২০০-তে শুরু হল ক্রুসেড (Crusade) এবং ওই সুযোগে হেরেটিকরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। রাজভয়, ধর্মভয় দিয়ে যা চেপে রাখা হয় তার বিরুদ্ধে কীরকমভাবে নতুন নতুন প্রতিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে— পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজলে সেসবের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যাবে। এইসময় দক্ষিণ ফ্রান্সে 'ত্রুবাদুর' সাহিত্যের সূত্রপাত হয়। যিশু নয়, ভগবান নয়, ওই জানালায় বসে থাকা যে মহিলা, তারই উদ্দেশে ব্যক্ত হল গান। ত্রুবাদুররা ছিল যাযাবর ধরনের, অনেকে বলে সিরিয়া থেকে ভারতবর্ষ ঘুরে তারা ফ্রান্সে গিয়েছিল। একদিকে যেমন ধর্মযুদ্ধ শুরু হল, অন্যদিকে ত্রুবাদুর কবিরা গোটা ধর্মযুদ্ধের যে উদ্দেশ্য, খ্রিস্টান ধর্ম যা রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করছিল, তা পুরো ধসিয়ে দেওয়া বলতে যা বোঝায়— তা-ই করল। কবিদের এমন একটা মারাত্মক ক্ষমতা আছে! তারা সমাজের মধ্যে একটা সাবভারসিভ রোল (subversive role) প্লে করতে পারে। উপরে যা মেনে নেওয়া হচ্ছে, ভিতরে ভিতরে কবিরা তা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিতে পারে। আরও বিস্তৃতভাবে বলা যায়, যে কোনো সভ্যতা যখন খুব বড় ধরনের হয়ে ওঠে, তখন তার ভিতরের ধ্বংসের বীজ গাছ হয়ে বিকশিত হয়। এই ফেটালিজম (fatalism) জগতজুড়ে, সব ইতিহাসে দেখা যায়। কিন্তু এখানে পাইয়োনিয়ার হচ্ছে কবিরা। তাঁদের ছবি-আঁকিয়েদের মতো মাল-মশলা নিয়ে ঘুরতে হয় না, লেখার জন্য এক টুকরো কাগজ পেন্সিল হলেই হল। আর ওই ওর‍্যাল সাহিত্যের যুগে কবিরা কোথায় কাকে কী বলে বেড়াচ্ছেন, কী ছড়া কাটছেন, গান বাঁধছেন তাও নিয়ন্ত্রণের উপায় নেই।

এই যে দেহ ও দেহজ প্রেমকে ভিত্তি করে রচিত ত্রুবাদুর সাহিত্য—এর মধ্যে যিশুর উল্লেখ পর্যন্ত নেই, ধর্মীয় চিন্তার লেশমাত্র নেই, আমি ও আমার প্রেমিকা— এটাই প্রধান। একে কিছুটা রোমান্টিক বলা যেতে পারে। এই ধারার সমন্বয় ঘটল দান্তের মধ্যে। দান্তের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিক মানসিকতার শুরু। এই মধ্যবর্তী অবস্থানের জন্য তাঁর গুরুত্বকে দু-দিক থেকেই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথেরও অনেকটা তাই। আমরা তর্ক তুলতে পারি, রবীন্দ্রনাথে মধ্যযুগ শেষ হচ্ছে না আধুনিক মানসিকতার সূচনা হচ্ছে?

রবীন্দ্রনাথের সাবভারসিভ রোল বুঝতে গেলে তাঁর পূর্ববর্তী যুগটাকে আমাদের বুঝতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ যে মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ কি একদিক থেকে তা সাবভার্ট (subvert) করেননি? ওঁর মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার চিন্তা, শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা— এগুলোকে

এক্সট্রা লিটারারি অ্যাকটিভিটি হিসাবে না দেখে গোটাটাই তাঁর ক্রিয়েটিভ জীবনের অঙ্গ হিসাবে দেখা উচিত। আর ভাষার আধুনিকীকরণ প্রসঙ্গে বলতে পারি যে আধুনিক মনের অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে দ্বিধা বা ডায়লেমা (dilema), রবীন্দ্রনাথের আগে সাহিত্যে যার কোনো চিহ্ন নেই। নোবেল পুরস্কার পাবার পরে এক সাক্ষাৎকারে ওঁকে নাকি প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'What is your greatest virtue ?' উনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'Inconsistency', আর 'What is your greatest fault ?'— এ প্রশ্নের জবাবেও বলেছিলেন, 'Inconsistency'. এইসব সূক্ষ্মতা উনিই প্রথম বুঝতে পারেন। এই ধরনের চিন্তা শুধু সাক্ষাৎকারে নয়, তাঁর গানে, সাহিত্যেও প্রকাশিত হতে দেখি। শেষের দিকের লেখাগুলো অদ্ভুত সব কনট্রাডিকশন-এ ভরা। A Man full of contradictions. A Man who is very proud to say/express, 'I am full of contradictions'. এই হচ্ছে আধুনিক মন। মধ্যযুগের প্রতিটি মানুষ হচ্ছে নিশ্চিত মানুষ। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এঁরা তাই। মধুসূদন সম্পর্কে অবশ্য আমার জানাটা কম। ওঁর সম্পর্কে একটাই কথা বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের মতো কনট্রাডিকশন— এই আধুনিকতা ওঁর লেখায় ছিল না।

...

একটু আগে, একটা যুগের শুরু ও একটা যুগের শেষ ইত্যাদি প্রসঙ্গে বলছিলাম। এই যুগসন্ধিক্ষণে প্রতিভাবান কেউ দাবি করতেই পারেন যে তিনিই এটা ঘটিয়েছেন। যেমন দান্তের ক্ষেত্রে বলতে পারি। আবার মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক এর মধ্যে অর্থনৈতিক কারণ, উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন ইত্যাদি ব্যাখ্যা খুঁজবেন, কেউ হয়ত অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটেছিল কিনা দেখবেন, এরকম বহু ফাংশনাল (functional) ব্যাখ্যা হতে পারে। তবু রহস্যের সমাধান হয় না। একটা যুগকে আমি বুঝব কী করে ? আমাদের দেশে যেমন চৈতন্যদেবে মধ্যযুগের সূচনা এবং রবীন্দ্রনাথে এর শেষ। এখন রবীন্দ্রনাথে মধ্যযুগের শেষ না আধুনিক যুগের শুরু— এ প্রশ্ন উঠতেই পারে।

রাঘব : মধ্যযুগে আমাদের সাহিত্য মোটামুটি ঘরে ঘরে পৌঁছত। আধুনিক যুগে যখন চলে আসছি তখন সাহিত্যকে মাইনরিটি-র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে দেখছি। এটা কি তাহলে আধুনিকতার একটা লক্ষণ যে ভাষা মেজরিটি-র কাছে পৌঁছবে না ? বা যখন সেটা বাজার-অর্থনীতি অনুসারী হয় তখন পৌঁছয় ? যখন সেটা তরল হয়ে ওঠে ? যখন সে ভাষায় গ্রাম্য, তরল সব উপাদান ঢুকে পড়ে আর বহিরঙ্গে আধুনিকতার একটা আবরণমাত্র থাকে তখন পৌঁছয় ? না হলে তো বলব এটা একটা রিগ্রেশন !

উৎপল : এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে বেশ কঠিন, কেন না এটাও আমার মনোজগত বা চিন্তাজগতের বাইরে। এ নিয়ে আমি ভাবিনি। বহুরকম ফাংশনাল বা কেজো কারণ অবশ্য আমরা খুঁজে বার করতে পারি। যেমন বাণিজ্য, প্রচার ইত্যাদি। আর বহু ক্রিয়েটিভ জিনিস আছে যা আমাদের মনোজগতের গভীরের বস্তু। যার জন্যে, প্রচার অতটা না থাকা সত্ত্বেও নজরুল এখনও এখানে গানের বা একটা মানসিকতার প্রবক্তা— তা খারাপ-ভালো যাই হোক না কেন। এটা খুব ভালো বোঝা যায় জনপ্রিয় জিনিসগুলোর দিকে লক্ষ করলে। গানের ব্যাপারে বিশেষ করে যৌনতার একটা বিরাট ভূমিকা আছে। গান বা গান-জাতীয় যা কিছু জনপ্রিয় হয় তার মধ্যে যৌনতার ভূমিকা যে কতটা তার হিসাব এখনও আমরা করে উঠতে পারিনি। যে ডার্ক ফোর্স-এর কথা আমি বলছিলাম, তার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে সেক্সুয়ালিটি। ভিটগেনস্টাইন একসময় বলেছিলেন যে আমাদের গোটা চৈতন্য বা বোঝা-টোঝার ব্যাপারটা হচ্ছে একটা দড়ির মতো। তার অনেক-গুলো স্ট্র্যান্ডস (strands) বা সুতো রয়েছে, সুতোগুলো মিলে দড়িটা তৈরি হয়েছে, কোনো একটা সুতোকে যদি আলাদা করি সেটা সহজেই ছিঁড়ে যায়, কিন্তু সুতোগুলো একসঙ্গে মিলে শক্ত দড়ি তৈরি করে।

অজিত : আচ্ছা, এটা শুধু গানে কেন, এতো কবিতা, প্রবন্ধ সবকিছুরই হবার কথা—

উৎপল : হ্যাঁ, কিন্তু বাঙালিদের সাংস্কৃতিক অবদান বলতে দুটো— সাহিত্য আর গান। গান মানে সাহিত্য-নিয়ন্ত্রিত যে গান। ধ্রুপদী গান নয়। ধ্রুপদী গানেও আমরা বেশ দুর্বল। কেউ হয়ত ফিল্মের কথা তুলবেন। কিন্তু এখানে ফিল্মও তো সাহিত্য-নির্ভর। স্বাধীন-ছবি করার কথা এখন অবশ্য কেউ কেউ ভাবছেন।

রাঘব : এটা বোধহয় স্বীকার করতেই হবে যে সৎ ভাবে সাহিত্যচর্চা (authentic literature) বলতে যা বোঝায় তার অভাব খুবই দেখা যাচ্ছে। সৃষ্টি কাকে বলব ? যা নতুন, তাকেই তো ? গদ্যে বছরের পর বছর ধরে একটা চর্বিত-চর্বণ দেখে যাচ্ছি। উপন্যাসের সংজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করা হয় না, নতুন মাত্রা যুক্ত হয় না, একই জিনিস লিখিত হয়ে চলেছে, তা নিয়ে আলোচনা, প্রশংসাও হচ্ছে যা সাহিত্যের জায়গা থেকে নয়। ধরুন, সমাজ সম্পর্কে আমার কিছু মতামত আছে এবং আমি একজন পীর। 'টারজান' জাতীয় গল্প লিখে বললাম এটাই আধুনিকতা, পরচা-পাট্টা ইত্যাদিতে যা আছে সেটাই আমাদের সমাজ। এমনকি আমাদের খবরের কাগজগুলো পর্যন্ত আধুনিক নয় ; যদি হত তাহলে সাংবাদিকতা জিনিসটাও অন্তত সাহিত্যের প্রান্ত ছুঁয়ে থাকত। সেক্ষেত্রে অবশ্য যারা সাহিত্যের নামে সাংবাদিকতা করে তাদের পেশা পরিবর্তন করতে হত। চল্লিশের তথাকথিত প্রগতিশীল

সাহিত্য, যা সামাজিক তথ্যগুলোকে সাহিত্যের মাধ্যমে জানাবার চেষ্টা করেছে এবং কিছুটা বাজার পেয়েছে, এখন সে ধরনের সাহিত্যকেও মেইন স্ট্রিম গ্রাস করে নিয়েছে, 'দেশ' পত্রিকায় 'ছোটলোকের যৌনতা'-র গল্প ছাপা হচ্ছে। তাহলে সৃষ্টি কোথায় হচ্ছে? আর সৃষ্টি যে হচ্ছে না, তা নিয়ে সাহিত্যিক-মহলেও কোনো গোলযোগ নেই; তাহলে কি খেতে-পরতে পেলে আর বাজার চললেই হল? অবস্থাটাকে আপনি কী রকম মনে করছেন? হতে পারে, একটা সময়ে হয়ত কোনো আঞ্চলিক ভাষায় এরকম সঙ্কট আসে, কিন্তু তা নিয়ে বেদনাবোধ তো থাকবে?

উৎপল: এর বিভিন্ন স্তর আছে। স্তরগুলো আবার পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যা আলাদা করা মুশকিল। প্রথমত, এটা বাংলা গদ্যের সমস্যা। বাংলা গদ্য কোনো সময়েই বাংলা কবিতার কাছাকাছি আসেনি, চিরদিনই একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। অবশ্যই ব্যতিক্রমী হলেন দু-জন। প্রথমজন রবীন্দ্রনাথ, যদিও তাঁর সম্পর্কে মতভেদ থাকতে পারে; দ্বিতীয় জন সম্পর্কে আশা করি মতভেদ নেই, তিনি— কমলকুমার মজুমদার। এঁদের পাশে অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে দু-চারজনের নাম করা যায়। গদ্য, আমাদের ক্ষেত্রে, সবসময়েই রুটি ছুঁড়ে দিয়ে কুকুরকে অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার মতো একটা চালাকি করে এসেছে। যাতে কুকুর আমাকে না কামড়ায়। রিয়ালিটি হচ্ছে ওই ছুঁড়ে দেওয়া রুটিটা। আর আমার যা যা করার তা যেন ঠিক ঠিক মতোই করতে পারি। কুকুর রুটি খেয়ে যাক, আমি যেন পরোটা-মাংস খেতে পারি। গদ্যকে দিয়ে এ কাজটা করানো বাঙালির সাহিত্যে গ্রেটেস্ট ক্রাইম। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; প্রত্যেক গদ্যলেখক এই ক্রাইম-এর অংশীদার। সৌভাগ্যবশত, সত্তর-এর পর থেকে, তখন যে সমস্ত রাজনৈতিক সচেতনতা এসেছিল, মূলত তারই অবদান হিসাবে গদ্যলেখকরা সচেতন হয়েছে যে এ ক্রাইম-এ আমার অংশ না নিলেও চলবে। নিতে পারলে অবশ্য খুবই ভালো, ওই যে বই বিক্রির কথা বলছিলাম— যদি প্রোফেসর শঙ্কুর মতো একটা চরিত্র সৃষ্টি করতে পারি, তাতে দশলক্ষ কপি বিক্রি হবে। সমস্ত চোরাই গল্প, চোরাই গল্পের চোরাই গল্প, চোরাই ব্যবসা, চোরাই পয়সা, হাতে নিতে ঘেন্না হয় এইরকম ধরনের বই চালু হয়েছে। সুন্দর কাভারে সুন্দর ছাপা ইত্যাদি— মাল যত চোরাই তত সৌন্দর্য বেশি। ভাগাড়ে মৃতদেহ পড়লে যেমন শকুনের অভাব হয় না তেমন ফিল্ম-মেকার, ছাপাই-ওয়ালা, প্রচ্ছদ-আঁকিয়ে ইত্যাদি বহু লোক এসে গেছে। এদের সম্মান দিয়ে বলছি— এরা শকুন ছাড়া আর কিছু নয়। সম্মানিত শকুনেরা সব গাছের ডালে বসে আছে কেন না ভাগাড়ে একটি মৃতদেহ পড়েছে— পুজো সংখ্যার নতুন উপন্যাস; কিছু খোরাক আছে কিনা

দেখা যাক, সিনেমা যদি হয় তবে হয়ত ফ্রান্স-জার্মানির গ্রাম্য কোনো পুরস্কারও জুটে যেতে পারে। এই ছকের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে।

এর আর একটা খারাপ দিক হল, এতে সমাজের মধ্যে একটা পিছুটান জন্ম নেয়, রক্ষণশীলতা আসে। আমরা পুরনো দিনের লেখা পড়ব, মধ্যযুগে ফিরে যাব, পদাবলী পড়ব— সেনসিটিভ লোকেরা এইসব পিছুটানের দিকে চলে যায়। সৎ সাহিত্যবস্তুর খোঁজে তারা আজ রামপ্রসাদ, সাধক কমলাকান্তের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অংশত কমলকুমারকেও শেষজীবনে এই সব জিনিসে আশ্রয় খুঁজতে দেখা গেছে। আমি এই প্রবণতার বিরোধী। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই ১৯৯৪-তেই থাকতে চাই, ১৮৯৪-এ যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যে কারণে আমার অনেক ড্র ব্যাকস্‌ (drawbacks) আছে। আমার জনপ্রিয় না হবার অন্যতম কারণ হচ্ছে এটা। অনেক সমালোচিত হয়েছি আমি এ জন্যে। সত্যিই তো, আমি কি মাথার নিচে একটা নরম বালিশ খুঁজে পাব না, যদি পাঁচশো বছর আগের চৈতন্যচরিতামৃতে ফিরে যাই?

একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসছে যে একজন প্রধান লেখক— তার অবস্থানটা কোথায়? তার সংস্কৃতি, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে? আমাকে প্রশ্ন করা হতেই পারে— কেন প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু নিজেকে সবসময় প্রতিবাদী চরিত্র হিসাবে ভাবাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে তো ছিদ্রান্বেষী, তিক্ত, কলহপরায়ণ, প্রত্যেকের দোষ দেখা— এরকম একটা চরিত্রে ফিরে যেতে হয় যা একপ্রকার আত্মহত্যার সামিল। এই মৃত্যু আমরা ঋত্বিকের ক্ষেত্রে দেখেছি। একসময় থিয়োরি ছিল, ক্রিয়েটিভ লোককে যদি কাজ না করতে দেওয়া হয় তাহলে তার ক্যানসার হবে। অতটা জানি না, এটুকু বলতে পারি, মনের দিক থেকে সে ডিজেনারেট (degenerate) করবেই, মানসিক অসুখ হবে। কাউকে ধ্বংস করতে হলে আগে একটা উপায় ছিল তাকে ক্রিয়েটিভ কাজ না করতে দেওয়া। এই যে তথাকথিত বাণিজ্য বা সফলতার জগত, তারও কিন্তু লক্ষ্য হচ্ছে ক্রিয়েটিভ লোককে কাজ না করতে দেওয়া, শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়ে তাকে এইভাবে ধ্বংস করা। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের কাজ হচ্ছে তাকে এড়িয়ে চলা— 'আমি তোমার আইনে, তোমার গ্রাউন্ডে খেলব না, অন্য গ্রাউন্ডে খেলব।' এই হচ্ছে ক্রিয়েটিভ লোকের ধূর্তামি, এই ধূর্তামি করেই তাকে আজকে বাঁচতে হবে, টিকে থাকতে হবে। এই হচ্ছে তার চ্যালেঞ্জ। তার সাবভারসিভ রোল··· তার আন্ডার-গ্রাউন্ডে চলে যাওয়া··· সাঙ্কেতিক ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করা···

অজিত : আপনি লিখেছিলেন 'বসন্তে এনেছি আমি হাবা যুবকের হাসি'। সেই হাবা যুবকের এরকম একটা ইমেজ আসত আমাদের কাছে : একজন প্রতিবন্ধী

ছেলেকে মা নিয়ে গিয়েছে বোটানিকাল গার্ডেনস্-এ, সে দেখছে বসন্ত, তার হাসি ফুটে উঠেছে ইত্যাদি। এখানে আপনি 'আমি' শব্দটা আনলেন, দাবি করলেন যে আমি হাসাচ্ছি ওই হাবা যুবককে, আমি ওর উপরে ঈশ্বরের মতো, আমি লেখক, কবি আর হাবা ছেলেটা তাকাচ্ছে, তার কাছে কবিতার বই এসেছে, আপনার কিংবা জীবনানন্দের— সেখানে অদ্ভুত একটা বিস্ময়। আপনার 'পুরী সিরিজ' পড়ে আমার মনে হয়েছিল— এটা ঠিক বুঝতে পারছি না, ধরতে পারছি না, কিন্তু একটা অদ্ভুত হাবা হাসি, বিস্ময় আসে— যে এটা ডিফারেন্ট। এর ম্যাজিকটা ধরা— যেন চ্যালেঞ্জ করছে— এই যে হাবা হাসির কবিতাগুলো আমি একটু একটু বুঝছি। এই হাবা হাসির জায়গা থেকেও তো একটা সাহিত্য হয়। আপনারা পাঠকশ্রেণী ও প্রতিভাবানের জায়গা থেকে দেখেছেন; আজকে প্রতিভাবান সেরকম আর্সেনি, দশ-পনের বছর পরে হয়ত তার জায়গাটা তৈরি হবে। আজকে কিছু হাবা ছেলে হয়ত সুইসাইড স্কোয়াড-এর কাজ করবে। কিছু পত্র-পত্রিকা তাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টাগুলো ধরে রাখবে, তারা মরে যাবে। তাদের কাছে চ্যালেঞ্জ শুধু বাজারি সাহিত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া নয়। সন্দীপন, উৎপল থেকেও বেরিয়ে যাওয়া, ক্যামু, সার্ত্র থেকে বেরিয়ে যাওয়া— তাকে নতুন আনতে হবে।

এক ধরনের লেখালেখি আছে যাকে আমার পরিভাষায় বলব Parasitical, Parricidal বা Patricidal writing। Parasite-এর মতো বেড়ে উঠছে, তারপর তাকে গুলি করে মারছে—

উৎপল : বুঝে নিই— গুলি করে মারছে মানে তারা যে লেখায় অনুকরণ করছে বা সেই পথ ধরে চলার চেষ্টা করছে, সেটাই অরিজিন্যাল কবিকে মারার চেষ্টা ?

অজিত : তাতে একটা জায়গায় দেখছেন যে সে আপনাকে অস্বীকার করছে। আপনাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করছে কিন্তু হঠাৎ আপনাকে ইনটারোগেট করতে শুরু করেছে। এতকাল হয়ত আপনাকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করেছিল, হঠাৎ ইনটারোগেট করা শুরু করেছে—

বিনয় : যেখান থেকে তুমি উৎপল বসুকে দ্বিতীয় পোস্ট মডার্নিস্ট কবি বলেছ ?

অজিত : সেটা সম্পূর্ণ আমার নিজের কাছে—

উৎপল : দ্বিতীয় বলার একটা সুবিধে হচ্ছে প্রথমটা কে সেটা—

অজিত : প্রথম জীবনানন্দ দাশ। আর কে হবে। কিছু কিছু লেখক থাকে তারা সবসময়— যেমন সার্ত্র লিখেছেন মালার্মে নিয়ে, দেরিদা লিখেছেন মালার্মে নিয়ে, মালার্মে আধুনিকতা এবং উত্তর-আধুনিকতার একটা বর্ডার লাইন। যারা পড়াশোনা করছে তারাও কিন্তু আপনাকে ওইভাবে সিরিয়াসলি নেয়— যে, এর থেকে আমাদের ড্র করতে হবে, এর থেকে আমাকে বুঝতে হবে, এর

লিখনভঙ্গিমার চার্ম-এ আমি পড়ে যাব না, তাহলে সেটা আমাকে গিলে খাবে, আমি মরে যাব—

উৎপল : পয়েন্টটা আমি বুঝতে পেরেছি। এটা হয়, যে একই লেখক কিন্তু দুই পর্যায়ে, যার আগে একটা pre-যুগ গেছে, পরে একটা post-যুগ আসছে, যাকে বলে বিভাজক ধরনের একজন লেখক— তার ক্ষেত্রে। তবে এখানে আমারও প্রশ্ন আছে। আমার মনে হয় এতে লেখাকে, সাহিত্যকে যান্ত্রিক-ভাবে দেখার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। একজন লেখক তৈরি হবার পিছনে শুধুমাত্র সাহিত্য বা লেখা তো কাজ করে না, আমার নিজের ক্ষেত্রে যেমন সাহিত্যের ভূমিকা নগণ্য— কিন্তু আমি অন্যান্য বহু সোর্স থেকে নিয়েছি, যেমন ক্রাফট্-এর কথা বলেছি। নিজের সাইকো-লিংগুয়িস্টিক যে জগত, তার বাইরে অন্যের ভাষার ব্যবহারও আমার কবিতায় আছে, একটা বাক্য নয়, গোটা chunk তুলে দেওয়া হয়েছে। যেমন একজন চালওয়ালি কী ভাষায় কথা বলে, তার ভেতরে সে কী জগত প্রকাশ করছে সেটা আমি টেপ-রেকর্ডারের মতো তুলে নিয়েছি, অচেতন বা অবচেতনভাবে কিছু ঝাড়াই-বাছাই নিশ্চয়ই করেছি। কিন্তু আজকাল যেটা হয়, হয়ত বয়স বাড়ার ফল, আমি বহু কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, দুপুরবেলায় বাড়িতে যখন কিছুটা নিঃসঙ্গ থাকি, ঘুমিয়ে পড়লাম হয়ত ৩/৪-টের সময়, তখন আমি যে সব গলা শুনতে পাই সে সব আমি ছেলেবেলায়— যখন বালক ছিলাম তখন শুনেছি। এইভাবে এক-ধরনের অডিও-ইমাজিনেশন কাজ করে। ছেলেবেলায় আমার হাতের লেখাটা ভালো ছিল, ভূর্জপত্রে, কলাপাতায় লেখা ইত্যাদি কিছুটা রপ্ত করেছিলাম। ক্যালিগ্রাফির একটা প্রবণতা ছিল। এর জন্য ছেলেবেলায় স্কুলে মারও খেয়েছি আমি। আঙুলের তিনটে ফাঁকে তিনটে পেন্সিল ধরে নিজের নামটা লিখলে সুন্দর রেখাও পড়ছে, সুন্দর ডিজাইন-ও তৈরি হচ্ছে, এসব আবিষ্কার করেছিলাম। এতে আমার মাস্টারমশাই প্রচণ্ড মেরেছিলেন। পরে বিলেতে গিয়ে দেখলাম ব্রিজিত রাইলী নামে এক ভদ্রমহিলা ওই ধরনের নকসা করে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁর করা লোগো ইত্যাদির ডিজাইন সব ওই ৪/৫-টা তুলি একসঙ্গে ধরে করা, উনি সম্ভবত হাতের বদলে কাঠের তৈরি হাতের মতো যন্ত্র ব্যবহার করতেন। ক্যালিগ্রাফি-র এটা একটা প্যাটার্ন, অনেক সময় ইসলামিক ক্যালিগ্রাফিতে এটা দেখা যায়।

আর একটা জিনিস— আমি ছেলেবেলায় অনেকের চিঠি লিখে দিতাম। গাঁয়ের বুড়ো-বুড়ি, যারা লিখতে পারত না, পুজোর সময় একটা পোস্ট কার্ড এনে বলত, জামাইকে লেখ সে হারামজাদা আমাকে পুজোর টাকাটা এখনও কেন পাঠায়নি। সম্বোধন হচ্ছে ওই 'হারামজাদা' ; আমি তো তা লিখতাম না, খানিকটা সেনসরিং করে নিতাম। 'হারামজাদা' তো লিখতে পারি না, আমি

লিখতাম 'প্রিয় সুবোধ, কেমন আছ, ভালো আছ, টাকা পাঠাইও'—এইরকম করে, সাহিত্য করে লিখে দিতাম। এই যে সব নন-লিটারারি ভয়েসেস্— এগুলো আমাকে এই প্রৌঢ়ত্বে, খুব হন্ট করে। যার উল্লেখ আমার কবিতায় আছে। এই রিলেশনশিপটা এখনও আমার কাছে একটা রহস্যময় মানব-সম্পর্ক। আর কিছুদিন পর, সাক্ষরতা বাড়লে, তখন আর এইসব চিঠি-লেখানোর বালাই থাকবে না— হাঃ-হাঃ— এই যে লেখার সোর্স, এমন অন্য আর কোথায় পাব? সাহিত্য তো তৃতীয় শ্রেণীর সোর্স, সত্যি বলতে কি, কোনো লেখকই সাহিত্যের কাছে কিছু জানতে বা শিখতে যায় না। পরে, বড় হয়ে, বলে বঙ্কিম ভালো, রবীন্দ্রনাথ ভালো ইত্যাদি। সে কিন্তু আসলে খোঁজে প্রতিটি পাড়া-প্রতিবেশীর ভাষা, চালওয়ালির গালাগাল, হেন-তেন, বাজারে কে কীভাবে কথা বলছে— এইসব থেকে সে সৃষ্টি করে। মানব-সম্পর্ক অনুধাবন করে।

অজিত : এখনকার একটা বিরাট সোর্স কিন্তু ক্রিটিকাল থিয়োরি। শুনতে হয়ত অদ্ভুত লাগবে। বিদেশে সমাজবিজ্ঞানের ভাষা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। আসলে প্রবলেম-গুলোই এমনভাবে বদলে যাচ্ছে যে একটা জায়গায় গিয়ে সমাজবিজ্ঞানের ভাষা সাহিত্যের ভাষার কাছাকাছি চলে আসছে। ধরা যাক, সমাজবিজ্ঞান এইভাবে মডেলিং করল : একটা টোটালিটি আছে যা পারফেক্ট নয়। এই পর্যন্ত ব্যাখ্যা সমাজবিজ্ঞান করল। যেমন স্টেট, পার্টি ইত্যাদি। এইবার স্টেট-এ যারা পাওয়ার-এ আছে তারা ফাঁকগুলোকে বোজায়, এই ফাঁকের বিরুদ্ধে যারা আঘাত করছে তাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করে, এইভাবে আর একটা বৃত্ত তৈরি করে। করতে করতে কিছু লোককে এক্সটেন্ড করছে বলা যায়, সে আর নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে না। ধরা যাক, গ্যাস-চেম্বারে মৃত্যু, কেউ যদি বলে হিটলার তো মারেনি, প্রমাণ কী করে হবে? এটা আমেরিকা— মিত্রশক্তির প্রচার, অত্যুক্তি। বা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। কেউ যদি বলে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প রাশিয়ায় ছিল— তাকে বলা হবে রিঅ্যাক-শনারি। মাস্টারপিস কেউ লিখল কিন্তু ছাপা হল না, লোকে পড়ল না, অ্যাপ্রিসিয়েটেড হল না, তাহলে সে মাস্টারপিস লিখেছে এটা কী করে এস্টাব্লিশ হয়? লজিকালি, কতগুলো জায়গা হয় যেখানে সাক্ষী নেই, বিচারক নেই এবং আমি আমার কেস-(case) টা রাখতে গেলে আমাকে প্যারানয়েড বলা হবে— বাইরে ঠেলে দেওয়া হবে— অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করে এই যে টোটালিটি— এই যে বাইরে —একে আমি বলি Margins of the Margins। একটা টোটালিটি আছে, ফাঁক আছে, তার মার্জিন-এ লোক আছে সে মার্জিন-টাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করেছে। বাইরেও, ধরুন, ইমিগ্রেশন-এর মধ্য দিয়ে, ফুকো ইত্যাদিকে সব পাগল সাজিয়ে হোক, আমাদের দেশ থেকে

যারা যাতায়াত করছে— থার্ড ওয়ার্ল্ডের রিপ্রেজেন্টেটিভ হোক —তার মাধ্যমে এটা ঘটছে। থার্ড ওয়ার্ল্ড-এ যে আমি আছি, আমি সেখানে দেখছি একটা ডামি থার্ড ওয়ার্ল্ড, প্রক্সি কতগুলো অভিনেতা নিয়ে আমাকে সরিয়ে দিয়েছে, তারাই থার্ড ওয়ার্ল্ডের অ্যাক্টিং করে যাচ্ছে। এবারে, আমার কথা আমি কীভাবে বলব ? আসল যে savage, লেভি স্ট্রাউস তাকে আউট করে দিলেন, তিনি একটা Savage Mind নিয়ে লিখলেন। স্যাভেজদের মধ্যেও কেউ বেশি, কেউ কম বুদ্ধিমান থাকতে পারে। আমার কাছে কিন্তু এটা ইনার্ট, হোমোজিনিয়াস একটা স্যাভেজ হয়ে আসছে, স্যাভেজটা আর ব্যক্তি থাকছে না। কী করে সে নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করবে ? সমাজবিজ্ঞানের এই যে বর্ডার-লাইন-এর ভাষা, এই ভাষাটা তো সাহিত্যিককেও খুঁজতে হয়। মার্জিন-এ বলতে গিয়ে তাদের হাতড়ে বেড়ানো যে ভাষাটা, সেই ভাষা একটা ইমপ্যাক্ট আনছে। মার্জিন-এ থাকা লোকদের অনুভূতি, তাদের নিজেদের মধ্যে করা গল্প, গালাগালি করা, যারা পাওয়ার-এ আছে তাদের প্যারোডি করে কথা বলা— এ-সবের মধ্যে নতুন ফর্মগুলো আছে। সেখান থেকে তুলে আনা যায় কী করে, সেই চেষ্টা চলছে, সে চেষ্টা যে খুব সফল হচ্ছে তা বলব না, মডেল-এর জায়গা থেকে পুরনোদের লেখা পড়ছে, ওইখান থেকেই যে তুলব তা নয়, কিন্তু হ্যাঁ, এরা ভালো লিখেছিল, আমাদের তা থেকে অনেকটা শেখার আছে, কিন্তু এরা আমাদের গুরু হতে পারে না।

উৎপল : এখানে একটা ক্রাইসিস-এর কথা উঠছে। সেটা হচ্ছে 'self' বলে যদি আমরা কিছু মেনে নিই, তাহলে একটা 'other'-কেও মানতে হয়। 'self' এবং 'other'-এর মধ্যে যে অ্যান্টাগনিস্টিক সম্পর্ক, এটা পশ্চিমী ভাবনার দৌলতে আমরা ভালোভাবে জেনে গেছি। 'other' যেন সবসময়েই 'self'-কে আক্রমণোদ্যত। কিন্তু পূর্বী ভাবনায়, ভারত ও চীনে, আমরা 'self' এবং 'other'-কে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে দেখি। এই 'self' এবং other'-কে বিভাজন করতে করতে, 'other' এর ভয় দেখাতে দেখাতে পশ্চিমী সমাজ বদলে গেল। এর মধ্যে কবিদের কথা আলাদা, তারা ব্যতিক্রমী, এগুলো কেটে তারা বেরিয়ে আসছে। ফিজিকস্ এবং শুদ্ধ গণিতের চর্চাকারীরাও আসছে। সাধারণভাবে, 'self' এবং 'other'-এর মধ্যে এই বিরোধী সম্পর্ক, পশ্চিমী সমাজের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত রকম মার্জিনা-লাইজড্ পিপল্-কেই তারা 'other' বলছে— লেপার, খোঁড়া, পাগল, মেয়েরা, প্রতিটি থার্ড ওয়ার্ল্ড-এর লোক হচ্ছে 'other', এবং 'self' হচ্ছি আমি, এরা সর্বদাই আমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে এবং আমার কাজ হচ্ছে এদের সঙ্গে লড়াই করা। আমার বক্তব্য হচ্ছে, 'self' কখনোই নিজেকে দেখতে পায় না, যতক্ষণ না সে একটা কুকুরের চোখে নিজেকে

দেখে। আমি যতক্ষণ না একজন মেয়ের চোখে নিজেকে দেখছি, একজন তৃতীয় বিশ্বের লোক, একজন পঙ্গু, একজন পাগলের চোখে নিজেকে দেখছি, ততক্ষণ পর্যন্ত সেলফ্ কনশাস্‌নেস তৈরি হচ্ছে না— সেলফ কনশাস্‌নেস ইজ নট অটোনোমাস : আমার এ বক্তব্য অবশ্য অনেকে মানবে না।

অজিত : না, এটা মানবেই। আমি বরং বলব, ওই 'self' তাই করানোর চেষ্টা করে— 'other'-কে দিয়ে পারমিট করা—

উৎপল : না, সেটা নীতিগত প্রশ্ন। আমি কোনো নীতিবিচারের মধ্যে যেতে চাইছি না। তাহলে দার্শনিকরা চেপে ধরবে, বলবে, এথিক্যাল কনসিডারেশন ইজ অ্যানাদার স্টোরি, তুমি এখানে সেসব প্রশ্ন তুলো না, তার ঝুট-ঝামেলা আলাদা, তার খেলা আলাদা। আমার বক্তব্য হচ্ছে, একজন ক্রিয়েটিভ পার্সন হিসাবে আমি বুঝতে পারি যে যখন রাস্তায় বেরুচ্ছি তখন আমার শত্রু বলে কেউ নেই, 'other' আছে, কিন্তু ওই 'other' আছে বলেই আমি আছি, আমি তার চোখেই নিজেকে দেখছি।

অজিত : 'other' হচ্ছে আমার আয়না—

রাঘব : বা, আই অলসো বিলং টু দ্যাট আদার— এভাবে বলা যায় কি ?

উৎপল : না, এভাবে বললে আবার স্প্লিট পার্সনালিটির প্রশ্ন চলে আসে। হ্যাঁ, স্প্লিট পার্সনালিটি-তে বিশ্বাস করলে আমি বলতে পারি— এ মুহূর্তের আমি আবার পরমুহূর্তেই আমার অংশ ভেঙে গিয়ে আমি— একজন চালওয়ালি।

রাঘব : না, সেভাবে বলছি না। এ পর্যন্ত যেভাবে ভাবা হয়েছে তাতে 'other' বলতে যারা সাবজুগেটেড, মার্জিনাল— তাদের বোঝানো হয়েছে। সাহিত্যের মেইন স্ট্রিম ভাবলে আপনিও তো 'other', মার্জিনাল যখন আপনি হয়েই আছেন, আপনার এই কনট্রাডিকশন তো থাকারই কথা নয়। এটা ক্লাসিকাল সিস্টেম-এ একটা পোলারাইজেশন দাঁড়াচ্ছে।

উৎপল : একটা বাইনারি সিস্টেম যা অ্যানটাগনিস্টিক।

রাঘব : এই পোলারাইজেশন-এ একদিকে একটা 'creamy layer' দেখছি, অন্যদিকে একটা জিগজ্যাগ সেকশন। উৎপল বসু তো 'creamy layer'-এ বিলং করেন না, সুতরাং তাঁর এই কনট্রাডিকশন থাকার কথাই নয়। এটা কালচারাল টেস্ট-এর প্রশ্নে থাকতে পারে, হেরিটেজ-এর প্রশ্নে থাকতে পারে।

অজিত : এইখানে একটা কথা বলছি— 'self' 'other'-কে প্রোডিউস করছে। তার ক্রাইসিস হল, সে আর 'other' রাখছে না। কনসেপচুয়ালি যে 'other'-কে প্রোডিউস করা হল সে ওই 'self' এর ভাষাতেই কথা বলে। ধর, তুমি থার্ড ওয়ার্ল্ড তৈরি করলে, তারপর এডোয়ার্ড সাইড বা আমাকে নিয়ে গেলে— আমি থার্ড ওয়ার্ল্ডের কথা বললাম। কিন্তু কীভাবে বললাম ?

যাতে সাহেবদের ভালো লাগে। ফলে সাহেবের এজেন্ট হয়েই আমি কথা বললাম। আসলে, সাহেবকে যদি 'other' এর কথাটা শুনতেই হয় তাহলে মার্জিন-এর যে একটা মার্জিন রয়েছে, যে রিপ্রেজেন্টেড হয়, সে তার কথা-গুলো ছুড়ে দেবে আর সেনসিটিভ সাহেব তার থেকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে নেবে। যে 'self' এর কথা বলছি তাও হোমোজিনিয়াস নয়, তার মধ্যে নানারকম মানুষ থাকে—

উৎপল : অনেক ভালো লোকও থাকে। ফরাসি চিত্রনির্মাতা জঁ রুস যেমন আফ্রিকায় গিয়ে একটা মাইগ্র্যান্ট কমিউনিটি-র উপর ছবি তুলেছেন। সেখানে যতদূর সম্ভব ইনটিগ্রেট করার চেষ্টা করেছেন, তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরেছেন। এমনকি তাঁর ফিল্মে দেখেছি দুই আদিবাসী আফ্রিকান প্যারিস শহরকে নৃতত্ত্ববিদের ভঙ্গিতে দেখছে। 'self' এবং 'other'-এর চমৎকার প্রতিফলন!

অজিত : সাহেবদের মধ্যেও যারা মার্জিনাল আর এখানে যারা মার্জিনাল, তাদের মধ্যে কী করে যোগসূত্র তৈরি হবে এটাই আজকে দেখার। আজ সাহিত্যে গ্লোবালাইজেশন-এর যুগ, কোনো একটা ভাষা খুঁজে বের করতে হবে যা পারটিকুলার।

রাঘব : তাহলে, পাওয়ার-কে যদি সেন্টার ধরি আমার ফোকাস হল পেরিফেরি-র উপরে।

অজিত : পাওয়ার সেন্ট্রালাইজড, তার কমিউনিকেশন সিস্টেমও অর্গানাইজড, আমি কী করে করব?

রাঘব : তাহলে, পেরিফেরি নিয়ে যখন কাজ করব, আমাকে, যা কনস্ট্রাকটেড ল্যাংগুয়েজ, আরটিকুলেটেড ল্যাংগুয়েজ, তার বাইরে যেতেই হবে।

উৎপল : এখানে ল্যাংগুয়েজ-এর প্রসঙ্গ ছাড়াও অন্য কতগুলো উপাদান আছে যা ইউনিভার্সাল, যেমন পথের পাঁচালির দৃশ্য : ছেলে চলে যাচ্ছে, মা একা ঘরে শুয়ে ট্রেনের শব্দ শুনে বুঝছে যে ছেলে চলে যাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখার পর সল বেলো হলের বাইরে এসে ফুটপাথে বসে কেঁদেছিলেন। কেন না, তাঁর মনে হয়েছিল গোটা দু-হাজার বছরের jewish detachment, তাদের বঞ্চিত হবার ব্যথা, ছিন্নমূল অস্তিত্ব, সব জেগে উঠেছে ওই একটি দৃশ্যে। দিস ইজ রিয়্যালি এ ইউনিভার্সাল সিচুয়েশন। বহু ফিল্ম-মেকার এ ধরনের ঘটনা ব্যবহার করেন। ইউনিভার্সালিটি অব সারটেন ইনসিডেন্টস। কথা হচ্ছে লেখার সোর্স কিন্তু এগুলো নয়, তা অন্য জায়গায়। লেখার সোর্স লেখকের সাইকিক ওয়ার্ল্ড, ইনার কনট্রাডিকশন, নিজের ভিতরের ভুল বোঝাবুঝি, তার সেক্সুয়াল ড্রাইভ, সাইকো-লিংগুইস্টিক জ্ঞান— এসবের ভিতরে, বিরোধে-সমন্বয়ে। ফিল্ম-মেকারদের সমস্যার কথা তাঁরাই বলতে

পারবেন। সত্যিই, একটা দেশের কালচার-এর রুটেড কোনো প্রোডাক্ট অনুবাদ করে অন্যত্র পৌঁছে দেওয়া যায় কিনা সন্দেহ আছে। কতগুলো ইউনিভার্সাল ইমোশনস্-কে আমরা ব্যবহার করতে পারি শুধু। বুদ্ধিমান, যারা জনপ্রিয় হতে চান (খারাপ অর্থে নয়) তাঁরা এ ধরনের ইমোশনস্ নিয়ে কাজ করেন।

অজিত : আমি এ ধরনের ইউনিভার্সাল অনুভূতির কথা বলছি না। ধরা যাক, জীবনানন্দের কবিতা, ওতে এমন অনেক চিত্রকল্প আছে যা কোনোভাবেই অনুবাদ করা যায় না কিন্তু 'বসন্তে এনেছি আমি হাবা যুবকের হাসি' এটা কোনো স্পেসিফিক ইমেজ নয়, এটা একজন সাহেবও তার জায়গায় প্লেস করতে পারে। আবার, 'বনের মধ্যে দমকল উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে'— এটা জীবনানন্দে পাব না। ধরুন, লাতিন-আমেরিকার ম্যাজিক রিয়্যালিজমের কথা যা টাইম-স্পেস ভাঙে। যার মাধ্যমে রিয়্যালিটি-কে আমি পৌঁছে দিতে পারি সারা বিশ্বে, বোর্হেস যেভাবে স্পেস-কে ভাঙেন। বোর্হেস নির্দিষ্ট কোনো 'দেশি' ব্যাপার নয়। ভারতবর্ষে এভাবে করলে অবশ্যই তা নকল করা হবে, আমি সেটা করতে বলছি না। কিন্তু টাইম-স্পেস নানা ভাবে মিশে ভারতবর্ষও তো অদ্ভুত একটা জায়গা, এখানে একজন লোক কিছু ইমেজ নিশ্চয়ই ভাবে যা তার চারপাশেই আছে, যা অনেকটা কমিউনিকেট করা যায়। আবার একটা জায়গায় সেটা করা যায় না, ভীষণ স্পেসিফিক, অনুবাদে আটকে যাবে। কবিতা ভীষণভাবে পারটিকুলার—

উৎপল : ভীষণভাবে ল্যাংগুয়েজ স্পেসিফিক।

রাঘব : আমরা আবার মনোনিবেশ করি আমাদের এই আঞ্চলিক ভাষা— বাংলা ভাষাতেই। উৎপলদা, ফর্ম আর কনটেন্ট নিয়ে সাহিত্যে যে বিতর্ক, পুরনো এই ব্যাপারটা নিয়েই আপনার মুখে শুনতে চাই।

উৎপল : বেশি কিছু বলার নেই এটা নিয়ে। এটা সুবিধে মতো তৈরি হয়েছে। যখন কাজে লাগে তখন শব্দদুটোকে আমরা ব্যবহার করি, আবার কাজে যখন লাগে না তখন বলি ফর্ম আর কনটেন্ট একই জিনিস। এরকম বহু সমান্তরাল জিনিস আমি খুঁজে বার করতে পারি। একসময়, গার্ট্রুড স্টাইন বলেছিলেন : 'The composition is the only explanation'— ছবির ক্ষেত্রে বিশেষ করে। এই ধরনের এক্সপ্লানেশন হয় কিনা, ফর্ম ধরে ব্যাখ্যা হয় কিনা, এই সমস্ত ব্যাপারে আমি নিজে তেমন উৎসাহী নই। এগুলো আমার কনসার্ন নয়, সংশ্লেষ নয়। আমার সংশ্লেষ হচ্ছে— একটা মনোজগত, তার সঙ্গে ভাষাজগত এবং ভাষাজগতের সঙ্গে ত্রিভুজ হিসাবে একটা যৌনতার জগত আছে। এই যে যৌন সচেতনতা, আজ প্রমাণিত, এটা জন্মমুহূর্ত থেকেই থাকে। শোনা যাচ্ছে, মায়ের পেটে থাকার সময়েও যৌনতা একটা ভূমিকা

পালন করতে থাকে। আমৃত্যু একজন ব্যক্তি এই যে একটা জিনিস বহন করে চলেছে— সেক্সুয়ালিটি— এতবড় একটা ডমিনেটিং ফ্যাক্টর, আমাদের জীবনে একটা কনট্রোলিং ফ্যাক্টর, এর সঙ্গে ভাষার একটা সম্পর্ক আছে। এখন, ভাষা বা যৌনতার কীভাবে উদ্রেক হয়, কোনটা কীভাবে প্রভাবিত করে, বাইরের লেখকদের ক্ষেত্রে তার বিশ্লেষণ করতে আমি রাজি নই; কিন্তু আমার নিজের লেখায় চিরদিনই এগুলো ভয়ঙ্করভাবে ফিরে এসেছে। 'হাবা যুবকের হাসি' প্রসঙ্গে আমি দু-একটা কথা বলে নেব। লাইনটা কিন্তু উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে আছে, কেন না লাইনটা আসলে র‍্যাবোর কবিতায় আছে: 'In the spring, an idiot smiles···'। একসময়ে ডালহাউসি পাহাড়ে আমি কিছুদিন ছিলাম। বিকেলে রোজ বেড়াতে বেরুতাম। নির্জন জায়গা, সুড়কি-ঢালা গোল একটা রাস্তা ধরে পাহাড় ঘুরে ফিরে আসা যেত। ওখানে দেখেছিলাম ১৭/১৮ বছরের এক ছেলেকে, সে হাবা, বড়লোকের ছেলে, বিকেলবেলায় বাড়ির চাকর তাকে বেড়াতে নিয়ে আসত। এ ধরনের লোক দেখলে আমি একটু সচেতন হয়ে যাই, ওই 'other' দেখার মতো, এড়িয়ে চলে যাবার একটা প্রবণতা আমার আছে, অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ আছে। ওই পথে বেড়িয়ে ওদের পিছু পিছু যেতাম, যাতে দেখা না হয়। একদিন একেবারে মুখোমুখি দেখা। দেখি, চাকরটা একটা বিড়ি ধরানোর চেষ্টা করছে আর ছেলেটা দেশলাই নিয়ে ওর বিড়িটা ধরিয়ে দিতে চায়। আকৃতিতে সে ছোট, বারবার লাফ দিয়ে দেশলাইটা ধরার চেষ্টা করছে। এই করতে করতে ওর হাত থেকে দেশলাইটা খসে পড়ে। কাঠিগুলো সব ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে চাকরটা ওকে দুটো চড় মেরে দুজনে মিলে রাস্তা থেকে মাথা নিচু করে কাঠিগুলো তুলছে, এমন সময়, ছেলেটা মাথা তুলে দেখে উপরে একটা বিশাল পলাশগাছ— ফুলে লাল হয়ে আছে। সে তখন হ্যা-হ্যা-হ্যা করে হাসতে থাকে, মুখ দিয়ে লালা গড়ায়। এই গোটা দৃশ্যটা আমি দেখেছিলাম। আমার পরবর্তী কাজ ছিল লাইনটা খাতায় লিখে রাখা। যার লাইনই হোক আমি লিখতে বাধ্য— এই ভেবে লিখে রেখেছি, কবিতাতে ঢুকিয়ে দিয়েছি। পরে অনেক অ্যাসোসিয়েশন এসেছে। ওই 'other'-কে যদি ধরতে হয়, identification of the 'other'— এই যে টোটালিটি, আমি এবং হাবা যুবক, এর মধ্যে বেসিক্যালি কিন্তু কোনো তফাত নেই। তার পরের লাইনেই আসছে— অনেক বেড়ালাম, অনেক অভিজ্ঞতা হল, যতদিন কালুবাবু জীবিত আছেন রক্তকরবী বুঝে নেব— এর মধ্যে আমার ওই যে ইডিয়সি (idiocy), আই ওয়ান্ট টু প্রিজার্ভ ইট। আমার ইডিয়সি-র বাইরে, এই 'otherness' এর বাইরে আমি যেতে চাই না, বা আমার 'self' এবং 'otherness' নিয়ে যে টোটালিটি তাকে ধরার চেষ্টা ছিল, ব্যবধান-

রেখাকে মুছে দেবার চেষ্টা ছিল। এটা টিপিকাল, একটা ক্রিয়েটিভ লোকের ক্রাইসিস। You know— this is 'self', you know this is 'other' then what are you going to do with that knowledge ? নলেজ তো পেলে, ঠিক আছে, তুমি বিরাট অভিজ্ঞ লোক, তারপর ? Where is your action ? What are you going to do ? এই হচ্ছে ক্রিয়েটিভ লোকের ক্রাইসিস। তুমি অবোধ ছিলে, বোকা ছিলে, ঠিক আছে, পড়াশোনা করে হোক, ইনটুইটিভলি হোক at one stage you know, you have access to your knowledge, but then what ? ক্রিয়েটিভ লোক তখন ভাবে I will do something with this, ছবি আঁকব বা লিখব ইত্যাদি ইত্যাদি।

অজিত : আপনার লেখা 'প্রাণের দিকে চেয়ে দেখি' 'ঐখানে অদিতির কণ্ঠস্বর শুনি আমি', হে যুবক নষ্ট কোরো না বীজ' এগুলো আমার অসম্ভব প্রিয় কবিতার লাইন। বেশ কিছু কবিতায় পুরো অ্যাসোসিয়েশনটা পাই— সব্জীর কাজে ব্যস্ত, গোয়ালঘরের মেয়েরা— যায় দিন, গ্রীষ্মের দিন যায়, যায় সূর্য, যায় দুর্ঘটনা, সময় বীজ নষ্ট কোরো না বলছে, ওদিকে অদিতি, আদিমাতা এবং তার আগে বনের মধ্যে উদ্দেশ্যবিহীন দমকলের ঘুরে বেড়ানো— এই সম্পূর্ণটা নিয়ে একটা রিভিলেশন-এর কবিতা হয়ে আসে। কবিতার মধ্যে রাইটিং-এর লেভেল-এ একটা রিভিলেশন হল। আপনি জানছেন, সেই ভাবটা আসছে এবং রাইটিংটা তখন— ফর্মটা আস্তে আস্তে— রাইটিং-টাই কনটেন্ট হয়ে উঠছে।

উৎপল : আই টোট্যালি এগ্রি উইথ ইউ। এটাকে বলা চলে ইট'স এ ক্রনিকল্। এটা একজনের ডায়েরি বা ক্রনিকলের মতো সে লিখে যাচ্ছে, এগুলো হয়ত বেসিক্যালি কোনো সাহিত্য নয়।

অজিত : এটাই একটা অনুভূতি যা আজকের ছেলেমেয়েরা ভীষণভাবে শেয়ার করছে।

উৎপল : হ্যাঁ, তাদের অনেকের সঙ্গে কথা বলে সেটা বুঝতে পারি যে ক্রনিকল্-টাকে তারা শেয়ার করে। আমার, সত্যি, এর চেয়ে বেশি আর কিছু বলার নেই, কিছু করার নেই।

অজিত : তার দরকারও নেই। আমি একটা মেয়ে, কি একটা ফুল নিয়ে কিছু অনুভূতির কথা বললাম সেটা নয়, লেখার একটা জগতে গিয়ে লিখতে লিখতে যে একটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, কতগুলো অনুভূতি আসছে, তারপরেই ধস নামছে—

রাঘব : একটা সূত্র পাচ্ছি। আমার লেখা গড়ে ওঠাটা একটা প্রসেস যা ভাষার জগতে আছে, ছাপার জগতে আছে, আবার চারপাশের জগতেও আছে। গোটা জিনিসটা গড়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া সেটাই লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। অন্যভাবে উৎপলদা এটা

বলেছেন যে উনি কথা যা শোনেন, টেপ রেকর্ডারের মতো রেকর্ড করে রাখেন। ফলে উৎস বলতে লিখিত বা মুদ্রিত সাহিত্য নয়। উৎস বিভিন্ন জায়গাতেই আছে। উৎস আর লেখা। এবার উৎপল বসুকে সরিয়ে দিই। লেখা অ্যানোনিমাস। কতগুলো জিনিস ঘটে যাচ্ছে—

উৎপল : উৎস আর রিভিলেশন-এর মাঝামাঝি—

রাঘব : অন-লুকার, পিকাসোর ছবির মতো— গুয়ের্নিকা হয়েই আছে—

উৎপল : গোটা মধ্যযুগ তাই, কোনো লেখকের নাম নেই।

রাঘব : তাহলে উৎপলকুমার একটা নাম মাত্র যে এই প্রক্রিয়ার একজন অংশগ্রহণকারী। যে একজন ক্রনিকল্ রাইটার, পুরনো দিনের গির্জার ক্রনিকল্ রাইটার-এর মতোই প্রায়। যতই সে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, নিজস্ব কালচারাল লেয়ারগুলোকে ঝরিয়ে ফেলবে ততই আরও ভালো ক্রনিকল্ রাইটার হয়ে উঠবে, ক্লিনিকাল অপারেশন-এর মতো ক্রিমটুকু তুলে সাজিয়ে দিতে পারবে। এটা ভয়ঙ্কর রকমের আধুনিকতার লক্ষণ। গুহাচিত্র যেমন কে এঁকেছে জানার মানে হয় না। যে দেখে সেই স্রষ্টা, আবিষ্কর্তা।

অজিত : আর একটু কোয়ালিফাই করে একে উত্তর আধুনিকতা বলি। আধুনিকতা তো নামটা রাখছে, সেখানে উত্তর আধুনিকতার এলিমেন্টগুলো থাকছে।

উৎপল : এখানে আর একটা কথা বলি। যারা এইরকম কাজ করবে তাদের পাঠকের উপরে গভীর বিশ্বাস রাখতে হয়, বিশ্বাস এই যে লোকে একদিন সমস্ত বুঝতে পারবে, আমার সবকিছু বলে দেবার দরকার নেই। যারা ন্যারেটিভ গল্প লেখে তারা ভাবে 'রাম বসল, রাম ভাত খেল, রাম ভাত খেয়ে জল খেল' এভাবে না লিখলে লোকে বুঝতে পারবে না। পাঠকের উপরে বিশ্বাস হারানোর চেয়ে বড় ক্রাইম ক্রিয়েটিভ লোকের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। একটা তো 'self' কে এক্সপ্রেস করতে না পারার ক্রাইসিস থাকেই, তার সঙ্গে এই এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ড ক্রাইসিস হচ্ছে ভয়ঙ্কর।

অজিত : যারা সকলের জন্য লেখে তারা এক হিসেবে এলিট। পাঠকের ওপরে তাদের বিশ্বাস নেই।

উৎপল : শুধু তাই নয়, এ ধরনের লেখা পড়তে গেলে অপমানিত বোধ করবেন যে লেখক কেন আমাকে এইভাবে কথাগুলো বলছেন, আমি কি বুঝতে পারছি না ?

রাঘব : অজিতের আগের একটা প্রশ্নের অন্যরকমভাবে একটা উত্তর পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। স্রষ্টা ঈশ্বর কিনা— লেখক ঈশ্বর কিনা। এখনও পর্যন্ত লেখকেরা মনে করে তারা ঈশ্বর এবং যারা শিল্পের শুদ্ধতা ইত্যাদি নিয়ে ভাবছে— তারা ঈশ্বর। আমি বলছি : না। এটা লজিকালি বলি বা না বলি, লেখার ক্ষেত্রে যখন এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করি তখন লেখক হিসাবে প্রথমেই

নিজের একজিসটেন্সকে ডিনাই করি—মাই একজিসটেন্স অ্যাজ এ রাইটার, মাই একজিসটেন্স অ্যাজ এ গড ; তখন আমি মানুষের যুক্তি— বুদ্ধি— তার ইমাজিনেশন-এর উপর আস্থা রাখি, তার ফিলিং এমনকি ইমাজিনড ফিলিং-এর উপরেও ভরসা রাখি। অর্থাৎ স্রষ্টা তখন এক নয়, বহু। কাজেই সবচেয়ে বড় শত্রু আমিই নিজে, অর্থাৎ স্রষ্টা এখানে হয়ে যাচ্ছে একজন শ্রমিক, একজন সাংবাদিক —শিল্পসাহিত্যের সাংবাদিক— যে নিষ্ঠার সঙ্গে, গভীর মমত্বের সঙ্গে কাজ করে চলেছে— এটা না মেনে যে ক্লাউড-টা কী— কিন্তু সে জানে যে মানুষ আছে।

উৎপল : এ প্রসঙ্গে বলি— সে লিপিকার ঠিকই, এ-ধরনের মনোবৃত্তি খুব ভালো। কিন্তু ওই যে বাল্যে পোস্ট কার্ড লেখার স্মৃতিচারণ করেছি— আমি সেখানে লিপিকার ঠিকই— তবু সেখানে আমার সেনসর ছিল, এডিটিং ছিল, কিন্তু যে ভাষা আমি জানি, ছোট থেকে তার ব্যবহারবিধি আমি জেনেছি— যেমন চিঠির শেষে 'তুমি আমার প্রণাম লইও' সে সব উনি না বললেও আমি জুড়ে দিয়েছি। এই যে আমি অ্যাড করছি— এখানেই তো I am not exactly a chronicler in the exact sense. I am adding something, I am subtracting something, I am elaborating on something, I am condensing something— বহু খেলা আমি ওখানে খেলছি।

রাঘব : ...একটা কোড আমি বার করছি। ক্রনিকল্ রাইটার হিসাবে যে জিনিসগুলো পাচ্ছি সেগুলো প্রেজেন্ট করছি না, তথ্য হিসাবে রাখছি না, কিন্তু প্যাকেজিং-টা এমন করছি যে একটা কোড থাকছে যা পাঠককে ডিকোড করতে হয়।

অজিত : এইখানে আমি বলব যে আমরা কিন্তু ঠগবাজ। হেঁসেলে মদ লুকিয়ে রাখি না, কিন্তু ঠগবাজ। সাহিত্য করতে গিয়ে যা আমার একেবারে ব্যক্তিগত কথা— (ঢুকিয়ে দিচ্ছি)।

উৎপল : ইমোশনালি, ইনটুইটিভলি— দিস মাস্ট বি রাইট, যেমন আমি জামাইকে চিঠি লিখছি— আমার শাশুড়ি মাতা ঠাকুরাণী জীবিত নেই— অন্যের হয়ে চিঠি লিখতে গিয়ে সেই দুঃখের একটা বহিঃপ্রকাশ আমার মধ্যে ঘটতেই পারে। একে আমি অসাধুতা বলছি না। কলম ধরে যে মুহূর্তে লিখতে বসেছি তখনই ইমোটিভ, ইনটুইটিভ শক্তিগুলো কাজ করে।

অজিত : আসলে ওইগুলো যখন করতে যাচ্ছি তখন ঈশ্বরের একটা ভার আমার উপরে পেয়ে বসে— তখন যদি আমার একটা-দুটো কথা বলে দিতে পারি—

রাঘব : একে আমি ঈশ্বর বলছি না, আমি বলব— হিউম্যান লিমিটেশন—

উৎপল : এর রহস্যটা, প্রসেসিং-টা কী তা আমাদের অজানা। উই আর গ্রোপিং ইন দি

ডার্ক'। একসময় ফ্রয়েড-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল : আচ্ছা, একজন লোক যখন একটা পেন্সিল হাতে নেয়, সাদা কাগজে হঠাৎ সে ছবি আঁকতে শুরু করে— কী হয় তার মনের মধ্যে? ফ্রয়েড ম্লান হেসে জানিয়েছিলেন : Psychology is too immatured to deal with the subject। কেন আমরা সেনসর করি, কেন এডিট করি, এটা-ওটা আনি— এর মধ্যে কত রকমের জ্ঞান কাজ করছে, কত রকমের সাইকিক প্রসেস কাজ করছে, এর রহস্য আমরা কিছুই জানি না। নানা রকমের অধীত জ্ঞান, রেসট্রিকশনস্, স্টিগমা কাজ করছে। আমি চাই না— এমন জিনিসও আমার হাত দিয়ে বেরিয়ে আসছে— কত কমপ্লেক্স ফ্যাক্টর কাজ করছে— যা ব্যাখ্যার বাইরে।

অজিত : মজা হল ওই লাইনগুলোও কিন্তু পাঠকের কাছে কোডেড হয়ে আসছে। আর একটা কনটেক্সট আগে-পিছের মাঝখানে তো অন্য মানে পায়— কিন্তু আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল যে একটা আমার নিজের—

রাঘব : এটা সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে ঘটনাচক্রে হঠাৎ আলো নিভে গেলে পরে তার ব্যাখ্যা খোঁজার মতো।

উৎপল : এক নম্বর, হ্যাঁ তাই। এছাড়া, কমিউনিকেশন-এ খুব সিম্পল ভাবে বলা হয়— বোকার মতো— যে লেখক যেন কোড করছেন আর পাঠক যেন ডিকোড করছেন। কিন্তু রিডার রেসপনস থিয়োরি-তে এটা পরিষ্কারভাবে বলে যে পাঠকও তার নিজের মতো করে কোডিফাই করে জিনিসটা বোঝে, যে কারণে সে-ও ক্রিয়েটার। রিডার-কে যে এই সম্মান দেওয়া, এটা আধুনিক লেখকরাই শুরু করেছেন। আমার রিডার, আমার ভিউয়ার, এরা অত্যন্ত সম্মানিত। এরা— অ্যাজ ক্রিয়েটিভ অ্যাজ আই অ্যাম। আমি কোডিফাই করছি বটে— কিন্তু এও (পাঠকও) নিজের মতো করে কোডিফাই করছে— আমার চেয়ে সে দশগুণ বেশি চালাক।

রাঘব : এখানে একটা লাইন অন-রেকর্ড রাখতে চাই যে— যারা সাহিত্যের মার্কেটিং-এ যাবে— তাদের চেয়ে যারা উৎপল বসুর মতো মার্জিনাল রাইটার, তারা পাঠককে অনেক বেশি শ্রদ্ধা করে। তাছাড়া, এখন যে লেখা-লেখির চল, তার মধ্যে অটোমেটিক রাইটিং বলে একটা ব্যাপারকে চিহ্নিত করা হয়। রল্যাঁ বার্থের কথা। অর্থাৎ লেখার প্রক্রিয়াটাকে লেখার মধ্যেই নিয়ে নেওয়া হয়। যেমন লেখক লেখার সময়ে যদি কফি খান, তখন হয়ত লিখলেন 'কফিতে চুমুক দিয়ে মনে হল', এটা হয়ত অপ্রয়োজনীয় একটা লাইন, কিন্তু সেটা বলে যে লেখাটি এভাবে লেখা হচ্ছে, সাইন থাকে, লেখাটিকে টাইম-স্পেস-এ বেঁধে দিই আমরা। অর্থাৎ লেখা নিয়ে আমরা এক্সাজারেট করতে চাইনা। স্বর্গীয় সুষমায় তাকে মণ্ডিত করার কোনো চেষ্টাই আমাদের থাকে না।

উৎপল : আমাকে যখন 'আজকাল' থেকে জীবনানন্দ দাশের 'ভারবি' কাব্যসমগ্র রিভিউ করতে দেয় তখন আমি লিখেছিলাম যে প্লেন-এ দিল্লি যাচ্ছি, দিল্লি যাওয়ার বর্ণনা আবার খানিক কবিতা পড়া। আমার পাঠক যে কোনো সময়ে প্রশ্ন করতেই পারে যে হে সমালোচক, এরকম স্থিতধী লেখা কোথায় বসে লিখলে? লাইব্রেরিতে-মিনিবাসে-ঘরে? আমি পাঠককে সব কিছুই ফিড করতে চাই। অদ্ভুত লাইন ছিল তারপর। প্লেন যখন দিল্লিতে ল্যান্ড করছে— সে সময়কার বর্ণনা ছিল— সিট-বেল্ট বেঁধে নেবার ঘোষণা— নামার জন্য হুড়োহুড়ি— ইত্যাদি— আমি তখন আবার বইটা খুলে ধরি— অদ্ভুত চারটে লাইন চোখে পড়ল আমার। আমি সেটা কোট করেছিলাম। দিস উইল অলমোস্ট মেকানিক্যালি ওয়ার্ক ইন এভরিবডি'স লাইফ— তাতে ছিল— অনেক দেশ ঘুরে যখন বাংলার মাঠে আসবে— তখন একজন চাষী তোমাকে আঙুল তুলে দেখাবে— অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাবে…ওই দিকে হচ্ছে তোমার ঘর…আমি ঝপ করে বইটা বন্ধ করে দিয়ে তাড়াতাড়ি জনস্রোতের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলাম— দেখলাম এ সাংঘাতিক জিনিস—এ-কোইনসিডেন্স বড় মারাত্মক —এ নিয়ে বেশি খেলা না করাই ভালো। এটা আমি ওই রিভিউ-তে বলেছিলাম। এখনকার দাবি হল রিভিউয়ার-কে বলতে হবে সে কোথায় বসে লিখেছে— তোমার আত্মপরিচয় দাও, শাস্ত্রাধিকার আছে কিনা বল, তবেই তোমার লেখা পড়ব। এই গ্রেট রেসপেক্ট টু দি রিডার, যা আমাদের সাহিত্যে কোনোদিন ছিল না— এটা এসেছে— এই এক্সচেঞ্জেস্। এটা একদিকে যেমন নঞর্থক কিন্তু এর পজিটিভ দিকও আছে। এর থেকে অনেক ক্রিয়েটিভ লেখা হচ্ছে।…□

এভাবে গপ্পো আর গুলতানিতে সন্ধ্যা হয়, কলকাতার দক্ষিণে, বা আরও উত্তরে ছুটতে হবে আড্ডাধারীদের। কিন্তু তারা বেশ প্রীত, অনেক কথা হল। ভাবখানা এরকম, 'কথা বলায় কী আনন্দ! সত্যি!'

একটি অসম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জীবন্ত একজন কবির নাম উৎপলকুমার বসু। জীবন্ত এবং কৌতূহলোদ্দীপক। অতি-আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে উৎপলকুমার নিবিড়-ভাবে যুক্ত। ভাষা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। কবিতার ভাষাগত দিক থেকে তিনি তরুণতম বাঙালি কবির সঙ্গী। তাঁর কবিতার পাঠক মূলত তরুণ কবিরাই, যারা আজও তাঁর কবিতার প্রতিটি নড়াচড়া সম্বন্ধে কৌতূহলী। তাঁর কবিতার সম্বন্ধে পাঠকদের তিনি দীর্ঘদিন ধরে আগ্রহী করে রেখেছেন। এর কারণ, তিনি তাঁর প্রতিটি লেখাতেই নতুনতর হয়ে উঠতে চান। তাঁর নবীন হয়ে ওঠার এই আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে একাত্ম করেছে।

শহরতলির ইস্কুল ছেড়ে আমি কলকাতার কলেজে ভর্তি হই ১৯৭৫ সালের শেষে। নতুন কবিতা লেখার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তখন আমার সর্বস্ব জুড়ে। সেই সময়ে তরুণ সাহিত্যিক-মহলে বাঙালি লেখকদের লেখা যে-কটি বই ঘন ঘন আলোচিত হতে শুনতাম 'পুরী

সিরিজ' তাদের অন্যতম। অথচ উৎপলকুমার তখন ছিলেন ভারতবর্ষের বাইরে। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর প্রায় কোনো যোগাযোগই ছিল না। দুটি মাত্র কবিতার বই প্রকাশ করে, হঠাৎই স্বদেশ ত্যাগ করে তিনি তখন ইয়োরোপের দেশ থেকে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অনুপস্থিতি সত্ত্বেও এক শ্রেণীর পাঠকের হৃদয় ও মনে তিনি ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিলেন। ওই সময়ে হঠাৎই একদিন এক বন্ধুর মুখে 'পুরী সিরিজ'-এর শেষ কবিতাটি শুনি, একাধিক বার। বন্ধুর পড়া শুনেই বুঁদ হয়ে গিয়েছিলাম। অদ্ভুত এক হাহাকার ও বিষণ্ণতায় মনটা ভরে গিয়েছিল। কবিতাটি হল :

এই সংগ্রহের শেষ কবিতা

'তারপর ঘাসের জঙ্গলে প'ড়ে আছে তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি। এবং
আকাশ আজ দেবতার ছেলেমেয়েদের নীল সার্ট পাজামার মতো বাস্তবিক।
একা ময়ূর ঘুরছে খালি দোতলায়। ঐ ঘরে সজল থাকত।
সজলের বউ আর মেয়েটি থাকত। ওরা ধানকল পার হয়ে চ'লে গেছে।
এবার বসন্ত আসছে সম্ভাবনাহীন পাহাড়ে জঙ্গলে এবার বসন্ত আসছে
প্রতিশ্রুতিহীন নদীর খাঁড়ির ভিতরে নেমে দু'জন মানুষ তামা ও অভ্র খুঁজছে।
তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি হারিয়েছ বাদাম পাহাড়ে।
আমার ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা আমি হারিয়েছি বাদাম পাহাড়ে।'

কবিতাটির ঝলমলে নতুন ভাষা এবং ভয়াবহ সব ঘটনার বর্ণনা ও ছবি আমাকে মুহূর্তের মধ্যে সম্মোহিত করে ফেলেছিল। ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি ও ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা বাদামপাহাড়ে হারিয়ে যাওয়া ; সজল, সজলের বউ ও মেয়ের ধানকল পার হয়ে চলে যাওয়া, প্রতিশ্রুতিহীন নদীর খাঁড়ির ভেতর নেমে দু'জন মানুষের তামা ও অভ্র খোঁজা—এসব বাংলা কবিতায় আগে পাইনি। ছেদচিহ্নহীন পঞ্চম পঙ্ক্তির 'সম্ভাবনাহীন' শব্দটির আশ্চর্য ব্যবহারও আমার চোখে পড়েছে। আসন্ন সর্বনাশের এই ছবিকে আরও বেশি ভয়াবহ করে তুলেছে একা ময়ূরের খালি দোতলায় ঘুরে বেড়ানো। 'দেবতার ছেলেমেয়েদের নীল সার্ট পাজামার মতো বাস্তবিক' আকাশের প্রেক্ষাপটে আঁকা এই গোটা ছবি আমাকে মুহূর্তের মধ্যেই উৎপলকুমারের একজন অনুরাগীতে পরিণত করেছিল।

উৎপলকুমারের কবিতা নিয়ে টুকরো টুকরো কিছু আলোচনা চোখে পড়েছে। কিন্তু ব্যক্তি উৎপলকুমার বিষয়ে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। উৎপলকুমারের মুখ থেকেই তার জীবন বিষয়ে কিছু কথা জানার জন্যে গত ১৬.৬.৯৪ তারিখে আমি তাঁর কর্মস্থলে গিয়েছিলাম। আমি যে যাব তা আগে থেকে ঠিক করা ছিল। গিয়ে

দেখি তিনি তাঁর টেবিলে গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা লিখে চলেছেন। আমাকে দেখে হেসে ইঙ্গিতে বসতে বললেন। চা এল। উৎপলকুমারের বেশভূষা অতি সাধারণ। সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরিহিত তিনি অত্যন্ত সৌম্যদর্শন। বড় বড় চোখ, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, ফরসা গায়ের রঙ, মুখে সব সময়েই মিষ্টি হাসি। নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে তাঁর প্রচণ্ড অনীহা। লেখা শেষ করে উৎপলকুমার বললেন, চল, অন্য একটা ঘরে গিয়ে বসা যাক। আমরা ছোট মতো একটা ঘরে গিয়ে বসলাম।

আলোচনার প্রথমেই উৎপলকুমার জানালেন : আমার জীবন ঘটনাবহুল নয়, মানডেন, বিশেষ কিছুই জানানোর নেই। খুব বড় একটা একান্নবর্তী পরিবারে আমার জন্ম, যেখানে জন্ম এবং মৃত্যু নিয়তই ঘটে চলত।

জানতে চাইলাম, আপনার জন্ম-তারিখ কী ? —‘স্কুলের খাতা অনুযায়ী আমার জন্ম-তারিখ ৩রা আগস্ট, ১৯৩৭। তবে, এই তারিখটা ঠিক না হবার সম্ভাবনাই বেশি। সালটা ৩৫ বা ৩৬-ও হতে পারে। তবে আমার জন্মের বাংলা তারিখ ৮ই ভাদ্র।’

আপনার বাবা-মা এঁদের সম্পর্কে কিছু বলুন। —‘বর্তমানে মা-বাবা দু’জনেই মৃত। বাবার নাম প্রফুল্লকুমার বসু। ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে কাজ করতেন। মায়ের নাম সন্তোষিণী বসু। মা যখন মারা যান তখন বয়েস আমার আট বা দশ। মা বেশ একটা রোগভোগের পর মারা গিয়েছিলেন। মা-বিষয়ক স্মৃতি বলতে মনে পড়ে অসুস্থ হয়ে তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন, শল্যবিদরা মায়ের দেহ বহুবার কাটা-ছেঁড়া করেছেন। আমার মা-র মৃত্যুর কয়েক মাস পর ভারতবর্ষে পেনিসিলিন আসে। শুনেছি, সময়মতো প্রয়োগ করলে মা হয়ত ভালো হয়ে যেতেন।

মনে পড়ল :

‘সীমাহীন কুয়াশায় তেমনই উঠেছ কেউ আমার মতন
ভয়ে, দুঃখে, মায়ের হাসির শব্দে !…’

জিজ্ঞাসা করলাম, মা সম্পর্কে আপনার কোনো স্মৃতি নেই ? —‘মা অসুস্থ ছিলেন বলে আমি এক নিঃসন্তান মাসির কাছে মানুষ হই, কুচবিহারের দিনহাটায়। খুব ছেলেবেলাতেই মাসির কাছে চলে যাই। দিনহাটা উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই মা মারা যান। তখন ছোট থাকার জন্যে মাতৃশোক বুঝতে পারিনি। তবে মনে আছে, মাসি খুব কান্নাকাটি করেছিলেন।’

আপনার জন্ম কোথায় ? —‘আমার জন্ম কলকাতায়। আদি নিবাস মালখাঁনগর, বিক্রমপুর। আমাদের পরিবারের ইতিহাস একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ট্রেস করা যায়। আমাদের আদি পদবি ছিল বসুঠাকুর। আমার ঠাকুরদা, কেন জানি না, ঠাকুর অংশটা ত্যাগ করেছিলেন। এর ফলে স্থানীয় মানুষজন বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বলে শুনেছি।’

উৎপলকুমার মা-বাবার তৃতীয় সন্তান। তাঁর দুই দাদাই তাঁর থেকে বয়সে অনেক বড়

ছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল পিঠোপিঠি ছোট বোনের সঙ্গে। দাদাদের নাম পরিমলকুমার এবং অমলকুমার। বোন নীলা মজুমদার। হায়দ্রাবাদে তার ঘরসংসার। শৈশবস্মৃতি বিষয়ে জানতে চাওয়ায় উৎপলকুমার জানালেন, 'দিনহাটা ছিল একেবারেই গন্ডগ্রাম। টিনের ঘরের স্কুলে পড়তাম। কাছাকাছি বড় শহর বলতে কুচবিহার। আলোকপ্রাপ্তির জন্যে আমাদের কুচবিহারে যেতে হত মিটার গেজ ট্রেনে চেপে। দিনহাটার বিখ্যাত ছিল হাট। সেই হাটে প্রচুর পরিমাণে পাট ও তামাক বিক্রি হত। গ্রামে ছিল ছোট নদী ধরলা, কুচবিহারে তোর্সা এবং জলপাইগুড়িতে তিস্তা। ছোটবেলায় সাইকেল ছিল আমার ধ্যানজ্ঞান। দশ-বারো বছর বয়েস থেকেই আমি দক্ষ সাইকেলচালক। সাইকেলের মেকানিজম আমি খুব ভালো জানতাম। গ্রামের জীবন নিঃসঙ্গ ছিল। তাছাড়া আমি ছিলাম বাইরের ছেলে, খাস কলকাতার। তাই দীর্ঘসময় ধরে একা একা কোনো কিছু অবজার্ভ করার একটা প্রবণতা আমার মধ্যে গড়ে উঠেছিল। ন্যাচারাল সায়েন্টিস্ট-এর মতো পোকা-মাকড়, গাছের পাতা সংগ্রহ করতাম। ছোট ল্যাবোরেটরি বানিয়েছিলাম। সাপ-গিরগিটি পুষতাম।

জিজ্ঞাসা করি, সাহিত্যের প্রতি সে-সময়ে কোনো উৎসাহ বোধ করেননি? —'সাহিত্যের প্রতি সেভাবে কখনো উৎসাহ আসেনি। সত্যি কথা বলতে কি, জানো, সাহিত্যের আগ্রহ ঠিক সেভাবে আমার মধ্যে আজো আসেনি। আমি সাহিত্যের ধার ধারি না। আমার বিভিন্ন কাজের মধ্যে একটা হল সাহিত্য। সাহিত্যকে কখনোই প্রায়োরিটি দিইনি, আজও দিই না। অন্য যে-সব কাজ আছে যেমন মানুষকে বোঝা, মানুষকে জানা, তারপর মানুষের শরীর এবং মন— এ-দুটো বিচ্ছিন্ন করে বা একত্র করে দেখা— এসব আমি চেষ্টা করেছি। অনেকে যেমন ছেলেবেলায় সমস্ত শরৎচন্দ্র পড়ে ফেলল কি বঙ্কিমচন্দ্র— আমার বেলায় তা ঘটেনি। ছেলেবেলায় আমি সমস্ত সাইকেল খুলে ফেলে আবার জুড়তে পারতাম।'

কিছুটা অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, তাহলে আপনার সাহিত্যচর্চা কীভাবে শুরু হয়েছিল?— 'স্কুলজীবনের শেষ দিকে— আমার হাতের লেখা ভালো ছিল বলে অনেকেই আমাকে দিয়ে চিঠি লেখাতে আসত। আমার কাজ ছিল সে-সব গুছিয়ে লিখে দেওয়া। আমার মনে হয় এই চিঠি লিখে দেওয়া থেকেই আমার ক্রিয়েটিভিটির শুরু। খুব ছেলেবেলায় হয়ত মৌলিক কিছু লিখেছিলাম স্কুল ম্যাগাজিনে— সেসব মনে নেই'।

আপনার কলেজজীবন এবং সে-সময়ের সাহিত্যচর্চা বিষয়ে কিছু বলুন। —'আমি স্কুলফাইনাল পাস করি ১৯৫২ সালে। তারপর দিনহাটার স্কুল ছেড়ে ভর্তি হই কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে। আই. এস সি. ক্লাসে। কলেজ ম্যাগাজিনের জন্যে লেখা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটা বাক্স রাখা হয়েছিল। আমি সেই বাক্সে একটা কবিতা ফেলে দিয়েছিলাম। কবিতাটা ছাপা হয়েছিল। ওই ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিলেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপক মজুমদারও ওই কলেজেই পড়ত। ওরা দু'জনেই আমার থেকে দু'ক্লাস উঁচুতে পড়ত। একদিন দীপক নিজে এসে আমার সঙ্গে আলাপ

করল। বলল : ম্যাগাজিনে আপনার লেখা পড়েছি। ভালো লেখা। —আমরা একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। কিছু পরে সুনীল (গঙ্গোপাধ্যায়) এল, আনন্দ বাগচী এল। সেই থেকে আমার রাত করে বাড়ি ফেরা শুরু। ওই সময়ে ডাকে হঠাৎই দুটো কবিতা পাঠাই। ১৯৫২-৫৩ সাল। একটা 'পূর্বাশা'য় আর একটা 'দেশ'-এ। দুটো লেখাই ওদের পুজোসংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। প্রথমে যাই সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে 'পূর্বাশা' অফিসে। সঞ্জয়বাবু এত বড়মাপের মানুষ ছিলেন যে উনি আমাকেই আমার কবিতা ব্যাখ্যা করে শোনাতে লাগলেন। লজ্জার কথা। আমার কবিতাটা ছাপিয়ে উনি খুশি হয়েছিলেন। সঞ্জয়বাবু আমাকে ম্যাকনিস্-এর 'মহাবলিপুরম্' অনুবাদ করতে বলেন। আমি বলেছিলাম : এ আমি পারব না। অত ভালো ইংরাজি আমি জানি না। উনি সাহস দিয়ে বলেছিলেন : না, না চেষ্টা কর, পারবে।— ওই অনুবাদ আমি অবশ্য করিনি। 'দেশ' পত্রিকায় আমার লেখা নির্বাচন করে ছাপিয়েছিলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রথম কবিতার পাতার একদিকে জীবনানন্দের, একদিকে বুদ্ধদেব বসুর এবং তলায় আমার ছোট্ট একটি কবিতা। 'দেশ' পত্রিকার অফিসে একদিন গিয়েছিলাম। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অতি ভদ্র ব্যবহার করেছিলেন আমার সঙ্গে। আমার হাতে একটি 'দেশ' পুজোসংখ্যা ও একটি পাস দিয়েছিলেন। সেই প্রথম জানলাম পত্রিকার আপিস থেকে পত্রিকা নিয়ে বেরুতে গেলে 'পাস' লাগে। যত দূর মনে পড়ে, এটা ১৯৫৩ সালের ঘটনা। 'দেশ'-এ কবিতা লেখার জন্যে আমি পঁচিশটা টাকাও পেয়েছিলাম।··· সে-সময়ে আমাদের আড্ডা বসত দীপকের বাড়িতে। সুনীল, আনন্দ, ভাস্কর, আশু, নৃসিংহ, অতীন, শ্যামাপদ··· সেই আড্ডায় নিয়মিত আসত। ওইখানেই 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা বের করার পরিকল্পনা করা হয়।'

উৎপলকুমার 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ছিলেন ; তবে 'কৃত্তিবাস'-এর প্রথম সংখ্যায় তাঁর কোনো কবিতা প্রকাশিত হয়নি। বুদ্ধদেব বসু প্রসঙ্গে উৎপলকুমার জানালেন, 'না, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। কখনও আলাপ হয়ওনি। 'কবিতা' পত্রিকায় লেখা পাঠাইনি কারণ, আমার বিশ্বাস ছিল, ওখানে সব কুশলী ও বিখ্যাত লোকেরা লিখে থাকেন। তাছাড়া, আমি যখন লেখালেখি শুরু করি তার কিছুদিন পরেই বুদ্ধদেব বিদেশে চলে যান। এবং বুদ্ধদেব যখন বিদেশ থেকে ফিরে এসে জাঁকিয়ে বসলেন, আমি তখন বিদেশে। বুদ্ধদেবের সঙ্গে আলাপ হয়নি কিন্তু কমলকুমার মজুমদারের সঙ্গে খুব আলাপ ছিল, সে-সময়ে কমলকুমারের ভীষণ ভক্ত হয়ে পড়ি।'

'আর কোন্ পত্রিকায় আপনার লেখা প্রকাশিত হত?' —'অগ্রণী'-তে একসময়ে প্রচুর লিখেছি। 'অগ্রণী'-র প্রতি সংখ্যাতে শক্তি, বিনয় বা আমার লেখা থাকতই।'

আই. এস সি. পাস করার পর আপনি কী পড়েছিলেন? —'স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আই. এস সি পাস করার পর আমি আশুতোষ কলেজে কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে ভর্তি

হই। কিন্তু কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে পড়াশোনা আমি শেষ করতে পারিনি কারণ অনার্স পড়ার রিজিডিটি আমার সহ্য হত না। আমি পাস কোর্সে বি. এস সি. পাস করি। লেখাপড়ায় আমি ছিলাম মাঝারি বা খারাপের দিকে। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ হবার ইচ্ছে ছিল। বি. এস সি. পাস করার পর আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জিওলজি নিয়ে এম. এস সি. পড়ার সুযোগ পাই। এই সুযোগ পাওয়ার কথা নয় কারণ আমার অনার্স ছিল না। তারপর জিওলজি নিয়ে এম. এস সি. পাস করি।'

আপনার প্রথমদিকের কবিতায় জীবনানন্দের সরাসরি প্রভাব আছে। —আমি এ-কথা বলতেই উৎপলকুমার বললেন, 'আমাদের আড্ডায় জীবনানন্দ বারবার পড়া হত, আর কারুরই কবিতা বিশেষ পড়া হত না। তাই সে-সময়ে জীবনানন্দকে এড়ানো মুশকিল ছিল'।

কীভাবে আপনার লেখাকে আপনি নতুন করতে চেয়েছিলেন, জীবনানন্দের প্রভাব এড়িয়ে ?— আমাকে আবার অবাক করে দিয়ে তিনি প্রথমেই বললেন, 'আমি ঠিক সাহিত্য, কবিতা বা এই সব বিষয়ের লোক নই বলে— আমার মনে হয়েছে, অন্য জিনিস আমি করতে পারি। যেমন নতুন চিত্রকল্প বা অন্য ধরনের ভাষা। লোকের মুখের কথাকে আমি সরাসরি কবিতায় নিয়ে এসেছি। খুব নিঃসঙ্গ ছিলাম বলে ছেলেবেলায় আমার আড়িপাতা স্বভাব ছিল। আমি এখনও ঘুমের মধ্যে ছেলেবেলায় শোনা বিভিন্ন কণ্ঠস্বর, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কথা শুনতে পাই। ভাষার মাধ্যমে মানুষের মনের গভীরে যাওয়ার প্রবণতা আমার আছে।

হাংরি জেনারেশনের সঙ্গে আপনি কীভাবে যুক্ত হলেন ? —'হাংরি জেনারেশন সে-ভাবে কোনো সংগঠিত আন্দোলন ছিল না। যার খুশি, যেখান থেকে পারে, বুলেটিন বের করে হাংরি জেনারেশন নাম দিয়ে বাজারে ছেড়ে দিত। এই আন্দোলন ছিল অনিয়ন্ত্রিত। কতকগুলো ফতোয়া মলয়, সমীর, শক্তি— এরা লিখেছিল। এ-গুলোর নিচে অনেকের নাম দিয়ে দেওয়া হত। বহুক্ষেত্রেই যাদের নাম দেওয়া হচ্ছে তাদের জিজ্ঞাসাও করা হত না। জিওলজি পড়ার সূত্রে আমি চাইবাসায় ফিল্ড ওয়ার্কে যেতাম। সেখানে সমীর ও মলয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। সমীরের বৌ বেলা আমাদের মনোহরণ করে। সুনীল, শক্তি, সন্দীপনও যেত। হাংরিদের সে-ভাবে কোনো কাগজও ছিল না। হয়ত ত্রিপুরা থেকে একটা কাগজ বেরুল— নাম দিয়ে দিল হাংরি-জেনারেশন বুলেটিন, নম্বর ১২, হয়ত তার ১০ বা ১১ বেরোয়নি।...'

সাহিত্য ছাড়াও হাংরিদের নামে নানা কথা শোনা যায়। যেমন, ওঁরা নাকি 'দেশ' পত্রিকার পুস্তক-সমালোচনা বিভাগে জুতোর বাক্স পাঠিয়েছিলেন, বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের ডেকে নগ্ন বক্ষ আদিবাসী মহিলার নাচ দেখিয়েছিলেন—আমি জিজ্ঞাসা করি।

'হ্যাঁ এরকম আরও বহু অভিযোগ ছিল। তবে, এগুলোর অনেক কিছুই বানানো। কাকে নাকি একবার ফোন করে বলা হয়েছিল, আপনার ছেলের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, বাড়ি ফিরে যান। এখন, এসব কে করেছে, কেন করেছেন, আদৌ করেছে কিনা

এ-সব আজ ট্রেস করা মুশকিল। পুলিশ ভেবেছিল হাংরি আন্দোলন একটা সংগঠিত ব্যাপার। তখন আমি রয়েড স্ট্রিটে থাকতাম। সেখান থেকে পুলিশ একটা ভ্যানে করে আমাকে লালবাজারে নিয়ে যায়। তখন লালবাজারে পুলিশ কমিশনার ছিলেন পি. কে. সেন। উনি প্রথমে আমাকে মৃদু ধমকালেন : আপনি কলেজের অধ্যাপক, ছেলেছোকরাদের ফিচলেমিতে কেন নিজেকে জড়ালেন ?··· আমি বললাম, আমি অত কিছু জানি না। সব কাগজে লিখি, ওদের কাগজেও লিখি। তবে আমি মনে করি, হাংরিরা লেখায় কোনো অসামাজিক কাজ করছে কিনা তার বিচার করুন এবং ওদের লেখাকে বিচার করুন লেখা হিসেবে। দুটো আলাদা জিনিস। যদি লেখার কথা বলেন, এদের লেখাকে যে-ভাবে অশ্লীল এবং অসামাজিক বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, সেটা আমি মানতে রাজি নই। অন্য যে-সব অ্যাকটিভিটিজ— সে-সব বিষয়ে আমার মন্তব্য করা সাজে না কারণ ওগুলো সত্য কিনা সে বিষয়েই সন্দেহ আছে। তারপর ওরা এ-সব ড্রপ করে দিয়ে মলয়ের 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটিকে অশ্লীল বলে শুধু মলয়ের বিরুদ্ধে কেস আরম্ভ করে।··· পুলিশ আমাকে বলে যে আপনি পুলিশের পক্ষে হয়ে যান, হয়ে গিয়ে বলুন যে আমি মনে করি না এ-লেখা অশ্লীল। তাহলে কেসটা আপনাদের পক্ষেই জোরদার হবে। তারপর, আমি পুলিশের পক্ষে বলি বা অন্য কারুর হয়ে বলি, আমি একই কথা বলেছি। আমি পুলিশের পক্ষে witness হয়েছিলাম কিন্তু I turned into a hostile witness.'

আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি পুলিশকে এরকম স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন যে হাংরিদের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই ? —'এরকম স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম কিনা মনে নেই। তবে হাংরিদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই— এরকম বলা হাস্যকর। কারণ, ওদের প্যাম্ফলেট, ইস্তাহারে আমার নাম ছিল। তাছাড়া ওই সময়েই কলেজে আমাকে নিয়ে গোলমাল শুরু হয়ে যায়। সেই গোলমাল নিয়েই আমি বেশি জড়িত হয়ে পড়ি।'

প্রসঙ্গত বলি, হাংরি জেনারেশন কর্তৃক উৎপলকুমারের একটি ৬৯ লাইনের দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয় ফোল্ডারের আকারে, ১৯৬৩ সালে। ওই ফোল্ডারে প্রকাশনা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি ছিল এইরকম : **VERE PAPA MORTUUS EST/A Hungry Generation message on the death of Pope John XXIII/Text by UTPALKUMAR BASU/Published by Haradhan Dhara, 269 Netaji/Subhas Road, Howrah, on behalf of the Hungry Generation, Calcutta.**

হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে উৎপলকুমার পুলিশকে যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন তা নিচে দেওয়া হল :

'আমি অবিবাহিত এবং আমার বয়স ২৮ বছর। বর্তমানে আমি ২৩ রয়েড স্ট্রীটে

থাকি। আমি জিওলজিতে এম. এস সি. ও আশুতোষ কলেজে প্রভাষক। ১৯৬২ সনে বা তার কাছাকাছি কোনও এক সময়ে হাংরি পুস্তিকা আমার নজরে পড়ে। আমি সাহিত্য আন্দোলনে আগ্রহী ছিলাম। পরে আমি মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে পরিচিত হই যদিও তার বড়ো ভাই সমীর রায়চৌধুরীকে আমি আগে থাকতেই চিনতাম। কলেজ স্ট্রীট কফিহাউস এই আন্দোলনকারীদের আড্ডা মারার জায়গা। কিছুকালের মধ্যে হাংরি আন্দোলনের অন্যান্য শরিক যেমন শৈলেশ্বর সুভাষ দেবী রায় ওরফে হারাধন ধাড়ার সঙ্গে পরিচয় হয়। তাদের অনুরোধে বিভিন্ন সময়ে হাংরি-পুস্তিকায় গদ্য ও কবিতা লিখেছি। কোথা থেকে সেগুলি ছাপানো হতো আর কে তার খরচ যোগাতো তা আমি জানিনা। ১৯৬৪ সনে গ্রীষ্মে মলয় পাটনা থেকে কলকাতা আসে ও আমাকে প্রকাশিতব্য পুস্তিকার জন্যে লেখা দিতে বলে। আমি 'কুসংস্কার' নামে একটা লেখার পাণ্ডুলিপি ব্যক্তিগতভাবে মলয়কে দিই। তারপর আমি দুমাসের জন্যে ডালহৌসী চলে যাই এবং কলকাতা ফিরে আমি আলোচ্য পুস্তিকাটি দেখতে পাই। পরে ডাকযোগে একটা কপি পেয়েছি। আমার মতে মলয় রায়চৌধুরীর লেখায় নিদারুণ বিরক্তি ও অসম্ভাব্যতার উপলব্ধি থাকে। আমি মনে করি তাদের সাহিত্য আন্দোলন নৈতিকভাবে কলুষিত হয়ে গেছে এবং আমি হাংরি আন্দোলন থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছি। মলয়ের হাতের লেখা দেখার সুযোগ আমার হয়েছে।'

এই জবানবন্দী উৎপলকুমার দিয়েছিলেন ৫. ৪. ১৯৬৫ তারিখে। আদালতে উৎপলকুমার 'প্রচন্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' নিয়ে যা বলেন তার সঙ্গে পুলিশকে দেওয়া জবানবন্দীর কিছু পার্থক্য আছে :

'চার নম্বরে উৎপলকুমার বসু ১৪.৭.৬৫ তারিখে। তিনি জানালেন তিনি প্রথম থেকেই এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। মলয় আর সমীরকে তিনি ভালোভাবে চেনেন। মাঝে মধ্যে কফিহাউসে হাংরি আন্দোলনকারীরা আড্ডা দিতো। মলয়ের লেখা তিনি পড়েন। হাংরি বুলেটিনে এখন আর তিনি লেখেন না কেননা এখন আর তা প্রকাশিত হয় না। মলয়ের কবিতাটা তিনি বেশ কয়েকবার পড়েছেন। তাঁর মনে হয় কবিতাটা উত্তেজিত অবস্থায় টেনশনের মধ্যে লেখা। নিঃসন্দেহে এটা নতুন ধরনের কবিতা। কবিতায় এরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাহিত্যে অত্যন্ত প্রয়োজন। কবিতাটিতে ডিসগাস্ট আছে বোঝা যায়।

ম্যাজিসট্রেট : উড ইউ কল ইট অবসীন ?

উৎপল : আই ডু নট নো হোয়াট ইজ মেন্ট বাই অবসীন। আই উড প্রেফার সামবডি এক্সপ্লেনস ইট টু মি।'

[সমীর রায়চৌধুরী কর্তৃক জুলাই, ১৯৯৪-তে প্রকাশিত মলয় রায়চৌধুরী লিখিত 'হংরি কিংবদন্তী' গ্রন্থের পৃ. ৮৪,৮৫ ও ৮৬ দ্রষ্টব্য। উপরের দুটি উদ্ধৃতিই ওই গ্রন্থ থেকে তোলা হয়েছে।]

আপনার কলেজের চাকরি নিয়ে কী গোলমাল হয়েছিল? —আমি জিজ্ঞাসা করি। —'এম. এস সি. পাস করার পর আমি আশুতোষ কলেজে পড়াতে শুরু করি। সকাল, দুপুর— নানা বিভাগে ভূতত্ত্ব পড়াতাম। ওই সময়ে হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত জনা পাঁচ ছয়ের ছবি টাইম ম্যাগাজিনে বের হয়। সিঙ্গাপুরের এক সাংবাদিক ছবিটি তুলেছিলেন। ছবিতে সমীর, মলয়, আমি, দেবী রায়, সুবো আচার্য— এরা ছিলাম। ওই ছবি কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে পড়ে এবং ওঁরা আমাকে তদন্তের জন্য ডাকেন। আমি নিজের লেখার ব্যাপারে সর্বদাই বেশ গোপনীয়তা অবলম্বন করেছি। ওঁরা জানতেন না যে আমি লেখালেখি করি। ওঁরা আমাকে বলেন যে আপনার বইপত্র দিন। আমি বলেছিলাম, আমার বইপত্র আমি তো দিতে পারব না, আপনারা জোগাড় করে নিন। এতে ওঁরা খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে ওই সব কলেজ চলত। মুখার্জি বাড়ির লোকেরা সব রাজার মতো বসে থাকতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অধ্যাপকেরা, বাংলার, ইংরাজির— কী স্তাবকতাই যে এঁরা করতেন! ওঁরা আমাকে সাসপেন্ড করেন। কারণ, আমার লেখা একজন অধ্যাপকের পক্ষে উপযুক্ত নয়। এর জন্যে একটা বিচার কমিটি গঠন করা হয়েছিল যাতে প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় অধ্যাপকেরা ছিলেন।— সব একেকটি স্তাবক একেবারে— অশিক্ষিত। আমাকে ১৫ দিন পরপর কমিটির কাছে হাজির হতে হত। প্রায় ছ' মাস ওইভাবে চলল। কমিটির লোকেরা আমার লেখার বিচার করত! আমাকে জিজ্ঞাসা করত এর মানে কী, ওর মানে কী? হাস্যকর ব্যাপার! আসলে কলেজে আমার খুঁটির জোর ছিল না। আস্তে আস্তে ব্যাপারটা হাংরি থেকে ব্যক্তির দিকে, আমার দিকে সরে যায়। ওরা ঠিক করেছিল আমাকে ছাড়াবে। আমি ঠিক জানি না আমার বিরুদ্ধে চার্জটা কী ছিল। ওরা একটা টাইপ করা কাগজে আমাকে সই করতে বলে যাতে লেখা ছিল: আমি যা লিখেছি তা একজন কলেজ শিক্ষকের উপযুক্ত নয়। এবং আমি ভবিষ্যতে আর এরকম লিখব না বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমি একটু ঔদ্ধত্য দেখিয়ে বলেছিলাম ১৫ দিন সময় চাই। সাহায্যের জন্যে অনেকের কাছে গিয়েছিলাম। মুখার্জি বাড়ির বিরুদ্ধে মুখ খুলতে কেউ রাজি হয়নি। সাহায্য করেছিলেন Indian Committee for Cultural Freedom-এর A. B. Shah. পণ্ডিত লোক। উনি কলেজ কর্তৃপক্ষকে ৮ পাতার চিঠি লিখেছিলেন। গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে খোঁজ পেয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ওঁর কাছে একদিন গিয়েছিলাম। উনি বলেছিলেন, আমি আপনাদের লেখা পড়েছি, আপনাদের লেখায় অন্যায় তো কিছু দেখছি না।—যাই হোক কলেজের চাকরিটা আমার যায়।'

এরপর আবার আমরা লেখালেখির প্রসঙ্গে ফিরে আসি। জানতে চাই, 'চৈত্রে রচিত কবিতা' প্রকাশের ইতিবৃত্ত, বইটা পাঠকদের কেমন লেগেছিল —এইসব।

'পঞ্চাশের শেষ দিকে আমাদের সকলেরই একটা চার ফর্মার বই বের করার হুজুগ ওঠে।

সবকটারই প্রকাশক ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রচ্ছদ পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা। পৃথ্বীশ খুব মন দিয়ে কাজ করত।— না, 'চৈত্রে রচিত কবিতা' নিয়ে সে-ভাবে কোনো রিঅ্যাকশন হয়নি। কারণ প্রায় প্রতিমাসেই একটা করে অমন বই বেরুত আমাদের, বিনয়ের বই নিয়েও কোনো রিঅ্যাকশন হয়নি, যতদূর মনে পড়ে। পাশাপাশি মনে রাখা দরকার, তখন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের, অমিয় চক্রবর্তীর বই বেরুচ্ছে। লোকেরা এঁদের প্রতিই বেশি আগ্রহী ছিল। সম্ভবত অলোকরঞ্জন আমার বইটা নিয়ে 'কৃত্তিবাস'-এই আলোচনা করেছিলেন।'

আবার জানতে চাই, কবিতাকে কীভাবে আপনি নতুন করতে চেয়েছিলেন, এ বিষয়ে কি সচেতন কোনো প্রয়াস আপনার ছিল? —'কবিতাকে সচেতন ভাবে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলাম কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবে, আমি এখনও একটা লেখা বহুবার লিখি। লিখে ফেলে রেখে দিই। পরিবর্তন করি। এমন হতে পারে আমি কোনো পুরনো নাটক পড়লাম, তার দ্বারা প্রভাবিত হলাম। একটা গ্রিক কবিতার সংকলন পেয়েছিলাম, তার কিছু উপাদান কবিতায় ব্যবহার করেছি। তবে, কবিতাকে আধুনিক করতে গেলে মনটাকে আধুনিক করতে হয়।'

'চৈত্রে রচিত কবিতা' বইটির বিষয়ে কিছু বলুন। —'চৈত্রে রচিত কবিতা' শুরু করেছিলাম প্রকৃতির ব্যাপার দিয়ে। ঠিক কী ভেবে লিখেছিলাম এখন বলা শক্ত। তবে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে আহরিত চিত্র, শব্দ ইত্যাদি আর 'বোধিত বিদ্যার জগৎ' থেকে পাওয়া নানা কৌশল ও উপাদান কবিতায় ব্যবহার করেছি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে তখন আমরা ইয়োরোপীয় কবিতার স্বাদ পেয়ে গেছি। অ্যাংলো-আমেরিকান কবিতা ছাড়াও ওই সময়ে আমরা গ্রিক, ফরাসি ইত্যাদি কবিতার খোঁজ পাই।'

কবিতায় আপনি কী বলতে চেয়েছেন একটু বলবেন? —'পরিষ্কার করে বলা কঠিন। তবে এটা হতে পারে, আমি এখন খানিকটা বুঝতে পারি, আমার লেখায় অবচেতনের ব্যাপার, মিথিকাল ওয়ার্ল্ড-এর ব্যবহার প্রথম থেকেই রয়ে গেছে, টিপিকাল বাঙালি মিথ আমি ব্যবহার করিনি। কৃষ্ণ-রাধার উল্লেখ আমার কবিতায় নেই, তবে যমুনার উল্লেখ আছে। অনেকে মূল জিনিসটাকে বাদ দিয়ে একটা মাইনর জিনিসকে বড় করে দেখেন। জীবনানন্দ (বেহুলা-লখিন্দর মিথের) গাঙুরের জলকে বড় করে দেখেছিলেন। আমি মিথ-এর খণ্ডিত অংশকে ব্যবহার করেছি। শুধু মিথ নয়, আমি যে কনশাসনেস-টাকে ব্যবহার করেছি তা কিন্তু যৌথ অবচেতন বা কালেকটিভ আনকনশাসনেস। সে-মুহূর্তে আমি 'সূর্যঘড়ি'র কথা বলছি, 'শ্বেত রাত্রি'র কথা বলছি।'

'পুরী সিরিজ' বা 'আবার পুরী সিরিজ' সম্বন্ধে আমার নানা প্রশ্নের উত্তরে উৎপলকুমার বলেন, 'পুরী সিরিজ' কবিতাটি হাওড়াবাসী সমীর রায়ের 'মহেঞ্জোদারো' পত্রিকায় ছাপা হয়। তখন আমরা ধর্মতলায় সোডা ফাউন্টেনে আড্ডা দিতাম— ছবি আঁকিয়েদের

সঙ্গে। আমি সমুদ্র দেখি বেশ পরিণত বয়সে। প্রথমে দীঘা যাই। তারপর পুরী— দিন সাতেক ছিলাম— তবে তখন লিখিনি, পরে লিখি।

'চৈত্রে রচিত কবিতা' সহজবোধ্য কিন্তু 'আবার পুরী সিরিজ' এর বহু কবিতাই তা নয়।— এই বিষয়ে কিছু বলবেন? —'আমার এ সম্বন্ধে কোনো সচেতনতা নেই। পাঠক কিছু বুঝতে পারল কি পারল না এতে আমার কিছুই যায় আসে না। খবরের কাগজের বুক রিভিউ-এর কথা বাদ দিলে— যা মনে আসে তাই লিখি। কিছুর ধার ধারি না। এই ডেসপারেটনেস-টা এসেছে যেহেতু আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। আমি সাহিত্যের প্রথা মেনে চলি না।'

পাঠকের ব্যাপারে কিছু না-ভাবাটা কি একজন লেখকের পক্ষে সর্বনেশে নয়?— আমি প্রশ্ন করি।

'পাঠকের কথা ভাবতে গেলে মাথায় অনেক চিন্তা আসে।··· বাক্য তৈরি করার যে প্রণালী— এটা অনেকটা দুর্বিনীতের মতো শোনাবে— সিনট্যাক্স-ভাঙা বাংলা কবিতায় আমিই প্রথম শুরু করি— এ পর্যন্ত আর কোনো কবি এ-কাজ করেননি। যেমন একটা কবিতায় ছিল: 'জাগো, রাণা কমলালেবুর বীজ প্রতাপের মতো' (শীতকাতর ঘুমের ভিতর গভীরতর ঘুম আছে: লোচনদাস কারিগর)।··· যেন একটা স্টেজ-এর মধ্যে এক-একজন কথা বলে যাচ্ছে। এই প্রলাপের মতো বলে যাওয়া— কোনো সিকোয়েন্স বজায় না রাখা— এটা কিন্তু মনোজগতের গভীর থেকে উঠে আসা এক নাট্যদৃশ্য।'

কিন্তু পাঠক এগুলোকে কী ভাবে নেবে? —আমার প্রশ্ন। —'আমি তো নানা আঙ্গিকে লিখেছি। যারা এরকম লেখে তাদের পাঠকের ওপর ভীষণ বিশ্বাস থাকে।— হয়ত আজ বুঝছে না কিন্তু আগামীকাল বুঝবে। এই বিশ্বাস আধুনিক কবিতার বিশ্বাস। এখানে পাঠককে কবির সমগোত্রীয় ধরা হয়। এজন্য কবিরাই আধুনিক কবিতার পাঠক। 'কৃত্তিবাস'-এর কোনো সংখ্যার সমালোচনা করতে গিয়ে কালিদাস রায় একবার আমার সম্বন্ধে লিখেছিলেন, আর সকলের লেখা বোঝা যায় কিন্তু এর লেখা কিছুই বোঝা গেল না।··· Syntactical গোলমাল কিন্তু কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা যায় না— এর জন্যে এক ধরনের প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়; শৃঙ্খলামোচন করা খুব মুশকিল। 'পুরী সিরিজ'-এর একটা বৈশিষ্ট্য দুটো জগতের মধ্যে আসা যাওয়া করা— একটা sane, balanced আর একটা insane, unbalanced।'

আপনার লেখার আপনি কি জগৎ ও জীবন বিষয়ে কোনো দার্শনিক উপলব্ধি প্রকাশ করতে চেয়েছেন?

— 'দর্শন যে-ভাবে জিনিসকে ব্যাখ্যা করে তার থেকে আমি বহু দূরে। কবিদের খেয়াল রাখতে হয় ভাষার সঙ্গে যৌনতার যোগাযোগ, ভাষার সঙ্গে সমাজের যোগাযোগ।' ক্রিয়েটিভ লোকেরা এক-এক সময় গভীর অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে যায়— যাকে বলে dark night of the soul— এর মধ্যে দিয়ে না-গেলে নাকি ক্রিয়েটিভ লোক হওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ সব সময়ে পজিটিভ দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

আমার ‘প্রিয় হে সবুজ ফল/তোমাকে কঠিন হতে/দেব না, সবুজ ফল’— একধরনের আধুনিক মানুষের পজিটিভিজম্‌··· ।’

প্রসঙ্গ পালটে এবার আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি হঠাৎ বিদেশে চলে গেলেন কেন? এর সঙ্গে কি হাংরি আন্দোলনের ব্যর্থতা বা কলেজের চাকরি যাওয়ার কোনো সম্পর্ক ছিল? —‘আমার বিদেশ যাওয়ার সঙ্গে হাংরি আন্দোলনের ব্যর্থতার কোনো যোগাযোগ ছিল না, তবে কলেজের চাকরি যাওয়ার সম্পর্ক ছিল।’

বিদেশে কোথায় আপনি প্রথম যান, সেখানে কী করতেন, সাহিত্যের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিলো কিনা— এসব বিষয়ে যদি কিছু বলেন।

‘আমি প্রথমে প্যারিসে যাই। সেখানে যোগেন চৌধুরীর কাছে থাকতাম, যোগেন একটা স্কলারশিপ পেত। প্যারিস থেকে লন্ডনে যাই। সেখানে নানা ধরনের কাজ করতাম। 6th form কলেজে (এখানের XI/XII ক্লাস) মাস্টারি করতাম। নানারকম পলিটিকাল অ্যাকটিভিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম যেমন প্যালেসটিনিয়ান লিবারেশন ফ্রন্ট, আলজিরিয়ার আন্ডারগ্রাউন্ড মুভমেন্ট, সাউথ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ভিয়েৎনামের আন্দোলন। লন্ডনে একটা ইন্ডিয়ান ওয়ার্কারস’ অ্যাসোসিয়েশন ছিল। আমি ছিলাম তার লন্ডন শাখার সেক্রেটারি। সেই সূত্রে অনেকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। বিদেশে যাই ১৯৬৫ সালে এবং ভারতবর্ষে ফিরে আসি ১৯৭৮-এ। এই বারো বছর বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রায় কোনো সম্পর্ক ছিল না। লিখেছিলাম ‘নরখাদক’ আর লিখেছিলাম দু-একটা কবিতা এবং অনেক চিঠিপত্র। তখন আমি বিরাট ডামাডোলের মধ্যে পড়েছিলাম।··· তখন আমি সংগঠিত মানুষের ক্রিয়া-কান্ড জানতে শুরু করি। ভারতবর্ষে ফিরে আসার ইচ্ছে ছিল অনেক দিন। বিদেশেই বিয়ে করি— ৬৯ সালে, এক বাঙালি মহিলাকে। একটা গাড়ি ছিল, ফোল্ডিং ছোট্ট তাঁবু ছিল। তাই নিয়ে ইয়োরোপের নানা দেশে খুব ঘুরতাম। আমি জিওলজিস্ট— ভুলে যাবেন না। এই সময়ে সাহিত্যের সঙ্গে আমার কোনো সংযোগ ছিল না।···

‘বিদেশ থেকে ফিরে এসে আমি দেশ ও ভাষাকে যেন পুনরাবিষ্কার করি। ‘লোচনদাস কারিগর’, ‘খন্ড বৈচিত্র্যের দিন’, ‘ধূসর আতাগাছ’— বিভিন্ন কণ্ঠস্বর সর্বত্র এসেছে। আমার নাটক/মঞ্চ প্রিয়তা আছে, এখনকার অনেক লেখাগুলোয় ডেলিরিয়াম আছে। কবি যেন ভেঙে ভেঙে দেখাচ্ছেন, একজন মনের দিক থেকে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে, স্প্লিট হয়ে গিয়ে, সব কিছু রেকর্ড করছে।··· ‘ধূসর আতাগাছ’ গদ্যের বই কিন্তু ওর মধ্যে এমন অনেক লেখা আছে যা গদ্য-পদ্যের মাঝামাঝি··· ধূসর জগৎ···’□

উৎপলকুমার বসুর প্রকাশিত গ্রন্থাবলির তালিকা ও তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ পর্যন্ত উৎপলকুমারের ছটি কবিতাগ্রন্থ এবং দুটি গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা গ্রন্থগুলির নাম হল : চৈত্রে রচিত কবিতা, পুরী সিরিজ, আবার পুরী সিরিজ, লোচনদাস কারিগর, খণ্ড বৈচিত্র্যের দিন এবং শ্রেষ্ঠ কবিতা। এদের মধ্যে 'আবার পুরী সিরিজ' গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে 'পুরী সিরিজ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ। অন্য গ্রন্থগুলির কোনো নতুন সংস্করণ বা পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়নি। গদ্যগ্রন্থ দুটির নাম হল : নরখাদক এবং ধূসর আতাগাছ। কৌতূহলী পাঠকদের জন্য এই গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হল।

চৈত্রে রচিত কবিতা

'চৈত্রে রচিত কবিতা' হল উৎপলকুমারের প্রথম প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ। এই বইটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠা নিচে পুনর্মুদ্রিত হল যা থেকে বহু তথ্য জানা যাবে।

'প্রথম সংস্করণ

ফাল্গুন, ১৩৬৮

প্রকাশক : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কৃত্তিবাস প্রকাশনী ২২ শ্যামপুকুর স্ট্রীট। কলকাতা-৪। প্রচ্ছদপট : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। মুদ্রাকর : নন্দদুলাল চক্রবর্তী। শ্রী তারা প্রেস। ৩৯/৪, রামতনু বোস লেন, কলকাতা-৬

রচনাকাল

১৩৬৩-১৩৬৮

কবিতাগুলি কালানুক্রমে সাজানো নয়। অধিকাংশ রচনাই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় হয়েছিল। এই গ্রন্থে তাদের কিছু পরিবর্তিত রূপ দেখা যাবে। কয়েকটি নতুন এবং অপ্রকাশিত কবিতা আছে।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত : সমালোচনা এবং অনুরূপ উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের যে কোনো অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। অন্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলে লেখকের অথবা প্রকাশনীর সম্মতি প্রয়োজন।

দাম : দু' টাকা'

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র পুস্তকপরিচয় বিভাগে বলা হয়েছে যে 'চৈত্রে রচিত কবিতা'র রচনাকাল : ১৯৫২-১৯৬১।

এই বইয়ের ছয়-এর পাতায় মুদ্রণপ্রমাদ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি আছে। বিজ্ঞপ্তিটি নিচে দেওয়া হল।

'মুদ্রণ প্রমাদ

পৃষ্ঠা ৪৫ : চতুর্থ লাইনের পাঠ এইরূপ
কখনও নেমেছ ঢেউ-এ, নীলিমায়, স্নানে

পৃষ্ঠা ৪৮ : নবম লাইনের পাঠ এইরূপ
অথবা পূর্বে এসে দাঁড়িয়েছি

পৃষ্ঠা ৪৯ : দ্বাদশ লাইনের পাঠ এইরূপ
একদিন মূঢ় অন্ধ পাতাল তিমিরে তুমি পেতে রেখো কান

আরও দু'একটি ভ্রম উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।
সেগুলির সংস্কারবিধি স্বভাবতই পাঠকের মনে পড়বে।'

যে তিনটি কবিতার মুদ্রণপ্রমাদের কথা বলা হল, সেই তিনটি কবিতার নাম যথাক্রমে 'দুঃসময়', 'কেবল পাতার শব্দে' এবং 'আবাস'।

'চৈত্রে রচিত কবিতা' গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬।

'চৈত্রে রচিত কবিতা' গ্রন্থের 'কেবল পাতার শব্দে' কবিতাটি 'আবার পুরী সিরিজ'-এর উৎসর্গপত্রে ব্যবহার করা হয়েছে 'পরবর্তী নতুন কবিকে' উদ্দেশ্য করে। এই সময়ে কবিতাটিতে কিছু পরিবর্তন করা হয়। নিচে কবিতাটির দুটি পাঠই সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত করা হল।

কেবল পাতার শব্দে

কেবল পাতার শব্দে আমি আজ জেগেছি সন্ত্রাসে।
ভেবেছি সমস্ত দিন এত লেখা, এত গূঢ় প্রশ্ন উত্থাপন
তার পিছে কোটি কোটি উদ্বেল কাচের শিখরে
উঠেছে গীর্জার সারি-ধ্বনিরোল-মাতৃকা মেরীর মতন।

আজ আছি চিরন্তন রৌদ্র ও হিম সকালের
আবরণ উদ্ভাবনে— যে প্রহর বাজে না চকিতে
কেবলই বুকের তলে ক্ষয়ে যায় অজ্ঞান অলক্ষ্য যাত্রায়
পুরনো পাতার শব্দে, ঝরে পড়া— অঘ্রানে, শীতে।

অথবা পূর্বে এসে দাঁড়িয়েছি— খামারের লোহার শিকল
অব্যবহৃত তাই খোলে না বা খুলিনি কি ভুলে
অথবা শিশির তাকে এত গ্রাস করে— দৃষ্টির অতল

সীমাহীন কুয়াশায় তেমনই উঠেছ কেউ আমার মতন—
ভয়ে, দুঃখে, অকস্মাৎ কোনো শব্দে, দুয়ার না খুলে
শুনেছ সমস্ত দিন নীলিমায় গৃধিনীর অনন্ত পতন।

('চৈত্রে রচিত কবিতা' থেকে)

উৎসর্গ

[পরবর্তী নতুন কবিকে]

কেবল পাতার শব্দে আমি কাল জেগেছি সন্ত্রাসে।
ভেবেছি সমস্ত দিন এত লেখা, এত প্রশ্ন, এ-কথন
কারও পিছে কোটি কোটি চিহ্ন-তীর শস্যের শিখরে
উঠেছে চাষের গান, স্বপ্নে দেখা মায়ের মতন।

আজ বসে আছি ভোরবেলা রৌদ্র ও হিম সকালের
আবরণ উদ্‌ঘাটনে। এ-প্রহর বাজে না চকিতে
কেবলই বুকের তলে ক্ষয়ে যায় অজ্ঞান অলক্ষ্য যাত্রায়
হলুদ পাতার ঝড়ে নেমে আসা বাৎসরিক শীতে।

অথবা পূর্বে এসে দাঁড়িয়েছি। খামারের লোহার শিকল
অব্যবহৃত তাই খোলে না বা খুলিনি কি ভুলে
অথবা শিশির তাকে এতদূর গ্রাস করে— দৃষ্টির অতল

সীমাহীন কুয়াশায় তেমনই উঠেছ কেউ আমার মতন
ভয়ে দুঃখে, মায়ের হাসির শব্দে। দুয়ার না খুলে
শুনেছ সমস্ত দিন নীলিমায় গৃধিনীর অনন্ত পতন

('আবার পুরী সিরিজ' থেকে)

'চৈত্রে রচিত কবিতা' থেকে ১৮টি কবিতা 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় গৃহীত হয়েছে। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় 'চৈত্রে রচিত কবিতা' গ্রন্থের কবিতার নামগুলিকে বর্জন করে কবিতাগুলিকে শুধুমাত্র সংখ্যায়িত করে মুদ্রিত করা হয়েছে। নিচের তালিকায় 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় দেওয়া সংখ্যা এবং 'চৈত্রে রচিত কবিতা' গ্রন্থের কবিতার নাম দেওয়া হল :

শ্রেষ্ঠ কবিতায় দেওয়া সংখ্যা	**'চৈত্রে রচিত কবিতা' গ্রন্থে কবিতাটির নাম**
১	আশ্বিন, ১৩৬৫
২	চতুর্দশী
৩	'গুপ্তচর' কবিতার প্রথম অংশ
৪	কবির উত্থান
৫	'নবধারা জলে' কবিতার চতুর্থ অংশ
৬	ক্ষয়
৭	পরিলিখন
৮	'নবধারা জলে' কবিতার প্রথম অংশ
৯	'স্তম্ভের গান' কবিতার পঞ্চম অংশ
১০	'স্তম্ভের গান' কবিতার দ্বিতীয় অংশ
১১	'স্তম্ভের গান' কবিতার তৃতীয় অংশ
১২	ভোর সাড়ে ছটা
১৩	'আবিষ্কার' কবিতার পঞ্চম অংশ
১৪	'দুঃসময়' কবিতার প্রথম অংশ
১৫	'দুঃসময়' কবিতার তৃতীয় অংশ
১৬	সেবাস্টিয়ান বাখ্
১৭	ময়ূর

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় গৃহীত 'চৈত্রে রচিত কবিতা'র বাকি কবিতাটি হল উৎসর্গপত্রে মুদ্রিত কবিতাটি : দয়িতা, তোমার প্রেম আমাদের সাক্ষ্য মানে নাকি ?

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় গ্রহণ করার সময় 'চৈত্রে রচিত কবিতা' গ্রন্থের কবিতাগুলিতে বিরাম-চিহ্নের বানানের এবং একটি ক্ষেত্রে পঙ্‌ক্তি বিন্যাসের পরিবর্তন করা হয়েছে ; অন্য কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে 'কেবল পাতার শব্দে' কবিতাটিতে পরিবর্তনের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল, গৌতম সেনগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত 'জনপদ' পত্রিকার দ্বিতীয় সংকলনে (বৈশাখ, ১৩৯২) 'চৈত্রে রচিত কবিতা' গ্রন্থটি সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।)

পুরী সিরিজ

'পুরী সিরিজ' উৎপলকুমারের দ্বিতীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থটির আখ্যাপত্র ও আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা নিচে দেওয়া হল :

আখ্যাপত্র

'পুরী সিরিজ / উৎপলকুমার বসু / সন্ধ্যাভাষা প্রেস'

আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা

'কপিরাইট ১৯৬৪
উৎপলকুমার বসু
তেইশ রয়েড স্ট্রীট্। কলকাতা ষোলো
৪৪-৪৫০৭

উনিশশো বাষট্টি থেকে চৌষট্টি— এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে যে যে কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল কেবল সেগুলি বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল। অবশ্য, বহু কবিতাই স্থানাভাববশত বর্জিত হয়েছে। পাঠক যদি তাঁর এক বা একাধিক প্রিয় কবিতাকে এখানে খুঁজে না-পান, আমি নিরুপায়। উপস্থিত এই কবিতাগুলিতেই প্রীত হোন।

প্রথম সংস্করণ
সেপ্টেম্বর। উনিশশো চৌষট্টি

প্রকাশক : দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যাভাষা প্রেস ২৮ কৈলাস বোস স্ট্রীট। কলকাতা-৬। মুদ্রাকর : সুনীল কুন্দগামী। গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট। কলকাতা-১৬।

কভারে কবির নিজ হস্তলিপি ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। সমালোচনা এবং অনুরূপ উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের যে কোনো অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। অন্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলে লেখকের অথবা প্রকাশকের সম্মতির প্রয়োজন।
দাম দেড় টাকা'

'পুরী সিরিজ' গ্রন্থের সমস্ত কবিতা 'আবার পুরী সিরিজ'-এ গৃহীত হয়েছে। 'পুরী সিরিজ'-এ যে-কটি কবিতা আছে তাদের নাম হল : পুরী সিরিজ, প্রকৃতির ছবি (১৯৬৩), স্মৃতি, আরো প্রকৃতির ছবি ; বিদায়, বিষণ্ণ সন্ধ্যা ; আকাশ যান, স্বপ্নের ভিতর দিয়ে গিয়েছিলাম, শাদা ঘোড়া, ফেরীঘাট, আমারই প্রাণের দিকে চেয়ে দেখি, তোমার সিন্ধুর বাড়ি, কুসংস্কার সম্পর্কে কবিতা, বোনের সঙ্গে তাজমহলে, বিশাল বাস্তবিক নক্ষত্রপদ্ধতি, উনিশশো বাষট্টি শেষ হ'ল, এই সংগ্রহের শেষ কবিতা।

'পুরী সিরিজ'-এর উৎসর্গপত্রে মুদ্রিত কবিতা 'হস্তচালিত প্রাণ তাঁত…' 'আবার পুরী সিরিজ গ্রন্থে 'ভূমিকা' শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছে। 'পুরী সিরিজ'-এর পাঁচ পাতায় নিম্নলিখিত বাক্যটি উদ্ধৃত করা হয়েছে : 'By the rivers of Babylon, there we sat down, Yea, we wept, when we remembered Zion. Psalm—137'

'পুরী সিরিজ' গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা—৩৮।

'পুরী সিরিজ'-এর চতুর্থ মলাটে একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া আছে। বিজ্ঞপ্তিটি হল :

'বছর দুই এক আগে পুরী সিরিজ লেখা হয়েছিল। তারই সম্পূরক আরো কিছু কবিতা একত্র ক'রে ঐ নামেই একটি বই প্রকাশিত হ'ল। এতে সমুদ্র, বামন, তাঁতকল, শিকারী, সতী, নপুংসক, মিসিবাবা, এয়ারোড্রোম, সূঁচ ও আত্মা, রণরক্ত ও সন্ধ্যাবাতাস, কৈবল্য ও ঈশ্বরোপাশনার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পাঠকদের ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য এক নিষিদ্ধ পারমানবিক চুল্লী খুলে দেখানো হল এই গ্রন্থে।'

'পুরী সিরিজ' ও 'আবার পুরী সিরিজ' এর পাঠভেদ সংক্রান্ত তথ্য একটু নিচে দেওয়া হয়েছে।

আবার পুরী সিরিজ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে 'আবার পুরী সিরিজ' 'পুরী সিরিজ'-এর পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত একটি নতুন সংস্করণ। নিচে এই গ্রন্থের আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা পুনর্মুদ্রিত হল :

'প্রথম সংস্করণ/আষাঢ় ১৩৮৫ : আগস্ট ১৯৭৮/গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। সমালোচনা এবং অনুরূপ/উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের যে-কোনো অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। অন্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হ'লে কবির লিখিত সম্মতির প্রয়োজন। প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল। বিশ্ববাণী প্রকাশনী/৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৯ /

মুদ্রক : অনাদিনাথ কুমার/উমাশঙ্কর প্রেস/১২, গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট। কলকাতা-৬/ দাম : আট টাকা।' প্রচ্ছদপট শিল্পীর উল্লেখ করা হয়নি।

'আবার পুরী সিরিজ' এর চতুর্থ মলাটে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তিটি আছে :

'উনিশ'শ চৌষট্টি সালে 'পুরী সিরিজ' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ হয়। বর্তমান সংগ্রহটি তারই পরিমার্জিত চতুর্গুণ বিস্তার। প্রতিটি কবিতাই সমসাময়িক— অর্থাৎ অনুমান উনিশ'শ বাষট্টি থেকে চৌষট্টি সালের মধ্যে লেখা। এ'তে সমুদ্র, বামন, তাঁতকল, শিকারী, সতী, নপুংসক, মিসিবাবা, এয়ারোড্রোম, সূঁচ ও আত্মা, রণরক্ত ও সন্ধ্যা-বাতাস, কৈবল্য ও ঈশ্বরোপাশনার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পাঠকের ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য এক নিষিদ্ধ পারমানবিক চুল্লী খুলে দেখানো হ'ল এই গ্রন্থে।'

'পুরী সিরিজ' এবং 'আবার পুরী সিরিজ' গ্রন্থ দুটির পাঠভেদ সংক্রান্ত তথ্য ও অন্যান্য কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় নিচের উল্লেখপঞ্জীতে দেওয়া হল। এই দুটি সংক্ষিপ্তক উল্লেখ-পঞ্জীতে ব্যবহার করা হয়েছে :

পু. সি.=পুরী সিরিজ এবং আ. পু. সি.=আবার পুরী সিরিজ।

উল্লেখপঞ্জী

- 'প্রকৃতির ছবি' কবিতার পু. সি.-এর 'বন থেকে বনে বনে টানা বিদ্যুতের তারগুলি মেলে দেওয়া হ'ল' অংশটি আ. পু. সি.-এ বর্জন করা হয়েছে।
- 'স্মৃতি' কবিতাটি পু.,সি.-এ সংখ্যায়িত নয় ; কবিতার দুটি অংশকে '●' এই চিহ্নের দ্বারা আলাদা করা হয়েছে এবং 'হ্যাঁ, তোমার কবিতাগুলি/পড়েছিলাম'কে প্রথমে ছাপা হয়েছে।
- 'বিদায়, বিষণ্নসন্ধ্যা' কবিতায় ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তি : … জানি এ আঘাত (পু. সি.), …জানি ও আঘাত (আ. পু. সি.)।
- 'আকাশযান' কবিতায় ২ ও ৩ সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত দুটি অংশ যা আ. পু. সি.-এ আছে তা পু. সি.-এ নেই।
- 'শাদা ঘোড়া'—এই কবিতাটির পু. সি. ও আ. পু. সি.-এর দুটি পাঠের মধ্যে পঙ্‌ক্তিবিন্যাস জনিত পার্থক্য আছে।
- 'ফেরিঘাট' কবিতায় সপ্তম লাইন : আমাকে দাও-নিশেষ জল সিঞ্চনের মতো জননী প্রতিভা (পু. সি.)। আমাকে দাওনি ক্ষেতে জলসিঞ্চনের মতো জননী প্রতিভা (আ. পু. সি.)।

এই কবিতার আ. পু. সি.-এর ৩১ পৃষ্ঠার ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তির 'নক্ষত্রতন্তু' শব্দটি পু. সি.-এ রয়েছে 'নাক্ষত্রতন্তু' হিসেবে।

এই কবিতার আ. পু. সি.-এর ৩২-তম লাইন আ. পু. সি.-এ 'উচ্চাকিত ছোরা', কিন্তু পু. সি.-এ 'উচ্চাকিত থালা'

'ফেরিঘাট' কবিতার পূ. সি. গ্রন্থের নিম্নলিখিত স্তবকটি আ. পূ. সি-এ বর্জন করা হয়েছে :

স্বাধীনতা ! অকস্মাৎ তোমাকেও মনে হয় নির্নিমেষ করুণ অঙ্গারে
সভ্যতার নাভির ভিতরে—
ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আছো, ক্রেমলিনে, যুক্তরাষ্ট্রে,
হয়তো বা বৈকুণ্ঠের যৌন মখমলে ;
হিন্দুর জিজ্ঞাসা নয়। শুধু কিছু ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের
কেবলই মঙ্গল করো। তুমি আপেক্ষিক
অন্য সকলের প্রতি— যেহেতু বিভেদ
'আন্তর্জাতিক' বলে উদ্যত মুষল—যেহেতু মানুষ
রেডিওর মতো এক অর্বাচিন বক্তার সম্মানে
পরিবারসহ শ্রোতা। যেহেতু কাগজে
নিত্যই সম্পাদক ছাপার কলের সঙ্গে কিভাবে সঙ্গম করে
তারই বিবরণ ধুরন্ধর লিখেছে বিশদ

এই কবিতার ৩২ পৃষ্ঠার ১৭ লাইন :

আমাকেও ভারতবাসীর মতো [আ. পূ. সি.]
আমাকেও খদ্যোৎবিন্দুর মতো [পূ. সি.]

● 'বিশাল বাস্তবিক নক্ষত্রপদ্ধতি' কবিতার আ. পূ. সি.-এর চতুর্থ কবিতাটি পূ. সি.-এ নেই। এই কবিতার পূ. সি.-এ প্রকাশিত চতুর্থ অংশটি আ. পূ. সি.-এ 'শোভাযাত্রা' শিরোনামে স্বতন্ত্র কবিতা হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে।

● 'উনিশশো বাষট্টি শেষ হল' কবিতার আ. পূ. সি.-এর ৪৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'রৌদ্রকে দিয়েছো তাপ, ততখানি, প্রয়োজন যত' অংশটি পূ. সি.-এ 'বৈকুণ্ঠকে, কিছু দূরে, নরকের বাইরে রেখেছে।'— লাইনটির আগে ছাপা হয়েছে।

'আবার পুরী সিরিজ' এর পাঁচটি কবিতা শ্রেষ্ঠ কবিতায় গ্রহণ করা হয়নি। কবিতাগুলির নাম হল : ভ্রমণকাহিনী, রাত্রির বাতাস মুখর কবি, পিকচার কার্ড, বহুকালের কথা।

লোচনদাস কারিগর

এক ফর্মার মনোরম প্রচ্ছদযুক্ত কবিতা-পুস্তিকা। অল্প মোটা কাগজের প্রচ্ছদপটের পেছনের দিকে প্রকাশনা সংক্রান্ত যে সব তথ্য দেওয়া আছে তা হল : 'প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮২/রচনাকাল ১৯৭৮-১৯৮১/সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত/প্রকাশক : প্রশান্ত মাজী ও পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল/প্রতিবিম্ব প্রকাশনী/বৈশাখী/ডি/১৩/৫ সল্টলেক/কলকাতা-৬৪/মুদ্রণ : তরুণ প্রেস/১১ অক্রূর দত্ত লেন/কলকাতা-১২/দাম : এক টাকা।'

এই গ্রন্থের 'রাজপুরুষ' এবং 'সতর্কবার্তা' এই দুটি ছাড়া বাকি সমস্ত কবিতাই শ্রেষ্ঠ কবিতায় গৃহীত হয়েছে।
'ধূসর আতাগাছ' গদ্যগ্রন্থে এই বই-এর তিনটি লেখা সই লুডো-খেলা ২ ও ৩ এবং সুখের কথা আর বোলো না—১ গৃহীত হয়েছে।

খণ্ড বৈচিত্র্যের দিন

এটিও এক ফর্মার একটি কবিতা-পুস্তিকা। অল্প মোটা কাগজের প্রচ্ছদপটের পেছনে প্রকাশনা সংক্রান্ত যে সব তথ্য দেওয়া আছে তা হল: 'প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬/ রচনাকাল ১৯৮২-১৯৮৫/সর্বস্বত্ব/সংরক্ষিত/প্রকাশক: প্রশান্ত মাজী ও পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল/প্রতিবিম্ব প্রকাশনী/বৈশাখী/ডি/১৩/৫ সল্টলেক/কলকাতা-৬৪/ মুদ্রক: তরুণ প্রেস/১১ অক্রূর দত্ত লেন/কলকাতা-১২/দাম: দু' টাকা'।
এই বইয়ের সংসার-১ কবিতাটি শ্রেষ্ঠ কবিতার বর্জিত হয়েছে, সংসার-২ কবিতাটি 'রবিবার' নামে শ্রেষ্ঠ কবিতায় গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া এই বইয়ের 'সময়গাছ' কবিতাটি 'আঁধার নামে' কবিতাটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'আঁধার নামে-২' হিসেবে শ্রেষ্ঠ কবিতায় ছাপা হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ কবিতা

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় উপরে উল্লিখিত কবিতা গ্রন্থগুলি থেকে কোন্ কোন্ কবিতা নেওয়া হয়েছে, তা আগেই বলা হয়েছে। অগ্রন্থিত কিছু কবিতাও এতে স্থান পেয়েছে। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র আখ্যাপত্রের পেছনের পাতা এখানে দেওয়া হল: 'রচনাকাল ১৯৫২-১৯৯০ প্রথম প্রকাশ ☐ এপ্রিল, ১৯৯১। দাম ☐ ২৫ টাকা। প্রচ্ছদ ☐ কৃষ্ণেন্দু চাকী। © উৎপল কুমার বসু। প্রতিভাসের পক্ষে বীজেশ সাহা কর্তৃক ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড কলকাতা-৭০০০০২ থেকে প্রকাশিত, দিলীপ মুখার্জি কর্তৃক ডি. বি. প্রেস ৮২ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।'
উপরিউক্ত কবিতাগ্রন্থগুলি ছাড়াও 'পোপের সমাধি' নামে একটি ৬৯ লাইনের কবিতা ১৯৬৩ সালে ফোল্ডার আকারে হাংরি জেনারেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি শ্রেষ্ঠ কবিতায় বর্জিত হয়েছে।

নরখাদক

আত্মজীবনীমূলক রচনা 'নরখাদক' সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত একটি মিনি বুক। লন্ডনে থাকার সময়ে উৎপলকুমার এই ছোট গদ্যগ্রন্থটি রচনা করেন। আখ্যাপত্রের পেছনের পাতায় প্রকাশিত প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য এখানে দেওয়া হল ঃ 'The cannibal by utpalkumar basu / 6 hillfield avenue london n. w. 9 / editor sandipan chattopadhyay / 71, Kashinath Dutta Road,

Calcutta-36 / price 30 paise / সম্পাদক-প্রকাশক ও লেখকের অনুমতি নিয়ে মিনি-বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে যে-কেউ যেখান-থেকে-খুশি এই ও আমাদের অন্যান্য মিনি বই ছাপতে পারেন যার লাভ-লোকসান তথা দায়দায়িত্বের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। সম্পাদক-প্রকাশক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা দেশবাণী মুদ্রণিকা প্রাঃ লি. ১৪ সি. ডি. এল. রায় স্ট্রীট, কল-৬ থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ : ও. সি. গঙ্গোপাধ্যায়। টাইটেল পাতার ছবি পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়।'

বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে যোগেন চৌধুরীকে। উৎসর্গপত্রে লেখা আছে : 'যোগেন চৌধুরীকে। আমার প্রিয় ছবি আঁকিয়ে যার সঙ্গে / আমি প্যারিসে অনেক সন্ধ্যা কাটিয়েছি / কবিতা এবং ছবি নিয়ে আলোচনা ক'রে'।

এই বইয়ের চতুর্থ মলাটে উৎপলকুমার সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লেখা হয়েছে যার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হল : '...পলাতক আর্তুর র‍্যাঁবো ছাড়া অপর কোনো কবির অনুপস্থিতি ও নীরবতা তার ভাষা সাহিত্যের পক্ষে দিনে দিনে এমন বাঙ্ময় ও প্রভাবশালী হয়ে উঠতেও দেখা যায় নি।'

'নরখাদক' উৎপলকুমারের প্রথম গদ্যগ্রন্থ।

ধূসর আতাগাছ

'ধূসর আতাগাছ' উৎপলকুমারের দ্বিতীয় গদ্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থের আখ্যাপত্রের পেছনের পাতা এখানে দেওয়া হল : 'ধূসর আতাগাছ। Dhusar Ata Gachh/(The Gray Tree of Custard Apples)/A collection of prose miscellany/Utpalkumar Basu/Rs. 20.00/প্রথম সংস্করণ : ১৯৯৪/© গ্রন্থস্বত্ব : লেখক/প্রচ্ছদ : রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : কমল চক্রবর্তী / ২৫এ, এগ্রিকো বাগান / জামশেদপুর—৮৩১০০৯ / প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ইম্প্রেশান হাউস / মুদ্রক : দি সারদা প্রিন্টার্স / ১৫, কানাই ধর লেন / কলিকাতা- ৭০০০১২ / মূল্য : কুড়ি টাকা।'

এই বইয়ের উৎসর্গপত্রে যা লেখা আছে : "ছেলে বেলায়, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুমহীন রাতে শুনেছি চৌকিদার হেঁকে যাচ্ছে 'বস্তিওয়ালে জাগো...কোঠিওয়ালে জাগো...।' সেই অজানা, অদেখা, সাবধানকারী, নিশাচর মানুষটির প্রতি আমার এই অস্থির মতি লেখা কালস্রোতে ভাসিয়ে দিলাম।"

'লোচনদাস কারিগর' গ্রন্থের তিনটি লেখা 'ধূসর আতাগাছ'-এ গৃহীত হয়েছে এ-কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ☐

আমার বন্ধু উৎপল

যোগেন চৌধুরী

ছয়ের দশকের গোড়া থেকেই উৎপল, তুষার (রায়) এদের সঙ্গে আমার পরিচয়। কফি-হাউসের আড্ডা কিংবা বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনের মাঠে সে সময়কার অনেক তরুণ কবিদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ ঘটত। অবশ্য তুষারের সঙ্গে যোগাযোগ হয় আকাদেমি অব ফাইন আর্টসের চত্বরে। ওর প্রথম দিককার কবিতা 'নান্দীমুখ'-এ ছেপেছিলাম আমরা। বিনয় মজুমদারের কবিতা আমার প্রথম থেকেই ভালো লাগে। তুষারের কাছ থেকে নানা পত্র-পত্রিকা পেতাম। উৎপলের 'পুরী সিরিজ'-এর এক কপি উৎপলই আমাকে দিয়েছিল— প্রথমবার ছাপা হয়ে বেরোবার পর। তার আগে থেকেই ওর কবিতা আমার কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে।

তখন আমার চব্বিশ/পঁচিশ বছর বয়স। ১৯৬০ সালে কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজের ডিগ্রি পাই। ১৯৬৫ সালে বৃত্তি পেয়ে পারির একোল দ্য বোজার্ত-এ স্নাতকোত্তর শিল্প শিক্ষার জন্য ফরাসি দেশে যাই। সে-সময় প্লেনের চেয়ে জাহাজে পাড়ি দেবার খরচ ছিল অনেক কম। তা ছাড়া স্টুডেন্টস' কনসেশন-ও আমাদের

জুটে গিয়েছিল। আর জাহাজযাত্রার একটা আলাদা আকর্ষণ তো ছিলই। সুয়েজ খাল দিয়ে যাবার সময় ডান দিকে পড়ে আরবদেশ, দীর্ঘ জায়গা জুড়ে। পাথুরে এলাকা আর পাহাড়। গাছপালা বলতে কিছু নেই। বিকালের সোনালি রোদ এসে পড়ে ওই পাহাড়ের গায়ে, এক অদ্ভুত সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। জাহাজ গিয়ে থামত মার্সাই বন্দরে।

পারি-তে তখন একটা থাকার জায়গা পাওয়া ছিল খুবই কঠিন। সৌভাগ্যক্রমে সে বছর একটা জায়গা আমরা পেয়ে যাই। বিভিন্ন দেশের বৃত্তি পাওয়া ছাত্র-শিল্পীরা সেইখানে থাকতেন। পরে কেবলমাত্র কর্মরত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীরাই ওখানে থাকার সুযোগ পেয়েছেন। অন্যদের ক্ষেত্রে এ সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। আমরা তিনজনই (আমি, দীপক ব্যানার্জি আর সুহাস রায়) ওখানে থাকতাম। আমার স্টুডিয়োর নম্বর ছিল ২১৪। বিল্ডিংটার নাম ছিল সিতে অঁতরন্যাশিওনাল দেজ আরত। সে-সময় উৎপলও কলকাতার কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে একটা জব ভাউচার জোগাড় করে লন্ডনের পথে পারি-তে গিয়ে হাজির হয়। যাত্রাসঙ্গী ছিল রেকসিনের একটা সুটকেস, তাতে জামাকাপড় আর জিনিসপত্র ঠাসা। সন্দীপনের লেখা পড়ে জেনেছি ও নাকি কলকাতার ঘর-টর, দামি জিনিসপত্র মায় পিয়ানো পর্যন্ত বিক্রি করে বিদেশে পাড়ির টিকিট আর অন্যান্য খরচের ব্যবস্থা করেছিল। যতদূর মনে পড়ে, এয়ারপোর্ট থেকে এসে বাস যেখানটায় থামত সেখান থেকে আমিই ওকে নিয়ে আসি। খুবই উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল উৎপলকে। মুখে চোখে একটা স্বস্তি আর আনন্দের ছাপ— 'শেষ পর্যন্ত এসে গেছি তাহলে !' পারি-তে পৌঁছে প্রথমেই ব্যক্তিগত ব্যবহারের সব জিনিসপত্র বাতিল করে ফেলল ও। যদিও তা সবই যথেষ্ট ব্যবহারযোগ্য ছিল। কিন্তু ওর যুক্তি ছিল—ওই পরিবেশে নাকি ওগুলো একদম মানানসই নয়। আমাকেও বলল পুরনো শেভিং সেট ইত্যাদি সব ফেলে দিতে। শুরু হল টুকিটাকি টয়লেট, বিশেষ ধরনের সব জামাকাপড়, টাই ইত্যাদি কেনার পালা। সেই রেকসিনের সুটকেসটা এদেশেও দীর্ঘকাল আমার কাছে ছিল। ব্যবহারও করেছি রীতিমতো। সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে বাড়ি পরিষ্কার করার সময় বোধহয় ওটা ফেলে দিয়েছি।

পারি-তে আমাদের থাকার জায়গার ক্ষেত্রে একটা অসুবিধে ছিল। বাইরের কাউকে থাকতে দেওয়ার ব্যাপারে ছিল কড়া নিষেধাজ্ঞা। মঁসিয়ে লংগে নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন ওখানকার ডিরেকটর, কাউন্টারের সামনেই বসে থাকতেন। মারী নাম্নী এক মহিলা ছিলেন তাঁর সহকর্মী—দেখা হলেই সম্ভাষণ জানাতেন। এছাড়া প্রতিদিন সকালে ঘরদোর সাফ করার জন্য একজন মেয়ে আসত। এদের সকলকার নজর এড়িয়ে উৎপলের থাকার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। সামনের দিকের দরজা ব্যবহার না করে পিছনের দিক দিয়েই যাতায়াতের ব্যাপারটা সারতাম। সৌজন্যের খাতিরে, থাকার অসুবিধের ব্যাপারটা উৎপলকে আমরা না বললেও ওর প্রখর বুদ্ধিতে চট করে ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায়। কলকাতা থেকে কার যেন ঢাউশ একটা ওভারকোট নিয়ে গিয়েছিল

যোগেন
পারীতে উৎপলকে যেমন মনে পড়ে।

উৎপল। ওতে আপাদমস্তক ঢেকে ভারিক্কি চালে যখন হাঁটত তখন ওকে মানাতও খুব, হাঁটার ভঙ্গি দেখে বহিরাগত হিসাবে কারুর ওকে সন্দেহ করার উপায় থাকত না। সকলের নজরকে ফাঁকি দিয়ে ও আসত রাত্রিবেলা, আবার সকাল হলেই বেরিয়ে পড়ত। ঘুরে ঘুরে রাস্তাঘাট চেনা আর ছোটখাটো নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো— এটা ছিল আমাদের দৈনন্দিন ব্যাপার। সাহিত্যিক হুইটম্যানের কোনো আত্মীয়ের একটা বইয়ের দোকান আছে পারি-তে। 'Shakespeare & Co.' নামের এই বিখ্যাত দোকানটিতে পৃথিবীর নানা প্রান্তের লোকের আনাগোনা। অ্যান্টিক ধরনের একটা দোকান, তেমনই ভাঙাচোরা চেয়ার আর খয়েরি রঙের সব আসবাবপত্র। কবিরা আসতেন, কবিতা পড়তেন ওখানে, ওই ভাঙা চেয়ারে বসেই—কোনো বাধা-নিষেধ ছিল না। আনুষ্ঠানিকতার বালাইও ছিল না কোনো। দোকানের ভিতরেই শোওয়ার ব্যবস্থা। গিনস্‌বার্গের মতো কবিরাও ওখানে আসতেন। জায়গাটা উৎপলের ভীষণ প্রিয় ছিল। ও ওখানে খুব ফিট করে গেল। দারুণ উপভোগ করত। লক্ষ করেছি, কোনো ফর্মাল ব্যাপার কখনই ও পছন্দ করে না।

মাঝে মাঝে ছাত্রদের রেস্তরাঁতে গিয়ে খেতাম আমরা। তিন ফ্রাঁ-র মধ্যেই খাওয়া হয়ে যেত। বাড়িতেও রান্নার ব্যবস্থা ছিল আমাদের। চার-পাঁচ ফ্রাঁ-তে ভালো ওয়াইন পাওয়া যেত সে-সময়। সন্ধ্যায় বন্ধুরা আড্ডায় আসত মাঝে মাঝে। খেয়ালের বশে আমার কাছ থেকে তেল রঙ নিয়ে একদিন একটা ছবি এঁকেছিল উৎপল। মানুষের একটা মুখ, তাতে খোঁচা খোঁচা চুল দাড়ি সব। তলায় লেখা 'উৎপল'। ছবিটা সম্ভবত এখনও আমার কাছে আছে। গল্পের বিরাম ছিল না ওর। ওর পড়াশোনা অনেক, অ্যাকাডেমিক জগত থেকেই ও এসেছে। যেটা আমাদের ক্ষেত্রে অতটা নয়। তা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে ওর অদ্ভুত একটা মিল হত। কমিউনিকেশন এর লেভেল-টা মূলত ইনটুইটিভ অনুভূতির ওপর গড়ে উঠেছিল। ওর সঙ্গে আলাপের গোড়া থেকেই এটা আমি অনুভব করতাম। ওকে আমার ভালো লাগত আর এই ভালো-লাগার জায়গা থেকেই ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ। সেই 'পুরী সিরিজ'-এর সময় থেকেই ওর কবিতা আমাকে আকর্ষণ করে। নানা ধরনের জিনিস সম্পর্কে অবারিত ওর কৌতূহল আর সব কিছু খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা ওর এক স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। আর প্রায়ই ও নানারকমের নতুনত্ব সে-সবের মধ্যে খুঁজে পেত। ছোটখাটো বহু জিনিস ওর চোখে পড়ত আর তা নিয়ে অদ্ভুত গল্প বলতে পারত। আমার কেমন যেন মনে হয়, উৎপল দত্ত আর উৎপল বসু—এদের দুজনের মধ্যে কোথাও চেহারার একটা মিল আছে। ঢোলা ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মাথা নিচু করে যখন হাঁটত তখন ভঙ্গির একটা বিশেষত্ব ফুটে উঠত। ওকে দেখলে একটা শব্দ আমার মাথায় আসত : 'বায়স'। সম্ভবত সেটা ওর কাল্পনিকতাপূর্ণ আবার সন্দেহভরা বড় বড় চোখদুটোর জন্যেই। দোকানের শো-কেসগুলো ঘুরে ঘুরে দেখাটা ছিল একটা মজার নেশা। হাঁটতে হাঁটতে হয়ত হঠাৎ কোথাও থেমে গেল। রু শাঁ মিশেল, রু শাঁ জারমা দ্য প্রে, এক্কোল দ্য

বোজার্ত, মোমার্ত, মোপারনস্— এসব জায়গায় আর নানা কাফেটেরিয়ায় আনাগোনা ছিল আমাদের। মাঝে-মাঝে বিয়ার পান চলত। সব সময়ই যে শিল্প বিষয়ে কথাবার্তা হত— এমনটা নয়। মুখে মুচকি হাসি আর বুদ্ধিদীপ্ত তাকানোর ভঙ্গি সহ উৎপল যে কোনো বিষয়ের আলোচনাই জমিয়ে তুলতে জানত। ড্রিংকস উপভোগ করত খুব। লন্ডনে থাকাকালীন একবার বলেছিল, মেয়েদের চেয়ে ড্রিংকসটাই ওর কাছে বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। বিশালাকার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখা ছিল ওর আর এক নেশা। বিরাট বিরাট বাড়ি জুড়ে দোকান, তার এক-এক তলায় এক-এক রকমের পণ্যসম্ভার। সুন্দরী মেয়েরা সব সেলস্-গার্ল। সারাদিন ধরে শুধু দেখতাম— ক্বচিৎ হয়ত টুকিটাকি কিছু কেনা হত। এছাড়া পারির বিখ্যাত সেক্স-শপ আর প্রসটিটিউটদের মহল্লাগুলোও (পীগাল) দেখেছি আমি আর উৎপল। এমন সব জায়গা আছে যেখানে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে হয়।

উৎপলের ভীষণ আগ্রহ ছিল কবর দেখতে যাওয়ায়। পারির কোথায় কোন্ প্রখ্যাত ব্যক্তির সমাধি তার শুলুক-সন্ধান কলকাতা থেকেই জোগাড় করে রেখেছিল ও। আপলিন্যের-এর কবর দেখার ব্যাপারে ওর উৎসাহের কথা আমার মনে পড়ছে। সম্ভবত বোদলেয়ার-এর কবরও দেখেছিলাম আমরা। সেই কবরখানা থেকে সংগ্রহ করা গাছের একটা পাতা আজও আমার কাছে আছে। এছাড়া 'প্যানথিও' নামে বিখ্যাত লোকেদের যে সমাধিক্ষেত্র— আমরা দুজনে তা দেখতে গিয়েছিলাম। সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেই ছিল— এই ঐতিহাসিক সমাধিক্ষেত্রটি। এ সমস্ত কিছু দেখার মধ্যে একধরনের বিস্ময়-বোধ কাজ করত উৎপলের— যদিও ওর অধ্যয়নশীলিত পরিণতমনস্কতার কারণে সেটা সবসময় বোঝা যেত না। বিখ্যাত 'লুভ' (Louvre) সংগ্রহশালা আর 'মোনালিসা' ছবি দেখার সময় আমার সঙ্গী ছিল উৎপল। কয়েকটা দিন ধরে আমরা সেখানে ঘুরেছিলাম।

উৎপল এর পরে লন্ডনে চলে যায়। সেখানেই ওর চাকরি ঠিক হয়েছিল। পরের বার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পারি আসে। সেটা ছিল টুরিস্টের কেতায় এক ভ্রমণ। হোটেল ভাড়া করেছিল। এর আগেই আমি ক্যামেরা কিনে ফেলেছি। লুভ সংগ্রহশালার ভিতরে তখন উৎপলের একটা ছবি তুলেছিলাম। দশ-বারো দিন ছিল, আড্ডা চলেছিল প্রচুর। আর ওর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সেবার ভার্সাই যাই। খুব হৈ হৈ করে কেটেছিল সে ক'দিন।

বস্তুজগত সম্পর্কে উৎপলের এক অদ্ভুত চেতনা আছে যা আবার ওকে স্পর্শ করে থাকেও না সবসময়। বাস্তবতা-অবাস্তবতার অন্তর্বর্তী কোনো স্তরে ওর অবস্থান। রামকৃষ্ণের উপমায় : জলের ভিতরে যেন হাঁস। ওর সকল ভাবনার পিছনেই নতুন একটা দৃষ্টিকোণ থাকে— তৃতীয় কোনো দৃষ্টিকোণ। বাস্তবতা ও কাল্পনিকতা (Reality এবং Fantasy) মিশে থাকে সে দেখায়। কল্পলোক ওর ভাবনার ভিতরে কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে বলি। ভবানীপুরের বাড়ি ছেড়ে একসময় ও উঠে এসেছিল রয়েড স্ট্রিটের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পাড়ায়। তিরিশ-চল্লিশ ফুট দৈর্ঘ্যের অদ্ভুত লম্বাটে ধরনের

একটা ঘরের মধ্যে ছিল ওর আস্তানা। ওই অস্বাভাবিকতাই উপভোগ করত ও। শিল্প সম্পর্কে ওর যে আগ্রহ তাতেও এই কল্পলোকের প্রভাব কাজ করে বলে আমার ধারণা। হঠাৎ কোনো কিছু ভালো লাগছে— বিশেষ কিছু চোখে পড়ল— কিন্তু তার মধ্যেই একটা যাথার্থ্য থাকে। কবি হিসেবে কতগুলো জিনিস ও বিশেষভাবে বুঝতে পারে যা হয়ত অন্যেরা পারে না। ওর অনুভবের একটা বিশেষত্ব টের পাওয়া তখন। ফ্রান্সে নানা জায়গায় ভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে এটা খুবই মনে হত আমার। মনে পড়ছে, ভার্সাইতে গিয়ে ও কীরকম ভাবে মারী আঁতোয়ানেত-এর গল্প বলতে শুরু করে দিয়েছিল।

উৎপল লন্ডনে থাকাকালীন বারদুয়েক আমি যাই। প্রথম বারে উৎপল ছিল না, দ্বিতীয় বারে যখন দেখা হল, এক অন্য উৎপল— এক বিপরীত উৎপলকে দেখলাম যেন। সেই 'কফি-হাউসের উৎপল', 'চাকরি চলে যাওয়া উৎপল'-এর সঙ্গে তার অনেকটাই ফারাক। স্বামী-স্ত্রী দুজনে চাকরি করছে, ফ্ল্যাট নিয়েছে একটা। খুঁটিনাটি আসবাব-পত্র থেকে শুরু করে ঘর সাফ করার মেশিন— এইসব যা দেখত তাই কিনে ফেলত তখন। অদ্ভুত একটা ঝোঁক। শীতের সময়, খুব একটা বেরুত না। একটা টিভি ভাড়া করে এনেছে, সন্ধ্যায় তারই সামনে বসে থাকে। খুব একটা ঘোরাঘুরি অবশ্য এখনও ও করে না ; হয়ত একবার কোথাও গেল, সারাবছর ধরে তারই গল্প চলল। লন্ডনে ফারুক হায়দার নামে এক বন্ধুর বাড়িতে তখন আমাদের আড্ডা বসত। আমি আর ফারুক ছাড়াও বিমল ব্যানার্জী, অঞ্জু চৌধুরী, গ্যারি ম্যাকিম প্রমুখ সে আড্ডার নিয়মিত অংশীদার ছিলেন। উৎপলকে ওখানে খুব একটা পেতাম না আমরা, হয়ত কোনোদিন রেস্তরাঁয় যাব ঠিক হল, সেদিন ও এল।

কবিতায় ওর শব্দচয়ন আর নির্মিত কল্পলোক আমাকে ভীষণ আকর্ষণ করে। পরি-শীলিত এক যাত্রা যা উচ্চাঙ্গের পর্যায়ে গিয়ে পেঁছয়। ও নিজেও উঁচুদরের এক চরিত্র। লেখার মধ্যে অনায়াসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে ; অত্যন্ত নির্দ্বিধ এই প্রকাশ। একটা পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ক্ষেত্র খুলে যায় যেন। কবিতায় আমরা খুঁজে পাব অনন্য সব 'ইমেজারি'র ব্যবহার : 'আমার বসন্তদিনের চটি হারিয়েছি বাদাম পাহাড়ে', গূঢ় অর্থ উঠে আসে, অলৌকিক এক ভাব সৃষ্টি হয়। অলৌকিক আর লৌকিকের অপূর্ব মিশেল এইসব কবিতায় সৌন্দর্যবোধের একটা সম্পূর্ণতা খুঁজে পাওয়া যায়। ভাষা নামমাত্র এক ব্যবধান, নইলে কবিতায় এই রূপনির্মাণ, এই সৌন্দর্যবোধের আবেদনে উৎপলের ব্যাপ্তি তো আন্তর্জাতিক। সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা এই কবিকে বোঝার, তার ভাষাবিন্যাসের অন্তর্গত চিন্তাকে অনুধাবন করতে পারার মতো পাঠকের সংখ্যা কম হওয়াটাই স্বাভাবিক। জনপ্রিয়তার নিরিখে এদের বিচার চলে না। রবীন্দ্রনাথকেই বা ক-জন বোঝেন ? তাঁকে গান লিখতে হয়েছিল ভেবে-চিন্তেই। উৎপলের 'নাম' হয়নি বলে বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই আমরা, আর উৎপল নিজে তো নয়ই। ও বিদেশে কাটিয়েছে দীর্ঘ সময়। তখন ওর অভাববোধ করেছি খুব। বাংলা ভাষার এই কবি

কলকাতায় ফিরে এসে নিজের ভাষায় কাজ শুরু করুক— এটা খুব চাইতাম। নানা-দিক থেকেই ওর ব্যক্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ সম্পর্কিত নানা বিষয়ে কার্যকর নানা ভাবনাই আছে ওর। কিন্তু ওর অলস স্বভাবের জন্য ভিতর থেকে টেনে বার করতে হয় সেইসব কথা। সেগুলি কতটা কার্যকর হয়ে উঠবে এ নিয়ে ওর বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। এই বৈপরীত্য ওর মধ্যে সর্বদা দেখতে পাই।

শব্দ পাশাপাশি বসে এক ঝংকার সৃষ্টি করে ওর কবিতায়। প্রথম দিকটায় হয়ত জীবনানন্দের সঙ্গে সামান্য সুরের মিল ছিল পরে যা একেবারেই অনুপস্থিত। শিল্পের উৎকর্ষ পরিমাণ দিয়ে বোঝানো যায় না, গুণগত বিচারেই তা উপলব্ধি করতে পারি আমরা। শ্রেষ্ঠ চিত্রকর সাদা কাগজে আঁকেন একটি রেখা যা স্পন্দিত হতে থাকে। শ্রেষ্ঠ কবির রচিত একটি পংক্তিও তেমন স্পন্দন সৃষ্টি করে থাকে। জীবনানন্দের কবিতা পাঠে যেমন অভিজ্ঞতা আমাদের হয়। এই সব মহৎ বৈশিষ্ট্যগুলি উৎপলের কবিতাতেও আছে। ওর ভিতরে সেই সম্পূর্ণ কবি আছে। পিকাসো যেমন যা ধরতেন তাই সোনা হয়ে যেত। এ গুণ অনেকে পরিশ্রম করে অর্জন করে। কিন্তু কেউ কেউ আছেন যাঁরা আপাদমস্তক শিল্পী। জীবনানন্দ-বিনয়-উৎপল এঁরা সেই জাতের। □

Collections of Short Stories in English/ English Translation.

Contemporary Indian Short Stories (Series I-III) per set	Rs. 105
Contemporary Indian Short Stories in English Compiled by Shiv K. Kumar	Rs. 65
Anthology of Hindi Short Stories Compiled by Bhisham Sahni	Rs. 150
Selected Kannada Short Stories Edited by G. S. Amur	Rs. 75
The Drought and Other Stories by Saratchandra Chatterjee tr. Sasadhan Sinha (2nd edn)	Rs. 30
Anandibai and Other Stories by Parashuram tr. Swapna Dutta	Rs. 50
Krishan Chander : Selected Short Stories Compiled by Gopi Chand Narang tr. Jai Ratan	Rs. 80
Rajinder Singh Bedi : Selected Short Stories Compiled by Gopi Chand Narang tr. Jai Ratan	Rs. 80
The Prayer Room and Other Stories Kishori Charan Das	Rs. 80
The Night of the Full Moon Kartar Singh Duggal	Rs. 75
The Bird of Gold and Other Stories by O M Goswami	Rs. 30

SAHITYA AKADEMI

Rabindra Bhavan
35 Ferozeshah Road
New Delhi 110001

Jeevan Tara Bhavan
23A/44X, D. H. Road
Calcutta-700 053
Phone 478-1806

'টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম'

প্রশান্ত মাজী

তখন গড়িয়াহাট রোডে নামছে সন্ধ্যা।

একে একে জ্বলে উঠছে দশতলা থেকে দোকানঘরের, হকার্স কর্নারের আলো। শাঁখের আওয়াজ না শোনা গেলেও বিকেল শেষের এই অদ্ভুত আঁধারকে স্বাগত জানাতে নিশ্চয়ই সবাই প্রস্তুত। কেননা এসময়েই ন'দিরা চুল বাঁধে, ছোটকাকীমারা সারাদিনের ক্লান্তি মুছে নেয় গা ধুয়ে, দ্রুত প্রসাধন সেরে ছোড়দি-রা হারমোনিয়মে বসে, সাদা-কালো রিডে তাদের আঙুল ঘোরাফেরা করে 'আমার বেলা যে যায়…।' গাছপালা নেই— কলকাতার অভিজাত পাড়া— তাই পাখিদের বাসা-দখল নিয়ে কিচিরমিচির শোনা না গেলেও, বারান্দায় বসে তাদের কিছু দলবদ্ধ উড়ে যাওয়া দেখেছি।

ঠিক এরকম এক শান্ত, নিঝুম সময়ে আমরা, মানে আমি আর কবি ভাস্কর চক্রবর্তী বসে আছি, এই তো ক'দিন আগেই 'মেঘমল্লার'-এর একফালি বারান্দায়। আমাদের মুখোমুখি সেই কবি, উৎপলকুমার বসু।

'এই, আমাদের খেতে দাও!' বলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। হয়ত এখুনি আমাদের ছাদে

যেতে বলবেন, সবে-নেমে-আসা সন্ধ্যার ছাদে দাঁড়িয়ে, আকাশে তাকিয়ে হয়ত বলে উঠতে পারেন সহসা, তাঁর কবিতার মতোই, 'ও মা ! এরা সব একে একে হাজির দেখছি ! কী কাণ্ড !'*

আমাদের মাথার উপরে তখন এক-আকাশ নক্ষত্রের দ্রুত, টপাটপ্ নেমে আসা শুরু হয়ে গেছে নিঃশব্দে, অলক্ষ্যে।

উৎপল থেমে থেমে সেদিন অনেক কথাই বলছিলেন— বাঙলার কথা, বাঙালির কথা, কোন্ কোন্ বুদ্ধিজীবী মুখ খুললেই (বক্তব্য ঠিক বা ভুল যাই হোক) তাঁদের বিরোধিতা করা দরকার— এইসব অনেক প্রস্তাব ও অনুধাবন। তার মাঝে মাঝে পদান্বয়ী অব্যয়ের মতো সব কিছুকে গেঁথে দিচ্ছিলেন তাই দিয়ে— যা কবিতা।

'...আজকাল কেবলই নানা লোকের গলা শুনতে পাই, হ্যাঁ, শুধু ভয়েস— কবেকার শোনা কণ্ঠস্বর— একেবারে অবিকল মনে পড়ে...'। তৎক্ষণাৎ আমাদেরও মনে পড়ে যায় তাঁর সাম্প্রতিকতম গদ্যগ্রন্থ 'ধূসর আতাগাছ' উৎসর্গ করা হয়েছে সেই ভয়েসকেই, "ছেলেবেলায়, বিছানায় শুয়ে শুয়ে, বহু ঘুমহীন রাতে শুনেছি চৌকিদার হেঁকে যাচ্ছে 'বস্তিওয়ালে জাগো... কোঠিওয়ালে জাগো...।' সেই অজানা, অদেখা, সাবধানকারী, নিশাচর মানুষটির প্রতি আমার এই অস্থিরমতি লেখা কালস্রোতে ভাসিয়ে দিলাম।"

তাঁর কবিতাও তো তাই। কিছু ভয়েস, কিছু ভ্রমণ, কিছু প্রকৃতির হেঁসেল, কিছু ছবি— রঙীন পাথর সব— আর কাঁচের টুকরোর ক্যালিডোস্কোপের খেলা। যত ঘোরাবে তত নিত্য নতুন নক্সা তৈরি হয়ে আসবে।

'হয়ত তাই। তবে কী জানেন, কবিতা লেখার কথা কি ছিল আমার ? মনে তো হয় না। ছেলেবেলায় ভালো লাগত হাতের কাজ— ক্র্যাফট্ ! বাড়িতে সবাই সুযোগ পেলেই বসিয়ে দিত ঐসব কাজে— জুতো পালিশ, নক্সাকাটা, কাগজকাটা, রঙ করা, সাইকেল মেরামতি, ববিনে সুতো পরানো। ভালোও লাগত আমার।

'তারপর একদিন সহসা কবিতা এল। কেন, কীভাবে এখনও বলা মুশকিল।'

হয়ত মুশকিল বলা, তবু 'কবিতা লেখা যে চমৎকার', তাঁর কাছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে কই, আর কবিতা কী তার ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন নানা সময়ে, নানা ভঙ্গিতে :

১. কবিতা ম্যাজিক মাত্র। এবং রসায়ণ। এবং দক্ষতা। আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন হ'তে হবে।
২. আমাদের আরো ধূর্ত হ'তে হবে, হ'তে হবে অবহিত এবং জ্ঞানী। আমাদের জানতে হবে প্রযুক্তি বিদ্যা— কেন কবিতা লেখা হয়, না লিখলে কী হয়, সম্প্রসারণশীল হতে হবে আমাদের অতীত এবং ভবিষ্যতের উভয়প্রান্তে, আমাদের সম্প্রসারণশীল যাতায়াত পেতে হবে। আন্তরিক হ'তে হবে না আমাদের। কেন না আজ অব্দি কেউ বলতে পারেনি কেন অমুক কবি আন্তরিক এবং অমুক কবি নন।

* 'পঁচিশটি কবিতা' অংশের কুড়ি সংখ্যক কবিতাটি দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

৩. ছন্দ, প্রকৃতি, শব্দ, প্রেম, প্রচেষ্টা, প্রজনন, যুক্তি, অযৌক্তিকতা ইত্যাদি বাহান্নোটা তাস একসঙ্গে যেন আমরা মেলে ধরতে পারি এবং গুটিয়ে নিতে পারি তৎক্ষণাৎ।

প্রয়াত সুব্রত চক্রবর্তী একবার উৎপলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'তাসের প্যাকেটে তো তাস থাকে ৫৪টি। আপনি ৫২ তাসের খেলা বললেন কেন? বাকী দু'টি জোকার ব'লে?'
'হ্যাঁ, তারা তো অংশগ্রহণ করে না খেলায়, আমার চাই প্রকৃত খেলোয়াড়কে। বাকী দু'জন এমনকি কোনভাবে অতিরিক্ত খেলোয়াড় হওয়া থাকে না, তাদের কাজ প্যাকেটের শোভা বর্ধন করা, প্রকৃতই মজা হয়ে থেকে যাওয়া। আমার তাদের প্রয়োজন নেই— '...না হয় মফস্বলে সামুদ্রিক মাছের সম্পাদনা তুমি কোরো। আমার ঘোড়াটি চাই।"
সুব্রত চক্রবর্তীর কথা যখন উঠলই, এই সুযোগে উদ্ধৃত করি তাঁর দু'একটি মন্তব্য। অবশ্যই উৎপল সম্পর্কে।
'নিজের কবিতার মতই রহস্যময় তিনি, আন্‌প্রেডিক্‌টেবল্‌। গ্রিক রূপকথার অ্যান্টিয়ুস যেন, তেমনই উজ্জ্বল ও সরল ও গ্লানিহীন— কথাবার্তা ও চালচলনে স্মার্ট ও চমৎকার আধুনিক, কিছুটা বেঁটে, ভারি ঠোঁটের ভাঁজে প্রচ্ছন্ন চালাকি, গাঢ়-খর চোখ, আপাত-অবিন্যস্ত চুল, 'কিছুটা খয়েরি'।' ঠিক এইভাবে উৎপল সম্পর্কে আমাদের তিনি জানিয়েছিলেন, লিখেওছিলেন 'প্রতিবিম্ব'-য় আজ থেকে আঠারো বছর আগে। যখন উৎপল পাকাপাকিভাবে ওদেশে আছেন কিন্তু মাঝে মাঝেই বলে যাচ্ছেন এখানে এসে 'দেখি, এর পরের বার এসে আর নাও ফিরতে পারি।'...
সুব্রতও তাঁর বর্ধমান শহরের ৩, ইছলাবাদ কলোনিতে বসে নিত্য বলতেন, 'একটু নুয়ে পড়েছি, বুঝলি!' আর বোঝাতেন কীভাবে উৎপলের কাছে কবিতা-লেখা প্লেজার, কেন উৎপল বাংলা কবিতার টারবুলেন্ট ফিফ্‌টিজ্‌-এর অন্যতম প্রধান কবি, কেন কীভাবে তিনি স্বপ্নতাড়িত, ইমেজিস্ট, চতুর, চেতনা-নিশ্চেতনায় সাবলীল ভ্রমণকারী ও বারোক কারুশিল্পে ভরা এক অভিনব ধরনের রহস্যময় বাংলা কবিতার বিপ্লবী পথিকৃৎ। শুধুই কি বোঝাতেন, তার সঙ্গে যে কাণ্ডটি করতেন সুব্রত, তা বললে এখন আর কেউ বিশ্বাস করবেন না, কেননা 'এখন সবই অলীক'। তবু এই সুযোগে আমাকে তা বলতে হবেই, কেননা আমি কিছু বানিয়ে বা বাড়িয়ে বলছি না। তখনও পর্যন্ত উৎপলের মাত্র দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, 'চৈত্রে রচিত কবিতা' আর 'পুরী সিরিজ'। তার মধ্যে 'পুরী সিরিজ' তখনই মিথ, গুপ্তপুঁথি, কোথাও পাওয়া যায় না, পড়া তো দূরের কথা, হাতে নিয়ে দেখাও একটা সৌভাগ্য। এসব শুনে আমরা নাছোড়বান্দা। 'পুরী সিরিজ' পড়তে দিন আমাদের। সুব্রত ধীর পায়ে হেঁটে যেতেন তাঁর বাড়ির শোবার ঘরের একমাত্র গোদরেজ আলমারিটির দিকে, বসবার ঘরে বইভর্তি কাঠের শেলফটির দিকে নয়। একের পর এক চাবি ঘুরিয়ে খুলে যাচ্ছেন পাল্লা, রত্নগুহার সামনে যেন তিনি আলিবাবা— তারপর দেখতে পেতাম আমরা, সেই লকার যার নরম

লাল ভেলভেটের বাক্সে স্ত্রীর গহনা, পাশে সোনার চেয়েও বেশি দামি এক খণ্ড 'পুরী সিরিজ'। আমাদের অনুমতি ছিল ওখানে বসে পড়ার, তাও খুবই সন্তর্পণে। হলুদ হয়ে-যাওয়া পাতার সেই ধূসর, কৃশকায় বইটির নিষিদ্ধ পারমাণবিক চুল্লীর ভেতর থেকে এখনও যেন স্ফুলিঙ্গ ছিটকে আসে— '…সবুজ রহস্যময় আত্মা, তুমি বাছা, চাও নাকি সশব্দ প্রস্থান, তৃণ বেহালার মতো…' বা '…হে সূর্য', আলোক বিন্দু ; একই সঙ্গে প্রসারিত করো তোমার জ্যোতির থাবা— ক্ষুধা ও চুম্বন'।

সুব্রতর লেখা 'উৎপলকুমার বসু ও তাঁর কয়েকটি কবিতা'— প্রকাশিত হল আমার সম্পাদনায়, 'প্রতিবিম্ব'য়। সংখ্যাটি নিয়ে গেছি ৭১, কাশীনাথ দত্ত রোডে, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। মনে আছে সেই দুপুর— যখন আমারও সন্দীপনেরই মতো বেলা তিনটেতেও অফিস গেলে দিব্যি চলে যেত। সুব্রত, তাঁর লেখার শেষে, পাঠকের অবধানের জন্য উৎপলের কয়েকটি কবিতা আস্ত ছাপতে দিয়েছিলেন। তৃতীয় কবিতাটি ছিল :

ন্যূনতম কবিতা/৫

প্রিয় হে সবুজ ফল
তোমাকে কঠিন হতে
দেব না, সবুজ ফল
আমাদের স্বীয়
ভবিষ্যতে দেখা হবে
সেরকম কথা নেই। আজ
নিশীথের মতো দূরে
সূর্য ও আঁধার
একই সঙ্গে দেখা যায়
যেন উপাসনা ভেঙে দিয়ে
ডেকে ওঠে কাক, প্রিয় সর্বস্বতার
কিছু আজ পড়ে নেই
শৃঙ্খল ছাড়া, ঐ
অস্থিগুলি ছাড়া আজ
কিছু আর পড়ে নেই
ফল প্রিয় হে সবুজ তুমি
কীটে নষ্ট হও তবু তোমাকে
কঠিন হতে দেব না আমার
প্রতারণা এই।

কথা হচ্ছিল আমাদের, সন্দীপনের সঙ্গে, উৎপলের কবিতা নিয়ে, তাঁর চলে-যাওয়া বা আবার ফিরে-আসা নিয়ে। হঠাৎ সন্দীপন একটি প্রস্তাব ছুঁড়ে দিলেন আমার দিকে

যা উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে উৎপলের কবিতার কীরকম পাঠক তিনি ছিলেন বা আজও আছেন।

সন্দীপন সহসা বলে উঠলেন 'আমরা দুজনেই এই কবিতাটি বেশ মন দিয়ে একবার, মাত্র একবারই পড়ব, তারপর দু'জনেই স্মৃতি থেকে তা বলার বা আবৃত্তির চেষ্টা করব, পুরোটা। দেখি তো, কে জেতে, কে হারে'। হঠাৎ এরকম প্রস্তাব কেন তা বুঝে ওঠার আগেই আমরা দু'জনেই শুরু করি সেই কবিতা নিয়ে খেলা— 'প্রিয় হে, সবুজ ফল…'।

বলা বাহুল্য, সেদিন সন্দীপন জিতেছিলেন। কোনো চালাকি নয়, অকারণ স্মার্টনেস নয়, সম্পূর্ণভাবে কবিতার বা উৎপলের কবিতার আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ সন্দীপন, সদ্য কবিতা-পাঠে-অভ্যস্ত আমাকে যথার্থ কারণেই হারিয়ে দিয়েছিলেন। '…যেন উপাসনা ভেঙে দিয়ে ডেকে ওঠে কাক…' পর্যন্ত ব'লে আমি যখন হোঁচট খেলাম, সন্দীপন শুরু করলেন, যেন স্তোত্র-পাঠ করবেন সমবেত ভক্তবৃন্দের সামনে, শেষও করলেন এমন ভাবে যে হাততালি দেওয়ার কথাও তখন আমি ভুলে গেছি। তাঁর সেই থেমে থেমে 'প্রিয়, সর্বস্বতার কিছু আজ প'ড়ে নেই, শৃঙ্খল ছাড়া…' বরানগরের ভর-দুপুরে, চারদিক শুনশানের মাঝে বসে যাওয়া গলায় সন্দীপনের আস্ত কবিতাটি নিরবচ্ছিন্নভাবে বলে যাওয়া আজও চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই। ওঁদের বাড়ির বারান্দায় তখন কিচির-মিচির করত নানা রঙের পাখিগুলো, পাশের রান্নাঘর থেকে ভেসে আসত 'নন্ এসেন্সিয়াল সাউন্ডস্ যত্তো সব'।

সন্দীপন সবে লিখে উঠেছেন 'এখন আমার কোন অসুখ নেই'।

আসলে সন্দীপনের সেই সময়ের লেখা ও পোলেমিক এবং উৎপলের কবিতা সব একে অপরের পরিপূরক ছিল। 'কবিদের সঙ্গে মিশেই আমি লেখা শুরু করি'—সন্দীপনকৃত উৎপলের কবিতার ব্যাখ্যা পড়লেই তা টের পাওয়া যায়। সব মিলেমিশে একাকার। কমলকুমার মজুমদারের চিঠি নিয়ে 'মিনিবুক' বেরুবে। রঘুনাথ গোস্বামীকে সন্দীপন বলছেন, 'কভারে একটা পুরনো দিনের কারুকার্যময় ফ্রেম ক'রে দেবেন ? ছবির জায়গাটা ফাঁকা রেখে দেব, কমলদা নেই, শুধু ফ্রেম…পাতা ওল্টালেই উৎপলের কবিতা '…সীতা ক্রোধে জলকুজ্‌ঝটির দিকে তাকিয়ে আছেন।/রাম তাঁকে বোঝাচ্ছেন এই জল, ফোয়ারা, তূণীর…/ পম্পাসরোবর তীরে মৃণালের আধো অবশেষ / ফেলেছে বানর। আরো অতিরিক্ত স্থির/অস্থি পড়ে আছে বনে…'। ওভাবেই মিনিবুক বেরিয়েছিল, তবে শেষপর্যন্ত সেই কারুকার্যময় ফ্রেমের মাঝে ছিলেন কমলকুমার।

কোন্ পত্রিকায় নিচের লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে তা অপ্রাসঙ্গিক, '…দূর থেকে হাত তোলো। যদি পারো জানাও সম্মতি / নইলে সঙ্কেত আজো বৃথা যায়। চলে যায় নৈশ ট্রেন দূরে। অর্ধেক জাগ্রত রেখে আমাদের। অবিরত যাত্রা কি কাঠের ?'—এই সেদিনও এক দৈনিক সংবাদপত্রে, উৎপলের এই বিখ্যাত কবিতার ব্যাখ্যা সন্দীপন সাধারণ পাঠকের জ্ঞাতার্থে করেছেন— যেন আস্ত একটা ট্রেন-দুর্ঘটনা ঘটে গেছে,

কতদিন আগে, ক্লাচ বগলে মুহূর্তপর্বের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একমাত্র সারভাইভার, যে ঘটনাস্থলে বারবার আসে ও সেখানে সেই ভয়াবহ ধ্বংসকে প্রতিভাত করে তোলে।

সেদিন, সেই কবিতা-খেলার দুপুরেই, সন্দীপন আমার হাতে তুলে দেন উৎপলের প্রবাসজীবনে তাঁকে লেখা বড়সড় চিঠিগুলি।

'প্রতিবিম্ব'র ঠিক পরবর্তী সংখ্যায় সেগুলি প্রকাশিত হয় 'উৎপলকুমার বসু অবশেষে ফিরে আসছেন' শিরোনামে।

বলা বাহুল্য, প্রায় প্রত্যেকটি চিঠিতেই উৎপলের এদেশে ফিরে পাকাপাকিভাবে থাকার পরিকল্পনা দানা বাঁধছিল।

আমরা চিঠিগুলি প্রকাশ করেছিলাম তাঁকে এদেশে স্বাগত জানিয়ে, জীবনানন্দের কবিতা দিয়ে— '…ফিরে এসো সমুদ্রের ধারে, / ফিরে এসে প্রান্তরের পথে ; / যেইখানে ট্রেন এসে থামে / আম, নিম ঝাউএর জগতে / ফিরে এসো ; একদিন নীল ডিম করেছো বুনন ; / আজো তারা শিশিরে নীরব……'

সেইসব চিঠিতে উল্লেখ ছিল শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে তাঁর প্রবাসী মনের অবস্থা, একমাত্র ছেলে 'কাটু'র হুড়হুড় করে বেড়ে ওঠা বা মস্তিষ্ক দিয়ে বাজার করা, রান্না করা, টাইপ করা, গাড়ি মেরামত করার কথা— অর্থাৎ সহজতম রান্না সহজতম প্রযুক্তির পদ্ধতি খুঁজে বের করার কথা। আর ছিল কিছু আগাম ঘোষণা বা কিছু সতর্কবাণী :

১. বেশি মদ খাবেন না— সরকারের ট্যাক্স লাভ হয় (সন্দীপনকে)

২. আমি এদেশে একেবারেই ফিট করিনি— একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই।

৩. লেখা ছাড়া কোন কাজে হাত দিতে চাই না।

৪. দেশে ফিরে আমার হাতে অনেক কাজ জমবে। এতবছর ধরে প্রচুর দৌড়োদৌড়ি করেছি। এবার শান্ত হয়ে বসা দরকার অন্তত কিছু দিনের জন্য।

৫. আমি ব্যক্তিগত ভাবে একটা বিরাট 'ম্যারাথন' দৌড়ের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। … দীর্ঘদিন এদেশে বসবাস করার অভিজ্ঞতা মনের উপর গভীর ছাপ ফেলেছে। ছেলেবেলায় গিরিডিতে এক প্রবাসী বাঙালী বলেছিলেন— উশ্রী জলপ্রপাত দেখতে যাচ্ছ যাও, কিন্তু বেশি বেলা কোরো না— ফেরার বাস নাও পেতে পার। বলা-বাহুল্য সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল— বাস পাওয়া যায়নি— অনেক রাতে একটা খালি, ভূতুড়ে ট্যাক্সি ধরে আমরা বাড়ি ফিরেছিলাম।

৬. এক আমেরিকান আর এক আমেরিকানকে একবার উপদেশ দিচ্ছে শুনেছিলাম : First make up your mind about what you want to do, then get someone to pay for it. আমরা এখনো হয়তো অতটা স্মার্ট নই।

১৯৭৮ থেকেই উৎপলকে দেখা যেতে লাগল কলকাতায়, কলেজ স্ট্রিট কফিহাউসে। হাসি, ঠাট্টা, মস্করা, বজ্জাতির মাঝে কখনও তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছেন, তরুণ

কবিদের মাঝে উজ্জ্বল হয়ে বসে আছেন, দু' কাপ কফি নিয়ে ভাগাভাগি করে পাঁচজনে খাচ্ছেন আর নতুন কবিতার সন্ধান করছেন। লিখতেও শুরু করলেন। জ্যোতির্ময় সম্পাদিত 'কলকাতা' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন সাময়িকভাবে। তরুণ কবিদের বলছেন— চারদিকে তাকিয়ে দেখুন। কীভাবে ডাবওয়ালা কয়েকটা কোপে ডাব কাটছে তার ক্ষুরধার দা দিয়ে, বা কীভাবে অফিসযাত্রী ছুটে যাচ্ছে বাসস্টপের দিকে, দু' হাতে মুঠো-করে-ধরা খুচরো-পয়সা-ভর্তি পাঞ্জাবির ঝোলা-পকেট, বা বাসের পিছনের সিটে বসুন, কান খাড়া রাখুন, শুনুন সামনে-বসা যাত্রীদের বাক্যালাপ, ঝগড়া, প্রেম-বিনিময়। আর লিখে যান কবিতা। '…অমুক কাগজে আমি কবিতার সম্পাদক…'।
প্রকাশিত হল 'আবার পুরী সিরিজ'— কফি হাউসে একদিন নিয়ে এলেন সেই বই। একেবারে কাকতালীয় ভাবেই আমরা দেখলাম সেই গ্রন্থের মলাটের রঙ আর কফি হাউসের দেওয়ালের রঙ মিলে-মিশে একাকার।
সেই সময় থেকে আজও এই কবিকে পাওয়া যায় তরুণতর কবিদের মাঝে, কফি হাউসে। কখনও কোনো নতুন কবির কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করছেন, আবিষ্কার করছেন কোনো কৃশকায় গ্রন্থের মৃদু স্বভাবের মহিলা কবিকে আবার কখনও কোনো প্রখর বুদ্ধিজীবীর প্রত্যেকটি মতামতের জ্বালাময়ী বিরোধিতা করছেন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে। দু'হাত ভরে না হলেও লিখেছেন গল্প, পুস্তক-পর্যালোচনা, গোয়েন্দা কাহিনী, কবিতার বই-আলোচনা, টি. ভি. বা রেডিয়োর অনুষ্ঠানের ভালো লাগা, খারাপ লাগা, বইয়ের ব্লার্ব, বিজ্ঞাপনের কপি। সব লেখাতেই আছে প্রচ্ছন্ন মজা, বুদ্ধিদীপ্ত কথা আর চুলচেরা চালাকি ধরে-ফেলা বিশ্লেষণ। সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা, যত্নে তুলে রাখার মতো স্ক্রিপ্ট তাঁর— এমনকি কাটাকুটির অংশটুকুও।
'কখনও আদেশপ্রাপ্ত হয়ে লিখেছেন কবিতা ?'
উত্তরে জানিয়েছেন, 'হ্যাঁ তাও লিখতে হয়েছে বৈকি! একবার শ্যামল, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 'অমৃত'য় কবিতা দিতে দেরি হয়েছে বলে আদেশ দিলেন 'কালকেই তোমার কবিতা চাই'। ব্যাস, আর কোনো কথা না বলে হাত-পা ধুয়ে কাগজ কলম নিয়ে টেবিলে বসে গেলাম। লিখলাম কবিতা।
আর একবার শম্ভু, শম্ভু রক্ষিতের আদেশ ছিল অভিনব— একটা সাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজ আর কলম দিয়ে সেদিন এক দূরের টেবিলে আমাকে বসিয়ে দিয়ে শম্ভু চলে গেল এই বলে, '…আধঘণ্টা সময়। আমি ফিরে আসছি। 'মহাপৃথিবী'র জন্য একটা কবিতা যেন রেডি থাকে'। আদেশ শিরোধার্য করে বসে গেলাম। ঠিক আধঘণ্টার মধ্যে লিখে উঠলাম 'বৌভাত'—'ঘুম আর বোঝাপড়ার মাঝখানে ধ্বনিবহুল ধানক্ষেৎ সঙ্গীতময় সরীসৃপ। আর দাদাকে জিজ্ঞেস করি সাহেবগঞ্জ কতদূর…'
১৯৭৮-এ 'আবার পুরী সিরিজ'-এর প্রকাশের পর থেকেই উৎপল বলতে শুরু করলেন, '…কবিতার বই এবার হোক এক ফর্মা, দেড় ফর্মা বা বড় জোর দু' ফর্মার। আসল ব্যাপার হ'ল কতগুলো কবিতা আছে তা নয়, কবিতাগুলো কীভাবে পরিকল্পনা-মাফিক নিখুঁত

সাজানো হ'ল—এটাই চিন্তার'।

তরুণ কবিদের সেইসময় প্রচুর কাব্যগ্রন্থ বেরুতে লাগল ঐভাবে— এক ফর্মার বা দু' ফর্মার।

ভেতরে ভেতরে আসলে তিনি নিজেও তাঁর ঐরকম বইয়ের কথা ভাবছিলেন হয়ত। হঠাৎ একদিন কফি হাউসে প্রস্তাব রাখলাম তাঁর কাছে, 'আপনারও এক ফর্মার একটি কবিতার বই হোক'। যেই কথা, সেই কাজ। 'প্রতিবিম্ব' থেকেই তাহলে প্রকাশিত হোক সে বই। প্রকাশক : আপনি আর পার্থ, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল'—বললেন উৎপল। পার্থ সব শুনে তাঁর চিরাচরিত মুচকি হাসি হাসেন আর আমাকে ঠেলে দেন সেই প্রকাশনার দায়িত্বে, অর্থাৎ 'বুঝুন এবার···'। ঠেলা অবশ্য আমায় প্রচুর সামলাতে হয়েছে। কেন না লেখক হলেন উৎপলকুমার বসু আর ছাপাখানা হল 'কৃত্তিবাস'-খ্যাত প্রয়াত গনেশচাঁদ দে-র তরুণ প্রেস। ভালো কবি বা লেখকদের প্রকাশনা বিষয়ে যে ওস্তাদি থাকে, তা আর একবার প্রত্যক্ষভাবে দেখলাম। কবিতা তো তাঁর সাজানোই ছিল, স্ক্রিপ্ট, একেবারে ছাপার অক্ষরে, টায় টায় এক ফর্মার, একটি অক্ষর বেশি নয়, কম নয়। কাগজ, ছাপার টাইপ, মলাট? উৎপল আর আমি দু'জনে গেলাম পান্নালাল শীলের দোকানে। খুঁজে খুঁজে বের করি, পছন্দ করি এক অসাধারণ ফুরফুরে, সাদা কাগজ (ব্রাজিলিয়ান নিউজপ্রিন্ট) মলাটের জন্য বিস্কুট রঙের ক্রোকোডাইল কভার। পান্নালাল শীল, অতি যত্নে, লোক লাগিয়ে, গুদাম থেকে বের করে দিলেন ঐ দুষ্প্রাপ্য কাগজ। উৎপলকুমার বসুর জন্য জলের দর। উৎপলের সঙ্গে পান্নালালের কাগজের কোয়ালিটি এবং নান্দনিকতা নিয়ে আলোচনা যথার্থই মিস্টিক। কাগজ নিলাম এক ফর্মার, সম্ভবত ৫০০ কপির জন্য। এক টাকা দামের 'লোচনদাস কারিগর' ছাপা হয়ে গেল। বইটি শেষ হয়েছিল 'সপ্তর্ষি' কবিতা দিয়ে, যাতে ঘুমের আহ্বান ছিল। বই ছাপা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে প্রেসের কর্মচারী এবং আমাদেরও যেন ঘুম এসে পাড়া জুড়োলো। ···'গভীর উদ্বেগ নিয়ে শুয়ে পড়ি বিছানায় / সাতখানি ঘুম / আমাকে রয়েছে ঘিরে /··· বলে : আয় / গভীর উদ্বেগ থেকে / ভয়াবহ সুষুপ্তির দিকে'।

ভয়াবহ সুষুপ্তি? তা ইতো। মলাট কই, মলাট? কে আঁকবে ঐ ভয়ঙ্কর কাব্যগ্রন্থের মলাট?' সেই মলাটকে তো হতে হবে আরও ভয়াবহ। এখুনি তা হবে কী করে? হবে-হবে করে হয়েও গেল সেই মলাট। যাঁদের 'লোচনদাস কারিগর'-এর মলাটের কথা এখনও মনে আছে, তাঁদের অবগতির জন্য জানাই কত-না-সহজে আমরা তৈরি করে-ছিলাম সেই উল্টে-যাওয়া বটগাছ, চেয়ার, ঘড়ি, হরিণ বা টিয়াপাখির ছবি। সাজানো হয়েছিল উৎপলের কবিতার মেজাজকে হুবহু ধরে। তরুণ প্রেস সে সময় প্রায় উঠে যায় আর কি, গনেশচাঁদ দে-র বড় টেবিলের দু'দিকে বসে আমরা। বস্তা করে আগেকার দিনের ছোট ছোট দস্তা বা তামার তৈরি ব্লকগুলো (যা অতীতে প্রায়ই ব্যবহার হত লেখার শেষে সমাপ্তির প্রতীক হিসাবে) বিক্রি হতে চলেছে সের দরে। তাদের

প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। উৎপল ধরলেন সেই বস্তা-মাথায় লোককে। বের করা হল টেবিলের উপর এক একটি ব্লক, রাখতে গিয়ে কিছু উল্টেপাল্টে গেল বা পাশাপাশি রাখা হল। ঐ হয়ে গেল মলাট। চান্স-ফ্যাক্টরকে মর্যাদা দিন— উনি জানালেন। পিছনের পাতাও অনুরূপ। মাছ, পশু, জলে ভাসা জাহাজ বা ধুতি পরিহিত নাদুস-নুদুস বালকের মাঝে থাকল অবিস্মরণীয় ব্লার্ব (উৎপল যাকে বললেন 'প্রগল্‌ভতা') 'ঝাঁকাও যে ডাল ইচ্ছে / গাছ তার চেনা ফলগুলি / উপহার দিতে থাকে / আমরা লাফিয়ে উঠি / দৌড়ে যাই'···

এইভাবে, ৮২-র মার্চে প্রতিবিম্ব প্রকাশনী, বৈশাখী, ডি ১৩/৫, সল্টলেক থেকে প্রকাশিত হল 'লোচনদাস কারিগর'। তার প্রকাশের টাকা কোথা থেকে এল আজ মনে নেই এবং এখন সে-বইয়ের একটি কপিও আর খুঁজে পাওয়া যায় না।
ব্যাক্তিগত সংগ্রহে মলিন হয়ে যাওয়া একটি কপি সেদিন এক তরুণ কবিকে দিতে পারায় তিনি জানালেন, 'এটি আমার কাছে এই শতাব্দীর সেরা উপহার'। তিনি বাড়িয়ে বলেছিলেন কিনা জানি না, তবে তাঁর অনেকদিন ধরে ঐ বই খোঁজার তাড়না দেখে আমারও অনুরূপ মনে হয়েছিল।

ঠিক চারবছর পর আবার আরেক এক ফর্মার কবিতার বই। 'খণ্ড বৈচিত্র্যের দিন'। প্রকাশকের জায়গায় আবার আমার আর পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের নাম। সেই পান্নালাল শীলের দোকানে ছুটে যাওয়া। খুঁজে পাওয়া গেল পুরনো দিনের ডায়েরি ছাপার অ্যান্টিক-জাতীয় কাগজ। এবার আর মলাটের রিস্ক নেওয়া হয়নি। উৎপলেরই নিজের তৈরি ডিজাইন। প্রথম মলাটে লাল খেরোর খাতার রঙের মাঝে কালোতে 'খণ্ড বৈচিত্র্যের দিন', পিছনটা গাঢ় কালো, যেন অন্ধকার। দু' টাকা দামের 'প্রতিবিম্ব প্রকাশনী'র ঐ কাব্যগ্রন্থ বেরুল ১৯৮৬-তে, ঐ একই ঠিকানা থেকে, যা ছিল আমার একসময়ের ছোট্ট ডেরা। আগের বই শেষ হয়েছিল ঘুম দিয়ে এবার শেষ হল জঙ্গলে ওড়া, বোতল আর গেলাস ভাঙা দিয়ে। ···'সমস্ত পাহাড় আজ চুপ/সব ঝর্ণা স্থির হয়ে আছে/প্রতিধ্বনি— গেলাস ভাঙছে/জঙ্গলে উড়ছে বোতল'।

পাওয়া যায় না এই বইটিও, কিন্তু মাঝে মাঝে বড় মুশকিলে পড়ি আমি। ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে আসার এতদিন পরেও, অসহায় আমার কাছে সে বাড়ির বর্তমান ভাড়াটে সহৃদয় হয়ে মাঝে মাঝে দু' একটি মলিন হস্তাক্ষরের ১ টাকা বা ২ টাকার মানিঅর্ডার দিয়ে যান, যাতে থাকে, সুদূর কোনো গঞ্জের বা জেলার কোনো এক তরুণ কবির আর্ত আর্জি, "এক কপি 'লোচনদাস' বা 'খণ্ড বৈচিত্র্যের দিন' পাঠালে খুশি হব।"

'কবিতা, আমরা জানি, কোনও স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তু নয়। কবিতা পাঠক এবং কবির মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া-সৃষ্টিকারী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকেন্দ্রিক চরিত্রের জন্য কবিতায় ব্যাকরণ, শৈলী এবং নশ্বরতা তৈরী হয়েছে। অপরদিকে প্রতিক্রিয়ার জন্মদাত্রী বলে কবিতায় প্রাণ আরোপিত হয়।' একেবারে সাম্প্রতিককালে উৎপলের দেওয়া কবিতার এই সংজ্ঞাকে

রেখে যদি আমরা জানতে চাই উৎপলের কবিতার প্রতিক্রিয়া পাঠকের কাছে কেমন এবং এককথায় যদি তার উত্তর দিতে হয়, তা হলে বলতে হয়, 'তীব্র'।

একসময় এমন হয়েছিল যে কথাবার্তায়, টেলিফোনে, অফিসে, বাজারে তরুণ কবিরা উৎপলের কবিতার ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। বরানগর বাজারে আমি আর কবি দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যাচ্ছি এক হোমিওপ্যাথের কাছে, দেবপ্রসাদের প্রবাদ-প্রতিম পেটখারাপ তখন চরমে। সব ছেড়ে তাই হোমিওপ্যাথি। দেখা ভাস্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে। তিনি সব শুনে দেবপ্রসাদকে দেখে বলে উঠলেন 'প্রিয়তমা, তোমার দু'খানি চোখ হোমিওপ্যাথির মতো করুণা-নির্ভর'। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হল 'প্রতিবিম্ব'র জন্য— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর আমি সাক্ষাৎকারী। সাক্ষাৎকারটি লেখার পর তার শিরোনাম দেওয়া হল 'চা-টেবিলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়' দেবপ্রসাদ প্রস্তাব দিলেন তার নিচে দশ পয়েন্ট-এ লেখা হোক— 'অপরাহ্ণে পাতা হল আরও বেশি চা-টেবিল বনের ছায়ায়'। বা কোনো তরুণ কবির কবিতা পড়ে আদ্র তত তরুণ নন, এমন কবিরা একসময় মন্তব্য করতেন, 'হ্যাঁ, তোমার কবিতাগুলি/পড়েছিলাম ...কবিতাগুলি বাংলা অক্ষরে.../ পাগল প্যান, আমাকে করো লাজুক'/টেলিফোনে উৎপলকেও একসময় নিয়মিত শুনতে হয়েছে কোনো জায়গায় তাঁর যাবার সম্মতি নিতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে— 'কী করছ রাধা, তুমি/আসছ না— না আসছ?' একজন কবির জীবদ্দশাতেই কবিতার এরকম স্মরণযোগ্যতা বাংলা কবিতায় খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না।

'আপনার কী মনে হয়— একজন কবির সাফল্য কোথায়?'—এই তো সেদিন এক তরুণের জিজ্ঞাসায় নিজের প্রসঙ্গ চেপে গিয়ে উৎপল বলে উঠলেন, 'যদি দেখা যায় সেই কবি এক স্কুলের জন্মদাতা— যে স্কুলের পড়ুয়া হয়েছে আরও একদল তরুণতম কবি, আরেক প্রজন্ম, কবির সাফল্য সেখানে, অন্তত আমার তো এরকমই মনে হয়।'

এভাবেই উৎপল আজও বাংলা কবিতার অগ্রবর্তী অংশে বিশাল জায়গা জুড়ে বসে আছেন তাঁর কবিতার ও গদ্যের দেশজ সম্ভার নিয়ে। হ্যাঁ, দেশজ সম্ভার— তাঁর কবিতার শরীর জুড়ে বিদ্যমান। জীবনানন্দকে রূপসী বাংলার কবি বললে পাশাপাশি উৎপলের কবিতাকেও সেই বাংলারই ছায়ায় নিয়ে আসতে হয়। লন্ডনে বসে লিখেছেন 'নরখাদক'-এর মতো গল্প, দীর্ঘদিন প্রবাসে থেকেও একটি কবিতাতেও বিদেশবাসের প্রসঙ্গ আসেনি। দেশে ফিরেই যে-কবিতা লিখেছেন তাতে এসেছে উত্তর চব্বিশ পরগণার হাত-পাখা বা '... যদি প্রাণ, যদি হে রসিক / নৌকায় ঠেলা দিয়ে বলো / দু'টো দিন, বেয়াই মশাই / দু'টো দিন থেকে গেলে হত'। বা 'টমাটো— তুবড়ি-লাল, আমি সিকি-আধুলির মতো গড়িয়ে পড়ছি / চিতল— ধারালো মাছ, খ্যাপা টান দু' দশটাকার'। শিকড় ছড়িয়ে গেছে বাংলাদেশের মাটিতে, মন যার ব্যস্ত 'সই লুডো খেলায়', যিনি দেখে যেতে চান অবিরত 'প্রতিটি ফার্নিচারের পিছনে যে-গাছ আতা দোলায় তার নিসর্গ' বা 'টায়ারের ভিতরে কি উপায়ে মদ চালান হয়। কিভাবে ইলেকট্রিক ট্রেনের গোড়ালির কাছে লুকিয়ে রাখা

হয় গোবিন্দভোগ ···।' যাঁর সংসার পাতা প্রকৃতির হেঁসেলে, 'মাটির অল্প নিচে রাঙা আলু, প্রকৃতিতে যথার্থ হেঁসেল, উপরে আগুন, নুনজল বাতাসে ফুটছে', সেই কবির দেশের বাড়ি যে কোচবিহার, সাং : দিনহাটা, এ বিষয়ে আর সন্দেহই থাকল না, না হলে এ-সম্বোধন কাউকে কোনোদিন করা যায় না '··· আমাদের দেশে এবার চাষবাস ভালো হ'ল— শাকশব্জী উঠেছে প্রচুর। পুকুরে নরম মাছ— হাঁসের নতুন ডিম— রিক্সয় / যদি-বা আসো চার আনায় পোঁছে দেবে ওরা।'

উৎপলের জীবিকা ঘর-সংসারের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে এ লেখা শেষ করা যাবে না। যদিও তার সঙ্গে সেদিন সারা সন্ধে 'কবিতা' নিয়ে যে-কথা হল তার কোনো সম্পর্ক নেই। আবার অন্যদিকে হয়ত বলা যায় একটা 'গোপন আঁতাত' নিশ্চয় আছে। প্রবাসী উৎপল এদেশে ফিরে যে-জীবিকা গ্রহণ করেছেন তা কিন্তু কবিতা লেখারই আর এক পিঠ। কাজটি হল কমিউনিকেশনের। মানুষের সঙ্গে মানুষের ছবির, গানের কথার, স্থির চিত্রের, চলচ্চিত্রের। এই সূত্রে আমার সঙ্গে উৎপলের দীর্ঘদিনের কর্মযোগ। গ্রামে, শহরে, সভায়, সেমিনারে, কর্মশালায় আমরা একসঙ্গে বহুবার গেছি। সহজ, সরল ভাষায় তিনি গ্রামের সাধারণ মানুষ বা মা-শিশুদের সঙ্গে কথা বলে আমাদের অভিপ্রেত-বার্তা যেভাবে পোঁছে দিয়েছেন তার তুলনা নেই। সুসংহত শিশু বিকাশ প্রজন্মের 'সিলেবাস' উনি তৈরি করে দিয়েছিলেন— সংযোগের ভাষা, পদ্ধতি, সামাজিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে।

একবার এক কর্মশালায় গেছি— জলপাইগুড়িতে। কর্মশালার বিষয় ছিল তৃণমূল-স্তরের মহিলা কর্মীদের, তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা, সহজ ও সরল ভাষার আরো বেশি-মাত্রায় লিখতে শেখানো। 'কীভাবে লিখতে হবে'— এই ছিল বিশেষজ্ঞ হিসাবে উৎপলের বক্তব্য। তাঁর বক্তব্য কর্মীদের এমন উদ্বুদ্ধ করল যে তারপর গ্রাম থেকে আসা সেইসব শিশুদের-নিয়ে-কাজ-করা মহিলা কর্মীদের লেখার বন্যায় আমরা ভেসে গিয়েছিলাম। আমাদের প্রকল্পের 'চোখের আলোয়' পত্রিকাটিতে সে সব অনেক ছাপা হয়েছে। কর্মশালা শেষে আমরা গেছি চা-বাগানে। ফেরার পথে ময়নাগুড়ির বাজারে চা খেতে নামলাম গাড়ি থেকে। আমরা চা খাচ্ছি, উৎপল চা না খেয়ে বাজারে এক ঝাঁকা কমলালেবু নিয়ে বসা ছেলেটির দিকে এগিয়ে যান ?' 'লেবু কত করে জোড়া'— ছেলেটির দেওয়া উত্তরে আমাদের মাথায় হাত। এখানেও, এই শীতকালে লেবুর দাম এত ? হঠাৎ উৎপল বলে ওঠেন, 'লেবুর হালি কত করে ?' এবার যে উত্তর আসে, তাতে আমরা আশ্বস্ত হই। লেবু বিক্রেতার কাছে 'জোড়া'র চেয়ে ('হালি' অর্থাৎ) চারটি অনেক বেশি কমিউনিকেটিভ। তাই এবার সে সঠিক দাম বলেছে।

স্টেটস্‌ম্যান এক-দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে, আমরা যে কাজের সঙ্গে চাকরিসূত্রে জড়িত সেই প্রকল্প নিয়ে এক পাতার ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হবে। বাংলা লেখাগুলো দপ্তরের অনেকেই ইংরেজিতে অনুবাদ করলাম। উৎপল বেছে নিলেন একটি দুর্বল এবং ভাষাজটিল লেখা—গ্রামের এক মায়ের নিবেদন। স্টেটস্‌ম্যানে ছাপা হয়ে যেদিন লেখা-

গুলো বেরুল, আমরা দেখলাম সব লেখাগুলোতেই তাঁদের বিভাগীয় সম্পাদকের হাতের প্রবল ছোঁয়া। কেবলমাত্র উৎপলের নিখুঁত ও বিস্ময়কর অনুবাদের একটি দাঁড়ি বা কমাও তাঁরা ছুঁতে সাহস পাননি।

আর এই কবির ঘর গেরস্থালি ? তা-ও নিখুঁত। এই তো সেদিন সকালে আড্ডা মারতে গেছি উৎপলের বাড়িতে। ড. ভূমেন্দ্র গুহ এসেছিলেন। হঠাৎই আমাকে বললেন ও'র লেখার টেবিলের ডানদিকের ড্রয়ারগুলো টেনে দেখতে। প্রত্যেকটি খাপ ছবির মতন সাজানো। কোনো খাপে খাম, কোনোটিতে কলম, আলপিন, ইরেজার, পেন্সিল, ক্লিপ ইত্যাদি ইত্যাদি... সব সাজানো, চাইলেই, খোঁজাখুঁজি তো দূরের কথা, সহজেই তুলে নেওয়া যাবে। উৎপলের লেখার ঘর থেকে অফিস ঘর, বসার ঘর থেকে তাঁর হাতের নোটবুকটি, কলম থেকে শুরু করে বাড়ির চাবির রিংটি পর্যন্ত পরিপাটি হয়ে থাকে তাঁর কাছে। এরকম শৃঙ্খলার মাঝে থেকে কী করে উৎপল ঐসব স্বপ্নবাস্তবতার লেখা লিখে ওঠেন, তাই কেবল ভাবতে হয়। ভূমেনবাবু বলছিলেন, 'স্ত্রীর সঙ্গে ও'র সম্পর্ক চমৎকার, ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মধুর। এই দেখুন না, এখনি কফি আর পাকোড়া আসবে। কবির ঘর-গেরস্থালির এমন সুন্দর নমুনা আর পাবে নাকো তুমি'। বেলা গড়িয়ে দুপুর।

একুশ শতাব্দীর কবি উৎপলকুমার বসু তখন মিটিমিটি হাসছিলেন। খাওয়ার প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আসলে ভূমেনের খিদে পেয়েছে। চাইছে এই ভরদুপুরে মাছের মুড়ো রুপোর বাটিতে, পঞ্চ ব্যঞ্জন, কাপড়ের ঝালর-দেওয়া হাত-পাখা নিয়ে সামনে কেউ বসে হাওয়া করুক।'

আগামী শতাব্দী থেকে আমরা আর মাত্র কয়েক বছর পিছিয়ে। ধূমপান পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। নিজে গাড়ি ড্রাইভ করেন কখনো-সখনো। পার্ক সার্কাসের মোড়ে ক'বছর আগে বাসে একবার চোখে অন্ধকার দেখলেও আড্ডা মারছেন নিত্যদিন। হৃদযন্ত্র অল্প বিকল। ক্লাবে যাচ্ছেন যখন ইচ্ছে। একবার কেবল গভীর রাতে নিজের ফ্ল্যাটের দরজা খুঁজে পাননি। তাতে কী যায় বা আসে ?

মাঝে মাঝে এখনও তাঁর রাগ হয়। আর রেগেমেগে কখনো-সখনো বলে ওঠেন 'অমুক বাবু যখনই কোনো বক্তব্য রাখেন, তা সে ঠিক/বেঠিক যাই হোক, আমার কাজ হবে বিরোধিতা করা— এই এক ব্যামো হয়েছে আমার আজকাল'। আজও এই বয়সে কফি হাউসে মস্করা, ফিচ্‌লেমিতে তুখোড় উৎপল চির-তরুণের হাসিতে ফেটে পড়েন। অপুরস্কৃত এই কবি তাঁর নবীন পাঠক-পাঠিকাদের ভয় দেখান "...আমার কবিতা পড়বেন না, পড়লেই বিপদ— ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, মৃত্যু। এই দেখুন না, শামশের চলে গেল। কত রাতে, কত সন্ধ্যা, কত গল্প শামশেরের সঙ্গে ! ওর কফিনটা যখন বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে, যদিও সেই ভয়ংকর দৃশ্যে উপস্থিত থাকিনি ইচ্ছে করেই— ওর বাড়ির লোকদেরই মতো আমারও বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, 'যদি কোনো অপরাধ করে থাকি, ক্ষমা কোরো, শামসের'। ... চলে গেল শংকর চট্টোপাধ্যায়,

তুষার রায়, সুব্রত চক্রবর্তী, অলকেশ ভট্টাচার্য, দীপক মজুমদার, মানিক চক্রবর্তী, অনন্য রায়, ফাল্গুনী রায়…"

হঠাৎ হাসতে হাসতে বলে ওঠেন : 'দুই বাংলা যদি কখনও এক হয়ে যায়— আমার সবার কাছে বিনীত প্রস্তাব রইল— সেই জুড়ে-যাওয়া নতুন দেশের রাজধানী হোক নতুন জায়গায়, গ্রীষ্মে পুরুলিয়া আর শীতে দার্জিলিং।

'আপনার নিজের লেখা সম্পর্কে এই মুহূর্তে প্রতিক্রিয়া কী ?'— আমার লেখা হল পুরনো বাড়ির সেই বড় জেঠি, যিনি অষ্টমীর দিন সন্ধেয়, সারা বছর পর, বাইরে বেরিয়েছেন, ঠাকুর দেখতে। ছেলেপুলে, নাতি-নাতনিদের খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, সংসারের কাজকর্ম সেরে, সেজেগুজে বেরিয়েছেন। আমার কাব্যগ্রন্থই বলুন আর গদ্যগ্রন্থই বলুন— সব যেন ঐ কপালে বড় টিপ, এক-গা গয়নায় ভর্তি সাজাগোজা বড় জেঠি। সেই জবাকুসুম, কান্তা সেন্ট, হেজলিন স্নো, ওটীন ক্রিম— সব মিলিয়ে এক মেট্রো প্যাটার্ন !'

'— আপনাকে কেউ যদি বলেন একটা বাণী লিখে দিন বা এপিটাফ্, কী লিখবেন উৎপল-দা ?'

একমুহূর্ত না ভেবে তাঁর ঝটিতি উত্তর, 'টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও'। ☐

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন

স দ্য প্র কা শি ত হ য়ে ছে

শঙ্খ ঘোষ রচিত

কবির অভিপ্রায়

দাম : তিরিশ টাকা

নতুন কলেবরে নতুন পরিকল্পনায়
প্রকাশিত হচ্ছে নবপর্যায়

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

সম্পাদক : ক্ষেত্র গুপ্ত

ক য়ে ক টি মূ ল্য বা ন বাং লা বই

কথা ও সুর / ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৫.০০ ☐ চিত্রভাবন / শোভন সোম ৩০.০০ ☐ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু / ড. ধীরেন্দ্র দেবনাথ ৪০.০০ ☐ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ / ড. নির্মল দাশ ৮০.০০ ☐ অভয়ামঙ্গল (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য সংবলিত) ড. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ৮৫.০০ ☐ বাঘনাপাড়া সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহিত্য / ড. কাননবিহারী গোস্বামী ২৩৫.০০ ☐ ভারতভ্রমণ দিনপঞ্জি / কাম্পো আরাই অনুবাদ : কাজুও আজুমা ৬০.০০

'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা'র অনেক মূল্যবান পুরাতন সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে

☐ **প্রাপ্তিস্থান** ☐

বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিক্রয় কেন্দ্র

মরকত কুঞ্জ অঙ্গন : ৫৬এ বি. টি. রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫০

মহর্ষি ভবন : ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৭

একটি চিঠি

সম্পাদক, 'যোগসূত্র' সমীপে,

আপনারা উৎপলকুমার বসুকে নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা করছেন, অথচ সেই সময়োচিত আয়োজনের মধ্যে আমি কোথাও নেই, একথা ভাবতেও পারি না। সুতরাং, আপনারা আমাকে ঐ প্রকল্পের অন্তর্গত করেছেন বলে, আমি খুশি হয়েছি। এই আনন্দের মধ্যেও শুধু একটিই আক্ষেপ, আপনাদের সম্পাদনাকাজ একেবারে শেষ হয়ে যাবার মুখে এবিষয়ে আমি অবহিত হলাম। সে কারণেই বিশদ পর্যালোচনার সুযোগ নেই। আসার সময় আপনাদের কথা দিয়েছি, হির্শবার্গে পৌঁছেই আমার মিতায়ত সংবেদন ডাকযোগে পাঠিয়ে দেব। এখানে অন্তত সেই প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রইল।

উৎপল আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। সেই কারণেই তাঁর বিষয়ে নিরাসক্ত কোনো প্রতিবেদন রচনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অথবা বুঝি, শঙ্খ ঘোষ প্রসঙ্গে সম্প্রতি যা লিখেছি, বন্ধুতাই সেই মানদণ্ড যা না থাকলে, বিশেষত আমাদের এই অনিকেত সময়ে, কোনো কবিপ্রতিভার যথার্থ নিরূপণ সম্ভবপর হতে পারে না। উৎপল নিজেও বোধ করি একথা

বিশ্বাস করেন। নির্মোহ তাঁর যুক্তিবিবেক, বিস্তৃত তাঁর অধ্যয়নের বলয়। তাঁর স্বভাবের সেই সমৃদ্ধি বর্জন না করেও তিনি যখন তাঁর কোনো সতীর্থের কবিতা বিষয়ে কথা বলেন, তার ভিতরে এক ধরনের মায়াবী মমতা লেগে থাকে। উৎপলের ব্যক্তিত্ব ও কবিতা নিয়ে এখানে আমি যে দুয়েকটি কথা বলব তার পরিসরেও কি ভালোবাসা জেগে থাকবে না ?

বন্ধুত্বের এই শর্ত, সন্দেহ নেই, অন্তত উৎপলের ক্ষেত্রে, একরকম মননজাত সমানুভূতির পারমিতা। একবার সিমলার ইনস্টিটুট অফ অ্যাডভান্স্‌ড্‌ স্টাডি-র একটি আলোচনা-চক্রে 'হাংরি জেনারেশন' প্রসঙ্গে আলোচনা করে ভাবাসঙ্গে উৎপলের কবিতা ইংরেজি তর্জমাসুদ্ধু যখন পড়ে শোনাই, হিন্দি ভাষাশ্রিত মনস্বী কবি অজ্ঞেয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন : 'এই আন্দোলনের সঙ্গে কি ইনি চূড়ান্তভাবে যুক্ত ?' তাঁকে আমি তখন বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, নিজস্ব সত্তার শৈলী নিয়েই ঐ আন্দোলনে তিনি অংশ নিয়েছিলেন।

তখন শংকর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত অনবদ্য 'এই দশকের কবিতা' বেরিয়ে গিয়েছে। মনে আছে, সিমলা যাবার মুখে শংকর আমায় নিবিড় অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর সংকলনে উৎপলের যে-কবিতাগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাদের একটিও যেন হিমাচল প্রদেশের সেই আসরে পড়তে না ভুলি। শংকরের কাছে আমার কথা রেখেছিলাম : উৎপলের সেই সাতটি কবিতাই ভারতীয় সাহিত্যের নানাভাষী দিক্‌পালদের আমি শুনিয়ে প্রগাঢ় আনন্দ পেয়েছিলাম। তাঁরা সবাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বাঘা মার্কসবাদী সজ্জাদ জহীর। তিনি বলেছিলেন : 'এই কবি যে-কোনো আন্দোলনের মধ্যেই থাকুন না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে, তিনি একা। এই একাকীত্ব কবিতার পক্ষে যতো আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, কোনো সম্মেলক প্রবর্তনার শামিল নয়। আপনার এই বন্ধুকে বলুন, মার্কসবাদী হতে। তাহলেই তাঁর সঙ্গহীনতার উপসর্গ কেটে যাবে।'

সজ্জাদ জহীরের ভাবিকথন অচিরেই সত্য হলো। তার অর্থ এই নয় যে 'কৃত্তিবাস' অথবা 'হাংরি প্রজন্মের' ভিতরে উৎপল মৈত্রীর তাপ বিকিরণ করেননি। আসলে তিনি কবিতার জন্য, সম্ভবত নিজের জন্যেও, এমন একটি বড়ো জায়গা খুঁজছিলেন যেখানে অস্মিতাকে লুপ্ত করে দেওয়া যায়। তাই বুঝি লন্ডনে কীট্‌সের সেই পুরাণপ্রতিম কবিতাভবনের অদূরে উৎপলের ডেরায় আমরা যখন গিয়েছিলাম, লক্ষ করেছিলাম, তিনি নিজের কথা এতটুকু না বলে আর সকলের কথা জানতে কেমন উদ্‌গ্রীব। সেই আড্ডা থেকে বেরিয়ে এসে তবু ছমছমে একটি বিষাদ আমায় গ্রস্ত করে নিয়েছিল : উৎপল কতো কথাই তো বললেন, একবারও কবিতা বিষয়ে একটি কথাও বললেন না কেন ?

হাইডেলবার্গের দক্ষিণ এশিয়াবিদ্যার ইনস্টিটুটে, এই ঘটনার ক'দিন পরেই, 'একটি কবিতার জন্ম : সমকালীন ভারতকবিতায় নতুন নন্দনচিন্তার সন্ধান' মর্মে একটি

দীর্ঘায়িত সেমিনার করতে গিয়ে মনে হলো, তাঁর ঐ তূষ্ণীদশা ঈষৎ খুঁচিয়ে দেখি। তাঁকে টেলিফোন করলাম, চিঠি দিলাম। তিনি বেশ কিছুদিন বাদে তার উত্তরে যে—চিঠি (লন্ডন, ২৮শে অক্টোবর, ১৯৭১) দিলেন তার পরতে-পরতে, নিষ্ঠুর নির্বেদ ছাড়াও কবিজনোচিত মার্কসীয় দৃষ্টিকোণের পরিচয় মেলে :

'...আপনি জানেন যে বাংলা কবিতায় আমার উৎসাহ বর্তমানে খুবই কম— প্রায় নেই বললেই চলে। এটা আজকের ঘটনা নয়। অনেক বছর আগে, আমি যখন কলকাতা ছাড়ি, তার আগে থেকেই বাংলা কবিতা বলতে যা বোঝায় তার ভেজালতা ও অসারতা লক্ষ করেছি। ঐ কবিতার সঙ্গে, দেশের সমাজের এবং বৃহৎ অর্থে মানসিকতার কোনোই যোগাযোগ নেই। কবিতা লিখে, এবং ছাপিয়ে খানিকটা আত্মতৃপ্তি হয়েছিল— 'ইগো'র তাড়না খানিকটা শান্ত হয়েছিল ...ওই অবস্থায়, আমি পকেটে তিন পাউন্ড সম্বল করে লন্ডনে এসে হাজির হলাম এক ডিসেম্বর মাসে। প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য যুদ্ধ করতে হয়েছে— সহজে কিছুই পাওয়া যায়নি। যদিও পশ্চিম দেশ প্রাচুর্যের দেশ— কিন্তু এমনই 'হস্টাইল' সমাজব্যবস্থা যে— অসতর্কের বিপদ অনিবার্য, কেননা এসব দেশের ঐশ্বর্যের মূল হল শোষণ-ধর্মী— দূরের গরিব দেশগুলির শোষণ বা নিজেদের দেশের মধ্যেই, দরিদ্রের শোষণ, অসমর্থকে নিষ্পেষণ। তখনই মনে প্রশ্ন জাগে যে তাহলে কি মঙ্গলজনক, সুষ্ঠু, নতুন সমাজব্যবস্থা আমরা তৈরি করতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি— কেননা মানুষের অসাধ্য কিছু নয়। কিন্তু সেখানে ঐ প্রাচীন কবিতার আর কোনো স্থান নেই এবং অনিবার্য বলেই আমার 'ব্যক্তিগত লিখন ভঙ্গিমা' পথের মধ্যে হারিয়ে গেল...'

বন্ধু বলেই তিনি আমায় অনুমতি দিয়েছিলেন, তাঁর এই পত্র অনুবাদ বা গবেষণার কাজে লাগাতে পারি। লাগিয়েও ছিলাম। কবিতাসংক্রান্ত সেমিনারে যাঁরা তাঁদের কবিতার উৎসারণ নিয়ে তন্নিষ্ঠ আলোচনা করেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই মনে হয়েছিল এই কবি নিজের এবং সময়ের কাছে সত্যবান। তাঁর এই সততা বিষয়ে আমার মনে আজও সামান্যতম সংশয় নেই। কিন্তু তাঁর চিঠির শেষদিকের উক্তিটি ('আমি ঐ জগৎ অনেক পেছনে ফেলে এসেছি— এবং ফিরে যাবারও কোনো ইচ্ছে নেই'।) আমার কাছে এখনও ছদ্মভাষণের মতন মনে হয়। তার কারণ, উৎপল শেষ অবধি কবিতার কাছেই ফিরে এসেছেন।

বস্তুত কবিতা কলকাতার কাছে ফিরে-আসার গরজেই বুঝি অন্তর্বর্তীকালীন তাঁর অতো আত্মক্ষয়, এত অন্বেষা এবং নতুন অভিজ্ঞতার বিস্তার। এঁর দৌলতে মার্কসবাদের শাস্ত্রিক এবং প্রয়োগসিদ্ধ সূত্রগুলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য। ফিরে এসে 'চিত্রবাণী'তে তাঁর যোগদান ও কাজকর্ম এক হিসেবে তাঁর ভবিষ্যৎকবিতার অভিমুখে নির্মীয়মাণ সোপানের মতন। এখানে সরেজমিন চর্যার মধ্যবর্তিতায় শিল্পের দৃশ্যনির্ভর এবং শ্রুতিগ্রাহ্য বিভিন্ন মাধ্যমের অন্তঃস্থ যোগাযোগের প্রয়োজন এবং সেই সূত্রে গণশিক্ষণের

প্রতি তাঁর নিরন্তর অঙ্গীকার শুধু তাঁর নিজের কবিতার জন্যই নয় তাঁর অপরাপর কবিবন্ধু এবং তরুণ প্রজন্মের কবিদের পুনর্বিন্যাসের জন্যেও কতো শিক্ষণীয় এবং উপকারী হয়েছে, সে বিষয়ে নতুন করে কিছু না বললেও চলে। আমরা, তাঁর বন্ধুরা, জানি তাঁর এসব উন্মীলনের প্রাসঙ্গিকতা অনেকের কাছেই প্রথম দিকে প্রমাণিত হয়নি, বরং নাটকীয় বাড়াবাড়ির মতই ঠেকেছিল। কিন্তু একরোখা নিষ্ঠায় তিনি দুরূহ এই ব্রতে অচ্যুত থেকেছেন। এজন্য আমরা আজ তাঁর কাছে ঋণবদ্ধ। তরুণ কবিদের সঙ্গে একাধিক বিনিময়েও একথা জানবার সুযোগ আমার হয়েছে, তাঁরা এই কবির অক্লান্ত শিল্পযোগ এবং মানবিক মুক্তিবোধের প্রতি কী পরিমাণ কৃতজ্ঞ।

ফলত যাদের উৎপল অনবরত উদ্দীপিত করতে চাইছেন এবং যাঁরা তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হয়ে চলেছেন, উভয়তই ওর কাছে এর প্রত্যাশা আরো বেড়েই চলেছে। এক এক সময় উৎপল যখন আমাদের তাঁর ইন্দ্রিয়লব্ধ এবং থিয়োরিসহ সংহিতায় শিক্ষিত করে তুলতে চাইছেন, অব্যবহিত ধারাভাষ্যের প্রত্যক্ষতায় লিখছেন :

তাকে ছন্দের নিয়তি
গুহার গভীরে ডাকে, খাদের অতলে ডাকে, সতী
জ্বলন্ত আগুনে ডাকে ; আজ কবিতা বা অন্ত্যমিল তথা
শুধু রঙ ,চিত্রার্পিত, রেখপাত— নয় কোনো কথা

আমরা, ঠাহর করতে পারি, তিনি আমাদের কাছে মিশ্র মাধ্যমের সমন্বিত অথচ অতিশায়ী রহস্যঋদ্ধি দাবি করছেন, আমরা তাঁর তিয়াষা মেটাতে পারছি না বলেই তাঁর কবি-অভিপ্রায় (Kunstwollen) হয়তো সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে নিতে এখনো অক্ষম।
অথচ দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতেই পাঠকের কাছে আভাসিত হতে থাকে কবির চিন্তার ন্যূনতম এই সিনট্যাক্স, তিনি বোধহয় বলতে চাইছেন, নিছক শব্দ দিয়ে শিল্পসমগ্রকে আয়ত্ত করে নেওয়া যাবে না আর, সেই সঙ্গে চাই পারিপার্শ্বিক বর্ণসম্পাত ও রেখার যোগসাজশও। এতটা আঁচ করে নেওয়ার পরেও, কবুল করতেই হবে, কবির বক্তব্য তাঁর কাছে তেমন উদ্ঘাটিত হয়ে ওঠে না।

২

এমন দাবি করলে অনৈতিহাসিক হবে, উৎপলের পূর্বপর্যায়ী কবিতাও সরাসরি অপাবৃত হতে চেয়েছিল। মনে রাখতে হবে, বাংলা কবিতায় তিনি অন্তর্বৃত একটি অভিনব বাক্‌রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁর সঙ্গে সেদিন ছিলেন বিনয় মজুমদার, এবং অংশত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও। কিন্তু উৎপলই এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সচেতন বেপরোয়া ছিলেন এবং অসীম সাহসিকতার সৌজন্যে সে কারণেই কবিতার অন্তঃশরীরে বুনে দিতে পেরেছিলেন আপাতঅসংগত শাখাপ্রশাখার দুর্জ্ঞেয় আলিম্পনগুণ। 'ইহাতে এই বাক্য-গঠনে চোরা রাজসিকতা রহিয়াছে, দর্প রহিয়াছে, যে প্রকৃতির বাড়ি যেন আদি বক্তার নখদর্পণে', কমলকুমার মজুমদারের অমোঘ বর্ণনায় এই নতুন কবিতার চারিত্ররূপ

চমৎকার উঠে আসে। এবং এরি জের ধরে বলা যায়, কমলকুমার তখন বাংলা গদ্যে যে-বিপ্লব সাধন করেছিলেন, বাংলা কবিতায় খুব সম্ভব উৎপলের মাধ্যমেই সেই ক্রান্তি সংঘটিত হয়েছিল।

এঁরা ঠিক কী করতে চেয়েছিলেন ? উভয়েরই মন দস্তুরমত নাগরিক, কিন্তু উভয়েই, অনাদি গ্রামীণ জীবনবোধের কাছে এক-একবার দীক্ষা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত নাগরিকতার অনুশীলিত (sophisticated) পারম্পর্য থেকে ভাষাশিল্পকে বেবল্গা করে দিতে চেয়েছিলেন। হয়তো-বা জয়েসিয় মগ্নচৈতন্যস্রোত তাঁদের শিল্পস্বজ্ঞার আড়ালে কাজ করে থাকবে। কিন্তু বাঙালি ধাঁচের প্রাত্যহিকতাকে আঘাত করাই ছিল তাঁদের অভিরুচি। কমলকুমারের গদ্যে কোম সংগীতের ইন্দ্রজালের সঙ্কেতও এই মর্মে স্পষ্ট : 'ঐ গীতে এই সকল কিছু [এই অংশটি পরবর্তী পর্বে তাঁর স্বহস্তযোজিত] যেই কিনা উহা ঐ গীত হউক, যে চাঁদ অস্থির হইবেক ; ঐ গীতের দিকেই সে আছে, তাহার পোষমানা ভয় আছে তাহার ঘর যে এবং।' অর্থাৎ প্রথানুগত অন্বয় থেকে সংগীতে ছুটি নেওয়ার সময়েও গ্রাহক অথবা শিল্পীর মানসে তার নগরনিরাপত্তাজনিত 'পোষমানা ভয়' সক্রিয় হয়ে আছে। কমলকুমার এবং উৎপল, 'সান্ধ্যভ্রমণের চেঞ্জাররা', নব্য বাঙালি বাবুসমাজের অনির্দেশ্য নিষ্ক্রমণ ও পোষ্যপোষক নিয়ন্ত্রণের অন্তর্বয়নের সৌন্দর্যেই সেদিন এরকম কিছু মন্ত্র রচনা করতে পেরেছিলেন :

১.…এমনও কি ঐ গীত-জাত উদ্দীপনার মধ্যে, নোস্টালজিতে…জানার হেতুতে …যাহারা নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে এবং যাহাদের কর্তব্য আপনি স্থিরীকৃত সুখে ভ্রমণ করে… ইহারাই তাহারা যাহারা আধো চন্দ্রালোকে নিঃসঙ্কোচে এক ইউক্যালিপটস গাছের নিম্নে সমবেত হইয়া দাঁড়াইয়া পাতার আওয়াজ শুনিয়াছে, সকলেই চুপ ছিল, একাগ্র থাকে ; …ধিক্ তাহাদেরকে যাহারা ইউক্যালিপটসের উপকারিতা বিনাইয়া থাকে…

২.…চাঁদ দেখে মনে পড়ে কেন্দ্রীয় কৃষিসমবায়

গিরিডির মাঠে ঐ যূথবদ্ধ ইউক্যালিপটাস
তোমাদের রাজ্যপাল একাদশ মনে হয়।

উৎপলের লেখায় এই ঘোর-লাগা চৈতন্যের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তিগত বাগ্বিধি (ideolect) উদ্বর্তিত হয়েছিল। মানুষের এক-একটি আয়ুযাপনের স্বকীয় আস্বাদ এবং উদ্যমের অন্তলীন নশ্বরতার টানাপোড়েনে প্রণীত হতে পেরেছে এরকম অনিন্দ্যসুন্দর পংক্তিস্পন্দ: 'স্বপ্ন ফুরায় আর সময় ফুরায় আর সামান্যই থাকে / দু-চার বসন্ত আমি ঘোরালাম সামান্য লেখাকে।' এবং বাংলা কাব্যধারার মন্দাক্রান্ত প্রহরে প্রবর্তিত হতে পেরেছিল একটি 'ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা' যা নাকি গল্পের মাঝখান থেকেই স্বয়ম্পূর্ণ পরা-কাহিনী শুরু করে দিতে পারে : 'তারপর ঘাসের জঙ্গলে প'ড়ে আছে তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি।'

জার্মান ভাষায় এই 'পুরী সিরিজ গ্রন্থের শেষ কবিতা' এবং 'ভোর সাড়ে ছটা'-র মত কবিতাগুলি সঞ্চারিত হতে একতিল দেরি হয়নি। কেননা সেখানে থেকে গিয়েছিল গুন্টার আইশ্ এবং হাইসেনব্যুটেলের মত ডাকসাইটে কবিদের উত্তরাধিকার যা মানুষের ভাষাকে দৈনন্দিন গৃহীর 'পোষমানা ভয়ের' কবল থেকে কবেই খালাস করে দিয়েছে! সবচেয়ে উল্লেখ্য, লোথার লুৎসে এবং আমার সম্পাদিত দুই বাংলার কবিতা সংকলনে (Gangesdelta / ১৯৭৪) এসব কবিতা আবিষ্কার করে লাজুক ভারততাত্ত্বিক গুন্টার সোনঠাইমার আমাদের বলেছিলেন : 'এখানে আমরা নতুন ভারতবর্ষের আত্মিক বিন্যাস দেখতে পাচ্ছি। এমন-কি যদি বলি, প্রচ্ছন্ন ইয়োরোপীয়তা সত্ত্বেও এই কবিতাগুলির মধ্যে ধরা দিয়েছে এক ধরনের হাল্‌কা উত্তরণ, এক ধরনের প্রাচ্য মায়া যা আমার মত অসাহিত্যিককেও কয়েক মুহূর্তের জন্য আবিষ্ট করে দেয়।'
আমার মনে হয়, এই নির্ধারণে উৎপলের কবিপ্রতিভার প্রস্থানভূমি যথাযথ সনাক্ত হতে পেরেছে।

৩

এই পটভূমির ব্যাপ্তি মনে রেখে তাঁর এখনকার রচনা, বিশেষত কবিতা, পড়লে আবিষ্ট হবার অবকাশ ততোটা কি পাওয়া যায়, এখনও 'বাঁধুনি' তাঁর লক্ষ্যমাত্রা, যদিচ তার উচ্চাশা কবিতার পরগণাকে ছাপিয়ে যেতে চায় :

এই দেশ ছোটো তবু বড়ো তার দেবদেবীগুলি
রক্তমুখ, রূঢ় ত্বক, নখে আবৃত অঙ্গুলি

দীর্ঘ কঠিন পথ, শীর্ষে বাঁক, এসেছ বিস্ময়
ঐ উপাস্যের হাসি যেন— জন্ম নেয় ভয়

পরিখার প্রান্তে খাদ, আরো নীচে উল্টে আছে যান
বর্ষার দুর্ঘটনা, গ্রীষ্মের আগুন বাগান

কোন শতাব্দীর কথা ? কত লোক মরেছিল, তুমিও ছিলে কি ?

এখানে চোখে পড়ে যায়, কবিতার সময়হীনতা থেকে আমাদের দিকে তাঁর নিরাভরণ অবরোহণের ঠাম, মৌলবাদের শোচনীয়তা থেকে শুরু করে ত্রিতাপবেষ্টিত শহরগুলির কদর্য বিপর্যয়গুলির পরিসংখ্যান নেওয়ার আপ্রাণ প্রয়াস। এত ভার কবিতা কি বইতে পারে ?
পারুক না পারুক, কবিতাকে এখন, এখনই, বিশ শতক শেষ হয়ে আসার মুহূর্তপুঞ্জে, এসব কাণ্ডকারখানার সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলা করতেই হবে। এ এক কিম্ভূত-

কিমাকার সময় যখন পণ্যবাদের স্বাচ্ছন্দ্যস্পৃহা আর সমাজতন্ত্রের বুলি উপজীব্য করে আমাদের ভাগ্যবিধাতারা তাঁদের ক্ষমতা অটুট রাখবার চেষ্টা করছেন। এই-ই তো, অতএব, সেই সময় যখন কবিকে বলতেই হবে :

শোনো…পোড়ামুখের গান
যে-যার মতো জ্বলে
সব্জিভরা আগুন
খাও…দু'হাত পেতে খাও
আগুন দিয়ে ভাতের দলা মাখো…

আমার বিনীত বিবেচনায়, এই নব্যরীতির কবিতার দৃশ্যপট আমাদের এত কাছেপিঠে ঘটছে বলেই তার নিষ্করুণ সত্যতা আমরা তেমন অনুধাবন করতে পারছি না এবং সেই কারণেই এই কবিতার একটি বড়ো অংশ আমাদের অননুভূত থেকে যাচ্ছে। আমি বলতে চাইছি না, কবিতার চারপাশে ঘটতে-থাকা এই বাস্তব পরিগ্রহণ করতে পারলেই যেন উৎপলের এই পর্যায়ের সমস্ত লেখা বিষয়গুণেই শাশ্বত হয়ে থাকবে। আমি শুধু এখানে এটুকুই বলতে চাই, উৎপল এসব লেখা লিখে এই কালপর্বের প্রতি তাঁর অনপনেয় বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন করছেন। এজন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

৪

বছর ছয়েক আগে পূর্বাঞ্চলের সাহিত্যিক অনুবাদ নিয়ে যে-ওয়র্কশপ করেছিলাম, উৎপল ছিলেন তার বাংলা ইউনিটের নিয়ন্তা। ওড়িয়া-মৈথিলি-নেপালী-মণিপুরী-অসমীয়া এবং বাংলা ভাষার প্রতিনিধিদের কাছে তখন তিনি থেকে-থেকেই বলতেন : 'হেরমেনিউটিক্‌স্ বলে একটা ব্যাপার আছে এবং তারি দৌলতে প্রতিটি ভাষার প্রতিটি অনুবাদ কবিতাকে নতুনতর একটি ভাষ্য হয়ে উঠতে হবে।' এরি রেশ ধরে আমি বলব, বাংলাভাষায় লেখা প্রতিটি কবিতাই আজ আমাদের যাপিত স্বকালের ভাষ্য হয়ে উঠতে চায়। উৎপলের কবিতাও এর ব্যতিক্রম নয়। বরং, এর সঙ্গে আরো একটি প্রস্বর জুড়ে দিয়ে বলা চলে, উৎপলের সাম্প্রত কবিতাবলি কবিতাকে এই জটিল সময়ের দায়ভার থেকে দূরে সরিয়ে না রেখে কবিতারই ধারণক্ষমতা ও প্রাণপরিসরকে প্রসারিত করে নিতে উদ্যত। ভবিষ্যতে এদের ভিতর থেকে কতোটুকু থেকে যাবে সেটা নিয়ে কষ্ট-কল্পনা এখন নিতান্তই অবান্তর বলে মনে করি।

উৎপল আমাদের জন্য, এক মুহূর্ত থেমে না থেকেও, প্রণিধান করে চলেছেন একটির পর একটি ভাষ্যদীপিকা। আমরা তাঁর সঙ্গে আছি। নানামুখী শিল্পমাধ্যমকে তিনি অন্বিত করতে চেয়ে এলিট-লোকায়তিক একটি নতুন দৃষ্টিকোণ সংজ্ঞায়িত করার কাজে ব্যস্ত আছেন। সেকথা মনে রেখেই এই ব্যাসার্ধে লেখা আমার নতুন প্রবন্ধপুঁথি তাঁকে আমি উৎসর্গ করেছি। আলোক সরকার এবং আমাদের সময়ের আরো কয়েকজন

ধীমন্ত লেখকের সঙ্গে তিনি একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশ করছেন যার উদ্দিষ্ট যুগসচেতন অথচ চিরায়ত রুচিরা রচনা। আমি অনেকটা স্বযাচিতভাবেই সেখানে একটি প্রবন্ধ ও কিছু কবিতা দিয়ে এসেছি। এখন এতদূর জল্পনার পর সংশয় হচ্ছে, আমার প্রশ্নার্ত মুগ্ধবোধের এই চিঠিখানি পড়ে সেই লেখাগুলি তিনি প্রকাশযোগ্য বলে বিবেচনা করবেন তো? সে যাই হোক, সান্ত্বনা ও উৎপলকে আমাদের প্রীতি জানাবেন ও আপনারাও জানবেন।

প্রীত্যর্থী

হির্শবার্গ, ২৫ অগস্ট ৯৪ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

অমীমাংসার আলো-আঁধারি

মিহির চক্রবর্তী

একটি খেলায় জড়াতে চলেছি উৎপলকুমার বসুর সঙ্গে। প্রায় চোর-পুলিশ খেলা, ছেলেবেলাকার। খানিকটা দূরত্ব রেখেছি আমাদের মধ্যে। চারদিকে ছড়ানো — সেলাই মেশিন— আকাশযান— বিষণ্ণ সন্ধ্যা— টেলিগ্রাম— বিজলীবালা— ধূসর আতাগাছ— স্মৃতি— দাঙ্গা— শোভাযাত্রা—চায়ের নিমন্ত্রণ— রক্ষাকবচ—উড়ন্ত ষাঁড়— রৌদ্রকেলাস— সহ্যভালুক— রাক্ষস— আঁধারমথ— প্রতিহিংসাপরায়ণ পর্দা আরো কতই না খলসামগ্রী। এর মধ্যে একটু পরেই লুকিয়ে পড়বেন উৎপল। আমার দায় তাঁকে খুঁজে বার করার। প্রায় অসাধ্য, আমি জানি। আরো অসাধ্য, কারণ এইসব খলসামগ্রী জীবন্ত। তারাও মাংসভুক্ উদ্ভিদের মতো লুকিয়ে ফেলতে চাইবে উৎপলকে তাদের পাতার, বৃন্তের এবং ডালপালার গভীরে— তাদের শরীরে। তবু দেখাই যাক না। রণনিমিত্ত হৃদয় আমার উদ্বেলিত। খলসামগ্রীর স্বরূপে কুরূপে যতই মায়াজাল বিস্তার করুন না পিশাচসিদ্ধ উৎপল, হাতে থাকে যদি এই লেখনী আর বাতাবরণে সম্পাদকের প্রশ্রয় তাহলে সহজে নিস্তার নেই তাঁর। আমরা দুজনে, কেউই, হত্যাপ্রিয় নই, তবু

দর্শকবৃন্দ, হতাশ হবেন না— এই পূর্বাহ্নেই এ খেলা হিংস্র হয়ে ওঠার পূর্বলক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। কী করি, কবি ও কবিতা-পাঠক হলেও মানুষের শরীর তো আমাদের। এই দুই বর্গের মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কে কোথাও কি হিংস্রতা আছে? ভেবে দেখবেন কেউ কখনো। আপাতত জিরো-আওয়ার। কেউ বাঁশি বাজিয়ে দিল বোধহয়। ঐ তিনি লুকিয়ে পড়লেন।

নদীর কাছে গিয়েছিলেম। নদীমাতৃক বাঙালি, খোঁজার শুরু তাই এখানেই। কিন্তু উৎপল, দেখুন দেখুন, কী করছেন সেখানে।

স্তব্ধ নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে আমার মতো দীর্ঘসূত্রী লোক
কি-ইবা ভাবতে পারে— জলের গভীরতম প্রহেলিকা ছাড়া।'

'ধুয়ে নিই জুতোজোড়াখানি
মুছে নিই এ-পদযুগল
তবু নদী যতটা জটিল
তারো চেয়ে লৌকিকতা গূঢ়।'

লৌকিকতার প্যাচালোপনার কথায় আসা যাবে পরে। আপাতত নদী। নদীকে প্রবাহিনী, স্রোতস্বিনী মনে হয় না তাঁর? শুধু প্রহেলিকা, জলের জটিলতা শুধু? দু-দণ্ড জিরোতে মন চায় না এর পারে বসে? ভাসতে ইচ্ছে করে না এর প্রবাহে? কথা বলতে সাধ হয় না— নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? উৎপলের নদী প্রায় স্থির। তার পার্শ্বগতি আছে— 'জাগো, ঢেউ এসে নাড়া দেয়, বটের শিকড়ে, জলস্পর্শে আছে নদীতীর'। কিন্তু রৈখিক গতি নেই কোনো। আশ্চর্য! আরো দেখুন, উৎপল কখনো (বহুদিন হল) নদীর জলের মধ্যবর্তী নন, তিনি তীরে। 'প্রতিশ্রুতিহীন নদীর খাঁড়ির ভিতরে নেমে দুজন মানুষ তামা ও অভ্র খুঁজছে'। অনেক আগে প্রথম যৌবনে (এও কি স্বাভাবিক!), একটু যেন ইচ্ছে ছিল স্রোতযুক্ত হবার— যখন তাঁর 'বড় মূর্খ' হবার সাধ ছিল কিছু— 'একটি সুরের জন্ম শত-শতাব্দীর আবহমানতার বুকে দাঁড় ফেলে, নৌকো বেয়ে যাওয়া'— যখন 'কলকাতা অনুপম উড়ন্ত মেঘের পালিতা পাখির মতো' মনে হত— যখন আশা করা যেত 'দিন আরো স্পষ্ট' হবে হয়ত এবং উৎপল ভাবতেন 'যাত্রী হবো দক্ষিণসাগরী'। কিন্তু সেসব দিন শেষ হয়ে গেছে কবে। এখন যদিও তিনি বহমান হন ক্বচিৎ কখনো, সে বহমানতা এইমতো— অসহায়-করুণ।

'নর্মদার জলে আমি অব্যবহৃত ভ্রূণ ভেসে যেতে দেখি।
তোমাকে নদী বাঁকে কাঠি দিয়ে তুলে নেয় বাগ্দী কিশোর।'

ভাসমান কর্ণকে এভাবেই হয়ত তুলে নিয়েছিলেন সেই আদিম সূত।
অবিশ্বাস্য রকমের নদীবিমুখতা এই বাঙালি কবির।
অথচ সমুদ্র তাঁকে ছাড়েনি কখনো। কারণ হয়ত সমুদ্র বলতেই তো সমুদ্রতীর, যেখানে একটি স্বাভাবিক সীমারেখা আছে, জল ও মাটির। টানাপোড়েন আছে। উৎপল কি

তবে ঢেউয়ের বারেবারে আসা এবং ফিরে যাওয়াতেই স্বস্তিবোধ করেন? 'এই সৈকত, এই ঝাউবন, উড়ে চলা ছায়াপত্ররাশি'। বারবার ব্যবহৃত একে কি তাঁর একঘেয়ে লাগে না?

এখানেও অবশ্যই তীরবর্তী তিনি। সমুদ্রের অনুষঙ্গে তা-ই স্বাভাবিক। মানুষের জীবনলিপিতে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার কাহিনী বিরল নয়— এমন কি বাঙালিরও। বাঙালিই তবু ভেলা ভাসাতে ভালবেসে এসেছে গাঙ্গুরের জলে। উৎপলও তীরবর্তী থেকেই সমুদ্ররসিক। 'আমার হোটেল থেকে দেখা গেল— যতখানি তোমাকে দেখায়'। সমস্তটা নয়, পরিপূর্ণতা নয়, অসম্পূর্ণ আধখানা, যতটা সম্ভব পারস্পরিক সীমাবদ্ধ সম্পর্কে। ফলে তীর, ফলে আংশিক।

তবু সমুদ্রের গভীরে এক রুদ্ধতা আছে যা তার ঢেউগুলিকে সীমায় আটকে রাখে। আরামপ্রদ ও নিরাপদ দূরত্বে নিজেকে রেখেও, এই রুদ্ধতার ধ্বনি আসে উৎপলের কাছে এবং তাঁকে ডাকেও।

'ফিরে দাও সাগরে আবার। ফিরে দাও উন্মাদ তুফানে
অস্তিত্বকে ফিরে দাও। বিপুল পৃথিবীময় পাথরের বুকে
আমি তার ভেঙে-পড়া দেখেছি গর্জনে।'

অথবা, পুরী সিরিজ এবং আবার পুরী সিরিজ, নিসর্গের কবিতামালা না হলেও— এতে সমস্তটা জুড়েই তো সমুদ্রের, সৈকতের সর্বগ্রাসী উপস্থিতি। লাল টালি সাদা বাড়ির প্রেক্ষিতেও 'সাদা ফেনা ও ফেনার টানে ঢেউ পড়ো পড়ো, জাগে বালিয়াড়ি'। যেখানে উৎপলের 'অনেক কথা বলা শেষ হয়, কিছু বাকি থাকে না আর'— সেখানেও 'রাত্রির জোয়ার লেগে নুয়ে পড়ে সৈকততৃণ'। এমনকি ছোটমাসী টুপীবোনা শিখে নিতে যান যেখানে, সেখানে, 'দেবতা বসে ছিঁড়ে ফেলে নীলদিগন্তের নক্ষত্র, সিন্দুর লেখা'।

পুরী সিরিজ দুটিতে থাকা তো স্বাভাবিক, বরং, এই সিরিজের শেষে তিনি বাঁচতেই চাইছেন সমুদ্রের গ্রাস থেকে। 'সমুদ্রতীরকে তুমি বিদায় জানাও। বলো: বিদায় ঝাউবন...'। অথচ আর একটু এগোলেই আদিম পিতা রুয়ার বিবাহে আয়োজক আবার সেই সমুদ্র।

'হে সমুদ্র অন্ধকারে বিবাহের এত আয়োজন ছিল তোমার প্রান্তরে
আমরা এনেছি ধাতু, ধর্ম ও সংগীত। রাত্রি
প্রকম্পিত করে নেমে আসা সৌরবাতাসের লুণ্ঠ চলেছে সৈকতে।'

কেন রুয়ার বিবাহের জন্য সমুদ্রতীরই এত প্রশস্ত মনে হল? পাহাড়ের উপত্যকা আছে, প্রেইরীর প্রান্তর আছে, পামীরের মালভূমি আছে, মরুভূমির বিস্তার আছে। তবু কেন?

কিন্তু ওঁকে কি এখানেও পাওয়া যাবে? এইসব নদী, সমুদ্র বা অন্য সে সমস্ত

বিকল্পের কথা আমি যা বলতে চেয়েছি এইমাত্র, যাকে বলে 'প্রকৃতি', এখানে কি বৃথাই খুঁজে ফেরা ?
'আরো প্রকৃতির ছবি ১নং'
বেশ ছিল বাতাস, ছিল ঢেউ, ছিল ঝাউশাখা, টার্জানের মতো করে হাঁক দেওয়া মুক্তার শিকারী। হঠাৎ 'প্রতিধর্ম' বলে দেয় : আমি চাই অসম্পূর্ণ পাঠ, সেইমতো মুক্তা বলে।'
একেবারে, রামলাল ডাকাত।
এই দার্শনিকতা খান খান করে দিল না কি অদ্ভুতভাবে গড়ে ওঠা সমস্ত নিসর্গকে ?
'প্রকৃতির ছবি (১৯৬৩)'। দেখুন—
নিরক্ষর বেশ্যাদের একজন, মরিয়মকে চিঠি লিখতে লিখতে তাঁর বাগানের বিবরণ— 'ভোরবেলা জানালার পাশে শুনি রাজহাঁস ডাকছে নালায়, সাদা আমার চাদর দেখে রাজহাঁস খুঁটে দেখছে নিজের পালক, কার্পাসবাগানে ঈশ্বরপ্রদত্ত গাধা চরছে অমনই, আমার দুখানি পা ক্রমশই বিদ্যুৎলতায় জড়িয়ে পড়েছে এবং চকিতে আমি দেখে নিচ্ছি, ঐ অধিদেবতার মল পড়ে আছে বনে'।
এ-ও উৎপলের 'প্রকৃতি'।
একটানা নিসর্গবর্ণনা অথবা বিশুদ্ধ প্রকৃতি অসম্ভব আশা তাঁর কাছে। ধূসর আতাগাছ-এ একটি সুন্দর প্রকৃতি রচনার মধ্য দিয়ে ভ্রমণ জমে উঠতে না উঠতেই— 'হঠাৎ পিছন থেকে হর্ন বাজাতে বাজাতে, এই নির্জন বনের পথে এগিয়ে আসে একটি টেম্পো'। সাইকোলজিস্টরা ভেবে দেখবেন এও এক ধরনের স্যাডিজম কিনা। নিসর্গকে গড়তে গড়তেই কেন তিনি এমন আক্রমণ করে বসেন অকস্মাৎ।
অথচ নিশ্চিতভাবে কিছুই কি বলা যায় ? [এমনও তো লিখেছেন উৎপল বসু— 'গির্জার পাশেই নির্জন কবরখানা। সেখানে সিকামোর গাছের সারি। বিশাল ও নিষ্পত্র। উল্লেখযোগ্য ওক ও এল্‌ম। তারাও পত্রহীন। ডীপ উইন্টার। শুকনো ডালের ফাঁকে ফাঁকে বাতাসের আর্তনাদ। খসে পড়ছে বরফ। আজ শুধু প্রকৃতির কথা বলার দিন। আমাদের নয়'।

তাহলে হল না এখানেও। এবারে ও পাড়ায় একটু ঘুরে আসা যাক তবে— মানুষ পাড়ায়। এমন মানবজমিন রইল পতিত। উৎপলের সাবধানবাণী পা বাড়ানো মাত্রই—

> 'আগেই বলে রাখা ভালো
> আমি চাষীদের সঙ্গে মেলামেশা করতাম এই ভেবে যে
> তারা মধ্যবিত্তদের থেকে অধিকতর জটিল ও পরিসংখ্যানজাত।'

এ কি সত্যকথন ? জলের কাছে, চাষীর কাছে শুধু জটিলতার খোঁজে ঘোরাফেরা ? প্রসঙ্গত একটু সাধারণ কথা। উৎপল কি কবিতায় আত্মপ্রকাশ করেন, নাকি

আত্মগোপন ? কথা, সভ্যমানুষের কথা, আমরা জানি যতটাই প্রকাশের মাধ্যম, ততটাই গোপন করার। কবিতা তো আরো গূঢ়তর ভাষা। এখানে কেউ লুকিয়ে ফেলতে চাইলে সাধ্য কি তাকে খুঁজে পাবার ? এক ধরনের থিয়োরাইজেশনও উৎপল করেছেন। যথা— সাহিত্য ধাক্কায় ধাক্কায় এগিয়ে চলে (কোয়ান্টাম তত্ত্ব), তার সময় ঐতিহাসিক সময় নয়, তার স্পেস ভৌগোলিক স্পেস নয়। সাহিত্য আ-মর‍্যাল, অসামাজিক (সামাজিক উত্থান-পতনের সাথে তার কোনো যোগ নেই) এবং সৌন্দর্যহীন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আসলে 'আর্গালি', 'পিশাচসিদ্ধ', 'নোংরামিতে ভরা'। 'আমি যদি নিজের ভালো চাই, তবে অবশ্যই সাহিত্য থেকে দূরে থাকব…'। ধূসর আতাগাছ-২ থেকে নেয়া। সাহিত্য থেকে দূরে উৎপল। ভাবতে পারেন কেউ ? তাহলে কি তিনি নিজের ভালো চান না ? এ-ও কি ভাবতে পারেন ? আর ঐ 'আর্গালি', 'পিশাচসিদ্ধ', 'আ-মর‍্যাল' ইত্যাদি ? এগুলিও কি আত্মগোপন বা আত্মপ্রবঞ্চনা ?

তাহলে ফেরা যাক মানুষের পাড়ায়।

দেখুন বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে কী বলেন উৎপল—

'জলে ভেসে গেছে দেশ'
কার দেশ ? কোথাকার জল ? কোথায় চলেছে ?

এবং—

'গ্রাম প্লাবনসীমার মুখোমুখি
উলঙ্গের অর্থনীতি, অন্ধের ভূগোল আর বধিরের ইতিহাস
কে কাকে আশ্রয় দেবে ?
আজ রাতে
কাটা হবে এই বাঁধ ?'

দেখুন, মধ্যশ্রেণী, নিজেদের সম্পর্কে কী ধারণা তাঁর—

'আমাদের পদবী ? শালা/হারামী ছাড়া আর কি হতে পারে ? এক কুম্ভমেলা থেকে আর এক কুম্ভমেলায় হয়রানি। রাইটার্সের কুম্ভমেলা থেকে কর্পোরেশনের, সেখান থেকে আয়কর, সেখান থেকে…'

'দেখাও ভাই, ন্যাংটো মন্ত্রীদের দেখাও, ক্ষ্যাপা আমলাদের দেখাও, উর্ধরেতা সম্পাদককে দেখাও, নিম্নরেতা সমালোচককে দেখাও, স্মাগলার উপাচার্যকে দেখাও, জালি বিচারপতিকে দেখাও…'।

ভূমি প্রায় তৈরি— কার দেশ কোথায় চলেছে, গ্রাম প্লাবনসীমার মুখোমুখি, রাইটার্সের কুম্ভমেলা, ন্যাংটো মন্ত্রী, ক্ষ্যাপা আমলা। এরপরে স্বভাবতই চাইবেন উৎপলকে কোনো 'নিপীড়িত সমাজ'-এর পাশে দেখতে। এবং অত্যন্ত তৎপর উৎপল তার গোড়া মেরে রেখেছেন— 'চাষী পরিসংখ্যানজাত' ইত্যাদি।

কেমন যেন বেঁকে যায় উৎপলের ঘাড় এই 'সমাজমানব'-এর কাছে এলেই। না মধ্যবিত্ত (সমাজ), না চাষী (সমাজ), না শ্রমিক (সমাজ)— কোনো সমাজের কাছেই তিনি

সোজা চোখে উপস্থিত হন না। শ্রমিক (সমাজ) সম্পর্কে তেমন কোনো উল্লেখ যদিও পাই না— তবু বোঝা অসম্ভব নয় যে প্রতিক্রিয়া অনুরূপই হবে। উৎপল কি ভাবেন 'চাষী' বা 'শ্রমিক' বা এরকম অন্যকিছু ধারণা দিয়ে সীমায়িত করে দিলে মানুষটা হারিয়ে যায়? এই খণ্ডীকরণ থেকে কোনো জ্ঞানই কি আহরিত হয় মানুষটি সম্পর্কে?

তবে কি মানুষের কাছেও নেই উৎপল?

যদি সত্য সাক্ষ্য দিয়ে থাকে তাঁর কবিতা তাহলে সমাজহীন এক ভিন্ন মানুষের পাশে কখনো কখনো— বস্তুত বারেবারেই তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। সেই শুরুর দিকে—

'যদি আমাকে সন্ধান করে
বোলো কেল্লার বাজারে
অন্যায় বেদনাহত মুচি ও সন্তানহীন পরিবার
পাদুকা নির্মাণ করে
তাদেরই তৃতীয়জন অথবা চতুর্থজন আমি বা আমার ভাই
ওখানেই আমাদের পাওয়া যাবে।'

এরকমই ছিল তখন। খোপে ফেলে যাদের কথা বলা যায় না ঠিকমতো, সেইরকম কোনো কোনো একক মানুষের কাছে বেশ ধৈর্যশীল বকের মতোই দেখা গেছে তাঁকে। এখনও। যে ছেলেটা পিলখানা বস্তি থেকে ঢাকুরিয়ায় চলে আসে কাগজ কুড়োতে কুড়োতে, তার প্রতি আগ্রহী উৎপল। গড়িয়াহাটের ফুটপাথে যে মানুষটি গড়িয়ে গড়িয়ে সারা শরীর দিয়ে জীবিকা ভিক্ষা করে, তার নামটি জানার জন্য গোয়েন্দার মতো অপেক্ষা করে থাকেন তিনি। তাঁর বইয়ের উৎসর্গপত্রে যে আসে সে হল উৎপলের ছেলেবেলার, অজানা, অদেখা, সকলকে সাবধানকারী নিশাচর মানুষটি, তাঁর ঘুমহীন রাত্রির চৌকিদার। তাঁর মন ছুঁয়ে যায় বেয়ারা বাবুরাম 'পক্সিরাজ', তার বিকট রক্ত হিম করা দীর্ণ, বহু-যুদ্ধ দেখা আহত-অশ্বের আর্তনাদ, তার বিশাল ডানা। উমাবাবুর অর্শকষ্ট— উৎপলের আশ্বাসদান, ও কিছু নয়। যে বন্ধুর ছেলেটি উচ্ছন্নে গেছে, স্ত্রী মুখরা, সহকর্মীরা শঠ তার ভারাক্রান্ত মাথার জন্য কাঁধ এগিয়ে দেন তিনি। কোথাও কি, খুবই ব্যক্তিগত, একধরনের বিবেচনাবোধের শিকার হয়ে পড়েছেন তিনি? এর কি হিসেব দেবেন উৎপল তাঁর পিশাচসিদ্ধির থিয়োরি দিয়ে? ভয়ানক নোটো পাখির কাছে অত্যাচারিত হতে, ভয় পেতে চান উৎপল নিজেকে রোগমুক্ত করার জন্য। কিন্তু তবু 'হারামজাদা বুদ্ধিবৃত্তি, শুয়োরের বাচ্চা বিবেচনাবোধ'-এর হাত থেকে এড়ানো যাবে না, 'নোটো পাখি ছুঁয়েও দেখবে না' এ-সব। বিবেচনাবোধ, দেখুন, কী ভাবে খেয়ে ফেলেছে উৎপলকেও। এই সংখ্যার ১৪ নং কবিতায়— শরীরের বদমায়েসি, গোপনচারিতার কথা জেনেও মন বোকা সেজে থাকে। যেন সাতে-পাঁচে নেই। ভোলা মন, মন রে আমার। উৎপল কি ব্যঙ্গ করছেন মনের এই ভূমিকাকে? কেন? কোনো বিবেচনাবোধ? মরালিটি?

আমার এই খোঁজাও শেষ পর্যন্ত বিবেচনাবোধ-এ এসে ঠেকল। এভাবে কি পাওয়া যাবে উৎপলকে, এইভাবে একটি লেখা থেকে অন্য লেখায়, একটি ডাল থেকে অন্যটিতে, লাফিয়ে লাফিয়ে, আমার মনোমতো শব্দগুলির পিছু পিছু ছুটে বেড়িয়ে? তবু আমার জানতেই ইচ্ছে করে উৎপলের কেন সমুদ্র আসে অথচ নদী নয়, কেন প্রকৃতি শব্দটি আসে অথচ তার থেকে ঝরে পড়ে এমন অ-প্রকৃতি, কেন মানবসমাজ আসে না অথচ মানুষ আসে।
কাল থেকে নিশ্চিতভাবে অন্য কোনো কৌশল নিতে হবে।

আজ কয়েকটি কবিতার জঙ্গল সাফাই করব। অনেক সময় বড় বেশি কথা বলেন কবিরা। অনেক আগাছা থাকে, মূল একটি, দু'টি কিংবা তিনটি লাইনের আশেপাশে। কবিরা এইসব চালাতে চান কবিতার রক্ত-মাংস বলে। আমি আজ শুধু অস্থিতে পৌঁছতে চাই। আগাছা সরিয়ে ফেললে যদি ওঁর দর্শন পাওয়া সম্ভব হয়।

১। কুসংস্কার সম্পর্কে কবিতা।
কবিতার বিষয়, নিজের আত্মার সংগে মস্করা। উৎপলের আত্মা সবুজ এবং রহস্যময় তো বটেই। নিজের আত্মাকে তিনি খুঁজে ফেরেন মাঠে ঘাটে। আত্মাটিকে অনুরোধ করেন তাঁকে দয়া করে ছেড়ে চলে যেতে।
পরের স্তবকে উৎপলের নিজস্ব ব্যস্ততার ফিরিস্তি। যেমন কৃষিসমবায়ে বক্তৃতা, মৌ-প্রজনন নিয়ে পরীক্ষা, ইত্যাদি। তার অর্থ এখন আত্মা, তুমি বাছা তাড়াতাড়ি কেটে পড়।
এর পরের স্তবকেই একটি আশ্চর্য লাইন— 'সবুজ রহস্যময় আত্মা, তুমি বাছা আমাকে বিরক্ত কর কেন— আমি শীতের লেপের পাশে নেহাতই রোদ্রের মতো পড়ে আছি'। আর কিছু কি প্রয়োজন থাকে? তবু আবারও তিনি তাঁর আত্মাকে, সন্দেশের বাক্স নিয়ে পাহাড়ের খাদের কিনারে ডেকে নিতে চান। ফুসলানো আর কি! ফুসলিয়ে তিনি জেনে নিতে চান উৎপলের মৃত্যুর পরে তাঁর আত্মা কী কী করে থাকে— অর্থাৎ করবে, আগামী মৃত্যুর পরে।
তারপরে, খুব প্রত্যাশিত ছিল না, দু'টি মোক্ষম পঙক্তি—'তুমি কি শ্মশানে তদ্বির করো শাপমোচনের?' উৎপলের ধারণা, তাঁর আত্মা এতই পাপী হবে যে কিছু উৎকোচের ব্যবস্থা বা ধরাধরি না করলে তার মুক্তির কোনো উপায় নেই, এবং শ্মশানই তো প্রথম দুয়ার। দ্বিতীয় পঙক্তিটি সরাসরি— 'আমি পরীক্ষামূলকভাবে তোমাকে বিদায় দিতে চাই'।
কবিতাটির এই হচ্ছে আমার পাঠ। বস্তুত আমরা উৎপলের আত্মাকে সবুজ, রহস্যময় ও নিতান্তই পাপী বলে জানলাম, এর কবল থেকে, অন্তত সাময়িক মুক্তিও, তিনি কামনা করেন এবং 'আমি শীতের লেপের পাশে নেহাতই রোদ্রের মতো পড়ে আছি।' এই একটি বাক্যই আমাকে আঘাত করে ফেরে। আমার অভিজ্ঞতা বলে কবিতার

এমন কেন্দ্রীয় লাইনগুলি সরাসরি আক্রমণ করে পাঠককে। তাকে আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না, সম্ভবও হয় না।

২। যীশুর বাড়ির হাঁস।

পয়ারে লেখা এই কবিতাটি কাহিনীর গড়নে সাজানো (উৎপলের কথকতা তুলনা-রহিত)। আমার মনে হয় না কোনো তুলে ফেলার মতো আগাছা জন্মেছে এটিতে। উৎপলের মতোই যীশুর বাড়ির হাঁসেরা একই অনাদরের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছিল—

মুস্তফী দিঘীর জলে সাঁতার কেটে, ঝরে পড়া কালোজাম আহার করে এবং পায়ের বেগুনি ছাপ ফেলে ফেলে সর্বত্র। কিন্তু অন্যরা একটু বিরক্ত হয়েছে তাদের এই অবলীলাক্রমে আসা যাওয়ায়। তাদের ঘটিবাটি চুরি যায়। হতেই পারে একটু সন্দেহ। বলেছে তারা— অন্য জলায়, খালে বিলে এবং অন্য আঘাটায় যেতে।

ঐ 'ঘটিবাটি চুরি যায় এবং 'অন্য আঘাটায়' সমস্ত কবিতাটিকে পূর্ণ রসসিক্ত করে। বোঝা শক্ত উৎপলকে, তবু মনে হয় একটু আহত বোধ করছেন তিনি সাধারণের এই অবহেলায়, এই অনাদরে। যদিও গল্পটি তিনি শেষ করেন একটি নৈর্ব্যক্তিক বিবৃতি দিয়ে— 'আমি বুঝিনি তাদের ধর্ম। সমুদ্রের দিকে চেয়ে হাঁসগুলি পেয়েছিল টের'। কবিতাটির বাইরে যেতে চাইনি আমি। শুধু এটুকুই উল্লেখ করতে চাই যে কেবলমাত্র ছেলেবেলাতেই নয়, পূর্ণ ও পরিণত বয়সের রচনাতেও এই ধরনের অভিমান হঠাৎ বুদ্বুদের মতো এসে পড়ে জলতলে।

৩। ষষ্ঠীতলা ২।

কবিতাটির কেন্দ্রে আছে এই লাইনটি :

'ত্যক্ত খোলস চলে এঁকেবেঁকে সাপের সন্ধানে।'

প্রায় সমস্ত কবিতাটি এই ত্যক্ত খোলসের আর্তনাদ। আমি বাবুটিকে চেনো না কি, আমি গয়ারাম, ভাগ্যান্বেষী, দাঁতাল মহিমা, মায়ের সুনামে স্কুল, বাপ-নিকেতন— যে আমি বস্তুত সারহীন, 'ভাঙ্গা নাটমন্দিরের মাটি', 'প্রতিমা ও প্রতিমার জলজ কলস'। আর একদিকে, এই প্রজন্মের কিশোরীরা যেন সরলবর্গীয় গাছ, কাঁটাতারের মতো হাসে তারা, আমেরিকার দুধ, চীনের কলম, নেপালের ছাতা প্রতিপালিত— আহা আন্তর্জাতিকতা— এই সমস্ত 'নড়েভোলা' 'ভূগোল-শিশু— দশে দশ। এও খোলস। কিন্তু খোলসের এই সর্পসন্ধান কেন?

'চলে এঁকেবেঁকে— করুণ প্রচেষ্টা, দৃশ্যতই। এ আমি বুঝি, খুব স্বাভাবিক লাগে আমার কাছে ,এই প্রাণপাত।

কিন্তু উৎপল এই জ্যাকেটটি নিয়ে কাহার শরীরে পরাতে চললেন? এ-কি তাঁর আত্মা-বিদায় পালার শেষ অঙ্ক? একটা দায়বোধ উঁকি দিচ্ছে যেন কোথাও।

৪। এই সংখ্যার ৬ নং কবিতা।

আমি নাম দিয়েছি 'ফুলডুঙরি পাহাড়' অথবা চেপারামের ঘর' (পাণ্ডুলিপিতে উৎপল যে নামটি লিখেও কেটে দিয়েছেন সেটি হল 'হাঁপানি'— যেন আসল কথা এই হাঁপানি)। কথা না বাড়িয়ে আমি যেভাবে এই কবিতাটি পড়েছি তা জানাই—

শ্বাসকষ্ট উঠলেই বুঝতে পারি ফুলডুঙরি পাহাড়
আর বেশি দূরে নয়—
যে জলস্রোত লাফিয়ে পার হয়েছিলাম তাকে
ঘুরিয়ে চাষজমির দিকে নিয়ে যাবার কথা ছিল—
এমন হাঁপাচ্ছি কেন ?
হাসপাতালের বিছানা শুকনো ডালপালায়,
ছেঁড়া কাগজে আর পরিত্যক্ত সাপের খোলসে
ভরে ওঠে— চেপারামের ঘরটা
এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। আরেকটু পা চালিয়ে
উঠে গেলেই হয়।

আশ্চর্য কবিতাটি! যে উৎপল তাঁর সবুজ আত্মাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন সেই তিনিই ফুলডুঙরির শীর্ষে প্রায় পৌঁছে গেছেন। শ্রীচেপারামের ঘরটা দেখতে পাচ্ছেন, আর একটু গেলেই হয়।

লক্ষ করুন গতিপথটি, আত্মার হাত থেকে পলায়ন— সাধারণের অবহেলায় অভিমান— নিজেকে খোলসমাত্রবিধায় কোনো সারবস্তুর সন্ধান— চেপারামের ঘরের কাছাকাছি। মন চলো নিজ নিকেতনে। এমনই তো হবার কথা। তবু কেন ধর্মকে যুধিষ্ঠিরের কাছে বারবার প্রশ্ন করে জেনে নিতে হয়!

'...যাবেন শ্মশানঘাট দিয়ে,
সেথা জেগে উঠেছে বাতাস তার পূর্বাপর নিয়ে।'

মন্তব্য করতে গিয়ে উৎপলের এই অসামান্য লাইনটি এসে গেল, হয়ত সংগতি ছাড়াই। পঙক্তিটি ছেঁটে নিয়ে আমি শুধু পড়ি— 'জেগে উঠেছে বাতাস তার পূর্বাপর নিয়ে।' আর কিছুই লাগে না আমার।

কতটুকুই বা বোঝা গেল উৎপল বসুকে এই এক্সারসাইজ কষে, এই ক'টি কবিতার আগাছা সরিয়ে? নিজের আত্মার হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে করতে, কোনো সার-বস্তুর সন্ধান করতে করতে বস্তুত তিনি শ্রীমৎ চেপারামের ঘরের দিকে চলেছেন, প্রায় পৌঁছেই গেছেন। অতএব 'মৃত্যুচেতনা' ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে যখন প্রায় বেঁধে ফেলা হয়েছে তাঁকে তখনই কথাপ্রেমী (এবং অভিমানীও বটে) উৎপল লিখে ফেলেন—

'তেমন করে আসতে বলেছিলে ?

যা-কিছু বলো বিকেলবেলায় স্বীকার যাই, মেঘের আলো, জলের যাঁতা, বৃষ্টিভেজা রৌদ্রভেজা, স্বচ্ছ থালে শুকোতে দেওয়া রক্তটুকু, জানলা-সিলে, আজও সরল, আলোতরল, না শুকোলে কে জানবে কোন্ বীজাণু, কোন্ চুম্বন, কোন্ কবিতা।'

জানলা-সিলে !
এমন শব্দ যাঁর আসে পরিণত স্তরে, সে কবির জীবন কে বিনাশে ?

এবারে একটু সন্ধিতে আসা যাক। উৎপল, আপনি আড়ালে থেকেই, আমার সাথে অন্ত্যাক্ষরীর মতো একটি খেলাতে যোগ দিন, অর্থাৎ আমি সেই মতো প্রস্তাব রাখছি। প্রকৃতির সাথে বিজ্ঞানী অথবা পরিপার্শ্বের সাথে শিশু যেভাবে খেলে ; আমাদের খেলাটি কিছুটা সেইমতো হবে। সম্প্রতি ডানিয়েল ওশারসন এই পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সকলের। বিজ্ঞানী অথবা শিশু এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী এবং শেখার বিষয় প্রকৃতি অথবা পরিপার্শ্ব। বিজ্ঞানী সামান্যই জানেন তাঁর প্রতিপক্ষ প্রকৃতি কী তথ্য উন্মোচন করবে তাঁর কাছে, অর্থাৎ কী কথা বলবে। তিনি একটি সম্ভাব্য সূত্র (ধারণা) উপস্থাপিত করবেন। সেই সম্ভাব্য সূত্রমতো তাঁর প্রতিপক্ষ কিছু কিছু তথ্য এগিয়ে দেয় এবং কিছু অন্য তথ্যও। এগুলির ভিত্তিতে সূত্রটি বদলে ফেলেন বিজ্ঞানী, নতুন সূত্র দেন। প্রকৃতি আবার সাড়া দেয় তথ্য দিয়ে। খেলা এভাবেই চলতে থাকে।
আমাদের খেলাটির নিয়মাবলি সূত্রায়িত করি এখন—

প্রথম চাল আমার। আমি একটি বা দু' তিনটি শব্দ এগিয়ে দেব। তারপরে আপনি পরপর কিছু শব্দ, শব্দবন্ধ বা বাক্য এগিয়ে দেবেন। এগুলি, আমি আশা করব, কোনোভাবে আমার শব্দগুলির সাথে সংগতিময় (একান্তই আপনার ধারণামতো)। তারপরে আমি। আমার নির্বাচনে আমি সংগতি রক্ষা করতেও পারি, আবার হঠাৎ একেবারে নতুন শব্দ চেলে দিতে পারি। এবং তারপরে আপনি আবার। এভাবেই চলবে। কীভাবে শেষ হবে এ খেলা অথবা জয়-পরাজয় কীভাবে স্থির হবে অথবা আদৌ থাকবে কিনা, খেলতে খেলতেই বোঝা যাবে হয়ত। শুরু হোক খেলা তাহলে।
[দর্শকবৃন্দ, লক্ষ করবেন আমার ব্যবহৃত শব্দগুলি নিতান্তই মামুলি ধরনের, এমনকি স্থূলই বলা চলে অনেকগুলিকে। দেখুন উৎপল কীভাবে খেলেন সেগুলি।]

আমি — ভালবাসা।
উৎপল — আমাদের দু-চার বছর আরো অতিরিক্ত ভালবাসা হতে পারত।
আমি — স্বপ্নে বহুক্ষণ।

উৎপল— স্বপ্নে তুমি কতবার তিরস্কার করেছিলে— ভাবি সারাদিন— স্বপ্ন ফুরায় আর সময় ফুরায় আর সামান্যই থাকে।

— সমস্তরাত ডুবো নদীর পাড়ে, আমি তোমার স্বপ্নে পাওয়া আঙুল, স্পর্শ করি জলের অধিকারে।

আমি — চিরজীবন

উৎপল— তোমাকে কিছুক্ষণ ভালো লেগেছিল। তারপর নিয়নে বিদ্যুৎ সহসা জানাল ঐ টুথপেস্ট আরো ভালো।

— প্রিয় তোমার শাড়ির থেকে চোরকাঁটা বেছে দিতে আমি অপারগ— অন্তত এবার। তোমার বাবার কাছে ফিরে যাওয়া ভালো।

আমি — জীবনবীমা

উৎপল— বীমার দালালি করে ভালবাসাবাসি হল আমার ও মাধবীর।

আমি — সন্দেহ

উৎপল— আমার হোটেল থেকে দেখা গেল— যতখানি তোমাকে দেখায়— কিছু কি গোপন রাখো? কোন প্রেমবৈষম্যের হাসি?

আমি — বিষাদ

উৎপল— তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি হারিয়েছ বাদাম পাহাড়ে।

আমি — অবসাদ

উৎপল— ভালবাসা থেকে দূরে রেখেছ কি মদ?

— ভালবাসা সে কি ভুল? লিখে রাখি দেহতাপ, প্রসারমালিনী এই ফুলবনে শুয়েছিল।

আমি — শরীর।

উৎপল— জানু তুমি! তুমিই জানালা। অনুসন্ধিৎসায় তুমি খুলে যাও— পুরুষের প্রেমের খেয়ালে।

আমি — যৌনতা।

উৎপল— নিজেরই বোনের প্রতি যৌনতা।

— যুবার পেশীর তলে সদ্যজন্ম ক্ষুধার্ত ইঁদুর।

— আমার স্ত্রীলোকেরা কোথায়।

— এখন বৎসর ঘুরে যৌনতার কাল এসে গেল। পেতে চাই অক্লান্ত শয়ন প্রতিটি ফুলের সাথে।

আমি — আগুলি।

উৎপল— বৃষ-মহিষের মতো সমকামী নারীদের একাধিক রবারের উরু নিয়ে খেলা।

আমি — উরুখেলা।

উৎপল— অপরাহ্নেই আমি ব্রনসমেত বেলাকে পেতে চাই বাথরুমের ভিতরে।

— স্ত্রীলোকেরাও বেশ রসালো হয়ে উঠেছে এবং পুরুষেরা শিথিল হয়ে পড়ছে ক্রমশ।

আমি — হিতোপদেশ।

উৎপল— স্ত্রীলোকের জন্য তার লোভ শর্তহীন।

— প্রিয়তমা দেখছি তোমার কালো স্তন ভরে যায় ধর্মীয় দ্রুত লিখন অক্ষরে।

আমি — সামাজিক দায়বদ্ধতা, অনুশাসন।

উৎপল— অতি অলৌকিক গম্ভীর আকাশী ঘণ্টা, তুমি কেন ডাকো।

— মানুষকে ভালবেসে, মানুষকে ঘৃণা করে অল্পই লাভ হল— সামান্যই ক্ষতি হল তার

আমি — প্রতিশ্রুতি।

উৎপল— আমার প্রতিশ্রুতি ছিল নেহাতই নাগরিক।

— আমি প্রতিশ্রুত নই লেখার জন্য।

আমি — স্বপ্ন।

উৎপল— আমার স্বপ্ন আমাকে ঘৃণা শিখিয়েছে।

আমি — ঘৃণা রাষ্ট্রকে, ঘৃণা ক্ষমতাকে।

উৎপল— ভোরবেলা কলতলায় এঁটো বাসনের স্তূপের উপর কেন হিম দাঁড়িয়ে থাকে গোয়েন্দা শুকতারা, সূর্য ওঠার আগে, ঠিকে আসার আগে।

— আমি ভালবাসি কচি কচি মন্ত্রীদের গালভরা হাসি।

— শস্যের সবুজ— তার হাহাকার— তার বীভৎসতা— তার রক্ত-ঝরে পড়া।

আমি — নিভৃত দায়

উৎপল— বন্ধু তোমার আজ যা বলার আছে আমাকেই বলো।

— ক্ষেত জাঙ্গালের কাছে ফিরে যেতে ভালো লাগে। নিরক্ষর বেশ্যাদের কাছে যেতে ঠিক ততখানি ভালো লাগে।

আমি — ক্রমাগত দায়ভার

উৎপল— এদিকের বিবাহ ফুরোলে, অন্য কোন বিবাহের উৎসবের জোয়ারভাঁটার দিকে চলে যাব।

আমি — পরিপার্শ্ব

উৎপল— এত জঞ্জাল সরাবে কে ? আমি কি সময় করে উঠতে পারবো ?

আমি — স্বাধীনতা, মুক্তি

উৎপল— ফাঁসির মঞ্চে বসে কাটে নখ ক্ষুদিরাম— স্বাধীনতা এখনো উন্মন করে আস্তাকুঁড়ে পচে-ওঠা সার শুধু জমেছে শহরে।

— কতখানি মুক্তি চাই ? তুমি বলেছিলে দু' হাত চার হাত। ভিখিরির সহচর পারিয়া কুকুর ঠিক যতখানি মুক্তি পায়।

আমি — বিদ্রোহ, আন্দোলন, হত্যা

উৎপল— স্রোত বিপদসীমার উপরে বইছে

— আমাদের জেলখানা ভরে যাবে পলাতক অসংখ্য যুবকে।

— ফেলে দেওয়া মৃতদেহ, গাছের পাতায় ছিটানো রক্তের দাগ লেগে আছে—

আমি — রাজনীতি

উৎপল— আমি লিখি আলাদা যুদ্ধের গল্প।

— এইভাবে শান্তি টানে যুদ্ধকেও।

আমি — শ্রেণীসংগ্রাম।

উৎপল— ঐ যা বলেছি তার বেশি কিছু বলবার নেই। ...তোমাদের হাতে তো রয়েছে গ্রেপ্তার পরোয়ানা, কোমরে পিস্তল আর উকো শিক যে-কোন দরজা খোলে, আমি জন্মমূক, কাকে চাও অবশ্যই জানি, ঐ বাদুড়ের মতো, ঐ কামঠের মতো আমি গতিময় অথচ নিশ্চল।

আমি — ট্র্যাডিশন

উৎপল— মধুসূদনের কবরের উপর আমি এক বৃষ্টির দিনে ছাতা খুলে বসেছিলাম।

— সাপের খোলস চলে এঁকেবেঁকে সাপের সন্ধানে।

— কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিম, ঈশ্বর, শিবনাথ, ভগিনি, জোড়াসাঁকো— রয়েছেন এঁরা সব প্রাতঃস্মরণীয় পিতৃকুল মাতৃকুল পরম্পরাপ্রিয়।

আমি — লৌকিকতা

উৎপল— নদী যতটা জটিল তার চেয়ে লৌকিকতা গূঢ়। ...নিমন্ত্রণলিপি শুধু— তার চেয়ে কে আর জাগ্রত।

আমি — প্রতিষ্ঠা, অমরতা

উৎপল— আমাদের মাথার চতুর্দিকে জ্যোতিষ্মান জড় দেবতার থালা দেখা দিতে পারে।

— আশা তা কি মৃত্যুর মতন বৃষ্টিহীন নয়?

আমি — আশা

উৎপল— আজো নই সুর, নই গান, নই উত্থানপতনের কোন ভ্রষ্ট রাজা, গীর্জার আঁধার— তবু আঙুল কেন উন্মাদক? কেন আঙুলে অক্ষর? কেন আমার ক্ষমতা নেই বিশাল ধ্বংস হয়ে জন্মিয়ে ওঠার।

— গেয়েছি সামান্য গান।

— ওগো প্রাণ, তুষ্ট হও।

আমি — মৃত্যু

উৎপল— লেখার খাতা অসম্ভব, অজ্ঞান লেখায় ভরে গেছে।

— বিদ্যুৎহীন এ লেখাসকল পাবে কশাঘাত।

— ফুলডুঙরি, চেপারামের ঘর।

— আমার প্রেতিনী কামড়ে ধরেছে দাঁতে এ মরজগত।

নাঃ। এই খেলা আর খেলতে চাইছেন না উৎপল, হয়ত ধরা পড়ে যাবার ভয়। আমারও মনে হচ্ছে প্ল্যানচেটে তাঁকে টেনে নামিয়েছি টেবিলে, কুরুচিকর লাগছে নিজের কাছেই। এ খেলার হাত থেকে মুক্তি চাই আমিও।
উৎপল তাঁর ভুলের জগতের দিকে ইঙ্গিত করে দ্রুত সরে পড়লেন।

হ্যাঁ, ভুলের মধ্যেই যেন অবস্থিতি তাঁর, হয়ত স্বস্তিও। এক ভুল থেকে ভিন্নতর ভুল-এ। এর মধ্যে কোনো রোমান্টিকতা নেই। অত্যন্ত বাস্তব এই ভুল এবং ভুল-বদল। পুরী সিরিজের কবিতাটি, স্মৃতি-২ ধরা যাক। 'আমার সৌভাগ্য ছিল ভুল বিদ্যাশেখা— ভুল আবিষ্কার— ভুল প্রজনন— ভুল গরিমা ও ভুল তুলাদণ্ড— ভুল ধূপাধার— ভুল পুষ্করিণী— ভুল দেবদারু— ততোধিক ভুল স্মৃতি, মিথ্যাবাদ, খেলাধুলা, বলের লাফানো আর মেঘের ভেতর থেকে আবির্ভূত জীবনের প্রথম এরোপ্লেন' এবং তারপরে আবার সমস্তটাই নাকচ— 'তাও সত্য নয়।'
সেই পুরনো ধন্দে আবার। উৎপল কি নিজেকে খুলে ধরলেন না দু'টি নেতির পর্দা তৈরি করে আড়ালে গেলেন আরো একটু।
কারো যাত্রার শুরু যদি কয়েকটি নেতিবাচক বাক্য-বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে হয় এবং তিনি যদি একের পরে এক যুক্তিসঙ্গত নেতির মধ্য দিয়ে চলতে থাকেন তাহলে কি উৎপলের চলনপথের কোনো তুলনা পাওয়া যাবে ? স্মৃতির ভুলগুলি এবং পিছুটান (ভুল ?) ছাড়া আর কিছু তিনি নিয়ে আসেননি— এমনই মনে হয় উৎপলের। শহরে, তাঁর মতে, তিনি শিখেছেন যথার্থ গান। কিন্তু এও কতখানি নির্ভুল ? প্রায় সবক্ষেত্রেই তিনি কোনো ধারণা এবং বিরুদ্ধধারণার মধ্যে অনায়াস চলাচল করেছেন— স্বৈরতন্ত্র থেকে রাজতন্ত্রে, অরাজকতায় অবলীলাক্রমে। ধরে নিচ্ছি শহরই তাঁকে যথার্থ গান বিবেচনাবোধ, বিচারবুদ্ধি, প্রতিটি সুরের শোকার্ত ঘর শিখিয়েছে, এবং যামিনীচারিতাও। কিন্তু এই বিবেচনাবোধের হাত থেকে তিনি যে পরিত্রাণ চাইছেন এও স্পষ্ট। তাহলে কি এই বিবেচনাবোধও তাঁর অন্যতর ভুল ? বিবেচনাবোধ তাঁকে ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু-ব্যাপকতা থেকে সরে আসতে বলেছে, কারো মুখোমুখি বসে থাকতে শিখিয়েছে কিন্তু আবার, তৎক্ষণাৎ, এই সরে আসা ভুল, ভুল এই বসে থাকা। তার ফলেই কি নিজের অবচেতনকে ভয় পেতে শুরু করেছেন তিনি ? 'আমার অবচেতন মন যা যা চেয়েছিল তার প্রতিটি রহস্য দেখছি এই গ্রীষ্মশেষের বৃষ্টি কোনও এক কৌশলে জেনে ফেলেছে, সে এর চেয়ে বেশি কিছু জানে কিনা ভাবতেও ভয় হয়।' তবে এই ভুলগুলি বা anti-theorem-গুলির মধ্য দিয়ে যাওয়া ছাড়া আমি অন্য কোনো পথও দেখি না।
ক্রমাগত ভুল কি অভিমানী করে তোলে ? 'একদিন যখন সময় হবে, বোসো এই কাব্যের পাশে একে ভাঙা টেবিলের মতো তুমি কাছে টেনে নাও।' অথবা 'আমার লেখা শেষ পর্যন্ত সেইসব ঠগবাজ পড়বে যাঁরা হেঁসেলে মদের বোতল লুকিয়ে রাখে।'
কিন্তু ঠিক কি তাই ? তবে 'যোগসূত্র'-এর এই সংখ্যায়ন কেন ? কেন তাঁর সাথে আমার

এই অর্বাচীন খেলার আয়োজন? এটা বোঝা শক্ত নয় যে আমার এবং উৎপল বসুর মধ্য দিয়ে অসংখ্য সমান্তরাল রেখা প্রবাহিত। কিছুতেই আমার কোনো রেখা ওঁর কোনো রেখাকে স্পর্শ করে না, বরং কয়েও করে না। তার অর্থ আমাদের পারস্পরিক জ্যামিতি অ-ইউক্লিডীয়। ইউক্লিডীয় হলে বিশুদ্ধ শরীরযাপনের রেখা দুটি ছাড়া অন্য সমস্ত রেখাই কোনো না কোনো স্থানে পরস্পরকে স্পর্শ করত। আমাদের কথোপকথনের খেলাটিতে উপরোক্ত সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত হয়। খেলাটিও তাই জমে উঠেছিল অসম্ভব রকমের। কিন্তু একটু হিংস্র হয়ে উঠছিল শেষ দিকে। আমি তো প্রাণপাত করেছি ওঁকে ধরে ফেলবার জন্য। ভালবেসেছি এই যুদ্ধ। এতে কি উৎপলের অভিমানও ভুল বলে প্রমাণিত হয় না?

'প্রতিধর্ম বলে দেয়, আমি চাই অসম্পূর্ণ পাঠ।' মানি আমি। এ খেলাও আমার একটি অসম্পূর্ণ উৎপল-পাঠ। ধরা তিনি দেবেন না। কিছুতেই। আমি শুরুতেই এমন ভেবে রেখেছিলুম।

দেখুন, দেখুন—

ঐ যে চলে যাচ্ছেন উৎপল, কাপড়ের জুতো— ঢোলা পাজামা— ফতুয়া এখনও মাথাভর্তি চুল— কাঁচাপাকা—দেখুন ট্রাম লাইন পেরিয়ে বাজারের দিকে, ঐ লুকিয়ে পড়লেন, আবার মাথা তুলেছেন।

কিন্তু না:

দূর দূর, কোথায় উৎপল, ওতো গোপাল ঐ তো সারদা বাজার করে ফিরছে জনার্দন-বাবু কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

আশ্চর্য! আবার ভুল হল। □

□ With best compliments from □

CUREPOINT

Modern Medicare Centre

10, Sudder Street

Calcutta-700 016

Phone : 245-0047

লোচনদাস নামে এক কারিগর

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

"প্রত্যেক রচনা এক-একটি বস্তু হাঁড়িকলসীর মতো, দাঁড়িকমাসমেত। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কনসেপ্ট খাড়া করি, আবার অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের যাবতীয় লেখালেখি। সাহিত্য এবং কনসেপ্ট (যা নৈতিক বা নান্দনিক বা সামাজিক) পরস্পরবিরোধী, যেন বৈমাত্রেয় সম্পর্কে বড়ো-হয়ে-ওঠা দুই দুর্দান্ত যুবক। কনসেপ্টের বিবর্তন ধীর, সংহত এবং 'লিনিয়ার' অর্থাৎ সরল রেখায় উঠে যাওয়া একটি গ্রাফের লাইন। সাহিত্যের বিবর্তন— ধাক্কায় ধাক্কায় এগিয়ে-চলা। তাই সাহিত্যের টাইম— ঐতিহাসিক টাইম নয়। সাহিত্যের স্পেশ-ভৌগোলিক স্পেশ নয়। সাহিত্য আ-মর‍্যাল, অ-সামাজিক···।" (ধূসর আতাগাছ, উৎপলকুমার বসু প্রণীত)।

বিচারক প্রভু হয়েও ভয়ঙ্কর রকমের সমাজ-দাস, তাই যা কিছু, যে কোনও পাঠ্যবস্তু, রচনা ইত্যাদি তাঁর লিঙ্গোত্থানে প্ররোচনা দেবে সেটি অশ্লীল বস্তু হতে বাধ্য। যা অশ্লীল, অ-সামাজিক তার বিনাশ ঘটাতে, সেইসব হরফ, বর্ণমালা, শব্দ ও গোঙানিকে তিনি খুন করবেন। দণ্ড দেবেন। এদিক থেকেও ব্যক্তি বিচারকরা খড়কুটো, নিমিত্তমাত্র। যেন যুদ্ধ অন্যত্র, অন্যদের মধ্যে। শব্দ, জ্ঞান ও শক্তির মধ্যে। এখন তো অনেকেই বলেন,

জ্ঞানীকে বীভৎস টাকা দিয়ে রাজদরবারে স্থান দেওয়ার মতো মোটা দাগের ঘটনা আজ না ঘটলেও, শক্তি তথা পাওয়ার জ্ঞানকে বগলদাবা করে ফেলেছে। পড়ে আছে কিছু শব্দ, সুর, ধ্বনি, চিত্র ও বর্ণ— শিল্পের প্রান্তর। কিন্তু সেই প্রান্তরেও বিষ্ঠা-ত্যাগ করতে, ওই অর্থহীনতা থেকে দরবারের দিকে তো তাঁরাও, শিল্পীরাও পা বাড়িয়েছেন কবেই। তবু গোঙানি আছে, বিপজ্জনক শব্দরা আছে সম্ভাবনা হিসাবে। বিচারকের দণ্ড ও পুরস্কার অস্ত্র দুটি ব্যবহৃত হয় দুর্বল, অস্থির ওই সম্ভাবনাকে বিনাশ করতেই।

'অ-সামাজিক', 'অশ্লীল', উন্মাদনামা লেখালেখির প্রথম দণ্ড হল, এ যে আছে এটাই কবুল না করা। প্রচার-কোলাহল বিস্ফোরণ ও কৃত্রিম, নিষ্প্রয়োজনীয় উৎকট গতির এই দুনিয়ায় একজন, দু-জন ক্ষ্যাপা, উদ্ভট লেখালিখির মানুষ এতেই তলিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে। আর সামাজিক, সুভদ্র, দায়িত্বশীল, নম্র ও বাধ্য লেখালিখিকে টাকা দাও, সম্মান দাও, বিজ্ঞাপিত কর, রাজকবি, দেশিকোত্তম কর, ব্যাস গপ্পো শেষ। এরই জন্য প্রয়োজন ভক্তি, শ্রদ্ধা, সুতরাং বুজরুকি জেনেও প্রতিভার কথাটা বেশ যুৎসইভাবে রটাতে হবে, অলৌকিক প্রেরণাকে এখনকার উপযুক্ত করতে, ঈশ্বরের গন্ধ মুছে ফেলতে 'সামাজিক দায়বদ্ধতা' এই ব্র্যান্ড-নেমে মার্কেটিং করতে হবে। প্রতিভা-প্রেরণার এই কৃষ্ণলীলা আজও অনুষ্ঠিত হয় কখনও ভাষা পরিষদে, কখনও পাঁচতারা হোটেলে, কখনও-বা সাহিত্য অকাদেমির দিল্লিস্থ ভবনে।

০ : ১

লোচনদাস এক সামান্য কারিগর বলে তাঁকে নিয়ে তেমন হল্লাগোল্লা হয়নি, অবশ্য একটা মজা, কেচ্ছা-ক্যান্টারের সুযোগও সেজন্য আমরা হারালাম। ওই ধরনের যজ্ঞ, তথা পুজোআচ্চায় আমাদের অতি পরিচিত লোচনকেও নির্ঘাৎ ফার্স্টক্লাশ ক্লাউনের মতো লাগত। সে-ও নিশ্চয়ই বাধ্য হতো চিবিয়ে-চিবিয়ে অত্যন্ত মামুলি ও বস্তাপচা কিছু কথা বলতে যা পরে বাণী হিসাবে ছাপা হত। লোচনের গায়ে ওই কাদা, ওই বিষ্ঠা মাখানোর লোভ আমাদের থেকেই গেল। মালটি বেঁচে যখন আছে, অল্পস্বল্প হলেও, লেখাটা যখন একেবারে ছেড়ে দেয়নি, একদিন ঠিক তাকে পেড়ে ফেলব আমরা। যদিও সে ইতিমধ্যেই এরকম একটি বাক্য লিখে ফেলেছে : 'বস্তুত, আমি যদি নিজের ভালো চাই, তবে অবশ্যই সাহিত্য থেকে দূরে থাকব'···

যে তার বয়স ঢের হয়েছে, আঞ্চলিক এই আ মরি বাংলাভাষার প্রাচীন ব্যবহার লেখায় হঠাৎ-হঠাৎ ঝলসে ওঠায়, এ-জিনিসটা ধরতে বিশেষ গোয়েন্দাগিরিও করতে হয় না।

খুব স্ট্রেইট একটি বাক্য, যা স্টেটমেন্ট, তাতেও এই দোষ বা গুণ, বা চিহ্ন আছে।

'আমরা একটি খরগোস আবিষ্কার করি পথিমধ্যে'।

আবার কেমন ধাক্কা দেখুন পথিমধ্যে : 'সুচারু দেবীর শাড়ির আঁচল, আঃ ছাড়ুন, দেখি

তাঁরই গভীর মেরু-কোমরের খাঁজ এবং কৃশাপিঠের নিচে ফুলে-ওঠা মেশিনের মতো নিতম্ব'…

যেখানে মেরু-কোমর, যেখানে কৃশাপিঠ, পাছা নয় নিতম্ব— সেখানে কী করে উড়ে এসে জুড়ে বসে ওই মেশিন? মেশিনের মতো নিতম্ব! পুরুষ নয়, নিতম্ব মহিলার, আর তা যখন মেশিন, তখন ওই মানিমেকিং মেশিন, ফাকিং মেশিন তো মনে পড়বেই, চাই কি চার্লির মডার্ন টাইমসের মেশিনের কথা মনে উদয় হলেও খুব একটা বিচিত্র কিছু ঘটছে না।

পথিমধ্যে নিতম্ব মেশিন আসলে একটা ক্লু, যা আধোজাগ্রত মেশিনলুম পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা বাতলে দিতে পারে। ক্যাননস অব ওড়িয়ান আর্কিটেকচার পড়ে টড়ে কোন শালা খাজুরাহোর কোমর, নিতম্ব, স্তন, শরীরের বৈভব দেখে! বিভিন্ন কম্পোজিশনে শিলায় ছেনির তুলিতে যুগপৎ যে শরীরী ও মায়াবী গতি এঁকে রেখেছে আমরা তো ভল্যুম, শেপ, ওজন ও আলোছায়ায় সেই গুহাচিত্রজগতের ইশারায় মেতে প্রায় মূক তখন।

গদ্যকবি হওয়াটাও কারিগরের চিহ্ন, হাতের উল্কির মতো, শুধু কবিও তাই। তফাত একটা অবশ্য করাই যায়, গদ্যকবি সীমানার, ব্যাকরণের শাসন মানছেন না। তবে তার থেকেও বড় কথা এই যে আমাদের বাস্তবের উদ্ভটত্ব: একটা বকচ্ছপ, নরসিংহ, নাগিনকন্যা, আমাদের বিমানচালিকা মেয়ে, আমাদের আগুনেপোড়া গৃহবধূ, মেট্রোরেল ও গোরুরগাড়ি, হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ও তাবিজ। এই খিচুড়িকে কী ভাবে বর্ণনা করব? কোন ভাষায়? চিত্রকল্পে? সময় না বলে 'কাল' শব্দের ব্যবহারে, এমনকি তার আগে 'মহা' যোগ করে বেড়ে হল বলা যায়। কিন্তু এতে প্রাণ যে যায়! অন্তর্জলির সেই দীর্ঘশ্বাস, প্রাচীনের সুবৃহৎ কঙ্কাল ছিমছাম বর্তমান ব্যেপে যেভাবে থাকতে দেখেছিলেন কমলকুমার।

লোচন লেখেন উৎপলকুমার বসু ছদ্মনামে:

> 'ঐ আমার জ্যাঠামশাই, অয়েল পেনটিন, পাশে জেটি, জেটমালানী, মোচবান, মানে ঐ জ্যাটা, জেটি বোরখাসুন্দরী, বালকহাসি, ঘেরাটোপে ঘেরা, এই যে আমার দিকে তাকান, আরেকটু মুখটি ঘুরিয়ে, বাঃ, বেশ হয়েছে, জ্যাটা দাড়িদণ্ডিত, দম্ভকালো, মিশমিশে, ছুঁয়েচ কি মরেচ, এসব ওয়েলের কাজ, সোনাবাঁধাই, গিল্টিসত্য, ফ্রেম-ফেসকো, দূর থেকে দেকুন, মাজ থেকে দেকুন,'…

রাস্তার ভেল্কিওয়ালার গলার স্বর না, কথাগুলোও যেন সেরকম ঠেকেছে 'ইয়ে তসবির, মোচবালা, ইয়ে তসবির গুরুজীকা, আচ্ছাসে দেখিয়ে, ইনকা কালার, আপেল মাফিক'… কথকতা, তবে রামায়ণ-মহাভারতের পালা নয়, ফেরিওয়ালার হাঁক, সস্তার রাজনীতির বক্তৃতা। স্পিচফর্ম আর রিটেন ফর্ম, বাকতাল্লা, আর মিতকথন, বিবরণধর্মী সাহিত্য ও ছড়ি হাতে মিউজিয়ামের গাইড-এ ওর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

আবার এই দেখা ও দেখানোর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, দূরত্ব, দ্রষ্টা লেখকের প্রশ্ন—সেই চালচিত্রও গরহাজির নয়। কিন্তু 'ছুঁয়েচ কি মরেচ' ম্যাজিককে ভেংচি কাটা, রাস্তার ভেল্কির

ঢঙে। অন্য কেউ ওই জ্যাঠামশাই, জেঠিমা, তাঁদের তৈলচিত্রের ভিন্ন এবং আকর্ষণীয় বর্ণনা দিতে পারেন নিশ্চয়ই। যদিও লোচনদাসের ভিউ পয়েন্ট, যেখান থেকে লোচন দেখছেন সেখানে তো মান্যবর ও মাননীয়ার মুখাবয়ব থেকে বড় হয়ে ওঠে 'সোনাবাঁধাই', 'ফ্রেমফ্রেসকো', 'বোরখা', পেনটিন' এইসব। আমরা ভুলে যেতে পারি এইসব ছবির মানুষদের। কিন্তু কী করে ভুলি আকার-আয়তন-রঙের, আলো ও অন্ধকারের এই গ্যালারি, এই মিউজিয়াম, কারিগরের কাজ। বিবরণ তাই এমনভাবে পেশ করতে হবে, যাতে ভাষায়, শব্দচয়নে কারিগরির ইতিহাস তার একটা রেকর্ড থাকে। শব্দ, বাক্য তো ওইসব জিনিস নয়, তাদের বোঝাতে, মনে করিয়ে দিতে কিছু চিহ্ন। ভাষা সাঙ্কেতিক। ঠিক জলছবি নয় ভাষাছবি। এখানে একটি জগৎ আছে, নানা রসায়নে, পাতনে, চোলাই হয়ে ভাষায় অনূদিত বাস্তব। তাই বিশ্বস্ততার পয়েন্টটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, আবার কাঁটাও আছে। নাকের বদলে নরুণ— এরকম অ্যাপ্রোচ তো চলবে না। সেদিক থেকে এ কৃত্রিম, বানানো, বরং সেটা বলে দেওয়াই ভাল— 'ভাই এটা কিন্তু ভেল্কি'। মজা হল বেড়ে, লেখার মধ্যে গুঁজে দেওয়া গেল লিখন প্রক্রিয়াও।

কী লিখি, বা যেভাবে লোকজন বলে লেখার কনটেন্ট, বিষয়বস্তু কী— এইটে যে ভাববার বিষয় নয়, এ যে একটা ভুল প্রশ্ন, সেজন্য এসব ক্ষেত্রে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মতোই ফর্ম খাতে, কনটেন্ট খাতে এমনকি পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা খাতেও নম্বর ভাগ করে দেওয়া থাকে। খবরের কাগজে কালেজের মাস্টার সমালোচক পুস্তক সমালোচনার সময় ওইরকম ফর্দ মিলিয়ে-মিলিয়ে নম্বর দিয়ে আসছেন গত একশো বছর যাবৎ। লোচনদাসের একটা মস্ত সুবিধা সে কারিগর, তাই তার লেখা জন্মায় কীভাবে লিখি এই প্রশ্নের গর্ভে। প্রক্রিয়াটি মেলে ধরাই সেজন্য তার সহজাত প্রবণতা, কেননা সেইটিই তার কাছে লেখা। অথচ এখানে দেখি এরকম লাইন, যেখানে সারল্য গ্রাম হয়ে আছে 'চিতচোর মনচোর জলে যেতে সই পারব না লো'। কিন্তু লাইনটা শেষ হয় অন্যভাবে, 'তখনই তোমার চিঠি এল।' ওই চিঠি এক অতর্কিত হানা, ঘটনা, আক্রমণও।

এবার কী দাঁড়ায়? নষ্টভূমির জন্য ছিঁচকাঁদুনেপানা নয়। দেখুন, কবির মাথায় নেই কোনও রহস্যের কুণ্ড, বরং নিজে সে ওইসব বুজরুকি ও রটনা, গুজব ও ডাকিনি-মন্ত্রতন্ত্র ঝেড়ে ফেলে তাঁতকলকে সামনে রেখে সবিস্ময়ে জানতে চায়— 'আর কি চাইতে পারো কলকাতায় তাঁতকল ছাড়া তুমি চেয়েছ কবিতা',

আমরা আরও দেখি :

কবিতা	প্রযুক্তি
|	|
চিতচোর মনচোর ইত্যাদি	মেশিনলুম
|	|
মেঘের তর্জন	অনিশ্চিত রেলডাক
|	|
রিবনে বাঁধা রবীন্দ্রনাথ	তানপ্রধান রেডিও

এভাবে সমান্তরাল চলতে থাকে শব্দগুলি, যারা কিছু বস্তুর ছবি এঁকে দেওয়া ছাড়াও অনিবার্য অনুষঙ্গে অর্থ সৃষ্টি করে চলে, 'হস্তচালিত প্রাণ তাঁত' হয়ে ওঠে 'আধোজাগ্রত মেশিনলুম'। এবং এখানেই শেষ নয়, যৌনতার বারুদও ঠাসা রয়েছে এই চিত্রকল্পে। এ শুধু পুরী সিরিজের নয়, উৎপলের সমস্ত লেখালিখির ভূমিকা বলেই গণ্য হতে পারে।

০ : ২

বাংলা ভাষা মানে শুধু কলকাতার ভাষা নয়, গ্রামাঞ্চলের ডায়লেক্ট, বাঙালভাষা (যা আবার চট্টগ্রামে এক, ঢাকায় অন্যরকম), সাহিত্যের, শিক্ষিত-অভিজাতের কুলীন ভাষা নয়, পুরুষের, নারীর, চাষার ভাষাও— স্থানকালপাত্র ভেদে নইলে এত রকম ভাষা, ভাষাশিল্পের কারিগরের কাছে সেসব তো খনি, উৎস। তাতে নথিভুক্ত হয়ে আছে প্রাচীন অভিজ্ঞতা। এবং তা এক জীবন্ত ইতিহাস, বাঁচার টুকিটাকি তথ্য, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার নির্যাস। স্তব্ধতা, হাবা হাসি, যতি চিহ্নের মতো, 'হুররে' ধ্বনি এক বিজয়-মিছিল।

ফিরে যাই চলুন 'পুরী সিরিজের ভূমিকা' নামের পদ্যটির কাছে, যদিও আমি একে পদ্য বলার পক্ষপাতী নই, এটি কবিতা। পদ্য শব্দটি যেন শুধুই পয়ার, চতুর্দশপদী ইত্যাদি। নিয়মের, শাস্ত্রের কড়াকড়ি। 'বসন্তে এনেছি আমি হাবা যুবকের হাসি' পদ্যের একটি লাইন বলেই মানতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই।

বসন্তে আমি এনেছি হাবা যুবকের হাসি।

বা,

আমি বসন্তে হাবা যুবকের হাসি এনেছি।

আবার 'আমি' ও 'এনেছি' বাদ দিলেই বা কী, এতে এমন কিছু ক্ষতি হয় না,

বসন্তে হাবা যুবকের হাসি।

এবার বসন্তের বিভক্তি ও বাদ দিই :

বসন্ত হাবা যুবকের হাসি

বসন্ত সম্পর্কিত সমস্ত কাব্যিক ধারণা, বসন্ত বলতেই অভ্যাসে, সংস্কারে ও সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতায় যেসব অর্থ ঝলসে উঠত, মুহূর্তে মুছে গেল সেসব। আমরা তার বদলে পেলাম একটি সাদা ক্যানভাস যেখানে নতুন কোনও ছবি আঁকা যেতে পারে। হাবা যুবক কিন্তু নতুন ছবি, নতুন অর্থের বদলে উগ্র করে তুলছে অর্থহীনতা, অবশ্য সেটাও অর্থ হতে পারে।

কবিতাপাঠে এতরকমের কাটাছেঁড়া করেন না রসের গ্রাহক, এখানে কবিদের কৃমি ঘাঁটা সমালোচকের কথা মনে পড়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু কখনওই এই লাইনটি 'রোদনভরা এ বসন্ত' গোছের করে তোলা উচিত হবে না। কারণ যুবক হাবা, তার হাসি যেমন আনন্দ বা স্ফূর্তিকে নিশ্চিত করে না তেমনি তা

যে বেদনার, কান্নার এমনও নয়, সে 'আধোজাগ্রত', যেমন 'আধোজাগ্রত মেশিনলুম' হল তাঁত, যা হস্তচালিত, যাই হোক আমরা তো বাহিত হয়ে চলেছি, আছে ভ্রমণ। যেমন মেশিনলুম ছিল আধোজাগ্রত অবস্থায় হস্তচালিত তাঁতে, যেমন তাঁত ছিল হাতে, প্রাণে, যেজন্য সে হস্তচালিত প্রাণ তাঁত। কিন্তু কবিতাটিতে তা সিঁড়ি-যুক্তিতে, এরকম রসহীন, কেঠোভাবে হাজির হয়নি। হাবা যুবকের মধ্যে একটা ছাপ, সই, আছে কবিতাটিতে, যেজন্য এইসব বস্তু ও প্রাণ সেখানে রয়েছে যুক্তির দিক থেকে এক চরম বিশৃঙ্খলায়, চূড়ান্ত নৈরাজ্যে। আবার দেখুন 'আঠারো / উনিশ মাইল টিকিট' কি প্রলাপ ছাড়া কিছু। যদি টিকিট অধিকার বোঝায়, ভ্রমণের এক নির্দিষ্ট দূরত্ব ও মাপ বোঝায় তাহলে কিছু বলার থাকে না। কিন্তু এ যদি ইতিহাস হয়, যদি তাঁতযুগ থেকে মেশিনযুগ হয়, তাহলে তো আমাদের এই ভ্রমণের পুরো টিকিট ছিল না। এখানে যে পর্বান্তর, কবে তা ইতিহাসের নিয়মটিয়ম মেনে, শিল্পবিপ্লব টিপ্লব সেরে এতদূরে পৌঁছল ? কবেই-বা আমরা 'চিতচোর মনচোর' জল আমাদের খাঁটি বাঙ্গালা 'কাব্য ছেড়ে রিবনে বাঁধা রবীন্দ্রনাথ' পেলাম।
আবার পড়ি সেই লাইনটি :

'ছিল আঠারো / উনিশ মাইল টিকিট অথচ বেড়ালাম অনেক অনেক অভিজ্ঞতা হল'
আর এই অভিজ্ঞতা আমাদের উৎখাতও করে, উৎস থেকে অনেক দূরে টেনে এনে চর্চার, পাঠ ও অনুশীলনের পাথরে আছড়ে ফেলে। খাঁটি বাংলা 'লো', 'সই' ইত্যাদির নস্টালজিয়াও মুছে ফেলে সে। লোকসাহিত্য, লোকগান সব কিছু ছেড়ে যাই, যেতে হয়, জোড়াসাঁকোর চর্চাকেন্দ্রের দিকে। কালুবাবুর কাছে নাড়া বাঁধলে তিনি বুঝিয়ে দেবেন 'রক্তকরবী' যন্ত্রসভ্যতা ও তার সঙ্কট।

টিকিটটি স্বল্প দূরত্বের শুধু সমাজ পর্বান্তরের প্রশ্নেই নয়, বরং আরও অনেক বেশি করে তা খাটে সাহিত্যের অভিজ্ঞতার প্রশ্নে। বাংলা সাহিত্য=রবীন্দ্রনাথ, তিনি একা একশো বছরের কাজ করেছেন— এইসব শুনতে শুনতে আমরা বড় হয়েছি এবং কথাটা ফেলে দেবার মতোও নয়। কিন্তু ওই একশোটি বছরের কী হল ? বহু কণ্ঠস্বরে বহুজনের চিন্তা, কল্পনা ও অভিজ্ঞতার আরও যে সব সুর, তান, লয় কোথায় হারাল সেসব ? সেই খুনের, হত্যাকাণ্ডের বিবরণ যে যুবকটির পেশ করার কথা ছিল ঘটনাচক্রে সে হাবা।

[যে ফাঁকটির কথা প্রসঙ্গক্রমে এখানে চলে এল, ভয় হয় কেউ না ভেবে বসেন এতে রবীন্দ্রনাথের মুণ্ডপাত করতে চাওয়া হচ্ছে। বা বলা হচ্ছে প্রতিটি স্তর-পর্ব পেরিয়ে আঙ্কিক নিয়মে অগ্রগতির সূত্র সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রেও ষোলো আনা খাটে। সেসব নয়, আমরা এখানে শুধু ওই হাবা যুবকটির মন পড়ার চেষ্টা করেছি। যা আরও দশ রকমভাবে পড়াও নিশ্চিত সম্ভব।]

০ : ৩

ভাষার বিবর্তনে ভাষাবদলে, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে, আকার ধারণ করে আমাদের বিশ্ব। শব্দ যেন কোনও কিছুর স্মারক, কত স্মৃতি, জীবন্ত ও সচল, সংগঠিতও। ভাষার, শব্দের তাই কোনও গুদোমখানা নেই, যদিও আকছার আমরা 'শব্দের ভাণ্ডার' কথাটা ব্যবহার করে থাকি। শব্দরা সম্পর্ক গড়ে, বিবাদে মাতে, তুমুল কোলাহল সৃষ্টিতে সক্ষম তারা। দেশ-কাল বিপর্যয় সংঘটনেও পটু। যাকে বলে 'অ্যাক্ট' তারা তা জানে এবং পালন করে।

এভাবে, এই প্রক্রিয়ায় রচনাদের 'হাঁড়ি-কলসীর মতো' হয়ে ওঠা, কারিগর-শিল্পীর দৃষ্টিতে, মানিয়ে যায়। আর তা যদি হয় ভাষা এবং শব্দ সেই কাদামাটি যার মধ্যে বিচিত্র, সম্ভব-অসম্ভব অনন্ত রূপ গ্রহণের, হয়ে ওঠার ক্ষমতা ও সম্ভাবনা রয়েছে।

এই বচনটিতে এক পয়সার নতুনত্ব নেই, পাঠক জানেন। কিন্তু আপনি শব্দগঠিত মূর্তিগুলি লক্ষ করুন : মঙ্গলকাব্য, চর্যাপদ, পদাবলী

এবং

'পৃথিবীর রাজপথে-রক্তপথে-অন্ধকার অববাহিকায়
এখনো মানুষ তবু খোঁড়া ঠ্যাঙে তৈমুরের মতো বার হয়।'

খোঁড়া তৈমুর তো মূর্তিই। আবার এই শব্দ 'তৈমুরের' এক স্মারক এবং মূর্তি ও স্মারক নিশ্চিত, তৈমুর নয়, রাজপথ নয় যেমন রক্তপথ সর্বদা, যে মানুষ খোঁড়া ঠ্যাঙে হেঁটে যায় তৈমুরের মতো সে তা জানে না, হয়ত-বা শোনেনি তৈমুরের নাম, সজ্ঞানে তার মাথায় নেই বীরত্ব, নৃশংসতাও। কিংবা কোন্ সে মানুষ? আমরা তো হাঁটতে দেখি নিঃশেষিত ভিখারি, প্রশান্ত সন্তকেও? তাহলে এ গল্প সর্বজনীন নয়, বড়ই বিশেষ। তবু এমন এক ধ্রুব স্বভাব আছে এতে বীজের মতো যে তড়িৎস্পর্শ ঘটে, জীবনানন্দ সেই জাদুটি সংঘটিত করলেন, কবিতা একটা পারফরমেন্স হল, চোখের সামনে শব্দরা এটা ঘটিয়ে ছাড়ল।

লোচনদাস ভাষা রচনার এই পারফরমেন্স ধর্ম কুসীদজীবির মতো খাটিয়েছেন। সেখানে—

'সবাই চলেছে ছুটে জ্বলন্ত পেট্রোলরেখা ধরে
শোধনাগারের দিকে—'
আর তাই 'পানপাত্র, আমিও বিদায় চাই'।

কিন্তু লেখালিখি কী করেই-বা থিয়েটারি অ্যাকশন হবে, ভাষায় রচিত চিত্ররা চিত্রের ফ্রেমও ভেঙে ফেলে, মজা হল এখানে ফ্রেম বা লক্ষ্মণগণ্ডী আমরা মাননীয় বলে ভাবি না। ভাষাকল্পনার বীজ আছে, মানসচিত্র এ, যতটা সে দেখায়, লুকিয়ে রাখে তার থেকে অনেক বেশি। আবার অল্পস্বল্প হলেও দেখানোটা রয়ে যাচ্ছে বলে বিশ্বসংসারের বস্তুরাও সেখানে স্থান পায় প্রকৃত মর্যাদায়। দু-চার লাইনের একটি পদ্যে কুমোর বা কাঁসারি বা অন্য কোনও কারিগরের চিহ্ন পানপাত্র, যা যুগপৎ বস্তু ও শিল্প, আবার

যা এসব কিছুই নয়, উষ্ণ-উত্তেজক-প্ররোচক তরলের আধারমাত্র বলে অর্জন করে নেয় এক রহস্যমাত্রা। তার বাহ্য উপস্থিতি, বাইরের রূপ এতে অস্বীকৃত হচ্ছে না। তার আকার, ওজন এসব আছে। আছে ছায়াও।

০ : ৪

বস্তুরা আছে না বলে তারা রীতিমতো বিরাজ করছে, অর্থাৎ বেশ একটা মহিমাও আছে, মনে পড়ে যেতে পারে দালির আঁকা একটুকরো রুটির কথা যার নির্যাস ভালবাসা। ভাষাশিল্পে, গদ্যেপদ্যে জোর কোনও বিবাদ (বা উৎপল যেমন বলেন গদ্য হল কুকুরকে এক টুকরো রুটি ছুঁড়ে দেওয়া, বা শঙ্খ যেমন মনে করেন, এ যেন জানাতেই ব্যস্ত) নাও থাকতে পারে যদি সৃষ্টিধর্মটা একশো ভাগ থাকে। এখন গদ্যকে কুকুরের রুটি করে ছেড়েছেন কিছু কালোয়ার নিজেদের মদ, রুটি, রমণী ও প্রাসাদের স্বার্থে। সেইসব ছিঁচকেপনা ও গণেশতোষণকে ধরতে আমরা বাধ্য নই। কেন না ওই রুটির টুকরোটির দালির ছবি হওয়ার শক্তি ও সম্ভাবনা নিশ্চিত ছিল। আজও আছে।
তবে সাবধানের মার নেই বলে নয়, ভুল বলার ঝুঁকি সামলাতেও নয়, তর্কটা আছে বলেই মানতে হচ্ছে, আর মানা মানে এইটে স্বীকার করা, এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়-নি। হয়ত কোনওদিন হবেও না। কিন্তু এই যে বিভিন্ন গড়ন, গদ্য-পদ্য-নিবন্ধ-রম্যরচনা-নক্‌শা, ভ্রমণকাহিনী এসবের অন্তর্বর্তী দেয়ালগুলি ভেঙে পড়েছে বার্লিন-দেয়াল ভাঙারও বহু আগেই। ভাষায় রচিত, সৃষ্ট সব কিছুই এখন লেখালিখি, তাতে সাহিত্যধর্ম আছে। আবার সাহিত্যও তার সংজ্ঞা বদলে-বদলে, নিজের ধর্মের মধ্যে আত্মসাৎ করেছে, শুষে নিয়েছে অনেককিছু— এক মহামিছিল এখন।
মানুষের মুখের দুটো কথা, সামাজিক আচরণ, সাহিত্য এখন তার উপর একটি মন্তব্য ও টীকা জুড়ে দিয়েও থেমে যেতে পারে, বা সাংবাদিক, সমাজতাত্ত্বিকের মতো কবিতায়ও উদ্ধৃতিচিহ্নের সাহায্যে নথি পেশ, ডকুমেনটেশন সম্ভব, লোচনও তা করেছেন :

> ‘ঐ ছেলেটা বাবু ঐ হারামজাদা দু’ টাকা চায় ব্যাটাছেলে খেটে খানা আমরা
> মেয়েমানুষ বালবাচ্চা আছে কোথায় পাবো দু’ টাকা সেদিন দিইছি...
> ... ...
> হাজত ঘুরে এলি বলনা বাবুকে এই শালা এই মড়াখেকো’···

এ তো সেই ‘ইমোশন্যাল, ওভারচার্জড স্টেটমেন্ট’ যা শুধু জানাচ্ছে না, ক্রোধ ও অভিমান ঝরে পড়ছে— একটা ধ্বনি-আবহাওয়া, ধ্বনিলিপি, স্বরলিপির মতোই, শঙ্খও এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছেন, দুটি স্তবকের একটি কবিতায় :

> ‘ছোটো হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
> ‘সরু হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
> ‘চোখ নেই ? চোখে দেখতে পান না ?
> ‘সরু হয়ে যান, ছোট হয়ে যান’—

প্রথম তিনটি লাইন ভিড়ের বাসে ট্রেনে কেউ বলে থাকতে পারেন, চতুর্থ লাইনটি সিদ্ধান্ত ও নির্দেশের মতো ভিড়ে উচ্চারিত হতে পারে। কিংবা এসব হুবহু কোথাও কখনও কেউ যদি না-ও বলে থাকে, অভিজ্ঞতায় বুঝি তা বলা খুবই সম্ভবপর, তাই বলেছে ধরে নিতেও কোনও অসুবিধে নেই। বা শঙ্খ এসব কথা শুনেছেন আরও টুকরো-টুকরো ভাবে, তারপর সাজিয়ে নিয়েছেন, যদিও বহুজনের কণ্ঠস্বরটা থেকেই যায়। ধরে নিতে পারি এ হল ডকুমেনটেশন।

এ তো প্রথম অংশ, প্রথম চারটি লাইন, দ্বিতীয়াংশে আমরা শুনি কবির কণ্ঠস্বর :

'আরো কত ছোটো হব ঈশ্বর
ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে !
আমি কি নিত্য আমারও সমান
সদরে, বাজারে, আড়ালে ?'

কবির এটা উপলব্ধি যেমন, তেমনি এ হল প্রথমাংশের নথি সম্পর্কিত টীকা, মন্তব্য।

০ : ৫

উৎপল সত্য-সত্য করে মাথা ফাটাতে, সমাজ সংশ্লেষে তেমন উৎসাহী নন। তিনি আদপেই চাননি 'প্রামাণ্য' হোক তাঁর রচনাগুলি, 'আমার রচনাগুলি আরো বেশি প্রামাণ্য ও তাৎক্ষণিক মনে হয়েছিল'। আধুনিক মানুষের বিশৃঙ্খল চেতনা, গ্রন্থিচ্যুত সময়, ঐতিহ্যের অস্পষ্ট স্মৃতি যাঁর কবিতার হাড়মাস, মজ্জা, তাঁর সত্য তো স্বতন্ত্র হবেই, আর এই সত্য সমাজসত্য যে নয় তা বলা বাহুল্য। এবং চরম পরম কিছু নয়, খণ্ড বৈচিত্র্যের শিল্প সত্য।

সমাজ সংশ্লেষ গভীর থাকা শিল্পী-সাহিত্যিকের এক মহান গুণ বলে বিবেচনা করে থাকেন অনেকে। এই পাসপোর্টটি দেখিয়েই অনায়াসে পার পেয়ে যেতে পারেন তাঁরা। যার লেখালিখিতে এই ডাকটিকিটটি প্রকট নয়, প্রধান নয়, তাঁর দিকে আমরা ফিরেও দেখব না। কারিগরি, দক্ষতা এসব গৌণ, ছুতোর ও মুচির কাজ। তাই বলে যে সবাই, দল বেঁধে কারিগরি বর্জন করেছেন এমনও নয়।

কেউ চাইলে এখন বিগত ৩০-৪০ বছরের বাংলা লেখালেখিকে পরিষ্কার দুটি টুকরো করে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমরা এও দেখতে পাব হয়ত ঐ দুটি টুকরোর মধ্যে প্রায় কোনও লেনদেন নেই। একটি টুকরোয় ধরা আছে ফর্মের খোঁজ, লেখালিখি সেখানে হয়ে উঠতে চাইছে নতুন, মৌলিক। শুধু সাহিত্য নয়, শিল্পের অজস্র রূপ থেকে সে বহু কিছু শুষে নিতে চাইছে। পাশ নম্বর, বা ফার্স্টক্লাশ, বা যাকে 'উত্তীর্ণ' বলা হয় সেসবকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে এবং উল্টোদিকে এক ভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রতি সঁপে দিয়েছে সমস্ত মনোযোগ। আর অন্য টুকরোটিতে প্রাধান্য পাচ্ছে শুধুই বাঙালির 'প্রগতিশীলতা', বাজারবুদ্ধি। লেখালিখি সেখানে বড়জোর নিষ্ক্রিয় সমাজসেবার

পর্যায়ভুক্ত। আকার-আয়তন-প্রচার-পুরস্কারে দ্বিতীয় টুকরোটি প্রথমকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। ফলে বস্তুজগৎ নয়, সমাজ ও তার বহিরাবরণই লেখালিখির মেদমজ্জা এখন।

০ : ৬

সম্মোহিনী আয়নায় অনুভব ও চিন্তার চিত্রকল্পেও আর ফিরে যাওয়ার পথ নেই। ভঙ্গুর ঢেউ এখন ঐ চিত্রকল্প, ক্ষণজীবী। যে স্ববিরোধ, ফর্ম ও অনুভূতি-চিন্তা-কল্পনার যে টানাপোড়েনে আমরা হস্তচালিত তাঁতটিকে দেখে ভাবতে পারি এক আধো-জাগ্রত মেশিনলুমের কথা, যেখানে ধ্বনি রচনা করে ছবি, ধ্বনি দেখায়, ফলে হৃদ্‌পিণ্ডের ধুকধুক-ই প্রাণ, তাঁত হয়ে ওঠে, এতে বস্তুজগতের ঐ তাঁতটির এমন এক পুনর্নির্মাণ হল যা কোথাও ছিল না। বস্তুর পুনসৃষ্টির এ এক উল্লাস, উৎসব। একে কি আমরা আদি চিত্রকল্প, প্রত্নসত্তা কিংবা আর্কিটাইপ বলতে পারি না। এই স্বর কি বহুকালের নয়, পিতৃপুরুষের কণ্ঠস্বর নয় কি। যৌথ নিশ্চেতনায় যে ছিল, উৎপল তো কবুলও করেন,

> 'একদিন নিশ্চেতনা এসে ছুঁয়েছিল এ-মোহশরীর। আমার অবাক লাগে। হেসে বলি— "তুই কাদের দুলালী?" দেখিনি পাশার দান ওর হাতে, দেখি নি সে রক্তমাখা তীর, চাদরে লুকানো তার প্রিয় পাখি, বাজপাখি, ডেকে ওঠে— 'শালী…"

হাজার-হাজার বছর ও আদি চিত্রকল্পের এক পুনর্নির্মাণ দেখি একের পর এক—

> 'বীজ সেই, যাকে নাম ধরে ডাকি।
> সে জেগে ওঠে খিদের জগতে, পশুহননের সন্ধ্যায়, ধুলোর ঝড়ে,
> তুমি তো আমায় বড়ো আতান্তরে ফেললে হে— ঐ তার
> আক্ষেপ শোনো।…
> আমি দূরে পালিয়ে যাব ভাতের থালা থেকে—
> তেপায়া টেবিলের নিচে লুকিয়ে থাকব আমি—
> চেষ্টা করব যাতে খাবার ভর্তি টিফিন-ক্যারিয়ার কোনোদিন না খোলে—
> দরজার আড়াল থেকে, ছাদের কার্নিশ থেকে নারকেল গাছের
> মাথা থেকে তাকে আমি দু' বেলা ডাকি
> সে একমাত্র আমার ডাকেই সাড়া দেয়
> —জানে ইল্বল তাকে ডাকছে।'

এই স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন বাস্তব। কবিতাটির প্রথম স্তবকে এই প্রশ্নও উত্থাপিত, 'হ্যাঁ গা এরা কি বাস্তব?' 'পত্রহীন ডালে সূর্যের বিষাক্ত ছাল', কোকিলার শব 'উকুনবাস্তব', 'বাতাসে উড়ন্ত বীজপশু'— এরপর ঐ বীজ, শস্য, খাদ্যকে ইল্বল যদি ডাকে তবে তো সে খাদকের উদর ফাটিয়ে নিশ্চিত নির্গত হবে। ইল্বলের ডাক খাদ্য ও খাদকের

সম্পর্ক-পরম্পরা, সম্পর্ক ভেঙে দেয়, উল্টে দেয়। আবার দেখুন ইস্বলের পুরাণ-প্রতিমা এখানে জেগে উঠছে, বাস্তব মুছে দিচ্ছে, স্বপ্নই বাস্তব তখন। কিন্তু এই কবিতা, এইসব কবিতার কাল বিশ শতক, স্থান বা দেশ কলকাতা এবং সেখানেই কাব্যপ্রেম বলে অন্যরকম অঘটনও ঘটে,

> 'আমি অমুক সম্পাদকের সেরেস্তায় গিয়ে একদল প্রবীণ লোকসমেত হামলা করব, বলব এরা অণ্ডকোষমর্দনে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছে, এদের যা-হোক একটা হিল্লে করে দিন'।

ভুল করে ভেবে ফেলা অসম্ভব নয় সম্পাদক-সংক্রান্ত ঐ লাইনটি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা-প্রতিবাদ ইত্যাদি। তবে তা হবে আমাদের সংস্কার, অভ্যাস। দক্ষতা যাতে, সেই কাজটি, কাজটির অর্থহীনতা প্রকাশ করা ছাড়া এটি এক বাচালতা মাত্র। কিন্তু তা এমনই, যার পরিণাম স্তব্ধতা। কেননা,

> '... — হাত পাতো, পাবে উড়ন্ত ধুলোয়-ভরা টুনি খাতা, দু-শো বছরের ধোপার হিসেব আর ধুতির রিবেট আর পাজামার আস্ত দড়ি-বিকেলভর্তি মাঠে খালি হাতে কে-ই বা ঘুরছে বলো।'

চৈত্রে রচিত কবিতা থেকে পুরী সিরিজ, আবার পুরী সিরিজ হয়ে লোচনদাস কারিগর খণ্ড বৈচিত্র্যের দিন-এ পৌঁছলে দেখি এক নাট্যামুদে কখনও তাঁর পেছু ছাড়েনি। বাঁকা চোখে দেখা, তেরচা হাসির সঙ্গে প্রায় সর্বদা আত্মগোপন করে থেকেছে ঐ নাটকীয়তা। এতে পূর্বকথিত পারফরমেন্স যেমন ঘটে তেমনি বস্তুসকল তাদের নগ্নরূপ সহসা দেখায়, বা ঝলসে ওঠে (পাজামার আস্ত দড়ি, পানপাত্র ইত্যাদি)। বক্তৃতা, বাণী, গভীর সত্যকথনের দায় কাঁধে। নেওয়া, কবিতাকে কথার জাল থেকে মুক্ত করতে চাওয়া উৎপলের রচনাগুলি স্বতন্ত্র প্রত্যক্ষতায়। এই প্রত্যক্ষতা বস্তু জগতের সঙ্গে, সমাজ অনুষঙ্গ মাত্র, তাও কদাচিৎ। পানপাত্রটির দশা এখানে সকল বস্তুর, কে জানত বলুন সেই আদি মৃন্ময়পাত্র, প্রস্তর বা ব্রোঞ্জপাত্র নীল বিষ উপহার নিয়ে উঠে আসবে ঠোঁটে! আকাশ 'নীল সার্টপাজামার মতো বাস্তবিক', নির্জনতা 'ফুটপাথে কেনা শান্ত নতুন চিরুনি' অপর এক 'ধাতুগান', বীণাযন্ত্রের তিনসুতো 'পশুকেশরের তার'-এ পশুরই স্বর, মূর্ছনা, সংগীত-সম্ভাবনা হিসাবে রয়ে গেছে। বস্তুর নির্যাস এরা সবাই। এইসব রচনা অলিখিতরূপে ছিল বস্তু জগতেই, বিদ্যুৎচমক তা দেখাল মাত্র।

০ : ৭

'প্রতিশ্রুতিহীন নদীর খাঁড়ির ভিতরে নেমে দু'জন মানুষ তামা ও অভ্র খুঁজছে'।

'আমার' ও 'ব্যক্তিগত' এই দুই ভুল গর্ব-পালক ছোঁ মেরে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে ঝড়ো বাতাস। তবু, তারপরেও, পেপার মিল থেকে সদ্য প্রসব হওয়া নবজাতক, হাতির জলছাপ সাদা কাগজে অক্ষর, শব্দ সাজানো, ওলটপালটের খেলা থেকে যায়। শব্দ-দৃশ্য অনুভূতি-চিন্তায়, দিল-দিমাগের সমন্বয়ে থেকে যায় 'লিখনভঙ্গিমা'।

অতীত কারিগরের চর্চা, বংশানুক্রমিক শিক্ষার বংশবিস্তার এই লিখনভঙ্গিমা, যা বেঁচে আছে এই, এখনকার শিল্পমুহূর্তে, এ যেন সময়-সঞ্চয়, শিল্পসময়।

[দশকের পর দশকব্যাপী মাস্টার-সমালোচক-কাম-কবি-লেখক-বাঙ্গালা-সমালোচকরা যে খাস্তা সাহিত্য-আলোচনা করে থাকেন, সেইসব তামাদি কথা, টোকা-জ্ঞান আমরা যে কবে নর্দমায় টান মেরে ফেলে দিতে পারব, ওই হল্লা থামানোর জন্য উৎপলের মতোই বলতে পারব : 'এরা অন্ডকোষমর্দনে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছে, এদের যা-হোক একটা হিল্লে করে দিন' — থামান এই কুৎসিত চিৎকার।]

কিন্তু গ্রহব্যাপী এই কারিগরি, শিল্পচর্চা, তার অভিজ্ঞতার নির্যাস নিয়ে মাথা ঘামানোর বদলে আমরা ভূগোলের ক্লাশ নিতে শুরু করি, নৃতত্ত্ব ইতিহাসের সিলেবাস ঘেঁটে ঘেঁটে ঐতিহ্যের ডানা ছেঁটে, 'দেশজ' এই শব্দটিতেই বারেবার ফিরে আসি। আমাদের ঐতিহ্য = দেশজ ঐতিহ্য। রামায়ণ-মহাভারত-চর্যাপদ-মঙ্গলকাব্য, পুকুরঘাট-আলপনা-ধুলো পা এবং আরও বহু টুকিটাকি জিনিস, পট-শিল্প, টেরাকোটা ইত্যাদি। ১৯৯৪ সালের কবিকে এইসব ঘেঁটে-গুলে খেয়ে গ্রো করতে হবে। তথ্য বিস্ফোরণের এই যুগে, স্যাটেলাইট-কম্পিউটার প্রযুক্তির এই সময়ে হে বাঙালি কবি, জেনে রাখ, তোমার কবিত্বের চেয়ে বাঙালিত্বকেই আমরা অধিক কদর করে থাকি।

'তারবার্তা, গালা ও দলিল এই দেহে ভাসমান।
আমি স্বস্তি পাই। যা ভাঙবার নয় তা-ও টুকরো হয়, ফাটে—
যেমন পাথরখণ্ড, ন্যাড়াবট, আমাদের ইহলৌকিকতা,
ঘুমন্ত বোষ্টুম পুঁথি ভেসে যায় খান-খান কাঠের মলাটে'।

উৎপল রোম্যান্টিক, টনটনে বাঙালিও, কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে যে আর কুলোবে না, কবিদের আন্তর্জাতিক হওয়া ছাড়া উপায়-ই বা কী— ইত্যাদি টের পেয়েছেন ঢের আগেই, স্বদেশী সাহিত্য তথা সাহিত্যে দেশপ্রেম (এখন তা খোলস বদলে হয়েছে 'সমাজ-সচেতন সাহিত্য' তথা সাহিত্যে সমাজসেবা) তাঁর কাছে রগড়ের বস্তু মাত্র,

'এমনিতরো কবিতালেখা
কবিতা লেখা চমৎকার
ও না না কবিতা নয় তেমন আর—
কে আর তেমন লিখতে পারে
সাতাশ খণ্ড রচনাবলী
নিদেন ছেচল্লিশটি স্বদেশী গান।'

স্বদেশী গান আর বৈষ্ণব সাহিত্যকে এক পঙ্‌ক্তিভুক্ত করবে না কোনও আহাম্মকও। আমরা যে 'বোষ্টুম পুঁথি'-টি ভেসে যেতে দেখি, তা কিন্তু নিঃশেষিত হয়নি, হবারও নয়। সাহিত্য তো মৌখিক বীজগণিত নয়, সে বাক্যবিন্যাসে, অন্তর্গত বীজে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম অনন্ত অর্থ-ব্যঞ্জনার সম্ভাবনা, যেমন ভাসমান ওই 'বোষ্টুম পুঁথি' বিচ্ছিন্ন নয় পূর্ব ও পরবর্তী পুঁথি ও গ্রন্থসমূহ থেকে, বরং সেসবের জটিল ও সূক্ষ্ম সম্পর্কের

নিসর্গটিতে এক প্রবেশপথ। এবং ধোপে টিকে যাওয়া সমস্ত গল্পই জড়িয়ে যায় ওই পূর্বাপর সম্পর্কে। লেখকের, পদকর্তার, রচনাকারের কণ্ঠস্বরে মিশে থাকে তার প্রিয় লেখকদের স্বরও, এদের মধ্যে কেউ হয়ত সুদূর অতীতের কেউ-বা বর্তমানের, এমনকি সে যার লেখা কখনও পড়েনি তার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি থেকে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। ভাষা নিজেই ঐতিহ্য বলেও এমনটা ঘটে থাকে।

ভালো ভালো কথা অনেক হল কিন্তু আমাদের সাহিত্য সংসারে কাদা ঘাঁটাঘাটি তো কিছু কম হয় না, কবি ও লেখককে রাজনীতি-সচেতন হতে হবে বলে চারের দশক থেকে শুরু হয় বিস্তর চিৎকার। এখন আমরা তার ফল হাতে হাতে পাচ্ছি মন্ত্রী-আমলা-সেরা মডেলদের সঙ্গে এখন তাদের ওঠাবসা। অফিসার মার্কা, রাজনীতির নেতা মার্কা লেখক জন্মাতে দেখলাম। রাজনীতি স্বদেশীযুগেও তাদের ক্ষমতার কাছাকাছি পেঁৗছে দিয়েছিল আর এখন এটা মহামারীর পর্যায়ে চলে গিয়েছে। সংস্কৃতির রাজনীতিটি যার রপ্ত নয় সে লেখক বাজারি লেখক হিসাবেও সফল হতে পারবেন না।

আমাদের লোচনদাস পারেনি, এইসব হল্লা, ব্রাহ্ম-অ-ব্রাহ্ম পরিবেশে তার দম বন্ধ হয়ে আসে ও সে পালায়। প্রতিভা নামক বুজরুকির সঙ্গে বিভিন্ন শাস্ত্রের টোকা জ্ঞানের মিশেল এবং ব্যাটাচ্ছেলে কবিকে নানাপ্রকার আন্দোলন-টান্দোলনে থেকে, দিকপাল-দের বৈঠকখানায় নিয়মিত কড়া নেড়ে কবিতা রচনার পাসপোর্ট সংগ্রহের যে ব্যবস্থাপনা সেইটি তার কোনওদিনই পছন্দ হয়নি। সাহিত্যের উর্দি গায়ে চাপিয়ে, নিজের একটি মার্কেটেবল ইমেজ তৈরি করে, সারাজীবন ওই ইমেজটিকে রক্ষা ও অনুসরণ করার মধ্যে বিশেষ সারবত্তা দেখতে পায়নি।

'আমি স্বেচ্ছায় এ-সব লেখার দায়, দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে রাজি নই। আমি প্রতিশ্রুত নই লেখার জন্য। আমার লেখা শেষ পর্যন্ত সেই-সব ঠগবাজ পড়বে যারা হেঁসেলে মদের বোতল লুকিয়ে রাখে।··· তাঁরাই ধন্য যাঁরা নিজ সাহিত্যকে নিখুঁত বলে জানেন'।··· এই চিঠির শেষে উৎপল শুধু একটি লাইন জুড়ে দেন :

'আজ যাঁরা নিজেদের কবর নিজেরা খুঁড়ছেন তাঁরা জেনে রাখুন— হাতঘড়িটি সঙ্গে নিতে ভুলবেন না।'

'হাতঘড়ি' যুগপৎ হাত এবং ঘড়ি, সময়-যান, সময়-অঙ্গ, একে আমরা টাইমবোমাই বা ভাবব না কেন। এক বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ যেন, যা স্মরণ করায় : হে ভণ্ড (লেখক/কবি) তুমি কিন্তু দণ্ডিত। সাফল্যলোভী হে কীট, অগৌরবের, ঘৃণার মৃত্যু বহন করছ তুমি। অথচ তুমিও বাঁচতে পারতে, যেমন ওই চিঠিতে, কবিতায় বলা হয়েছে, 'হয়তো আমি মানুষ বলে এ যাত্রা বেঁচে গেলাম এবং আমার চারপাশের আত্মীয়স্বজন, কল কারখানা তারাও যে ক্ষতিগ্রস্ত হল না তার কারণ আমি আসলে স্বপ্নবিস্মৃত-পুরুষ'। এর আগেই তিনি জানিয়ে রেখেছিলেন, 'আমার স্বপ্ন আমাকে ঘৃণা শিখিয়েছে'।

সমস্তই উলটপুরাণ এখানে,
স্বপ্ন = ঘৃণা
সাহিত্য = সহজ ব্যবহারিক মিথ্যে
শ্রোতা = অর্বাচীন মাতাল
ঈশ্বর = উদরাময়
বক্তব্য = চেপে যাওয়া
বিদ্বৎসমাজ = কাপ ও পালং
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

০ : ৭

ভণ্ডামির কথাটা নীতিবাগীশের মতো উৎপল কখনও তোলেননি, ওই যে আমাদের শান্ত, সুভদ্র সাহিত্যের পচা লাশ ঢেকে দেওয়ার জন্য কুন্দশুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদন, তাঁর আপত্তি সেটিতে, তিনি মনে করেন ও হল বহু ব্যবহৃত একটি ন্যাকড়া মাত্র। যেজন্য 'আকাঙ্ক্ষা ছিল মোটামুটি স্বার্থপর', 'পৌরুষ ছিল বাস্তুসাপ', 'সৌভাগ্য ছিল ক্রমান্বয়ী ইন্দ্রিয়-শাসন-ভুল বিদ্যাশেখা' আর জীবন 'ফাঁপা, নিষিক্ত ও সহিষ্ণু' : উৎপল লেখেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় আধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তি খাটিয়ে যে অজস্র গ্রন্থ উৎপাদিত হয় আজও, সেসবে এখনও এক প্রশান্ত চিত্তের, নৈর্ব্যক্তিক মহত্ত্বের জয়গান, সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রেমেরই রকমফের, বা বড়জোর বাস্তব চিত্রণে কলমের এমন ব্যবহার যাতে কল্পনার আকাল যতখানি প্রকট বাস্তবও ততখানি মিথ্যে হয়ে যায়। ভাষা-চাদর ঢেকে দিচ্ছে সব।

'ব্যক্তিগত লিখন ভঙ্গিমা', তার সন্ধান, এমন এক নজর, এমন এক দৃষ্টিকোণ, যাতে সুদীর্ঘকাল নিনাদিত 'মহাজীবন' হয়ে ওঠে 'ফাঁপা, নিষিক্ত, সহিষ্ণু', নদীর খাঁড়িতে তামা বা অভ্রের কোনও প্রতিশ্রুতি নেই, তবু সেখানে নেমে 'দুজন মানুষ তামা ও অভ্র খুঁজছে।'

এ এক আদি চিত্রকল্প, যা সাহিত্যের সূচনায় থাকে, থাকে অন্তিমেও। অভ্র বা তামা তুচ্ছ, ধুলোমাটিরও কম। কিন্তু যে হাত আঁজলা হয়, আঙুলের কুশলী ব্যবহার রপ্ত করে, সন্ধানকার্যের বহু রীতিপদ্ধতি আবিষ্কারে যত্নবান, সেই হাত, চোখ, শরীর-মন তো কারিগরের, যার কোনও ছুটি নেই। অভ্র ও তামা আছে মস্তিষ্কে, কল্পনায়, বাস্তবের নোংরা জল কাদা ঘাঁটা তো শুধু তারই জন্য। সেজন্যই তো এতখানি সহিষ্ণু ও নিষিক্ত আমরা। স্বপ্নতাড়িত, উন্মাদ।

০ : ৮

অথচ বিস্ময়ের অপমৃত্যু, আদর্শের বীভৎস কঙ্কাল এইসবও তো আমরা দেখেছি। কিন্তু কই, আত্মহননের কথা তো ভাবি না! 'উকুন বাস্তব,' চোর না 'চোরাইনাগর' কিংবা

চোর ও নাগর নালপিঁপড়ে কালো পিঁপড়ে হয়ে যায়, 'জঙ্গলে উড়ছে বোতল'— ভাবি এইসব, যা হয়ত মাস্টারমশাইরা মানবেন না খাঁটি বাংলা কবিতা বলে, যে মাস্টারমশাই-দেরই একাংশের ইয়োরোপের দেখা 'কমিউনিজমের ভূত'কে পিঁড়ি পেতে বসতে দিতে আপত্তি নেই, যাঁরা শিল্পের সর্বজনীনতা আর বাজারের শিল্পভোগের মধ্যে কোনও তফাত করেন না। কেন না এই কাব্য ভাষায় র‍্যাবো, অ্যাপোলিনেইর, এলুয়ার থেকে আঁদ্রে ব্রেতোঁ পর্যন্ত সবাই উঁকিঝুঁকি মেরেছেন।

আত্মহননের কথা ভাবিনি, মাঝরাতে মধ্যযুগীয় শিল্পীর নকলের-নকল করে কলকাতায় কিছু দুর্দান্ত আচরণে, কবির মিথ গড়ে তোলায় তো মেতে উঠিনি এজন্য যে কলকাতায়, এই বাংলায় মধ্যবিত্তের পক্ষে বিলাস-বিহ্বল হওয়া মানায় না। কবিদের এমত আত্মক্রীড়া আদতে আত্মহননই। তাকে যদি কেউ 'লুম্পেন' শব্দে চিহ্নিত করে, আপত্তি করা কঠিন, যদিও আমাদের কোনও জাঁ জেনে নেই— আবার এটা এভাবে বলা ঠিক না, স্কটের সঙ্গে বঙ্কিম সাদৃশ্য এবং এই লাইন ধরে যেমন-যেমন বলা হয়, আমরা সেরকমভাবে দেখতে রাজি নই, ওটা ভুল।

ষোলো আনা লুম্পেন হওয়ার যোগ্যতা আমাদের ছিল না, আমরা চেয়েছিলাম গল্প বানাতে, রটনা ও গুজবের জন্ম দিতে যাতে মাথার পিছনে একটি জ্যোতির্বলয়ের উদ্ভব হয়। তাই ওই সাজালম্পট, কপটলুম্পেন হলাম এবং পরে রাতারাতি দিব্য ভদ্রলোকও হলাম, সিংহচর্ম খসে পড়ল, আমারও আত্মোপলব্ধি হল : আমি তো সেই মেষ।

শুধু পাওয়া গেল না লুম্পেনের প্রকৃত দৃষ্টিকোণ, যেজন্য অশালীন, অভদ্র, শিষ্টাচার-ভাঙা, ভাষা ও তার আক্রমণের সুযোগ অবধি বিনষ্ট হল, জিতে গেল সব্জিপ্রাণ কাব্য।

০ : ৯

'আর সব ভালো— যেমন, বাজার করা ভালো, চিঠির উত্তর দেয়া ভালো,
মা-বাপের আন্তরিকতা ভালো গোল হয়ে খাবার টেবিলে বসে— উড়ো-
জাহাজের তো ক্রমশঃ উন্নতি হচ্ছে—নতুন বিস্ময়কর ধাতুদ্রব্য খুঁড়ে তোলা
হচ্ছে না যদিও, তবু এটা-ওটা মিশিয়ে এমন কিছু কম রহস্য চলছে না—
...
কাঠবিড়ালীও আপন উরুর ফাঁকে চুমু খাচ্ছে যে কোনো সপ্তাহে আমাদের
আত্ম উপলব্ধি হতে পারে'...

০ : ১০

আমরা, শেষে, স্মরণ করি হাবা যুবকটিকে, একথা না ভুলে যে শেষ ও শুরু বলে কিছু নেই, শেষের শেষ ও শুরুর শুরু তাহলে যায় কোথায়!

বসন্ত হাবাযুবক তার হাসি

'এনেছি' ক্রিয়াপদটি অবান্তর, কেননা সে তো ছিলই, না হলে আনলে কী করে? আর তাই ছবি হল মূলত দুটি :

বসন্ত (প্রকৃতি) হাবা যুবকের হাসি (নিশ্চেতনা)

এই নিশ্চেতনায় 'অনুধাবনের মতো কালো দুর্গ' রয়ে গেছে আজও। □

'আর কী দ্যাখো তুমি'

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

[১৯৮৮-র ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে বর্তমান লেখক দু'টি বক্তৃতা দেন। বিষয় : 'আধুনিক বাংলা কবিতার চিত্রকল্প : পঞ্চাশ দশকের তিন বিতর্কিত কবি।' তাঁর প্রথম দিনের বক্তৃতাটি প্রধানত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা-সম্পর্কিত। এবং দ্বিতীয়টির প্রসঙ্গ উৎপলকুমার বসুর কবিতা। এখানে দ্বিতীয়টিই পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশিত হল। কথ্য থেকে লিখিত ভাষায় রূপান্তরের জন্য এবং মুদ্রণ পারিপাট্যের স্বার্থে সামান্য পরিমার্জনা করা হয়েছে। এই ভাষণে উল্লিখিত কবিতাংশের জন্য 'উৎপলকুমার বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা' (প্রকাশক : প্রতিভাস) এবং গদ্যাংশের জন্য 'ধূসর আতাগাছ' (প্রকাশক : কৌরব) দ্রষ্টব্য। —সম্পাদক]

□ ১ □

'আর কী দ্যাখো তুমি— নিজেকে আমি প্রশ্ন করি, দেখি পাখির ধড়, তারপর মাথা, তারপর চোখ, দেখি এই সাহিত্য জন্মে উঠেছে বাস্তব থেকে এবং এখন নেড়ে-চেড়ে দেখছে জাতকের রক্তমাখা কাপড়-তুলো-ব্যান্ডেজ, এবং এ-ও সত্য যে, যে-হাসপাতালে

সে জন্মেছিল সেখানেই— তাকে ফিরে যেতে হবে মরণোন্মুখ মানুষ হিসেবে, না এটি সত্য নয়, রিয়ালিটি, তাই অধিকতর আকর্ষণীয়, যখন আমি পাখিটার চোখ দেখি তখন, কেবলমাত্র তখনই, তার রিয়ালিটিকে দেখি, এবং রিয়ালিটি কী এ-প্রশ্নের জবাবে আমি ৺জগদীশ রায়কে স্মরণ করি, যিনি ছিলেন আমার স্কুলের বন্ধু দীননাথ ওরফে দীনে-র বাবা, দীনে ছিলো বুদ্ধিতে খাটো যেমন ছিলেন তার বাবা জগদীশবাবু চেহারায় খাটো, আমি ওদের বাড়িতে প্রায়ই যেতুম, দেখতাম বেশ হৈ চৈ খাওয়াদাওয়া চলছে, দীনের মাসি-পিসি-মাসির ননদাই-পিসির ভাসুরে বেশ জমজমাট সংসার, কেবল মা সগ্গে গেছেন, দীননাথের লিমিটেড আবেগ এর বেশি আর কিছু বলতে পারত না, আর ওর বাবা আসতেন সমস্ত হৈ চৈ মিটে যাবার পর, বারান্দার এককোণে, প্রায় অচ্ছুতের মতো প্রায়ান্ধকারে আসন ও জলের গেলাস নিয়ে বসতেন কেননা উনি ছিলেন ঘোড়ার সইস, রেসের মাঠে ঘোড়া দৌড়ুতেন, তাই বাড়ির টাটা-আই. সি. আই-চাটার্ড ব্যাঙ্ক-পোর্ট কমিশন-মহিলারা ওঁকে একটু আড়ালে আবডালে রাখতেন, সেই জগদীশবাবু আমাদের শোনাতে ভালোবাসতেন তাঁর বিশ্বজয়ের কাহিনী, যখন আমরা একা থাকতুম, আমাদের একা পেলেই তিনি তাজ হোটেলের সায়েব-বেয়ারাকে কি ভাবে আঙুলের তুড়ি দিয়ে ডেকেছিলেন বা খিলনমার্গের পথে বরফে-আটকে-পড়া এক অশ্বারোহিণীকে তিনি কি ভাবে উদ্ধার করেছিলেন-জাতীয় কাহিনী শোনাতেন— আর শোনাতেন অত্যাশ্চর্য খাওয়ার গল্প, সৌদে নাকি তার সম্মানে যে নৈশভোজের আয়োজন হয়েছিল সেখানে ছিল রোস্ট উট, তার পেটের ভিতর রোস্ট গাধা, তার পেটের ভিতর ভেড়া, তার পেটের ভিতর তিতির পাখি এবং গল্প শেষে আমাদের হাতে কিছু খুচরো গুঁজে দিয়ে বলতেন দৌড়ে পবারিকে চলে যা, লুচি আর ছোলার ডাল নিয়ে আয়, সেই জগদীশবাবুর ছেলে, আমার প্রাণের বন্ধু দীননাথ একদিন ফুটপাথের রেলিঙে কুঁজো হয়ে বসে, পা দোলাতে দোলাতে বল্লে কিনা তার বাবার গল্পগুলো নাকি ফ্যান্টাসি, যদি তা না হ'ত— আমি প্রশ্ন করি, তাতে দীননাথ বিন্দুমাত্রও ঘাবড়ে না গিয়ে উত্তর দেয় তাহলে ওগুলো হ'ত রিয়ালিটি।

হাঁ, সেই প্রথম আমি রিয়ালিটি শব্দটির সংস্পর্শে আসি, নেগেটিভ সূত্রে, এবং তারপর থেকে সে আমার পিছু ছাড়েনি।...'

('ধূসর আতাগাছ')।

না, এই দীর্ঘ, আপাত্তিকররূপে দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি কোনো গল্পচ্ছলে তৈরি-করা হয়নি। যা-হয়েছে তা কেবল আমাদের সমবয়সী এক বিশিষ্ট কবিবন্ধুর প্রার্থিত শিল্পতত্ত্ব। ঐ রচনা থেকে আমরা জানতে পারছি এক আমেরিকান লেখিকা তাঁর ১৯২৬ সালের কেম্ব্রিজ সাহিত্যবক্তৃতায় বলেন কম্পোজিশনের কথা। সমগ্রকে দেখতে, এই কম্পোজিশনই তার 'একমাত্র স্বীকারযোগ্য এক্সপ্লানেশন'। অতএব এই প্রস্তাবিত তত্ত্বের উপস্থাপনায়, অগত্যা, কবি উৎপলকুমার বসু এক সইস জগদীশ রায়কে দাঁড়

করান। তাঁর সামাজিক অস্তিত্বের অনিবার্য নিঃসঙ্গতা নিঙরে-নিঙরে দেখান। তাঁর গল্প বলার ধরন ও বিষয়ের ফ্যান্টাসি থেকে রিয়ালিটির দিকে— পাখির খড় নয়, তার চোখটিকেই দেখতে পেয়েছেন যেন, এইভাবে, বহু-কৌণিক দেখার ফ্র্যাগ্‌মেন্টেশন বা খণ্ডতায়, অবশেষে উৎপল সমগ্রের কম্পোজিশন যা হোক টের পেয়ে যান। তাহলে, সইস জগদীশের অভিজ্ঞতার গল্প— গল্প নয় ফ্যান্টাসি। আবার ফ্যান্টাসি যদি না হয়, তবে তা-ই রিয়ালিটি। যেহেতু স্বয়ং জগদীশও একটি কম্পোজিশন। এইরকম, মৌলালীর মোড়ে, মনপসন্দ্‌ অন্য এক হেকিমি-ইউনানি পাশ স্বপ্নাদ্য ওষুধবিক্রেতা, যখন স্বপ্নরহস্য ও জীবনে তার প্রয়োগ বিষয়ে বলে, বলছে মনের অসুখের কথা, মন ও শরীরের দার্শনিক সম্পর্ক, ঠিক তখনই— তার থলি থেকে বেরোয় সেই 'বাস্তবরূপী একটা খড়পোরা শেয়ালের চামড়া'। নেতি নেতি ক'রে যা নিশ্চিতই এমন এক বাস্তবে এসে পেঁছয়, যেখানে সে-খোড়ো খ্যাঁকশেয়ালটি সত্য না হলেও বাস্তব। উপপাদ্য (খ্যাঁকশেয়াল) আর সম্পাদ্যে (স্বপ্নাদ্য ওষুধ) আপাতত যোগাযোগরহিত সে-অসম্ভবে— বাস্তবতার সামগ্রিক কম্পোজিশন ও তার সমস্ত অনুপুঙ্খ উপাদানসমেত, যোজনা করে পরস্পর 'আলোছায়াময় সম্পর্ক'। এমন সম্পর্কের দিকেই আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট ক'রে একবার উৎপলকুমার বসু লেখেন : 'এই সম্পর্ক বা রিলেশনসিপ সম্বন্ধে অবহিত ও সচেতন না থাকলে লেখালেখির চেষ্টা করা বাতুলতামাত্র।' এখন, 'সম্পর্ক' বলতে যে তথাকথিত আমাদের 'নিয়মানুবর্তী' সম্পর্কের কথাই ভাবতে হয়, যেহেতু এখনও— উৎপলের কথায়, আমরা সেই 'আত্মপ্রত্যয়ী মুহূর্তে' এসে পড়তে ইতস্তত করছি। অথচ কম্পোজিশন ও তার ভিতরের তাবৎ খণ্ডীকরণের মূল, এই সম্পর্ক। যা আপাত-নিঃসম্পর্কীয় বলে মনে হলেও, একের পর এক— ঝড়ের রাতে কুড়িয়ে পাওয়া নানারঙের 'এলোমেলো পাথর' রঙ মিলিয়ে আলাদা আলাদা বাক্সে না রেখে, উৎপলের দেখা একটি ছোট মেয়ে যেমন চেয়েছিল তা একত্রেই তুলে রাখতে। নিশ্চয় তাদের একত্রীকরণই শুধু 'সম্পর্ক' নয়। বরং তার ক্রমাগত অন্বয়ে ও অনন্বয়ে যে টেনশন অনিবার্য, এ স্থলে, অনিয়মিত বলে ভুল করলেও তা-ই প্রকৃত সম্পর্ক। ব্যবহারিক জীবন ও শিল্পীত জীবনময়তা যে-অর্থে একই সঙ্গে অন্বয় ও অনন্বয়েরই টেনশনজাত বহুমাত্রিক বিচ্ছেদ-রেখা। যা বহুর ভিতর দিয়েও একটি মিলনবিন্দু খুঁজে বের করতে চাইবে। চাইবে, কারণ ছোট ও পরিচিত সম্পর্কগুলি ভেঙে দিতে দিতেই আসে বড় ও অনিয়মিত সম্পর্ক গড়ে তোলার তাগিদ। অতএব, সে-কাজও শুরু হয়ে গেছে কবেই।

'অফিসের চারদিকে এক একদিন প্রবল কুয়াশা নামে। জানালার পাশেই আমার টেবিল। আমার ফাইলের তাকটা সেবার কুয়াশার ভিতর ভেঙে পড়ল। কারো দোষ নেই। আমি বড়বাবুকে গিয়ে বললুম ওটা তো ভাঙবেই, কেরোসিন কাঠের তক্তা। উনি হাসতে হাসতে বললেন : কেরোসিন কাঠ আবার কি, বলুন পাইন কাঠ। কুয়াশা এবং ঐ ভেঙেপড়া পাইন গাছ দেখে বাহাদুর তার গ্রামের গল্প

সুরু করে : সেবারে পাহাড়ে কোনো ফসল নেই খুব ঠান্ডা পড়ল দেওয়ালির রাতে…'
(ধূসর আতাগাছ)

কবি উৎপলকুমার বসু প্রদত্ত সম্পর্কের এই শেষ উদাহরণে, হঠাৎ কুয়াশা ও অফিস-টেবিলের কেমন একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা-সবসময়ই আমাদের অচেনা, সুতরাং অনিয়মিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও, নঞর্থক সে-বিচ্ছেদরেখা ধরেই কুয়াশার ভিতর অফিসের ফাইল-রাখবার তাকটি ভেঙে পড়ে ; যেহেতু তা কেরোসিন কাঠের তক্তা, কেরোসিন কাঠ নয় পাইন কাঠ— পাইন, কুয়াশাময় আস্ত একটি পাইন গাছই তবে সম্পূর্ণ করে দেখায় সে-ভেঙে পড়ার কম্পোজিশন! আর এইখান থেকেই আমাদের তাবৎ গল্প বলার আরম্ভ। গল্প ? না ফ্যান্টাসি ? 'যদি তা না হতো—' নিশ্চয় গল্প ভেঙে দিয়ে আমরাও এই প্রশ্ন করি। আর উত্তরটিও পেয়ে যাই মনে মনে, 'তাহলে ওগুলো হতো রিয়ালিটি।'

উৎপলকুমার বসুর 'ধূসর আতাগাছ' নামক রচনাটির উল্লেখ করে এই যে আমি আমার বক্তব্যের উপস্থাপনা করতে চাইছি, তাতে আপাতত এই-একটা অসুবিধে হওয়ার কথা, তা হল, উক্ত রচনাটি যেহেতু অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত ও কম প্রচারিত লিটল্ ম্যাগাজিনে প্রকাশ পেয়েছিল, তাই সে-রচনা বিষয়ে আপনারা হয়তো অনেকেই অনবহিত। অথচ সে-লেখাটি এমন যে তার প্রত্যেকটি পঙক্তি বা পদের সঙ্গে পাঠকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে না থাকলে, এ-সময়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি তাঁর কাব্যরচনা বিষয়ে যে-শিল্পতত্ত্বের আলোচনায় আসছেন তা ঠিকমতো জানা যাবে না। উপস্থিত বক্তৃতায় এই ত্রুটি আমি সবিনয়েই স্বীকার করছি। স্বীকার করছি কিন্তু প্রসঙ্গটি উল্লেখ ব্যাপারে ক্ষান্ত হচ্ছি না, কারণ, কবি যখন নিজের লেখালেখির সূত্রে এই জাতীয় শিল্পতত্ত্বের উত্থাপন করেন, তখন কবির রচনাধারারই শুধু নয়— তাঁর সমকালীন কাব্যাদর্শেরও একটা পরিচয় তাতে পরিস্ফুট হওয়ার কথা। কখনো, কবিদের চিঠিপত্র যে অর্থে তাঁদের রচনাপ্রকৃতির গোপন তথ্যসূত্র, এস্থলে, 'ধূসর আতাগাছ'-নামধেয় রচনাটি, ততটাই প্রবন্ধ-নিবন্ধ-গোত্রীয় নয় নিশ্চয়। তবু যে-ধরনের লেখা লিখে ফরাসি প্রতীকবাদীদের পথিকৃৎ বোদলেয়ারকেও খুলে দেখাতে হয়েছিল প্যারিসের প্লীহা, আর অন্ধকারকে মনে হয়েছিল আলোর বেশি, এক বাঙালি কবির ধূসর আতাগাছও তেমনি ধূসরতর হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যেতে যেতে তার লৌকিক তোতাপাখিটির জ্বলজ্বলে চোখটুকুই স্মৃতিচ্ছন্ন করে। যা-দিয়ে, সমগ্রের বস্তুনিরীক্ষায় পাখির ধড় নয়, তার চোখ-দেখার কেন্দ্রবিন্দুটিই যা-হোক আমরা শেষ অব্দি চিনে নিতে পারি। বস্তু বা ব্যক্তি উপাদানের বিন্যাসগত খণ্ডীকরণের ও তার কেন্দ্রবিন্দু নির্ণয়েই যে-সমগ্রের বাস্তবতা পায় প্রতীকোৎসারিতা, অন্তত এটুকুর জন্যও চাই তো একটি ধূসর আতাগাছ, যার ডালে বসে অনেকদিনের তোতাপাখিটি।

□ ২ □

এবারে আরো-একটু ভেঙে বলি।

বাংলা কবিতার— যে-সময়টিকে আমি বলছি সেটা ১৯৫০-এর সময়কার একটা বিশেষ অবস্থা। আজ তার আটত্রিশ বছর পরে, পেছনে তাকিয়ে, সমস্তটাই দেখতে পাচ্ছি। দেখছি সেইসব কবিদেরই, যাঁরা, তাঁদের বয়ঃসীমায়— সকলেই এখন পঞ্চাশোর্ধ্বে। এঁদেরই প্রতিনিধি স্থানীয় কবি হিসেবে আমি বলেছি আপাতত তিন-জনের নাম— যাঁদের একজন অবশ্যই উৎপলকুমার বসু। এবং অন্য দুজন— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়। স্বীকার করাই ভালো, শেষোক্ত দুজন যতটা তাঁদের শক্তিমত্তায় ও প্রচারকৌশলে আজ পরিচিত কবি, প্রথমোক্তকে ততটাই অপরিচিত বলতে হয়, অন্তত, সাধারণ পাঠকসমাজের কাছে।

কিন্তু সে যাই হোক, আমার বক্তব্য : এই নির্বাচন এঁদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য নয়। আর সে-রকম ঝুঁকি আমরা নেবই বা কেন। বরং যদি বলি— একটাই অখণ্ড প্রবাহের ভিতর থেকে লক্ষ্যগোচর এই তিনটি বিতর্কিত ঝোঁক, বাংলা কবিতা ও কবিদের অতি-সাম্প্রতিকেও কমবেশি স্পর্শকাতরতার বিষয় হয়ে উঠেছে। সেইটেই আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আর এই উপলক্ষে, প্রভাব-প্রতিপত্তির কথাও তুলছি না। শুধু দেখতে চাইছি, এই তিন ধরনের ঝোঁকের প্রতি ইদানীংকার কবিদের গ্রহণ-বর্জনের প্রবণতায় সেই ত্রয়ীয় গোপন ভূমিকা। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন তিন তারার বদলে পাঁচ কি সাত নক্ষত্রের দিকেই যাচ্ছি না এখনো। সপ্রতিভ ও ভাস্কর সে-নক্ষত্রগুলির থেকে, কেনই বা বেছে নেব না অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শঙ্খ ঘোষের নাম, এবং আলোক সরকার ও প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর মতো কবিকে ? এবং বিনয় মজুমদারকে ? হয়তো এই কারণে যে এঁরা সকলেই নিজের নিজের পরিধিতে শীর্ষস্থানীয় হলেও আলাদা করে কোনো নতুন বিতর্কের ঝোঁক সৃষ্টি করেন না পরবর্তী কবিদের মধ্যে। যা করেছেন, তা ঐ পূর্বোক্ত প্রধান তিনটি ঝোঁকেরই স্বপক্ষীয় পুষ্টিসাধন। সেখানে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য তর্কাতীত এবং অবদান নিঃসংশয়েই শ্রদ্ধেয়। আমি হয়তো অন্যত্র, স্বতন্ত্রভাবে, ভিন্নতর প্রসঙ্গে, এঁদের প্রত্যেকের কবিকৃতি সম্পর্কে বলব। পঞ্চাশের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি হিসেবে এঁরা কেউই কারুর চাইতে কম নন। স্বকীয়তা এঁদের রচনাপ্রকৃতিকে, একজনের থেকে অন্যজনকে অবশ্যই কোনো-না-কোনো ভাবে বিশিষ্ট করে। যেমন, অলোকরঞ্জনের কল্পনা-প্রতিভার বহুমুখিনতা ও শব্দব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও দেখি তাঁর আবিশ্ব মানুষ এখনো দূরান্বয়ী ; অন্যদিকে শঙ্খ ঘোষের সামাজিক সুসমাচারের প্রত্যাশায় আত্মগত মিতকথন যে-ভাষায়, ছন্দে আপাত-নিরলংকৃত নিঃশব্দের সর্বদিকেই খুঁজে ফেরে এক-একটি কথামুখ— তা এখনো, সহজেরই রসে সঞ্জীবিত বলে গ্রাহ্য। গ্রাহ্য— কিন্তু বিতর্কিত নয়। আবার, আলোক সরকারের শুদ্ধ কবিতার ধারাবাহিক স্বরবৃত্তও তেমনি প্রতীকনির্ভর। যে-প্রতীক অনুষঙ্গের বিচিত্রতায় না-গিয়ে কেবলই ফিরে আসে তাঁর আত্মমগ্নতায়। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত কবিতাকে সচেতন-ভাবে ভারমুক্ত করার জন্যই তৈরি থাকেন আজও। আজও কবির ব্যাপক দায়বদ্ধতাকে তিনি একমুখী নিচুস্বরের আত্মস্থতায় নিয়ে আসতে চান এবং বিনয় মজুমদারের আযৌন

শব্দবিবাহে যে সরল ও অকপট উচ্চারণধারা আজও পয়ারপ্রতিম, তা-ও, এক-একটা স্বকৃত উত্তর মেলানো অঙ্কেরই অনুবর্তী, তর্কের স্বতন্ত্র ঝোঁক সেখানেও অনুপস্থিত। অবশ্য এঁদের নিজের নিজের সফলতার ও শক্তিমত্তার পরিমাপে বাংলা কবিতা এ-পর্যন্ত সমৃদ্ধই হয়েছে, সন্দেহ নেই। কম হোক বেশি হোক, এঁরা সকলেই সমাদৃত কবি। এঁদের নিয়ে সুধী পাঠকসমাজে, বা কবিমণ্ডলীতে, এখনো অব্দি কোনো বড় ধরনের বিতর্ক গড়ে ওঠেনি। সেটা কবি-বিশেষের পক্ষে সুলক্ষণ না দুর্লক্ষণ, এমনকি তাতে করে এইসব কবিদের খ্যাতি-প্রতিপত্তির কিছুটা খর্ব হয়ে যাচ্ছে কিনা— তেমন বিচার-বিবেচনায় না গিয়ে— ফের সেই তিনজন বিতর্কিত কবি-বিষয়েই মনোনিবেশ রাখি। যেহেতু, বিতর্কিত এই ত্রয়ীই আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান-বুদ্ধিমতে এখনো trend-setter হয়ে আছেন আজকের বাংলা কবিতায়।

অতএব, এই আলোচনার গোড়াতেই যে উৎপলকুমার বসুর শিল্পতত্ত্ব-সম্পর্কিত বক্তব্যের অনুসরণ করেছি— আপাতত তারই রেশ ধরে ফের শুরু করি। এই আরম্ভ উপস্থিত বক্তৃতার একরকম উপসংহারও বটে।

□ ৩ □

রিয়ালিটি আর তার দ্বান্দ্বিক সমাজসম্পর্ক বা রিলেশনশিপের সূত্রেই তবে ইমেজিস্ট্-দের ব্যবহৃত আতসকাচে শ্লেষবিদ্ধ আর তির্যক প্রতিফলিত হয়ে ওঠে আজ কালবেলা — যা পুরোপুরিই বিশ শতকীয় এক বিরাট কম্পোজিশন। তাহলে পাখির ধড়টাই দেখব, না শুধু চোখ— সেই তর্কে, আপাতত সুস্থির ও অতিক্রান্ত আমরা, জানি, জেনেছি, তার—আদি প্রেরণাসূত্রের উৎসস্বরূপ সে উনিশ শতকীয় ফরাসি সিম্বলিজম। স্বচ্ছ জলের উপর প্রতিচ্ছায়ায়, পাখির নয়, মাছের চোখ লক্ষ করে তীর-ছোঁড়ার সেই মহাভারতীয় কৌশল— কত কাল পরে, আরেকবার, আমাদের মনে পড়ে। পর্যবেক্ষণ-শক্তির এই আর্কেটাইপ, অতঃপর, কত ঘাট পেরিয়ে, বস্তু ও বস্তুসত্তার বিভেদজনিত চূড়ান্ত সোরগোলের মুহূর্তেই, হয়ে ওঠে আরো আধুনিক শিল্পতত্ত্ব। আর সেই হাতেনাতে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়ার আধুনিক শিক্ষাটা আসে কিনা অগত্যা ফরাসি সিম্বলিস্ট্দেরই কাছ থেকে। সুতরাং ফরাসি সিম্বলিস্ট্ আর ইঙ্গ-মার্কিনী ইমেজিস্ট্দের উনিশ-বিশ— সেই সার্থক উত্তরাধিকার— আমাদের তিরিশের বাংলা কবিতায়। এবং একচুলও স্থানান্তরিত না হয়ে, পাঁচের দশকের প্রধান কবিসমাজও, বহিরাশ্রয়িতার সে অনূদিত মূলধনে বিনিয়োগ করেন তাঁদের অধ্যবসায়। এমনকি পূর্বসূরীদের নিরন্তর রবীন্দ্রমনস্কতাই যে দেশীয় ঐতিহ্যের সংলগ্নতা— সেই ঐতিহ্যেরও সাময়িক-পরিবর্জন এবং ক্রমে তার পরিগ্রহণও তাঁদের অবচেতনের অনুধ্যেয় বিষয় হয়ে ওঠে।

দেখার ধরনটা পাল্টে দেওয়াই তো সেই স্থিরতর বিন্দুর সমীপবর্তী হওয়ার প্রথম শর্ত। আক্ষরিক বর্ণনার বদলে, বস্তুকে নির্বস্তুক বিমূর্ততার উদ্ভাসে নিয়ে

আসা— এই তো চেয়েছিলেন প্রতীকবাদীরা। তথাকথিত ইমেজিস্ট্ বা চিত্রকল্পবাদীরাও তাই চাইলেন। সব প্রতীকই একেক ধরনের চিত্রকল্প। যদিও যে-কোনো চিত্রকল্পই প্রতীক নয়। অবশ্য বস্তুত্ব প্রতিপাদনের জন্য, এলিয়ট বলেছেন, আমাদের স্মৃতিচ্ছন্ন বিশেষ-বিশেষ বস্তুর মূল্যবোধই তার প্রতীকিতার সারাৎসার। ফলত, আরো অব্যক্ত অনুভূতিস্তরে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেই 'অব্যক্ত অনুভূতিটি'ই বিশেষ অনুভূতি : যার 'objective correlative' বা 'উদ্দীপন বিভাব'টি হল এলিয়টের কথায়, 'a set of objects, a situation, a chain of events'। যেমন, উৎপলের আলোচনায় কম্পোজিশন ও তার রিলেশনশিপের উদাহরণে (দ্র. পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি), আপিশের চারপাশে হঠাৎ কুয়াশা নামে, কুয়াশার ভিতর ভেঙে পড়ে ফাইলের তাক। সম্ভবত কেরোসিন কাঠের তক্তা। কেরোসিন কাঠ কি—আসলে পাইন কাঠ। এইভাবে কুয়াশার সঙ্গে পাইন মিশে আস্ত একটি পাইন গাছই তার পাহাড়সুদ্ধ প্রতীয়মান হয়ে ওঠে সেই আপিশের বাহাদুরের মনে। বাস্তবতায় এই সম্পর্কযোজনার সূত্র তবে ইমেজিস্ট্দেরই ধরন, আরো ব্যাপক অর্থে বললে— প্রতীকবাদী পন্থারই সমগোত্রীয় নিশ্চয়। উৎপল এখানে যার স্কেচটুকুই আমাদের দেখিয়ে দেন।

□ ৪ □

এরপর তাঁর একটি কবিতাই আমাদের বিচার্য বিষয় হবে। আমরা সেখানে দেখব এক রূপান্তরিত বাস্তব ও তার মাত্রান্তরের পর্যায়গুলি। কবিতাটির নাম 'ময়ূর'। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চৈত্রে রচিত কবিতা' (১৯৬১) থেকে এটি সংগৃহীত হচ্ছে হয়তো এই প্রমাণের জন্য যে, কবির নিজের লেখালেখির তত্ত্বভাবনা কোনো তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নয়। তার মূল, খুব কম করে হলেও বছর কুড়ির ভাবনাতাড়িত। সুতরাং, সমুদ্রবিষয়ক একটি কবিতার নাম কেন ময়ূর— আপাতত সেই প্রশ্নেরই অন্তর্গত রহস্যে, আমরা প্রথমেই তার ইমেজ বা চিত্রকল্প বা বাক্প্রতিমার প্রকৃতিটি অনুধাবন করতে চাই। কবিতাটি এই :

ময়ূর

ময়ূর, বুঝি বা কোনো সূর্যাস্তে জন্মেছ।
এবং মেঘের তলে উল্লাসে নতুন ডানাটিকে মেলে ধরে
যখন প্রথম খেলা শুরু হবে— সেই স্থির পরকালে
আমি প্রথম তোমার দেখা পেয়েছি ময়ূর ।

সমুদ্রসৈকত ধরে এত দূর, এত গাঢ় স্তব্ধতার কাছে এসে
তোমার প্রবল দৌড় দেখা গেল, যেন
আরো শব্দহীনতার প্রতি— অন্ধকার ঝাউবনে— অস্তিত্ব জটিল

আমাদের আর্তরবে ডেকেছ সহসা।

সেদিন বনের শেষে নির্বসন যৌবনের চোখে
বিদ্যুৎ চমক বলে মনে হলো তোমার প্রতিভা
মনে হল নবীন নবীনতমা সৃষ্টির ক্ষমতাও বুঝি
এইভাবে ক্রমাগত অন্তহীনতার বুকে মিশে যায়।

ফিরে দাও সাগরে আবার। ফিরে দাও উন্মাদ তুফানে
'অস্তিত্ব'কে ফিরে দাও। বিপুল পৃথিবীময় পাথরের বুকে
আমি তার ভেঙে পড়া দেখেছি গর্জনে। দেখেছি আছাড়
ডুবন্ত জাহাজ থেকে ভেঙে নেয় পাটাতন, জয়ের মাস্তুল।

তবুও ঝড়ের শেষে, তবুও দিনের শেষে, অন্ধকার বনে
বৃষ্টির মেঘের তলে শোনা গেল আর্ত কেকারব
বুঝি নির্জনতা পেয়ে পুনর্বার মেলেছ বিশাল
নক্ষত্রে সাজানো ডানা। পেয়েছ নির্দেশ?

('চৈত্রে রচিত কবিতা')

সমুদ্রতীরে সূর্যাস্ত— এই প্রচলিত কবিত্বলোভন বিষয়টিকে প্রথমেই ভেঙে দিলেন উৎপলকুমার বসু। 'অস্তিত্ব জটিল আমাদের আর্তরবে ডেকেছে সহসা'— সমুদ্রের পরিবর্তে, একটি পেখমছড়ানো ময়ূরের ডাক— যেন মানুষের অন্তরাত্মাই ডেকে উঠেছে সহসা। অরণ্যচর ময়ূর ও সাময়িক সমুদ্রবাসী, তথা চিরবিরহী মানুষের এই একাত্মীকরণই আপাতত এ-রচনার মোটিফ চিত্রকল্প। যে বিরাট কম্পোজিশন তিনি মনস্থ করেন, হয়তো তারই প্রতি নিবিড় ঔৎসুক্যে— কবি যেন সেই সমগ্রের প্রত্যেকটি এলিমেন্টের ভিতর থেকেই বের করে আনেন এক 'আলোছায়াময় সম্পর্ক'। তাই সূর্যাস্ত। নরম আলোছায়াময়তারই যেন জাতক সে, জন্মমাত্রেই বিশাল ডানাদুটি মেলে সেই 'স্থির পরকালে' তার 'প্রথম খেলা সুরু হবে' বলে— দিনশেষের এই এক দৃশ্যজাত উদ্দীপনার সূত্রপাত ঘটায়। কবির কাছে নীল আকাশ ও সমুদ্রের রঙ স্পষ্ট ও একীকৃত যেন। তাকেই ফিকেনীল আর আবছা করে তোলার জন্য তিনি ব্যবহার করেন সম্ভবত গাঢ় মেঘরঙের আড়াল। এইভাবে ময়ূর দেখা দেয়। খুবই সাধারণ চিত্রকল্প। কিন্তু প্রয়োগ বিশেষত্বে— তা আর ইহকালের সমুদ্রআকাশ নয়, যথার্থই ময়ূর হয়ে গেছে বুঝি। এই যে ইম্প্রেশনিস্টিক্ দৃশ্যকল্প ইমেজ, যা অনায়াসেই এক প্রতীকী চিত্রকল্প হয়ে ওঠে— সমুদ্রতীরে তারই 'প্রবল দৌড়' প্রবলতর তরঙ্গোচ্ছ্বাস —'আমাদের আর্তরবে' প্রতিধ্বনিত। কবিতাটির শেষ তিনটি স্তবক, রচনাটির যেন দ্বিতীয় ভাগ। যে-ময়ূর এ-মুহূর্তে সৃষ্টিশীলতার প্রতীক : 'নবীনতমা সৃষ্টির ক্ষমতাও বুঝি'— তাকে অনন্তে বিলীয়মান বলেও যদি ভাবি, তবে অস্তায়মান 'দিনের শেষে,

অন্ধকার বনে / বৃষ্টির মেঘের তলে' তার 'প্রতিভা'র বিদ্যুচ্চমকও এক নির্দেশের অপেক্ষায়। সে কোন্ 'নির্দেশ ?' 'আর্ত কেকারব' আর 'ফিরে দাও উন্মাদ তুফানে / 'অস্তিত্ব'কে ফিরে দাও'— এই চিৎকারের নিঃশব্দ প্রচণ্ডতার অভিব্যক্তি, উভয়তই তবে সমুদ্রকে ময়ূরভ্রমে তার ধাবনশীলতার প্রতি নিয়ত সৃষ্টিশীল বলে মনে করে। 'অস্তিত্ব'-কে ফিরে পাওয়ার প্রার্থনায় কবি তাই সৃষ্টিক্ষমতাকে শব্দহীনতার প্রতি এক সময়োচিত আক্রমণ বলে জানেন।
দেখা যাচ্ছে, কয়েকটি দৃশ্যকল্প ইমেজকে ছুঁয়েই কবিতার অন্তর্গত আর্তিটুকু এক ট্রাজিক কম্পোজিশনের রূপ ধরেছে অর্থাৎ বিন্যাসের সেই ট্রাজিক অংশটিই এ-রচনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু— যাকে বলেছি এই কবিতার মোটিফ্ বা প্রতীকীচিত্রকল্প।
উৎপলের প্রথমদিকের লেখায় কবিতার বিষয়-হয়ে-ওঠা এমনি রূপান্তরের প্রধানত অনুষঙ্গনির্ভর চাপা আবেগধর্ম, তখন সবে, একটু-আধটু অনিয়মিত ছন্দো-যতির প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছে। 'আমি প্রথম তোমার দেখা পেয়েছি ময়ূর'— পয়ারজাতীয় ছন্দে 'আমি' নামক এমন অস্ফুট অতিপর্ব-যোজনা দিয়েই, কালক্রমে, তাঁর পরবর্তী নিচুস্বরের 'পরকালে' তিনি এসে পড়েন। 'ময়ূর' কবিতাটির তাৎপর্যেও উৎপলের 'পুরীসিরিজ'-এর সুনিশ্চিত পূর্বাভাস আছে। উচ্চারণকে মাঝেমাঝেই বিবৃতমাত্রিক করে-তোলা তাঁর পরবর্তী পয়ার-প্রবণতার একটি নিয়মিত অভ্যাস। যার সূচনা তাঁর রচনায় প্রথমাবধিই লক্ষণীয়। তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে tonal variation-এর এই জীবনানন্দীয় উত্তরাধিকার, একমাত্র উৎপলই সঠিক কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর 'চৈত্রে রচিত কবিতা'র বইয়ে, কবির যৌবনদিন চচ্চড় শব্দে ফেটে-পড়া কার্পাস কি শিমুলেরই আঁশ নয় শুধু। বরং এই বলেন :

'আমার চেতনা শুধু শব্দের করস্পর্শে ভেঙে যায়।
অথবা তাকেই আমি খুঁড়ে ফেলি, যেন উদ্বেলিত
ছায়া-গন্ধ-ঝরা গাছ খুঁড়ে ফেলে, বীজের আশায়
সূর্যের আন্দোলনে মাঠে মাঠে যা-কিছু নিহিত।

এ শ্রমের অন্ত কবে ? সুরু বা কোথায় ? ···'

('চৈত্রে রচিত কবিতা')

কবি চৈতন্যের সঙ্গে প্রার্থিত শব্দসংঘাতের অতল গহনলোক আবিষ্কারে, তাঁর পরিশ্রমও তাই নিহিতার্থসন্ধানী। শব্দানুষঙ্গের অপেক্ষাকৃত-সুলভ পারম্পর্যগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো করা এবং তারপর আবার অবচেতনে পুনঃসংস্থাপনের বিপর্যাস গড়ে তোলা— এই যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি, একে কবির আত্ম-অবলুপ্তির অধ্যায় বলেই জানব। কিন্তু সে-'অজ্ঞান-তিমিরতলে' প্রচ্ছন্নকে তিনি দিতে পারেন নিটোল প্রতিমার গড়ন, প্রতীকের ব্যাপ্তি, এমনকি তা দিয়ে তিনি মূর্ত-কেও বিমূর্তেরই অন্তরে প্রোথিত করেন। তিনি তাঁর অন্বিষ্ট চিত্রকল্পের মধ্যে magical power-কেও স্বীকার করেন।

তখন জীবনভঙ্গি ও তদনুযায়ী ভাষাভঙ্গির জোরে শব্দ তার নতুন পরিচ্ছদ গ্রহণে তৎপর হতে থাকে। বোদলেয়ার এইভাবে ফরাসি সিম্বলিস্ট্‌দের সামনে তুলে ধরেছিলেন তাঁর বহুখ্যাত correspondance-এর তত্ত্ব। উৎপলের 'দুঃসময়' কবিতায় বস্তুজগতের অন্তর্নিহিত সত্ত্ব-সন্ধান, প্রতীকবাদের সেই আদি প্রেরণা থেকেই যে অগ্রসর হয়েছে—তা বলতে পারি। হয়তো এইজন্যই শব্দভুবনের চেনা অর্থ ছাপিয়ে অতিকায় হয়ে ওঠে এক অপার রহস্যময় ভুবন, যাকে ইন্দ্রিয়লব্ধ বা ইন্দ্রিয়ান্তরসিদ্ধ রূপান্তরে গ্রাহ্য বলে মনে হলেও যার অনেকটাই ইন্দ্রিয়াতীতও বটে। তাই উৎপল ঐ 'দুঃসময়' কবিতায় বলেন :

'... বীজের আঁধারে
ঢেকে রাখি শ্বেত রৌদ্রে আমরণ অন্তঃসার
—আমার চেতনা...'

('চৈত্রে রচিত কবিতা')

প্রতীকের এহেন অতীন্দ্রিয় চিত্রকল্প উপস্থাপনাই অবশ্য তাঁর একমাত্র বিশেষত্ব নয়, তা এই প্রথম কাব্যগ্রন্থেও উৎপল প্রমাণ করেন নানা ইন্দ্রিয়নির্ভর অনুষঙ্গসমূহে। কিন্তু প্রেম ও অপ্রেমের যে বিধুর দ্বন্দ্ব এ-গ্রন্থে উত্থাপিত, তারই উপলক্ষে— কবি কী ভাবে তাঁর ইন্দ্রিয়জ দৃশ্যজাত উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়াকেও একপ্রকার বিমূর্ত রূপান্তরের বিষয়ীভূত করেন— তার একটি উজ্জ্বলতম উদাহরণ আমি এ বইয়ের প্রথম পাতা খুললেই নাম-কবিতার আদি পঙক্তিতে লক্ষ করতে পারি :

'নিঃসঙ্গ দাঁড়ের শব্দে চলে যায় তিনটি তরণী।...'

('চৈত্রে রচিত কবিতা')

এলিয়ট-বর্ণিত 'auditory imagination'-এর ছায়াপাত ঘটেছে এই চিত্রকল্পটিতে। যখন পড়ছি এই লাইন, তখন সংবেদনশীল শ্রোতার কাছে 'তিনটি তরণী' আমাদের 'শিরিষের রাজ্যকে চঞ্চল করে' যেন 'তিনটি তরুণীরই মতো লীলাভরে' চলে যায়। ছিপ নৌকোর চলনের সঙ্গেই তাদের এত মিল যে এখানে দৃশ্যগ্রাহ্য তিনটি তরণীকে তন্বী তিন নারীর দৃশ্য ও শ্রুতিকল্প অনুষঙ্গের অনায়াস মিশ্রণেই আমরা যথারীতি দেখতে ও শুনতে পাই। উৎপলের রোমান্টিক কবিধর্ম এবং তখনো পর্যন্ত অবিরল লিরিকপ্রবণতার গুণেই তা সম্ভব হয়েছে। এলিয়ট, বোদলেয়ারের ভাষাশিল্পের সপ্রশংস উল্লেখে, যেমন তার সেকেন্ডহ্যান্ড ইমেজারি প্রয়োগের কথাও বলেন, অনুরূপ তাৎপর্যে, আমরাও উৎপলের পৌনঃপুনিকরূপে ব্যবহৃত 'জাহাজ', 'সমুদ্র', 'রাজহংস,' 'কান্তার', 'পাহাড়', 'ঝর্ণা', 'উটের ঘণ্টার শব্দ', 'গীর্জার সারি', 'পাতালতিমির', 'কার্নিভাল', 'অর্গ্যানবিধুর রোল' এবং ফের সমুদ্রের 'সোনালি বালির তলে রক্ত নারিকেল' ইত্যাকার চিত্রকল্প বা প্রতীক বা শুধুই অনুষঙ্গময় উল্লেখের প্রাচুর্যকেও অনেকটাই যে তাঁর তখনকার 'reading source' থেকে প্রাপ্ত বলতে পারি। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, এই বিশেষ প্রবণতাটি পাঁচের দশকের প্রধান কবিদের মধ্যে তখন অন্য

আর একটি কারণেও বলবৎ হয়েছিল। তিরিশের দশকের প্রধান কবিদের পঠনপাঠন ও অনুবাদকর্মের ভিতর দিয়েই পাঁচের দশকের কবিরা পেয়েছিলেন ফরাসি, জর্মন ও অন্যান্য সিম্বলিস্ট্ এবং ইঙ্গ-মার্কিনী ইমেজিস্ট্ কবিকুলের সংসর্গ। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে ছাড়া, তখন একা বুদ্ধদেব বসুই বোদলেয়ার, হোল্ডারলিন, রিলকে-র নিয়মিত অনুবাদ পরিকল্পনায় যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৪-৫৮-এর ভিতর বুদ্ধদেবের 'যে আঁধার আলোর অধিক'— নামক কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিও রচিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বাংলা অনুবাদে বোদলেয়ারের 'ক্লেদজ কুসুম' ও 'রিলকে-র কবিতা'— প্রধানত এ-দুটি বই, তখনকার তরুণতর কবিদের হাতে হাতে ফিরত। অতএব, এ কথা মানতে হবে, প্রাথমিক স্তরে পাঁচের দশকের বাংলা কবিতার ডিকশান ও প্রতিমা-প্রতীকের জন্য এই ব্যাপক reading source-ই— কোনো-না-কোনো ভাবে কার্যকরী হয়েছে। এমনকি বুদ্ধদেব বসুর 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যগ্রন্থটির দ্বারা এঁদের অনেকেই প্রভাবিত হয়েছিলেন।

□ ৫ □

অবশ্য এরূপ প্রভাবের পরোক্ষতা সত্ত্বেও, উৎপলকুমার বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়— গোড়া থেকেই তাঁদের রচনায় চিত্রকল্প ও প্রতীক-নির্মাণে নিশ্চিত সেই স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের পরিচয় দেন, যা নিছক reading source ছাড়াও প্রত্যক্ষ সংবেদনলব্ধ, ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতারই বিষয়। এই দ্বিতীয়োক্ত উৎসসূত্রেই, উৎপলেরও 'চৈত্রে রচিত কবিতা'-র আবহ, অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে তাঁর 'পুরী সিরিজ'-এর স্বেচ্ছা-নির্বাসন, বন্দীত্ব ও স্বাধীনতাকামীর উদাসীন হৃদয়বত্তায় দ্রুত অনুপ্রবিষ্ট হয়। হয় এ-যুগের কবিতার যা শ্রেষ্ঠ মূলধন সেই তীব্র শ্লেষনির্ভরতায়। এই পর্বে, তাঁর কবিতা আরো চিত্রকল্পময়, আরো প্রতীকী। এক সমুদ্রেরই কাছ থেকে তার শুরু। আর আসমুদ্র আকাশ ও দিকদিগন্তব্যাপী তার উৎক্ষিপ্ত বিস্তার। 'ও শ্বেত বৈধব্য, পাখি, তুমি কারাগার রৌদ্র থেকে ফেলে দাও গরাদের ক্রমপরম্পরা ('পুরী সিরিজ')— বলে, তিনি তাঁর সেই বন্দীত্ব ও স্বাধীনতার দ্বান্দ্বিক এসথেটিকস্ রচনায় মনোনিবেশ করেন। অতিকথনের ঝোঁকও তাঁর এই সময়েরই একটি বিশেষ প্রবণতা। ফলে, কখনো এমন মনে হতে পারে, কবি তাঁর ইমেজিস্ট্ সত্তাকে লঙ্ঘন করছেন এবং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে automatic wriitng থিয়োরির শরণাপন্ন হচ্ছেন। অপর এক যুদ্ধের কথা তাই মনে আসে তাঁর। কোনো 'চৈত্রে রচিত কবিতা'র 'অনুপম উড়ন্ত মেঘের পালিতা পাখির মতো' এক মুক্ত ও স্বাধীন কলকাতার কল্পনা ছেড়ে তাঁকে এই 'সামুদ্রিক মফস্বলে' প্রকৃতই ঘোড়সওয়ার হয়ে ওঠার 'অখিল শুশ্রূষা' প্রার্থনা করতে হয়। 'এত বড়ো বেসরকারী আতুরালয়ের নীল ভানুসিন্ধুজলে' লুকোচুরি-খেলার নিমন্ত্রণে, তিনি তখন স্বেচ্ছায় যোগ দেন।

□ ৬ □

আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, ছয়ের দশকের শুরুতেই, একদা কলকাতার কোনো কলেজের এক ভূবিদ্যা-র অধ্যাপক, তথাকথিত তাঁর অশ্লীল কবিতারচনার দায়ে এবং হাংরি জেনারেশন আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ইন্ধন যোগানোর অভিযোগে— কলেজ কর্তৃপক্ষের দ্বারা বরখাস্ত হন। সেই অধ্যাপক— উৎপলকুমার বসু। জীবনানন্দের পর আরো একবার— উৎপলের প্রতি এই সামাজিক আক্রমণ যথার্থ বামনোচিত। তাই সংগত প্রতিক্রিয়াতে উৎপল তাঁর তাবৎ রণরক্তকৌশলের বিপরীতে এক বিসম্বাদী বামনের প্রতীক প্রায় নিয়মিত খাড়া করে তোলেন। আর এইভাবে, তাঁর কবিতার অন্তর্গত শ্লেষ 'কার্পাসবাগানে ঈশ্বরপ্রদত্ত গাধা'-র বিচরণশীল রূপান্তরে, স্বভাবতই আবিষ্কার করে এক 'ব্যক্তিগত প্রেত'। এরই পুনর্লিখন, 'সার্বভৌম বেশ্যাদের প্রকৃতির জীবজগতের আর দারুপুতুলের ছবিগুলি' যে-অস্ত্রকে শাণিত করে তোলে সেই অস্ত্রের ব্যবহারও তাই অটোমেটিক। সুতরাং কবির এসথেটিকস্-ও বদলে যেতে থাকে দ্রুত, এবং কবিতার ভাষায়, চিত্রকল্পে, প্রতীকে তার প্রতিফলনেরও মাত্রান্তর অনিবার্য হয়ে ওঠে :

> '— আমার সৌভাগ্য ছিল ক্রমান্বয়ী ইন্দ্রিয়শাসন— ভুল বিদ্যাশেখা— ভুল আবিষ্কার— ভুল প্রজনন— ভুল গরিমা ও ভুল তুলাদণ্ড— ভুল ধূপাধার — ভুল পুষ্করিণী— ভুল দেবদারু— ততোধিক ভুল স্মৃতি, মিথ্যাবাদ, খেলাধুলা, বলের লাফানো আর মেঘের ভিতর থেকে আবির্ভূত জীবনের প্রথম এয়ারোপ্লেন— তাও সত্য নয় !'
>
> ('স্মৃতি-২')

তবে এই সেই উৎপল-বিবৃত 'মাতৃজঠর'— যা থেকে বেরিয়েই কলে-কারখানায় তোতাপড়ানো ভুলের কারিগরি থেকে পরিত্রাণের জন্য ফের সেই মাতৃজঠরমুখী সন্তান 'বিষণ্ণতা', আজ আবার 'নেড়েচেড়ে দেখছে জাতকের রক্তমাখা কাপড়-তুলো-ব্যান্ডেজ, এবং এও সত্য যে, যে-হাসপাতালে সে জন্মেছিল সেখানেই তাকে ফিরে যেতে হবে মরণোন্মুখ মানুষ হিসেবে, না এটি সত্য নয়, এটি রিয়ালিটি...' (পূর্বোক্ত 'ধূসর আতাগাছ')। কল্পের উৎসমুখ দেখাতে গিয়ে একটি দিকে যেমন এলিয়ট তার উৎপত্তিস্থল হিসেবে ধার্য করেন রচয়িতার পড়াশুনোর অভিজ্ঞতার জগৎ, আর অপর দিকটিতে ধার্য হয় তার আবাল্যের সংবেদনশীল জীবন। উৎপলকুমার বসুর 'স্মৃতি-৩' নামক কবিতাটির পরতে-পরতে সেই দ্বিতীয়োক্ত উৎসটিই উৎসারিত এবং উদ্দীপন বিভাবে বা এলিয়টের অবজেকটিভ কোরিলেটিভে সমগ্র কবিতাটির জন্য মাত্র একটিই চিত্রকল্প কেন্দ্রস্থ। উৎপল-এর শেষ তিনটি পঙক্তিতে লিখেছেন :

'...সেদিন ছিলাম
বাল্যে, বিষণ্ণতা, তোমারই সন্তান, তোমাকেই
মাতৃজঠর ব'লে মনে হয়েছিল।'

('স্মৃতি ৩')

এরূপ উক্তি প্রকৃতই একজন ইমেজিস্টের উক্তি বলে মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। বাল্যকালই সেই মাতৃজঠর, 'বিষণ্ণতা' তারই গর্ভজাত সন্তান। 'শুকনো পাতা ঝ'রে যায় কবে / সুরু (সুধীরলাল) বাংলায় / বিলেতে অনেক আগে কাতর / সন্তাপময় কবিতায় লেখা হ'ত...' ('স্মৃতি : ৩'), এই যে শুকনো পাতা-ঝরার অনুষঙ্গ, যা রোমান্টিকদের তো বটেই, প্রতীকবাদী বা ইমেজিস্ট্‌দেরও কম প্রিয় অনুষঙ্গ নয়। পাঁচের দশকের বাঙালি কবি, রিলকের সেই বিখ্যাত 'Autumn' কবিতায় যখন পড়েছেন : 'Leaves are falling...', তখন, সেই পাতাঝরা বিষাদগীতি অবলম্বনে বাংলার হেমন্তে— হয়তো জীবনানন্দীয় জগতে— পউষের পাতাঝরা পর্যন্ত যেতে পারেন। কিন্তু উৎপলকুমার বসুর এ-কবিতায় ঠিক তা তো নয়। 'বিলেতে অনেক আগে কাতর / সন্তাপময়...' কবিতার বিপরীতে অতি অবশ্য সে-পাতাঝরার বিষাদ বয়ে আনে সুধীরলালের গান : 'মধুর আমার মায়ের হাসি...'। এ-গান চল্লিশের দশকেই আধুনিক বাংলা গান হিসেবে খুব প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। আমাদের বাল্যস্মৃতির সঙ্গে সেই দূরত্ববিধুর মাধুর্য মিশে গিয়ে কত তুচ্ছ কথা কবিতাটির পঙক্তিতে পঙক্তিতে ঢুকে পড়েছে। আমাদের নস্ট্যালজিয়ার যদি কবিতায় কয়েকটি পঙক্তিনির্ভর শিল্প-বিন্যাস দিতে হয় তবে এই তার উপযুক্ত গঠন। অপ্রস্তুত পাঠক হয়তো উৎপলের 'স্মৃতি : ৩' কবিতাটি ঠিকমতো ছন্দোযতি বুঝে পড়েই উঠতে পারবেন না, এমন এক স্বেচ্ছাকৃত এলোমেলো গড়নের আভাস দিয়েছেন কবি। অনুষঙ্গবিধি ও তদনুযায়ী স্মৃতিগুচ্ছের এরূপ উদ্দীপনশক্তি স্বভাবতই অচ্ছেদ্যভাবে আমাদের আচ্ছন্ন করতে চায়। আর বর্তমানের অবস্থিতি এবং নিরীহ ঘটনাবলীর মধ্যে কখনো কখনো বহুদূর বিদ্যুৎ-চমক এসে পড়ে। তা এমনভাবে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয় যে নিমেষেই আমরা বর্তমান আর অতীতকে একীকৃত করে তৃতীয় অপর কোনো স্থির কালমাত্রায় প্রবেশ করি। উৎপলের এই বিখ্যাত কবিতাটি থেকে সেইরকমেরই একটি বিদ্যুৎ-প্রহার পাঠকের লভ্য। কিন্তু সেজন্য অপ্রস্তুত পাঠককেও প্রস্তুত হতে হবে। পড়তে হবে পয়ারজাতীয় ছন্দের আধুনিকতম যতিবিচ্ছেদের প্রত্যেকটি গোপন বাঁকে থতমত না হয়ে—'perspective kind of reading habit'-এ। তার মড্যুলেশনের সমস্ত স্বরক্ষেপণ-বৈচিত্র্য যথাযথভাবে মানতে হবে। প্রথম পর্যায়ে উৎপলের কবিতার বিন্যাস অত জটিল হয়ে ওঠেনি কিন্তু জটিলতর হয়ে উঠবে, এইরকম আভাস এসে গিয়েছিল প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চৈত্রে রচিত কবিতা'-য়।

একদা তাঁর চৈত্রে রচিত মহিমময়ী মনের ময়ূর থেকে গোপন সমুদ্রবিভব কী দ্রুত ঝরে পড়ে ও পরিবর্তিত হয় ভিক্ষু স্থানান্তরিত বেলায়, 'যখন ওষ্ঠে দুই করতল স্ফীত ক'রে

হাঁক দেয় মুক্তার শিকারী…'। ('প্রকৃতির ছবি') এখানে নেমে, উৎপল লেখেন : 'প্রতি ধর্ম বলে দেয় : আমি চাই অসম্পূর্ণ পাঠ।' ('প্রকৃতির ছবি') ব্যাপারটি তাঁর 'আরো প্রকৃতির ছবি'-তে যেসব দৃশ্যকল্প ও শ্রুতিগ্রাহ্য চিত্রকল্পের নিরীহ রূপ সৃষ্টি করে, সেখানে, কবির প্রত্যক্ষবেদন (perception) পায় জলের প্লাবনে 'মুক্তা'। আর তারই তরঙ্গাভিঘাতে আরো দূর 'সমুদ্রকপাটের' এক গোপন 'auditory imagination'-নির্ভর দুই প্রবল হাতে খিল খোলার অসম্পূর্ণ আয়োজন। 'যেখানে জলের রঙ লোহমরিচার / শিকলের মতো লাল…'। সেইখানে— 'জলের গভীরে রুদ্ধ শৃঙ্খলের ধ্বনি !' ('প্রকৃতির ছবি')।

প্রত্যেকটি বস্তুধর্ম ও তার 'অসম্পূর্ণ পাঠ'-জনিত যে poetic intuition 'মুক্তা'কে 'সমুদ্রকপাট' মুক্ত করার গোপনীয় আর্তি পর্যন্ত ব্যাপৃত করতে পারে— সেই অশ্রুত ও অদৃশ্যের ভিন্নতর দৃশ্যমহিমা, কবিকে তাঁর অনন্তর নিরীক্ষাশক্তিতে আবিষ্ট করে। তিনি লেখেন :

'…চূর্ণ সবিতার দিন ক্রমাগত দূরে সরে যায়।
যেখানে সৈকত তৃণ অর্ধেক আলোকগ্রস্ত অর্ধেক ঢাকা।
যেখানে রুপোয়-গড়া সুবর্ণের, তরঙ্গের অতীন্দ্রিয় চাকা

আগুন উড়ায় দ্রুত ! মৌমাছি কি গতিদিব্যতায়
আবার বসন্তদিনে খুলে ফ্যালে রান্নার হাঁড়ি
যখন প্রস্তুত সব, ধোঁয়া ওঠে, ক্ষুধা, কাড়াকাড়ি ?'

('আরো প্রকৃতির ছবি')

'সবিতা', 'সৈকত তৃণ', 'রুপোয়-গড়া সুবর্ণের, তরঙ্গের অতীন্দ্রিয় চাকা' ; আর মৌমাছির 'গতিদিব্যতা' যা বসন্তদিনে খুলে ফ্যালে রান্নার হাঁড়ি— এই প্রস্তুতি, আসলে 'ধোঁয়া', 'ক্ষুধা', 'কাড়াকাড়ি'-র উঞ্ছজীবিতায়— দৃশ্যান্তরে কবির সমুদ্রবিষয়ক তাবৎ পোশাকিয়ানারও অবসান। 'রান্নার হাঁড়ি'-ই সে যাত্রায় আপাতত এক জৈব আশ্রয়। যেখানে, চিত্রকল্পের বিমূর্ত লোকেশান্ এই প্রথম একটা 'লাল টালি'-ছাওয়া 'সাদা বাড়ি'-র দিকে উঠে আসছে দেখি। তাহলে, প্রচলিত এমনকি প্রসিদ্ধিসূচক শব্দেও কিছু যায় আসে না, যদি থাকে তারই মাঝখানে এক উন্মুক্ত 'রান্নার হাঁড়ি' ! চিত্রকল্পের অতীন্দ্রিয়তা যে এইভাবেও আদায় করে নেয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিপর্যাস, আর তখন ফোড়নেরই ঝাঁঝে 'হ্যাঁচ্চো' ব'লে— এতকালের পরিচিত সংস্থানগুলোকেই যা-হোক বদলে দিতে পারি। শব্দ দিয়ে এমনি অদলবদলের রূপরেখাগুলি— যেমন,

'তুমি সম্রাট, প্রভু ও যাতায়াতকারী পথিকের দেবতা
তুমি এক কাঠা মদ দাও আর আমাদের
দাইমা-কে ফিরে দাও…'

('আকাশযান')

এক লোকায়ত উপাখ্যানস্তরে, আমাদের নব্য সমাজেতিহাসের গড়ন একই সঙ্গে মহাকাব্যের পুরাণ ও ইতিহাস-নির্ভর এবং গার্হস্থ্যাশ্রমের 'বৃষ ও মানুষ' ঐহিক আমোদের জোগান বজায় রাখে। আর তারই জন্য 'শুল্ক' আদায়ের প্রথানুগত্য। যদিও সে শুল্ক 'যাতায়াতকারী পথিকের' ঝুড়ি থেকে তুলে নেওয়া 'বজ্রসেগুন পাতা'! অর্থাৎ, যে অক্ষরধৃত পাতা— বজ্র তুল্য সারবান্, তা-ই পথিকের আত্মুধ 'সম্রাট, প্রভু' বা 'দেবতা' যা অজ্ঞাতসারে 'শুল্ক' বলে ছিনিয়ে নেয়। পথিক বলে— 'দেখহ বিচারি'। এই বিচারের ইতিহাসই আধুনিক সমাজেতিহাস। যা এখনো 'দেবতার' অজ্ঞাত বা অনায়ত্ত বা অনাধীন। 'আকাশযান'-নামক কবিতাটিকে অমূলক 'এক-কাঠা মদ' ও 'দাইমা-কে' ফিরে পাওয়ার স্বাদু, স্তন্যপায়ী প্রাগিতিহাস থেকে আমাদের আধুনিক সোশিয়ো-ইকনমিক তথা পোলিটিকাল হিস্ট্রি পর্যন্ত পথিক সেই 'দেবতার'ই মুখাপেক্ষী। অতএব 'দেখহ বিচারি' এই আর্কেয়িজম সেই ইতিহাসের শ্লেষ ও 'বজ্রসেগুন পাতা'র অনন্ত সম্ভাবনা। এ কবিতার 'কাগজসন্ন্যাসী'-র কাছেও তা-ই রচনাটি ১-২-৩ এই পর্যায়ক্রমে বিবৃত হয়েছে। স্বভাবতই, 'কাগজসন্ন্যাসী' শব্দটির অন্তরে ওতপ্রোত এক অনুষঙ্গ থাকে— ফরাসি সিম্বলিস্ট্ কবিদের শীর্ষস্থানীয় মালার্মের সুধীন্দ্রনাথ অনূদিত 'নীলিমা'-য় যা উল্লিখিত হয়েছে 'রিক্ত কাগজের শুভ্র স্বগত সংযম' রূপে।

□ ৭ □

উৎপলের কবিতা অবশ্য তাই বলে মালার্মেপন্থী বস্তুজগৎকে শূন্যতায় প্রতিফলনের বিশুদ্ধ ও বিশদ শিল্পকারিগরির প্রশ্রয় নয়। মালার্মের 'Void' উৎপলের হাতে এক অকৃপণ ভাষাশিল্পের কখনো গ্রামীণ লোকায়তিক, কখনো বা নাগরিক-লোকায়তিকের নিরীক্ষাশক্তি ও বিশ্লেষণের প্রতীকী বিন্যাস। এখানে আমি পরপর দুটো উদাহরণ তুলে ধরছি :

ক. আমরা খরিদ করি তামাক মূলত আমাদিগের পিতা ৺মুরারী সাহা তাং…মৃত ও ঐ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে দোকান ও প্রেস বন্ধকী রেখে আমরা সন… এই দেশে আসি অনুপায় যদিনা সরকারী / বেসরকারী খাস-দখলের জন্য উক্ত জমি চাষ ও বীজ বপনের শর্তে জলসেচ পরিকল্পনা তেমন সুষ্ঠু হয় না কারণ ভাগচাষীদের মধ্যে পরস্পর বিবেচনার অভাব আমাদিগের ভাইবোনের ভিতরও তেমন বিচার নাই দ্বিতীয় ভগ্নীপতি কৃপণ ও অসদাচারী

খ. এবং আমাদের এই প্রয়াস গ্রন্থ-রচনার আড়াআড়ি দপ্তরীদের দোকান অধিকাংশ মুসলমান তা হোক পদ্ধতি অনুসারে হয় ইলাহি যেমন দুর্বিভগ্রহ ও দেহাতী ভূষণ ও রজচামর রক্ত ও তেল কিন্তু বিচার নাই আমরা চাই পরিবার চাই রেশনের বাইরে ঘর পিছু সম্বৎসর চাল ও জ্বালানি ও সরিষা মাথাপিছু দুই কেজি উক্ত

> দরখাস্তে আমাদিগের সই ছিল সাতজন অনুপস্থিত অর্থাৎ মৃত বা রুগ্‌ণ আমাদের তিনজনের সই যথেষ্ট ব'লে বিবেচিত হোক এই আবেদন
>
> ('স্বপ্নের ভিতর দিয়ে গিয়েছিলাম')

উপরোক্ত উদ্ধৃতি দুটি যে কবিতার অন্তর্ভূত, তা একটি 'ব্যাপার সম্বন্ধীয়' আবেদনপত্রের আদলে চারটি গদ্য-অনুচ্ছেদে মুদ্রিত। এবং তা এমন এক প্যাটার্নের কাছাকাছি এসেছে— যাকে পূর্বোক্ত গ্রামীণ-লোকায়তিক ও নাগরিক লোকায়তিক Speech-pattern-এরই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কজাত এক প্রতীকী বিন্যাস বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। লোকসাধারণ্যে যে-অভিজ্ঞতা, ভাবভাষা ও প্রকাশশৈলী সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত এবং অনায়াসসিদ্ধির কারক— তা-ই লোকায়তিক। তাতে গ্রাম ও নগরভেদে লোকসম্প্রদায়ে Speech-pattern-এরও মাত্রান্তর অনিবার্য। বাংলা ভাষা-সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণও যে এই মাত্রান্তরের দ্বন্দ্বকে শিরোধার্য করে— তা বলা বাহুল্য। লক্ষ করতে হবে, আলোচ্য কবিতায় উৎপল উক্ত দ্বন্দ্বের দুটি দিকের জায়গায়— 'শারদ মধুপুরে দেখেছিলাম' বলে অতঃপর একটা তৃতীয়মাত্রারও অবতারণা করেছেন। সেটি তাঁর কবিব্যক্তিত্বের দিক। 'ব্যাপার সম্বন্ধীয় পত্র'-তে ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক রীতির লোকব্যবহার থেকে আরও অন্তরঙ্গ স্তরে তাঁর কবিব্যক্তিত্বের আরোপ ব্যাপারটি আমাদের বুঝিয়ে দেয় আমরা এই ভাষা-জগতের ধ্বস্ত ও ধারভারহীন কোন্ গাড্ডায় পড়ে গেছি। ললিতলাবণ্য রোমান্টিক ক্লিশে থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই 'যা ব্যাপার সম্বন্ধীয় পত্র ব্যবহার'-এর কম্পোজিশান এবং তাকেই আপাতত একটি প্রতীক হিসেবে তিনি খাড়া করেন। এইভাবে আমাদের গ্রামীণ-লোকায়তিক ও নাগরিক-লোকায়তিক বাক্‌পদ্ধতির দ্বন্দ্বময়তার দুটি ভিন্ন-ভিন্ন মুখ, যথাক্রমে উপরোক্ত উদ্ধৃতি দুটিতে ফুটে ওঠে। কিন্তু যা অপরিস্ফুট থাকে, তা হল তাঁর কবিব্যক্তিত্ব উন্মোচন দিয়ে তিনি যে-তৃতীয়মাত্রায় কেন্দ্রস্থ হতে চান। তা-হয়তো তখনো সেই পদ্ধতিগত দ্বন্দ্বের প্রকৃত কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে না। পারে না, কারণ স্বপ্নদৃষ্ট ফ্র্যাগ্‌মেন্টেশন এখানে শুধুই অনুষঙ্গমাত্র, তখনো ইমেজ হিসেবে প্রতিফলনের অপেক্ষায়। তাঁর এই প্রয়াসের আরো অভিনবত্ব ও সফলতার পরিচয় পেতে হলে আমাদেরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হয় কবির পরবর্তী কাব্যপুস্তিকা 'লোচনদাস কারিগর' (১৯৮২) ও 'খণ্ডবৈচিত্র্যের দিন' (১৯৮৬) পর্যন্ত।

□ ৮ □

তবু এরই আগে, 'আবার পুরী সিরিজ'-এ উৎপলকুমার বসুর কবিতার অন্যান্য বিভব-গুলিও তাঁর নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রয়াসেরই যে অন্তর্গত থাকে, তার একটু পরিচয় নেব। পূর্ণ তালিকা আপাতত নিষ্প্রয়োজন। তবে কয়েকটি উদ্ধৃতির বিশ্লেষণ জরুরি :

১. 'সাদা ঘোড়া, তোমার কেশরে আমি হাত দিয়ে আজ
বুঝেছি কেমন শ্বেত কবুতর, স্বাস্থ্য, দুধ, সূর্যের পাহারা...'

('সাদা ঘোড়া')

২. 'কুয়াশায় রাজহংসের ফৌজ দৌড়ে চলে যায়। ...'

('ফেরীঘাট')

৩. 'বনের ভিতর আজ সকালের উদ্দেশ্যবিহীন দমকল একা একা ঘুরছে আমাকে টেনে নিয়ে চলো ঐ অগ্নিনির্বাপক ক্ষমতা আমারও আছে স্ত্রী আছেন পুরুষের আয়ত্তে যেমন ফুল আছে দানবীর আয়ত্তে যেমন আমার কয়েকদিন ব্যথা হ'ল বাঁ চোখে এবং আতঙ্ক হ'ল অন্ধতা আমার বেশিদূর যাবে কি যৌবনে— নাহয় গাড়ির টায়ারচিহ্ন ধ'রে চলেছি এবার গভীর বনের দিকে দমকল কিছু আগে গেল'...

('আমারই প্রাণের দিকে চেয়ে দেখি')

৪. 'কিছু কিছু ঘোড়া আজ নেই
এবং সহিস একা প্রাসঙ্গিক নয়
এজন্যই ফিরে আসে ঘাস আর ঘাসের জন্ম হয়
শরতকালীন
আবহাওয়ায় আমাদের ক্লান্তিবোধ হতে থাকে।'

('নীলকুঠি')

৫. 'দূরত্বই বোধ, বুদ্ধি। অপ্রাপণীয়ের
বিস্ময়, মমত্ব, ক্ষোভ। মানুষের যা-কিছু সম্বল।
ফুল তাই গন্ধে আজ আমাদের সতর্ক করেছে।...'

('উনিশশো বাষট্টি শেষ হ'ল')

৬. 'হেমন্তকালীন সাদা খড়ি দিয়ে আঁকা হয় সৌন্দর্যবোম্বেটে।
অমন সৌন্দর্য আমি হাতে পেলে চলে যাই নবদ্বীপ
আবিষ্কার-করা আর আবিষ্কৃত হওয়া থেকে উল্লাসের চোটে
পরস্পর চিঠি লেখালেখি অব্দি থেমে যাক। ট্রাক্টর, জীপ
পরিকল্পনার মতো কবিতার কালো ক্ষেত চষে খায়। ছিঁড়ে যায়
আধোঘুমে মশারির পায়ের দিকের পাড়। ভালো নাগরিক
হতে চাই। নবদ্বীপে, ফরাসী শেখার ক্লাসে, বকুলবাগান থেকে চৌরঙ্গী পাড়ায়
হেমন্তের কোণা ধ'রে শুয়ে আছি এবারের সৌন্দর্য ও মশার জ্বালায়।'

('তেরজা রীমা')

৭. ...'সোনার নৌকা, তুমি নিয়ে যাও যা-কিছু সম্ভব
সোনার বিড়ালী, তুমি নিয়ে যাও মেয়েদের,
শিশুদের নিয়ে যাও,

খুন করো, খোজা করো, মুছে ফ্যালো উল্কির লিখা
ফেলে দাও ধানখেতে, নদীজলে ব্যবহৃত শব।...'

('যুদ্ধের ডাক এসেছে')

৮. 'তোমাদের বিচালিগাদায় আমাকে দিয়েছে ঘর—
গ্রীষ্মে এতে আগুন লাগাব'

('আগুন আগুন')

৯. 'খড়্গ, তুমি তাপ ও বিদ্যুৎ একাধারে'

('ভোর থেকে দেখছি আগুন')

১০. '—আমাদের মাথার চতুর্দিকে জ্যোতিষ্মান জড় দেবতার থালা দেখা দিতে পারে—বুদ্ধদেব বসু যদি আমেরিকা থেকে ফিরে না আসেন তবে এই কথা তাঁকে আর চট ক'রে জানানো যাবে না— আমি তো মুর্শিদাবাদ চলে যাব এই আশ্চর্য জিনিস দেখাতে— কবে ফিরব ঠিক নেই—'

('এ সপ্তাহটা কেমন যাবে')

১১. '...জানোয়ার
যে-ভাবে ভয়ে ঘুরে দ্যাখে চারদিক তেমনই চিরস্থায়ী
বিদ্যুৎ-চমক চার পাঁচ মিনিট আলো ক'রে রাখে
ফুলের টব, কাপড়-শুকানোর তার—'

('চিঠিপত্র : ৭')

১২. 'দিতি-অদিতির কোলে মাথা ডুবে যায় শেষ-রজনীর চাঁদ।
আজ ঈগলের, পাখিদের রাজা দেখা দিক।
ডাকো। যারা কবিতার বিরুদ্ধতা করে
আজ ঈগলের, পাখিদের রাজা স্বচক্ষে দেখুক।'

('চিঠিপত্র : ৮')

১৩. '...সাদা বরফের ধার দিয়ে সেলায়ের ছাপের মতন
প'ড়ে থাকে পদচিহ্ন তোমাদের।...'

('ভ্রমণকাহিনী')

১৪. 'যা নয় তোমার বাহু তা-ই কালো তা-ই অন্ধকার :
উচ্চকিত তান ধরে গাছে গাছে নপুংসকদল...'

('রাত্রির বাতাস')

১৫. 'আছে ভয়
মেঘের সারল্য আর বালুচর যেভাবে খেলছে'

('ট্রেনে লেখা কবিতা')

১৬. 'তারপর ঘাসের জঙ্গলে প'ড়ে আছে তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি। এবং আকাশ আজ দেবতার ছেলেমেয়েদের নীল সার্ট-পাজামার মতো বাস্তবিক।

একা ময়ূর ঘুরছে খালি দোতলায়। ঐ ঘরে সজল থাকত।
সজলের বউ আর মেয়েটি থাকত। ওরা ধানকল পার হতে চলে গেছে।'
('এই সংগ্রহের শেষ কবিতা')

□ ৯ □

উৎপলকুমার বসুর প্রধান কাব্যগ্রন্থ এই 'আবার পুরীসিরিজ' (১৯৭৮)। যার ভিতর গত ষাট-সত্তর দশকে লেখা তাঁর প্রধান কবিতাগুলিই চোদ্দ বছর আগের পূর্বপ্রকাশিত 'পুরী সিরিজ' (১৯৬৪)-এর 'পরিমার্জিত চতুর্গুণ বিস্তার' লাভ করেছে। গ্রন্থটির পিছন মলাটে যেমন ঘোষিত থাকে : **'এতে সমুদ্র, বামন, তাঁতকল, শিকারী, সতী, নপুংসক, মিসিবাবা, এয়ারোপ্লেন, সূচ ও আত্মা, রণরক্ত ও সন্ধ্যাবাতাস, কৈবল্য ও ঈশ্বরোপাসনার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। পাঠকের ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য এক নিষিদ্ধ পারমাণবিক চুল্লী খুলে দেখানো হ'ল এই গ্রন্থে।** যখন বর্তমান আলোচনার জন্য আমি উদ্ধৃতিগুলি সংগ্রহ করছিলাম, তখনো চতুর্থ মলাটের এই ঘোষণাটি আমার চোখে পড়েনি। এখন, অক্ষম আলোচকের হতাশার মুহূর্তে, যখন বইটি উল্টে রাখছি, দেখি কবিকৃত এই ব্লার্ব। কেউ যদি এখন জিজ্ঞেস করেন, বইটি কী-বিষয়ে লেখা হয়েছে, তবে তার সদুত্তর নিশ্চয়ই এই কবির নিজের ঘোষণা, যার আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু মজা এই, আমার উদ্ধৃতিগুলি ও তার আগেই কবিতা ধরে ধরে যেটুকু আলোচনা করেছি, তা এই বলছে : ঐসব বিষয় বা প্রসঙ্গগুলিই এ-গ্রন্থের প্রামাণ্য লক্ষণীয় বিষয় নয়। যদি তা হত, তাহলে— তা-ই হত এ-বইয়ের পক্ষে এক বিচিত্রতর ফ্যান্টাসি। এবং উৎপলের সাম্প্রতিক শিল্পতত্ত্ব ভাবনা-অনুযায়ী, আমরাও এই প্রশ্ন করি : 'যদি তা না হ'ত', তখন স্বয়ং কবিই হয়তো বলবেন : 'তাহলে ওগুলো হ'ত রিয়ালিটি'। কবিতার ইমেজ সৃষ্টির প্রয়োজনে ইমাজিনেশনের তুলনায় ফ্যান্টাসি হয়তো কিছুটা নিচুস্তরের জিনিস। আর তা-ই যদি হয়, তবু, ইমেজিস্ট্রা নিশ্চয় ভোলেন না যে, এই ফ্যান্টাসিই কোনো-কোনো ক্ষেত্রে নির্মাণের, তথা বাস্তবতার সমগ্রতা অনুধাবনে, অনুষঙ্গসহ খণ্ডীকরণেরই শক্তি। সার্ত্র যাকে বলেছেন— 'the power of making all parts into a whole'। প্রচলিত অভিজ্ঞতার গল্পকথা বা তার ভগ্নাংশ থেকেও কাব্য কল্পনার সূত্রপাত হয় প্রত্যক্ষত কবিরই সৃজনকৌশলে। তখন কবির স্মৃতির বিষয় ও তার নান্দনিক মূল্যবোধ ক্রমশ এমন একটা আকারপ্রকারহীন অবস্থায় এসে পড়ে যে তার বিমূর্ততা পাঠকের অসহনীয় হলেও তা-থেকে আবছা কোনো অনুস্মৃতি যা-হোক জেগে ওঠে। কল্পনা ও কল্পবস্তুর মধ্যস্থতা-সূত্র সেক্ষেত্রে অপরিহার্য। হয়তো দার্শনিক বিচারে, মনোবিজ্ঞানী বলছেন, (অধ্যাপক এস. আলেকজান্ডার) এই মধ্যস্থতার জন্য কবির অন্তর্দৃষ্টি (introspection) জরুরি। জরুরি, যেহেতু তা যথার্থই বস্তুমুখী হয়ে মনঃপ্রকৃতির বিশাল ভাবাজগতে প্রবেশাধিকার পায়। অন্তর্দৃষ্টি (introspection) ও অনুষঙ্গবিধিই (laws of association) তা পাইয়ে দেয়। সাধারণত কোনো সজীব

অভিজ্ঞতা, আমাদের কাব্য অভিজ্ঞতার সচেতনতায় রূপান্তরিত হওয়ার আগেই, তার অন্তর্বর্তী যোগসূত্র স্বরূপ এক প্রগাঢ় চিন্ময় রূপ লাভ করে। এমনকি বিচিত্র শব্দানুশাসিত 'human perspective' মধ্যস্থতার তাৎপর্যেই যে তার বস্তুসঞ্জাত ক্রিয়া ও সংবেদন জাগাতে সক্ষম— তা বলাই বাহুল্য। মড বোদ্‌কীন আমাদের কাব্য-অভিজ্ঞতার আদি রূপকল্প বিচারে তাই ফ্যান্টাসির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন :

'It is in the process of fantasy that the contemplated characters of things are broken from their historical setting and made availlable to express the needs and impulses of mind.'

(Archetypal Patterns in Poetry)

আধুনিক স্বপ্নতত্ত্বকে সাক্ষী মেনে, তিনি বলেন, ঘুমন্ত মনে যে বিভ্রান্তিকর চিত্রকল্পগুলির জন্ম, তারা মনে আমাদেরই আবেগদীপ্ত পারম্পরিক ক্রিয়া বলবৎ রাখে। যদিও সুপ্ত মন আনুষ্ঠানিকরূপেই নিয়ন্ত্রণক্ষমতাহীন। আবার, বিনিদ্র অবস্থার ব্যক্তিগত ফ্যান্টাসিগুলি, বা মিথ ও উপকথা তাদের emotional pattern অনুযায়ী স্বপ্নেরই মতো চমৎকার ও অদ্ভুত। আবার সেই স্বপ্নবৎ চিত্রকল্পগুলিও একটা যুক্তিগ্রাহ্য প্রতিফলনই পায় যখন তা শব্দে সমর্পিত হয়। এইভাবেই আমরা অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধ রূপান্তরগুলির একটা তুলনামূলক বিরোধিতা বা বৈসাদৃশ্যেও এসে পড়ি। সুতরাং, চিত্রকল্পের আপাত-অসংলগ্নতা কোনো কবির ব্যক্তিগত প্রহেলিকা-সৃষ্টি নয়, বরং বোদকীনের মতো আমরাও হয়তো এই ভাবব :

'When a great poet uses the stories that have taken shape in the fantasy of the community, it is not his individual sensibility alone that he objectifies. Responding with unusual sensitiveness to the words and images which already express the emotional experience of the community, the poet arranges these so as to utilize to the full their evocative power. Thus he attains for himself vision and possession of the experience engendered between his own soul and the life around him, and communicates that experience, at once individual and collective, to others, so far as they can respond adequately to the words and images he uses.'

(Archetypal Patterns in poetry)

বড় কবির 'tragic poetry' জাতীয় মহৎ শিল্পকর্ম সম্পর্কে যা সত্য, ঠিক সেই সূত্রগুলিই আমাদের কালের খণ্ড কবিতার বিচারে ততটাই প্রাসঙ্গিক কিনা— সে তর্ক থাকছেই। তবু ভাবতে দোষ কী— মহাজনপন্থার কোনো-কোনো দিকে আমাদের আধুনিকতা, নিশ্চয় তার সুদূর বা অনতিদূর আত্মীয়সম্বন্ধে কিছু একটা

দিশা পেতেই পারে। এই শতাব্দীর তিনের দশকেই তো ক্যারোলিন স্পার্জন তাঁর *Shakespeare's Imagery* গ্রন্থে প্রধানত ইন্দ্রিয়ানুগত ও ইন্দ্রিয়াতীত চিত্রকল্পের প্রকৃতি নির্ণয় করেছিলেন। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রভাবাধীন বস্তুজগতের দৃশ্য-শ্রুতি-গন্ধ-স্পর্শ-স্বাদ-সম্পর্কীয় কাব্য-অভিজ্ঞতা কতদিকে বিস্তীর্ণ হয়েছে। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অপরাপর মাধ্যমগুলির তুলনায় এক দর্শনেন্দ্রিয়ই তার আধিপত্যে এ-যাবৎ যতটা প্রাধান্য বজায় রেখেছে, তাতে স্পার্জনের এমন উক্তি সর্বৈব সত্য। তিনি বলেন :

'....it is indeed the gateway by which so large a portion of life reaches the poet, and the registration, description and interpretation of things seen depend so completely on faculties of mind and imagination— that to deal with this sense at all adequately almost amounts to the same thing as to deal with the man as a whole and his work in its entirety.'

(*Shakespeare's Imagery*)

এই দৃক্‌শক্তি কবিমন ও কল্পনারই এক বিশেষ শক্তি, যা আপাত অর্থে, কোথাও ফ্যান্টাসির বহিরাবরণ লাভ করেও আরো গভীর ও ব্যাপকভাবে রিয়ালিটির মাত্রিক সম্প্রসারণ ঘটাতে সক্ষম।

ধরা যাক 'সমুদ্র' নামক একটি বিষয়ানুষঙ্গ, যে-বিষয়ে বাংলা কবিতায় মধুসূদন, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং উৎপলকুমার বসু পর্যন্ত প্রায় সকলেই তাঁদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিজের-নিজের মতো করে চিত্রকল্পের দিকে গিয়েছেন। একই দেখার বিষয় কত ভাবে ও রূপে অদলবদল হয়ে গেছে। যেমন, উৎপলের 'ময়ূর' কবিতাটি স্মরণ করলে, গোড়া থেকেই তা যেন বিষয়ান্তরিত হয়ে ও রূপান্তরিত এক প্রতীকী চিত্রকল্পের বিন্যাস লাভ করে।

বস্তুত তিনি তাঁর প্রভূত দৃশ্যকল্প ইমেজগুলির ভিতর অনেক সময়ই ফ্যান্টাসি ও রিয়ালিটির আপাতদূরত্বকে প্রতীকের মতো ব্যবহার করেন। কবিতায় শ্লেষ নির্মাণের সহায়ক হয়ে ওঠে এই তথাকথিত দূরত্বের সম্বন্ধ। বলেন :

'...দূরত্বই বোধ, বুদ্ধি। অপ্রাপণীয়ের
বিস্ময়, মমত্ব, ক্ষোভ। মানুষের যা-কিছু সম্বল।'...

('উনিশশো বাষট্টি শেষ হল')

তার মানে শিল্পেরই শর্ত পূরণ। কবির দৃক্‌ভঙ্গিমায় ইনটেলেক্ট ও ইমোশানের মিশ্র প্রক্রিয়া কখনো একীকৃতরূপে, কখনো বা আলাদা-আলাদা খণ্ডীকরণের তীব্র প্রতিফলন

হয়ে, স্পর্শ করে কোনো সম্ভাব্য কম্পোজিশনেরই সমগ্রতাকে, তার অ-লৌকিককে। এই তাৎপর্যে, তার 'সাদা ঘোড়ার কেশর' স্পর্শমাত্রেই পেয়ে যায় যেন এক প্রতীকী দৃশ্যাবকাশ, অর্থাৎ বস্তুজগতেরই একটা visual ও conceptual space-এর এক-একটি টুকরো। আর এইসব টুকরো জুড়েই তাঁকে গড়ে নিতে হয় তাঁর সমগ্রতার নির্মাণ। কী ভাবে— তা বলছি। আমরা 'সাদা ঘোড়া' কবিতাটির পূর্ণ রূপ দেখি :

সাদা ঘোড়া

সাদা ঘোড়া, তোমার কেশরে আমি হাত দিয়ে আজ
বুঝেছি কেমন শ্বেত কবুতর, স্বাস্থ্য, দুধ, সূর্যের পাহারা,
বুঝি নি গোপন পথে কিভাবে বা চলে যায় ছিন্নবাহু তারা
অজস্র পণ্য নিয়ে— বালি ভেঙে, ক্রমাগত সূর্যহীনতায়

পশ্চিমে, ঢালুর দিকে। পিতৃহীন রণক্লান্ত মহাদেশ জানে
প্রবল হাতুড়ি গড়ে ধর্ম শুধু। পড়ে গেছে সাড়া।
অদ্ভুত বাতাস— তাকি দোলা দেয় খেজুর-মর্মরে ?

নীল তাঁবু স্ফীতমান, হায় ক্রেতা, হায় রে মার্জার
মৃত ঘোড়াদের অন্ত্র ফুলে ওঠে ক্ষুধার্তের হাতে।

কবি যখন 'সাদা ঘোড়া' বলে শুরু করেন, তখন 'সাদা' শব্দটির ওপরেই এমন এক জোর আছে মনে করি যে তার ইনট্যুইটিভ্ ভাষাপ্রকৃতি রঙের সমস্তপ্রকার কম্বিনেশন সত্ত্বেও— এক 'nothingness'-এর প্রতীক। 'বুঝেছি' এবং 'বুঝিনি'— উক্ত কবিতাটির পরস্পরবিরুদ্ধ এই দুটি প্রস্তাব— একদিকে ঘোড়ার কেশরের স্পর্শসহ ইন্দ্রিয়ময়তায় আমাদের প্রেমপ্রীতির গার্হস্থ্যাশ্রম-সূচক 'শ্বেত কবুতর'-এর কমনীয়তা জাগায়, 'স্বাস্থ্য' ও 'দুধ'-এর অনুষঙ্গে আনে স্পর্ধিত যৌবন ও তার আস্বাদ্যমানতা, আর এইসব সফলতার জন্যই উল্লিখিত 'সূর্যের পাহারা' থেকে এসেছে দিনগুলির সতর্ক প্রহরার অর্থবোধকতাও। অন্যদিকে, সেই অন্ত্যর্থকই 'ছিন্নবাহু'। ঘোড়া-কে যখন ঐ 'ছিন্নবাহু' শব্দটির সঙ্গে মিলিয়ে ভাবা যায়, তখন স্বভাবতই 'রণক্লান্ত' ঘোড়সওয়ারদের পতন ও প্রত্যাবর্তনের মুখে— কোনো ডানাকাটা পক্ষীরাজের মিথ, তথা ফ্যান্টাসির প্রশ্রয়ও হয়তো অসম্ভব নয়। যেহেতু 'সূর্যের পাহারা'— 'ক্রমাগত সূর্যহীনতায়/পশ্চিমে, ঢালুর দিকে' আপাতত এক ট্রাজিক পরাভবে পরিসমাপ্ত। আমাদের প্রত্যক্ষ অর্থবাচক জীবনযাপনের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতে যাওয়া ও 'পণ্য' কিনে আনা ইত্যাদি আর্কিটাইপাল অনুষঙ্গের অসদ্ভাব নেই সত্য, কিন্তু পরিণামে— 'পিতৃহীন রণক্লান্ত মহাদেশ'— ও ততোধিক সত্য যেখানে 'প্রবল হাতুড়ি গড়ে ধর্ম শুধু'। 'হাতুড়ি' শব্দটি নিশ্চয় এক্ষেত্রে তার মর্মাঘাত মাত্র। সেই 'মহাদেশ' বা দৃশ্যমান মহাকাশটি যেন

এক 'স্ফীতমান নীল তাঁবু', যদিও ব্যর্থ 'ক্রেতার' জীবনে তার টাট্টু ঘোড়াটি আজ বুঝি 'মার্জার'-এ পরিণত। অতএব, 'সাদা ঘোড়া'-র শেষ পঙক্তিটি এই : 'মৃত ঘোড়াদের অন্ত্র ফুলে ওঠে ক্ষুধার্তের হাতে।' কবিতায় প্রকাশ্য বোঝাপড়া এবং অপ্রকট না বোঝার 'গোপন পথ'— এই দুই তরফা প্রতিবেদনের উপর— কীভাবে এক দীপ্ত মধ্যাহ্নের খরসূর্য ঢলে পড়ছে ও শূন্যগর্ভ সূর্যহীনতার তমিস্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে— সেই nothingness-এর প্রতীকী-চিত্রকল্পটিই এই রচনার প্রধান বিষয়। এবং ঘোড়া নামক বিষয়ানুষঙ্গ থেকে যা ক্রমেই একটি বিষয়হীনতার পর্যবসান লাভ করেছে। যদি বলি, শব্দকে এমন চূড়ান্তভাবে নিঃস্বভাবীকৃত করার মালার্মেপন্থী 'গোপন পথে'— উৎপল-কুমার বসুর পদক্ষেপ আকস্মিক, তবেই বোঝা যাবে, এ পথের বিপরীতে তাঁর অধিষ্ঠান 'ঘোড়া', 'সহিস' ইত্যাদির প্রসঙ্গান্তরে 'ঘাস' ও 'ঘাসের জন্ম'কেই 'শরৎকালীন আবহাওয়ায় আমাদের ক্লান্তিবোধ' বলছে কেন। (দ্র. পৃ., ৪) শুধু আকাশ নয়, মালার্মেপন্থী 'নীলিমা'ই কি পূর্বোক্ত 'নীল তাঁবু' ছেড়ে উৎপলের স্বকীয় 'নীলকুঠি'-তে এসে পড়েনি ? একই বইয়ের মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার ব্যবধানে— 'সাদা ঘোড়া' ও 'নীলকুঠি'-র মতো কবিতায় তাঁর বস্তুনিরীক্ষার পরস্পরবিরুদ্ধ প্রকৃতিতে যথাক্রমে negation এবং affirmation-এর দুটি দিকই যেন লক্ষণীয় হয়েছে। প্রথমোক্ত নীলিমান্তরে, তিনি শুধুই প্রতীকী, অতএব সাংগীতিক। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে, তা-ই অন্বয়প্রধান, ঈষৎ ন্যারেটিভ ও অবশ্যই চিত্রকল্পময়। উৎপলের পুরী সিরিজ-এর প্রতিমা-প্রতীকে এই দুটি প্রবণতাই সমান গুরুত্বে স্বীকৃত হয়েছে বলে মনে করি।

খুব ভালো হত, আমাদের উত্থাপিত উদ্ধৃতিগুলির সমূহ-বিশ্লেষণ। কিন্তু স্থান-কাল-পরিসর বিবেচনা করেই আপাতত তা থেকে বিরত থাকছি। বিরত থাকছি কিন্তু রণে ভঙ্গ দিচ্ছি না। বরং বলছি আবার, ঐসব উদ্ধৃতির স্মরণীয়তা আপনাদেরও নিজের নিজের বিশ্লেষণের বিষয় হয়ে উঠলে, তবেই বাংলা কবিতায় অধুনা উৎপলজাতীয় বিতর্কেরও প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যাবে।

□ ১০ □

তাঁর 'লোচনদাস কারিগর' (১৯৮২) ও 'খণ্ড বৈচিত্র্যের দিন' (১৯৮৬) নামক অপেক্ষাকৃত দুটি ক্ষুদ্র কাব্যপুস্তিকায়, উৎপলকুমার বসু আরো গ্রাহ্য ও গম্ভীর হয়ে উঠলেন কি, বিশেষত, আমাদের অনর্থক হাসাহাসির মুহূর্তে। অথচ তিনি নিজে যখন হাসছেন— ঈষৎ বাঁকা ধরনে, তখনি 'বিজলীবালা' শব্দটিরও রমণীয় শ্লেষ পাঠকের অপটু হিন্দুস্থানী উচ্চারণে— যথেষ্ট ছুঁচোলো মনে হয়। মনে হয়, 'বিজলীবালা'র গোঁফ থাকাই স্বাভাবিক। আচ্ছা, কোনো 'সার্কাস তাঁবুর পথে যেতে যেতে/কতখানি মুক্তি চাই' ভাবলেও তো একরকমের জীবনদর্শন হয় ? উত্তরে, মুচকি হাসি ও স্টেটমেন্ট্— 'দুহাত চার হাত'। অর্থাৎ, 'ভিখিরির সহচর পারিয়া কুকুর ঠিক যতখানি মুক্তি পায়' ! তাহলে, অনেক মুক্তি। আর সেই মুক্তির সমাজ ইতিহাসও ভাবুকদের চুপ-করে থাকার

'আরেক ভাষায়' অলিখিত হয়ে গেছে। আশ্চর্য, এ বই-দুটিতে উৎপল সেই না-লেখার ভাষাসন্ধান করেন এবং লেখেন। প্রায় বছর আষ্টেক চষে-পাওয়া ফসলের ষোলো-দু-গুণে বত্রিশ পৃষ্ঠা শিল্প— কবির গত '৮০ সালে পোঁতা 'ধূসর আতাগাছ'-এরই এস্‌থেটিকস্‌-তাড়িত। পুরী সিরিজে এই এস্‌থেটিকস্‌ ছিল অনেক বেশি লিরিকাল। অধুনা-এর ঘরগেরস্থালি ও চামড়ার বদল হয়েছে— কিন্তু অন্তরাত্মা বিশেষ বদলায়নি। লিরিসিজম্‌ থেকে মুক্তিও তবে 'দু-হাত চার হাত'-এর মুক্ত পয়ার, যার পরতে-পরতে— আমরা এখনো যেটুকু পারছি— তা এই : (১) কবিতাকে মুখের ভাষার মধ্যে এনে বসানো, এবং (২) তারও গায়ের অলংকার আছে অনেক ; অবশ্য লেটেস্ট্‌ ডিজাইনের। (৩) রূপকাদির 'নতুন রূপ' নির্মাণ আর চিত্রকল্প ও প্রতীকের শর্ত অনুযায়ী ক্রমশ একটা এমন ভাষাস্পন্দ জাগানো, যেখানে প্রার্থিত হতে পারে, প্রকৃত অর্থেই, নিঃশ্বসিত গদ্য, অর্থাৎ প্রচলিত গদ্য-পদ্যের থেকে যতিবিচ্ছেদের চিরবিরহ। এজরা পাউন্ড্‌ যেমন ইমেজিস্টের কর্তব্যে চেয়েছিলেন ভাষার সেই রিদম্‌ তৈরি করে নিতে : 'to compose in the sequence of musical— phrase, not in the sequence of metronome'। আমাদের ইদানীংকার কাব্যভাষার তথাকথিত গদ্যগুণেও সেই সাংগীতিক পদবিন্যাসের লঘুগুরুর স্বচ্ছন্দ সহাবস্থান— অবিকল এইরূপ :

ক. 'এই ঘাটে পরমার্থ সিঁড়ি
বহুদিন বাসন মেজেছি
বহুদিন কাপড় কেচেছি
নামিনি গভীরতর জলে
মনে ছিল ভয়, আজো আছে
আংটির গল্প-গেলা মাছে…'

('রক্ষাকবচ')

খ. 'ঘুম আর বোঝাপড়ার মাঝখানে ধ্বনিবহুল ধানক্ষেত সঙ্গীতময় সরীসৃপ
আর দাদাকে জিজ্ঞেস করি সাহেবগঞ্জ কত দূর…'

('বৌভাত')

ভাষার absolute আর triviality পাশাপাশি থাকে তার উচ্চাবচ ধ্বনিতরঙ্গে, যেভাবে থাকলে— গানের কলিও সুরকে বাণীর প্রতীক হিসেবেই পায়। তা 'পরমার্থ সিঁড়ি' আর ঘাটের সে-সিঁড়িতে বসে 'বাসনমাজা' 'কাপড় কাচার' ধুমও আপাতদৃষ্টে মনে হতে পারে দুই মাত্রারই তফাৎ, কিন্তু দুই নয়, তিন মাত্রা। এক— পরমার্থে সিঁড়ি', দুই— 'বাসনমাজা কাপড়কাচা' এবং তিন— 'আংটির গল্প-গেলা মাছের' পুরাণ। পুরনো ঐতিহ্য, কর্মোদ্যম আর সমসাময়িকের উপার্জন, এই তিন মিলে যে ত্রিমাত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে তাতেই ভাষানির্ভর বাস্তবতার 'খণ্ডবিশ্বাস' ও 'খণ্ডবৈচিত্র্যে'র একটা সমগ্র আদল আসে। তার জন্য ঘুমের নিশ্চেতনাকে— বোঝাপড়ার চেতনা-অবচেতনায় আনতে,

একমুখে 'ধ্বনিবহুল ধানক্ষেত' ও 'সঙ্গীতময় সরীসৃপ'-এর প্রতীকভাষ্য-করা, আর অন্যমুখে— 'নিমন্ত্রণলিপি'র জাগর-অনুসন্ধিৎসায়, 'দাদাকে জিজ্ঞেস করি সাহেবগঞ্জ কত দূর'। একদিনকার গুরুচণ্ডাল—'শিবপোড়া মরাদাহ'-র বঙ্কিমী-শ্লেষ, কত-ভাবেই তা ব্যর্থ করে দিয়ে আজকের ভাষাবাস্তব আরো কত-কত প্রার্থিত ও সম্প্রসারিত, সে তথ্য উৎপলেরও মতো শব্দশিল্পী অবশ্যই জানেন।

কিন্তু লিরিসিজম্ থেকে, তার লিরিকাল প্রকট-অপ্রকট আবেগ থেকে, বাংলা কবিতায় দু-চার পঙক্তির 'মুক্তি' কদাচিৎ সম্ভব হলেও, সম্পূর্ণ কবিতার মুক্তি আজও সম্ভব হয়নি। অন্তত, উৎপলকুমার বসু তা পারেননি। আর, তা পারবেনই বা কেন। যদি তিনি জানেন, আবেগ কবিতাভাষার একটা মুভ্মেন্টও বটে, যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই আজও কবিকৃত্য। এই তাৎপর্যে, নিশ্চয় জ্ঞানবুদ্ধিমতে আবেগের যথাযথ সংস্থান ও প্রয়োগ-বিশেষত্বই শিল্পের প্রধান শর্ত।

অতএব, উৎপলেরই প্রতিভূ লোচনদাসের তথাকথিত কারিগরিটাই এ যুগের প্রধান শিল্প। সেখানে আবেগ ও বুদ্ধি উভয়তই সমীকৃত। সেখানে— বস্তুগত 'খণ্ডবিশ্বাস' একটি বিশেষ প্যাটার্ন :

'...'যখন ছিলাম পেটে জায়মান, ভ্রূণরূপী, অসত্য ছিল না
খণ্ডবিশ্বাস ছিল, কাদা ছিল, ছিল বনে পায়ে হাঁটা পথ'

('প্রকৃতি')

আবার, প্যাটার্নটি ভেঙে ভেঙে এগোনোই এখনকার 'সাংবাদিকতার বোধ' থেকে ছাড়া-পাওয়ার প্রকৃষ্ট পন্থা। 'কেননা প্রকৃত স্বপ্নের রূপ নেই, শুধু অবতংস আছে।' অর্থাৎ 'কারিগরি' স্বীকৃত।

তাহলে, এই চিত্রকল্প— 'যা ভাঙবার নয়, তা-ও টুকরো হয়' বলে কবিকে 'আলাদা যুদ্ধের গল্প' লেখার ইন্ধন জোগায়।

'...ফুল হতে ঝরবার আগে
যে-মাকড়লালাবিন্দু স্থির হয় শতছিদ্র জালে
স্মৃতি থেকে বিস্মৃতির ভিতরে ক্রমশ তাকে টেনে নেয়
প্রকৃতি ও আমাদের হুল

সাংবাদিকতার বোধ।'...

('রক্ষাকবচ')

লক্ষণীয় যে 'সাংবাদিকতার বোধে' সে উর্ণজাল আমাদের স্মৃতি থেকে ক্রমশ বিস্মৃতি-বিলগ্ন। যেমন, একই ভিতরটানে 'শান্তি' টানে যুদ্ধ, 'নালে পদ্ম টানে জল', এবং 'নৌকাটিকে টান দেয় বুঝমান ক্ষেত্রজ লোক'। বস্তু ও তার অন্যোন্যনির্ভর অনুষঙ্গধর্ম এই-সব টান ও টেনশনেরই বহু বিচ্ছুরিত রেখা। অধুনা লেখালেখির গোপন ইতিহাসে, কবি তাঁর 'খণ্ড বৈচিত্র্যের দিন'-এ জানান :

'...আমি
হাড় হয়ে জন্ম নিতে চাই...'

('খলসামগ্রী)

এবং 'হাড়ে' যে মাংস লেগে থাকে, সে শুধু যেন তার 'শেষতম হাড়ে' পৌঁছবার জন্য। বস্তুর মৌলিক কাঠামো ঐ 'হাড়'। যাকে 'সময়গাছ' কবিতায় উৎপল বললেন 'করোটিপ্রতিমা'। কিন্তু এই প্রতিমারই জন্য যখন বলা হয়, '...নীল / ইস্পাতখণ্ড থেকে লাফ দিয়ে ওঠা / ধাতুকবিতার / শেষতম হাড়'— তখন, সে দৃশ্যকল্প ইমেজটি আগুন বা স্ফুলিঙ্গও বটে। আবার দধীচির হাড় দিয়ে বজ্রাস্ত্র-তৈরির পুরাণকল্পনাও, এ স্থলে, যেন কবিরই আত্মোৎসর্গপরায়ণ self-identification-এর তুল্য। অতএব আর্কেটাইপ। আগুনকে যেমন আমরা খেতে দিই, করোটিপ্রতিমার তেমনি চাই 'মাটি'। চাই 'খড়-অলঙ্কার'। তাকে মাটিচাপা 'অন্তরাল' থেকে টেনে বের করাই তাই কবিকৃত্য। কবির পুনরুদ্ধারও বটে। □

ভাষার ব্যবহার : উৎপলকুমার বসু

উপল দত্তগুপ্ত

কবিতার শরীর তৈরি হয় শব্দ দিয়ে, সেই শব্দ যা আমরা ব্যবহার করে আসছি বহুকাল ধরে। মহৎ কবিরা কিন্তু এই ব্যবহৃত শব্দ দিয়েই আলোকিত করেন কবিতার শরীর, সৃষ্টি করেন কবিতা আর পাঠকের মধ্যে এক সম্পর্ক যাতে আপ্লুত হন পাঠক। কিন্তু ইদানীং এই ধরনের কবিতা আর আমরা খুব একটা পাচ্ছি না।
দেবেশ রায় বা কমলকুমারের গদ্য আলাদা ভাবে চেনা যায়। কিন্তু আজকাল যাঁরা কবিতা লিখছেন তাঁদের অধিকাংশের কবিতা, যদি কবির নাম ছাড়া আমাদের দেওয়া হয় তখন পাঠক সব কবিতাকেই একজন কবির কবিতা বলে ভুল করতে পারেন। উৎপলকুমার বসুর কবিতা কিন্তু এই সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। কিন্তু ব্যতিক্রম বলেই তাঁর কবিতা ভালো লাগে এরকম অদ্ভুত দাবি আমরা নিশ্চয়ই করব না। ভালো-লাগা, না-লাগাটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অনেক অদৃশ্য সুতোর টান, অনেক অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গ। আমরা বরং অন্য দিক দিয়ে বিষয়টাকে দেখি।

আমরা বলেছি শব্দ দিয়েই তৈরি হয় কবিতার শরীর। আবার একদিক থেকে দেখতে গেলে, শব্দই কবিতার প্রাণ কারণ যে সমস্ত বাক্য কবিতায় ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের অর্থ একদিক থেকে নিরূপিত হচ্ছে সেই সমস্ত বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের দ্বারা। কিন্তু শব্দের অর্থ নির্ধারিত হয় কী ভাবে? অগস্টাইন মনে করেছিলেন যে শব্দমাত্রই কোনো না কোনো কিছুর নাম। তাই তাঁর মতে, শব্দের অর্থ নির্ধারিত হয় সেই শব্দের দ্বারা নির্দিষ্ট বস্তুর মাধ্যমে। এই মত গ্রহণযোগ্য কিনা সেই প্রশ্নে না গিয়েও অন্তত এইটুকু হয়তো বলা যেতে পারে যে এই মতটা কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য নয়। একটা সময় ভিটগেনস্টাইনও (যখন তিনি *Tractatus Logico Philosophicas* লেখেন) এই মত সমর্থন করতেন।

কিন্তু *Philosophical Investigations* লিখবার সময় ভিটগেনস্টাইন এই নামের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। এখানে আরও একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। এক সময়ে চমস্কি ভাষা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে জোর দিয়েছিলেন ভাষার আকারের দিকে। তাঁর আলোচনায় তাই ভাষার দৈনন্দিন ব্যবহারের দিকটা বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। একসময়ে ভিটগেনস্টাইনও ভাষার আলোচনা করতে গিয়ে আকারের আলোচনার দিকে ঝুঁকেছিলেন। *Tractatus*-এ তিনি এইরকম একটা ধারণাকে লালন করেছেন যে, সমস্ত বাক্যেরই সামান্যত একটা তর্কবিদ্যাগত আকার রয়েছে। কিন্তু *Philosophical Investigations*-এ আমরা পেলাম নতুন এক ভিটগেনস্টাইনকে। এখানে তিনি জানালেন যে ভাষাকে নানারকম ভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব এবং সেই জন্যই তার মধ্যে নানারকম আকার থাকতে পারে। এখানেই তিনি বললেন 'ভাষার খেলা'র কথা। এই ব্যাপারটা বোঝা আমাদের পক্ষে খুব জরুরি। নামের বৃত্ত থেকে ভিটগেনস্টাইন যে বেরিয়ে এলেন তার কারণটাও এ প্রসঙ্গে বোঝা দরকার। *Philosophical Investigations*-এ ভাষার ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভিটগেনস্টাইন যন্ত্রপাতির বাক্সের বিভিন্ন যন্ত্রের বিভিন্ন ব্যবহারের প্রসঙ্গ এনেছেন। একটা যন্ত্রপাতির বাক্সে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র থাকে। তাদের কাজও বিভিন্ন। ভিটগেনস্টাইন মন্তব্য করেছেন যে বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার যেমন বিভিন্ন, শব্দের ব্যবহারও সেইরকম বৈচিত্র্যপূর্ণ। ভাষার ব্যবহারের এই বৈচিত্র্যকে ব্যাখ্যা করার জন্যই ভিটগেনস্টাইন 'ভাষার খেলা'র কথা বলেছেন। সাধারণভাবে 'খেলা' শব্দটির কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। ফুটবলও খেলা আবার নবজাত শিশু যখন হাত-পা আন্দোলিত করে তখনও আমরা 'খেলা' শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। বলি—'শিশুটি খেলছে'। একই রকম ভাবে—ভাষার ব্যবহারকেও একটা নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে বেঁধে রাখা যায় না। কাজেই ভিটগেনস্টাইন যখন 'ভাষার খেলা'র কথা বলেন তখন সেখানে 'খেলা' শব্দটারও একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। ভাষার বিভিন্ন ব্যবহার যে, কোনও সাধারণ নিয়মকে মেনে চলে না, তা বোঝানোর জন্যই ভিটগেনস্টাইন ভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে 'খেলা' শব্দটি নির্বাচন করেছেন। তাঁর মতে ভাষার ব্যবহার এতই বিচিত্র যে, কোনও সাধারণ নিয়মের শৃঙ্খলে

তাকে বাঁধা অসম্ভব। অবশ্য 'ভাষা' বলতে আমরা এখানে সাধারণ ভাষাকেই বুঝছি, কৃত্রিম ভাষাকে বুঝছি না।

এবার একবার কবিতার দিকে চোখ ফেরানো যাক। উৎপলকুমার বসুর কবিতায় ভাষা ব্যবহারের বিভিন্নতাই আমাদের বুদ্ধিকে নাড়া দেয়। বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলোকে তিনি তাঁর কবিতার শরীরে এমন ভাবে স্থাপন করেছেন বা ব্যবহার করেছেন যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তৈরি হয়েছে ভাষার, বা বলা যেতে পারে, বাক্যের নতুন আকার এবং তার ফলে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলো পেয়ে গিয়েছে নতুন এক মাত্রা। তাঁর কবিতা মার্গ সংগীতের মতো, উপস্থাপনাই যেখানে নিয়ন্ত্রিত করে অর্থকে। কবিতার শরীর থেকে শব্দ বা বাক্য তুলে এনে এটা দেখানো অসম্ভব ; যেমন অসম্ভব কোনো চিত্রকরের ছবির কোনও একটা অংশকে বিচ্ছিন্ন করে তার মূল্যায়ন করা। সামগ্রিকভাবেই তার বিচার করতে হবে কারণ তার প্রতিটা অংশই পরস্পর-সংযুক্ত। উৎপলকুমারের কবিতাকেও তাই সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে, কারণ সেখানেও প্রতিটা শব্দ জড়িয়ে আছে একে অপরের সঙ্গে। বিমূর্ততা থেকে সরিয়ে এনে ভাষাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন জীবন ও ব্যবহারের মধ্যে। শব্দের বা বাক্যের অর্থ যে উপস্থাপনার উপরেই অনেকাংশে নির্ভর করে, নির্ভর করে কী ভাবে তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপরে, তাঁর লেখার মধ্যে উৎপলকুমার এই ধারণাকেই যেন লালন করেছেন। ভাষার আকার নিয়ে তাঁর এই খেলা বাংলা কবিতাকে বদ্ধ জলাশয় থেকে মুক্ত করার এক সাহসী প্রয়াস।

উৎপলকুমারের কবিতা 'আকারসর্বস্ব'—এইরকম ভাবলে অবশ্য ভুল হবে। বাক্যের আকার যে অনেকাংশেই বাক্যের অর্থকেও নিয়ন্ত্রিত করে, বাক্যের আকার ও তার মাধ্যমে প্রকাশিত বক্তব্য যে একই মুদ্রার দুটো দিক, এইরকম একটা বিশ্বাসও যেন তাকে ঘিরে রয়েছে। □

☐ With best compliments from ☐

M/s. DAS PRINTERS

123/1, ACHARYA P. C. ROAD, CALCUTTA-700 006
Phone : 350-4312, 350-8843

Leading House of Quality Letter Press & Off-Set Printing

ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা

গৌতম বসু

ভাষায় ও চিন্তায় বাংলা কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসে তাঁর সমসাময়িক কবিরা সার্থক, এ-বিবেচনা যদি নির্ভুল হয় তবে উৎপলকুমার বসুর কবিতার অবস্থান কোথায়? কী কারণে তাঁর কবিতা পঠিত হচ্ছে আজ, পঠিত হবে ভবিষ্যতে? একটি বালিকা ধারাপাত বিক্রি করতে করতে এসে পড়েছে শ্মশানে, অথচ আশ্চর্য, শায়িত মৃতদেহটিকে নিরক্ষর জ্ঞান করছে— উৎপলকুমারের এ উদ্বেগ কি সঞ্চারিত হল বাংলা কবিতায়? যেসব স্ত্রীলোক রণভূমি অতিক্রম করে যেতে চেয়েছিলেন একদা, প্রহরীর নিঃশর্ত অনুমতি তাঁরা পেলেন কি? আজ মনে হয় এইরকম অজস্র প্রশ্নের আড়ালে সম্পূর্ণ নতুন একটি কাব্যভাবনা নীরবে এখনও অপেক্ষমান। এর সঙ্গে বর্তমান কবিতাপাঠকের প্রথম পরিচয় হয়েছিল প্রায় চল্লিশ বছর আগে অথচ, যে-অভিজ্ঞতার প্রাথমিক বিস্ময়বোধ এ-পাঠক এতদিনে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পেরেছে, এমন কথা নির্দ্বিধায় বলা যাবে না। কবিতা কী হয়ে উঠতে পারে, কতদূর যেতে পারে, কেমন উড়তে পারে আরও, তারই সঙ্কেতধ্বনি

যেন গচ্ছিত রয়েছে উৎপলকুমার বসুর রচনায়। তাঁর কবিতার নানা প্রান্ত ও গুণের কথা আলোচিত হতে শুনেছি বহুবার, সেই সূত্র অনুসরণ করে মনে হয় তাঁর লেখার সমস্ত লক্ষণের নিচে একটি গুণ তাঁকে সতত কর্মক্ষম রেখেছে, শুধু বিশেষতা নয়, তাঁকে একাকীত্বও দিয়েছে— পূর্বজ্ঞানক্ষমতা। এই কারণে, স্বল্পায়ু কবিতার জগতে 'চৈত্রে রচিত কবিতা'-র যে কোনো পৃষ্ঠা আজও স্মরণযোগ্য। 'দূর থেকে হাত তোলো, যদি পারো জানাও সম্মতি / না হ'লে সঙ্কেত আজও বৃথা যায়'— ঠিক এইরকম একটি মন্দ্রস্বরের জন্য বাংলা কবিতা প্রস্তুত ছিল না। আনন্দের কথা, অপ্রতিরোধ্য স্বরটি চিনে নিতে, গ্রহণ করতে বাংলা কবিতা দ্বিধাবোধ করেনি। আজকের নবীনতম পাঠকের দৃষ্টিতে উৎপলকুমারের কৃতিত্ব তত প্রকট নয় কারণ তাঁর কাজের অনেকটাই বাংলা কবিতার মূলদেহে দ্রবীভূত হয়ে গেছে, তিনি যে-সম্ভাবনার দিকগুলি একদা খুলে দিয়েছিলেন সেগুলির কিছু-কিছু অবলম্বন করে স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে উঠেছে বিগত ত্রিশ বছরের কাব্যসাহিত্য, মনে হচ্ছে, নিত্যসঙ্গী এইসব কবিতা বুঝি চিরকাল আমাদের সঙ্গেই ছিল। বস্তুত, এটিই যে কোনো কবিতার উৎকর্ষের শেষতম পরীক্ষা ; যে কবিতা আলাদা হয়েই রইল, আরও পাঁচটি তৃণের মতো তৃণ হয়ে উঠতে পারল না, মিশে যেতে, হারিয়ে যেতে পারল না মানুষের দীর্ঘায়ু ভাষা আন্দোলনে, সে কবিতা, আমরা জানি, মৃত। একটি কবিতা কবে নতুন ছিল, কবে থেকে সে প্রাচীন হতে শিখল— এ-প্রশ্নের সদুত্তর হয়ত নেই, অথচ, এইখানেই লুকিয়ে রয়েছে তার প্রাণভ্রমর।

কথাগুলি এই কারণে উঠছে যে উৎপলকুমার বসুর কবিতা এখন সেই সন্ধিক্ষণে উপনীত যেখান থেকে তাকে রূপান্তরিত হতে হবে পুরাতনে। আমরা যারা তাঁর সমসাময়িক নই, 'চৈত্রে রচিত কবিতা' অথবা 'পুরী সিরিজ' কেউ-কেউ হয়তো ছুঁয়ে দেখতে পেরেছি মাত্র, মুখে-মুখে শিখে নিতে হয়েছে তাঁর কবিতা, পরে বিশ্ববাণী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণে ফিরে পেয়েছি স্বপ্নোত্থিত সেই সকল অত্যাশ্চর্য পংক্তিমালা, তারাই উৎপলকুমারের কবিতার পরিণতির প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমাদের সময়ের অনেকের লেখা তাঁর কবিতা থেকে রসদ সংগ্রহ করেছে, তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত কথোপকথন থেকে কুড়িয়ে পাওয়া সূত্র ধরে কাজ করার চেষ্টা করেছি আমরা অনেকেই, প্রত্যেকেই তাঁর কবিতার ভয়ংকর সম্মোহনক্ষমতা থেকে নিজেদের লেখা বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন অনুভব করেছি।

দুই

ভাষা, অনেক ক্ষেত্রে, মনের ভাব, যতটা প্রকাশ করে, গোপন করতে পারে তার চেয়ে বেশি ; প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের পরিবর্তে বক্তার অভিপ্রায় অনুসারে ভাষা একটি সাঙ্কেতিক বার্তার রূপ গ্রহণ করে। দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভাষায় এই মাত্রা অপ্রতুল না হলেও সন্দেহ নেই এর সর্বোৎকৃষ্ট প্রয়োগ আমরা দেখি কবিতায়। ভাষার এই সঙ্কেত-

ধর্ম, বলা বাহুল্য, একদিনে অথবা কোনো দ্রষ্টার একক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠেনি ; এর অন্তরালে রয়েছে দীর্ঘ বিবর্তনের, সামাজিক নিপীড়নের, রাজভয়ের, লোকভয়ের ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবন্ধনের কাহিনী। আমরা যাকে বাংলাভাষার আদিকবিতা বলে মানি সেই চর্যাপদেই রয়েছে সেই গূঢ়লেখের অভিজ্ঞান, কিন্তু এমন মনে করা ভুল হবে যে সর্বত্র, সর্বকালে কবিরা এই সঙ্কোচনকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। সম্প্রসারণ অথবা সঙ্কোচন, উভয়ই সমাজে কবির অবস্থানের উপর প্রধানত নির্ভর করে ; এমনকি, প্রান্তদুটির চরিত্রলক্ষণ একই সময়ে একই ভাষায় প্রকাশিত হওয়াও অসম্ভব নয়। একটি উদাহরণ হয়তো অসংগত হবে না— রামমোহন রায় ও লালন শাহ ফকির প্রায় একই সময়ে, একই ভাষায় গীত রচনা করেছেন অথচ তাঁরা সর্ব অর্থে দুই ভিন্ন পৃথিবীর অধিবাসী। রামমোহনের প্রয়োজন ছিল সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের, তাঁর ভাষাও সেইমতো গড়ে উঠেছে। অন্যপ্রান্তে লালন শাহের অবস্থান যেখানে সেখানে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের তীব্র ও নিষ্ঠুর শাসন সর্বব্যাপী ; আমরা অনুমান করতে পারি, পরিত্রাণ পাবার আশায় লালন একটি ব্যক্তিগত ভুবন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তাঁর ভাষাও সেই প্রয়াস ও সার্থকতার সাক্ষ্য বহন করে। অন্য পাঁচটি বাউলগীতের পাশে লালন শাহের কাজ রাখলে অন্তত দুটি কথা উঠে আসে ; এক, বাউলসাহিত্যের অনেকটাই নিছক অনুকরণের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং দুই, বহু রচনাই তত্ত্বের ভারে অবহ। বস্তুত, লালন শাহকে একাধারে একজন মৌলিক ভাবুক ও প্রধান কবি রূপে স্বীকার করার ভিত্তি আমার মনে হয় এই যে, তত্ত্বের দাস তিনি নন, তাঁর রচনা, শেষ পর্যন্ত, তত্ত্বভারমুক্ত নিরুপম লিরিক। এখানে আমরা হয়তো একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রে উপনীত হয়েছি। সামাজিক অবস্থানের কারণে যাকে গূঢ়চারী হতে হল, ভাষা দিয়ে বাধ্যত আড়াল করে রাখতে হল কান্নাহাসি, ভাষা তাঁকে শুধুমাত্র নিরাপত্তারই প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ব্যবহারের এই স্তরে সীমাবদ্ধ না থেকে ভাষায় সঙ্কেতময়তার গুণকে যিনি শিল্পের স্তরে তুলে আনতে পারেন, যাঁর হস্তক্ষেপে উপযোগিতার মাত্রান্তর সম্ভব, তাঁর কীর্তি বারংবার স্মরণযোগ্য। সঙ্কেতের প্রয়োগ আত্মরক্ষার প্রয়োজনবোধে আবিষ্কৃত একটি পদ্ধতিমাত্র, তাকে লালন শাহ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন তত্ত্বের ভার থেকে মুক্তির এক উপায় রূপে— বিশেষ অর্থে সাঙ্কেতিক ভাষার ব্যবহারে এবং সাধারণভাবে কবিতার ইতিহাসে এটি এক বিরল দৃষ্টান্ত।

সঙ্কেত প্রয়োগের তাৎপর্য ও সম্ভাবনা বোঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা এতক্ষণ একটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করেছি ; ভিন্ন পরিবেশ থেকে গৃহীত আরও একটি দৃষ্টান্ত এবার দেখা যেতে পারে। জর্মানি থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরেও, নাৎসি বাহিনী থেকে রক্ষা পাবার জন্য কুর্ট শুয়িটর্সকে ইয়োরোপের নানা দেশে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। অবশেষে নাৎসি বাহিনী কবলিত নরওয়ে থেকে জলপথে তিনি পৌঁছলেন স্কটল্যান্ডে, কিন্তু জন্মসূত্রে জর্মান হওয়ার কারণে ইংরেজ বাহিনীর হাতে তাঁকে বন্দী হতে হল। অজ্ঞাতপরিচয় সেই মানুষটি তাঁর স্বদেশ থেকে বাক্সভর্তি কোলাজ সামগ্রী ব্যতীত

কিছুই আনেননি, সেগুলি পোস্টারের ছেঁড়া অংশ অথবা ক্লোকরুমের টিকিটের চেয়ে বিপজ্জনক কিছু নয়, ইংরেজ সেনা ক্রমে তাঁকে কিছুটা প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করলেন। এই পরিবেশে এবং মুক্ত হওয়ার পর, শুয়িটর্স যখন তাঁর জীবনের অন্তিমপর্বের কোলাজগুলির কাজে ব্যাপৃত, তখন তিনি নিশ্চয় অনুমান করতে পেয়েছিলেন যে, এইভাবে কাজ করতে-করতে সকলের অজ্ঞাতে একদিন তাঁর মৃত্যু হবে। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান চিত্রীদের মধ্যে শুয়িটর্সের স্থান আজ তর্কাতীত ; সাঙ্কেতিক ভাষায় গঠিত শিল্পকর্ম যে কোন্ স্তরে পেঁছিতে সক্ষম তা, তার কাজের মধ্যে আমরা আরও একবার প্রত্যক্ষ করি। ধ্বংসস্তূপ থেকে কুড়িয়ে আনা কাগজের টুকরো সাজিয়ে কী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন শুয়িটর্স? তাঁর দশদিকে অস্থিপঞ্জরের, পরিত্যক্ত মূল্যবোধের স্তূপ, প্রাণের স্পন্দনটুকুও যেন রুদ্ধ— এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে, পুনর্গঠন অন্তত তাঁর পক্ষে দুরূহ সাধনা ছিল সন্দেহ নেই। সমস্ত দুঃখ দুর্দশা উপেক্ষা করে সে-কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন শুয়িটর্স ; তাঁর ভাষায় 'এভ্রি থিং হ্যাড ব্রোকেন ডাউন ইন এনি কেস, অ্যান্ড নিউ থিংস হ্যাড টু বি মেড আউট অফ ফ্রাগমেন্টস'।

তিন

দীর্ঘ এই অবতারণার কারণ অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। বাংলা কবিতার পাঠক নিশ্চয় অবগত আছেন যে উৎপলকুমার বসুর কবিতাও প্রবলভাবে সাঙ্কেতিক গুণে আক্রান্ত। তাঁর ভাষায় প্রবেশাধিকার অর্জন করতে না পারলে, তাঁর সংশয় ও উদ্বেগের অংশীদার না হতে পারলে, বারংবার পাঠেও কবিতার মর্মার্থ অনায়ত্ত থেকে যাবে। এই কারণ-বশত, তাঁর পাঠক সংখ্যা বহু হলেও অগণিত নয় এবং যা আমাদের কাছে পরম সৌভাগ্যের কথা. এই কারণে তাঁর কবিতার পংক্তি বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয়েছে, এই দৃশ্য থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি। এই আলোচনায় আমরা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বত্র প্রযোজ্য কোনো নিয়ম নেই ; সঙ্গে-সঙ্গে আমরা দুটি সূত্র পেয়েছি, এক, সঙ্কেত ব্যবহারের সঙ্গে সংকটমোচনের একটি সম্পর্ক রয়েছে এবং দুই, সংকটমোচনের প্রসঙ্গটি প্রাথমিক স্তরের, কবিতায় একটি উত্তরণের সম্ভাবনা যদি না থাকে তবে তার আয়ুষ্কাল খর্ব হতে বাধ্য। এই কথাগুলি উৎপলকুমার বসুর কবিতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তৎক্ষণাৎ দুটি গভীরতর চিন্তা আমাদের ভাবিত করে এক, কোন্ সংকটের সম্মুখীন হয়ে তাঁকে সঙ্কেতের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং দুই, কোন্ উত্তরণের সম্ভাবনা আমরা পাই তাঁর লেখায়?

প্রথম প্রশ্নটির সদুত্তর নির্দিষ্ট করা সহজ নয় মানি, তবু মনে হয় উৎপলকুমার বসু ও তাঁর সতীর্থদের ক্ষেত্রে এটি ছিল আত্মপ্রকাশের সংকট। তাঁদের সময়ের পূর্ববর্তী এক শত বছরের পরিসরে বাংলা কবিতা ও সাধারণভাবে বিশ্বসাহিত্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে তা বিস্মৃত হবার সুযোগ নেই। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো তরুণ লেখকের আত্মপ্রকাশের সমস্যাকে ন্যূনজ্ঞান করবারও কোনো উপায়

নেই। কোন্ পথে হাঁটবেন তিনি? সমস্ত জমি কর্ষিত, সব চিন্তা কবিতায় আকার-গ্রহণ করেছে, এমনকি অন্য এক কবির পংক্তি উদ্ধার করে বলা যেতে পারে, 'সব কবিতাই পুনর্লিখিত কবিতা'— এই পরিস্থিতিতে একটি ব্যক্তিগত ভাষার, একটি 'ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা'র নিরন্তর সন্ধান ব্যতীত তরুণ লেখকের সম্মুখে অন্য কোনো পথ খোলা নেই। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই প্রক্রিয়াটি লেখকের জীবনে অতিশয় কষ্টকর একটি অধ্যায়, কিছু কবিতায় তার ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেলেও, সাধারণভাবে কেউ কোনোদিন লেখকের এই কৃচ্ছ্রসাধনের কথা বিশদ জানতে পারেন না। এইজন্য, লেখকের পদক্ষেপ যখন সত্যিই পাঠকমহলে ঘোষিত হয় তখন তা একই সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর। উৎপলকুমারের কবিতা প্রসঙ্গে পাঠকের বিস্ময়বোধ আজও অক্ষত কারণ তাঁর প্রস্তুতিপর্ব রহস্যাবৃত; প্রথম থেকেই তাঁর লেখায় যেমন একটি পরিণত মনের পরিচয় পাই, তেমনই অন্ধকারে রয়েছে তাঁর কবিতার পূর্বসূত্র। বস্তুত, বিভিন্ন উৎস থেকে তরঙ্গ এসে মিশে গিয়েছে তাঁর লেখায় যে কোনো একটি বা দুটি উৎস শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব। প্রসঙ্গত, আজ তাঁকে প্রকৃত অর্থে এক মৌলিক কবির মর্যাদা দেওয়া হয় এই শর্ত মেনে নিয়েই যে তাঁর কবিতা শুধুমাত্র অভিনব নয়, বাংলা কবিতার অভিজ্ঞতায়, নতুন।

একজন কবির কষ্টের ও আত্মখননের কথা শেষ পর্যন্ত কেউ মনে রাখে না, শুধুমাত্র একটিই প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে; বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে কবিতা মুক্ত হতে পারল কি না, কবির তমসাবৃত জীবন ছেড়ে সে কি উড়ে যেতে পারল অন্তরীক্ষে? পুরী সিরিজের কিছু কবিতা এমনই, মনে হয় এরা যেন জীবনকে খুব কাছ থেকে ছুঁয়ে রয়েছে অথচ যেন বাঁধা পড়েনি কোথাও, যেন এরা কারুর মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, উদ্ভিদের মতো যেন আপনিই গজিয়ে উঠেছে। একেই উত্তরণ বলব কি? যে অর্থে পাখি মরণশীল কিন্তু পাখির ডাক অমর, সে অর্থে এইসব কবিতা লেখকের জীবন ছেড়ে, ছায়া হয়ে সতত ফিরছে কি? একান্তই ব্যক্তিগত অনুভব এটি, প্রমাণাদি পেশে অক্ষম, তবু বলতে ইচ্ছা হয় উৎপলকুমার বসু অনাগতকালের উদ্দেশ্যে কবিতা লিখেছেন, কয়েক ক্ষেত্রে কবিতাগুলি যেন তাঁকেও প্রত্যাখ্যান করে চলে যেতে চেয়েছে নিরুদ্দেশে, না হলে কেন তাঁকে নিজেরই কবিতার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হবে, কেনই বা শেষ কবিতায় এসে প্রকৃতির ভিতর হারিয়ে যায় তাঁর ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা? কোনো এক গুণীজন বলেছিলেন, সত্য, এই পৃথিবী আমার উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি কিন্তু তার চেয়েও গভীর কথা এই যে, ভাবীকালের হাত থেকে পাওয়া এক কর্জ এই পৃথিবী; উৎপলকুমার বসুর কিছু কবিতা পড়ে বোঝা যায় এটি অতি মূল্যবান এক উক্তি। □

With best compliments from :

MAITHAN CERAMIC LIMITED

CHIRKUNDA : PIN : 828202
DIST. : DHANBAD

With 30 years of dedicated service to the Nation serving core sectors like Steel, Glass, Aluminium Chemicals, Petrochemicals, Cement and Other Ferrous and Non-Ferrous Industries backed up with Qualified Engineers for after sales service.

Product range includes High Alumina Bricks upto 95% Alumina, Zircon, Zirmul and Basic Refractories like Magnesia Carbon, Magnesite, Mag. Chrome Bricks and Insulating Bricks in wide range with Allied Mortar, Ramming Masses and Castable.

Produces Refractories to I. S. and various International Standards

Regd. Office :
3F, EAST INDIA HOUSE,
20, BRITISH INDIAN STREET,
CALCUTTA-700 069.

Telephone : 243-0758 (4 Lines)
Telex : 021-5051 MCPL IN
Fax : 033-230585 : GRAM : MACERA
Works Telephone : (06552) 22191, 23005, 22070.

কোরা কাপড়, গিঁট এবং পাপ সমুদ্রের মতো কবিতা

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

['সংযোজন' অংশ বাদে এ লেখার প্রথম অংশটি 'ইন্দ্রাণী সাহিত্য', মে-৯৪, সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।—সম্পাদক]

১. □ It is necessary to return to zero first. □ Godard
উৎপলকুমার বসুর কবিতার মুখোমুখি, প্রথমাবধি, গিয়ে দাঁড়ালেই আমার কানে ভেসে আসে কিছু, এবং যার আড়াল থেকে তাঁর, গোদারের, জয় অফ লার্নিং-এর চরিত্রটি, প্যাট্রিসিয়ার সেই অমোঘ মন্তব্য[১] যে, 'I want to learn, to teach myself, to teach everyone that we must turn back against the enemy that weapon with which he attacks us : Language', ভাষা। এবং উৎপলকুমার বসুর কবিতা। খেই হারিয়ে যায় এরপরে। টের পেতে থাকি দৈনন্দিনতার চামড়া ফুঁড়ে 'কবিতা' বলতে যা বোঝায়, যা বুঝেছি আমি, এতদিনে, ত্যুর ইফেলের দানবিকতায় তা যেন এসে আছড়ে পড়ল আমার বোধে। চোখ বন্ধ হয়ে আসে আমার, এবং যেন সন্ধ্যার প্রথম কুমারীআঁধার, সবকিছু ফুঁড়ে ঝলসে ওঠে একের পর এক ছবি,

ছবিগুলি তাঁর, আবছা। আমি টের পেতে থাকি ওঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার[২] উৎসর্গ পত্রের ঐ বজ্রসম শব্দগুচ্ছকে যে, 'একদিন, যখন সময় হবে, বোসো এই কাব্যের পাশে।' যখন সময় হবে— বলছেন উনি, শুনতে পাই— 'যখন সময় হবে'! কেটে-কেটে, থেমে, যার রক্তের গভীরে নিহিত থাকল ঐ 'আমি স্তব্ধতাকে ভালবাসতে শিখব আরো বেশি কথা বলে।'[৩] ফের যেন উল্কাসম কোনোকিছু, ফের, ফিরে আসে ঐ শব্দ, প্যাট্রিসিয়ার ঠোঁট থেকে, যে Language, এবং এবার, টের পাই, এ-ফেরার চরিত্র আলাদা, কিঞ্চিৎ। বলে নেয়া ভাল, উৎপলকুমার বসুর 'কবিতা' বলতে কী যে বোঝায় ঠিক জানি না আমি। আমার কিছু অন্ধকার আছে, ব্যক্তিগততম কিছু অতীতে-আবছা সিপিয়া এবং রঙহীন ছবিমালা আছে— উৎপলের লেখা, আমি বলি এখানে, ধাক্কা দিয়ে যায় ঐ ছবিরই ত্বকে, আলতো স্পর্শেই যা ফুঁড়ে জেগে ওঠে সূর্যাস্তের সোনালিতে জন্ম-নেয়া ময়ূরীটির অস্তিত্ব-জটিল ডাক, যার, মধ্যে একাকার হয়ে রইল দেখুন ঐ 'নক্ষত্রে সাজানো ডানা' তার : 'নির্দেশের গভীরতা থেকে উঠে এসে, উন্মাদ, যা চকিতের ঝাপটে চুরমার করে দেয় আমাদের সাজানো-গোছানো বেঁচে থাকার ঘর-সংসার। অতীতের রঙ ভেদ করে উঠে আসে এইসব, এতকিছু, স্পর্শের অতীত এইসব। টের পাই, আর চোখে পড়ে সন্ধ্যা থেকে সন্ধ্যার অতীত অন্য কোনো সন্ধ্যার আদিম না-বোঝা ভেদ করে, ছিন্ন ভিন্ন করে লাফিয়ে উঠল কেউ, কোনো কিছু, যার পেছন-পেছন জঙ্গলের মর্মে ছুটে চলেছে বনকুকুরের সারি পেছনে লুব্ধক… সমুদ্রমন্দির…

২. ☐ The image serves neither as illustration nor support for thought, ☐ Sartre

আমি জানি না কাকে শূন্য বলে, 'জিরো'র অর্থ জানা নেই আমার। ফলে আমাকে এ-লেখায় হাতড়াতে হবে এবং যেন প্রথম অক্ষর-পরিচয় হল এভাবেই, দেখি, খুলে যাচ্ছে নতুন জগৎ। এবং আমার মনে পড়ে সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে বোধিধর্ম[৪]-এর কথোপকথনের শেষাংশ, যে : 'কিন্তু হে প্রভু, আমি যখন আমার মনের খোঁজ করছি কই দেখা তো পাচ্ছি না তার।' এবং জবাবে বুদ্ধের নিস্তাপ চোখ তুলে তাকানো, 'there ! I have pacified your mind'[৫] বুদ্ধের এই কথা থেকে কিছু পাইনি আমি, কেবল সামান্য কেঁপে-ওঠা বাদে, শিহরণ বাদে। এবং টের পেয়েছি, হয়তো এই সেই জিরো, শূন্য, হয়তো, যা 'কবিতা' বলতে আমি যাকে অনুভব করি আদিম দেবতাদের সেই হো হো হাসির স্তব্ধ উল্লাসটুকুকে ছড়িয়ে ব্যাপ্ত করে দেয় আমাদের মধ্যে, যার পরে বদলে যেতে থাকে জীবন, এবং ঐসব টুকরো টুকরো ছড়িয়ে থাকা যার মধ্যে একাকার, সেই ধারণাও।

ভাষা-বিষয়ক কথা আসে এরও পরে। সরলতা মিরর হাউস[৬] থেকে শুনি ভেসে এল স্বরগুচ্ছ, উনি বলছেন শোনা যায়, 'যদি স্পষ্ট মনে পড়ে আমার পানীয় ছিল সারাৎসার— পৃথিবীকে ভরাট লেবুর / মত মনে হয়েছিল— ব্যথা-বেদনার দূর মাস্তুল,

কুম্ভীপাক ঘুরে গিয়েছিল দেখে / আমারই মুঠোর মধ্যে ঐ গোল অর্থহীনতা— ফাঁপা নিষিক্ত ও সহিষ্ণু জীবন / ও জীবনব্যাপী কলরোল…'৭ এবং টের পাই, উৎপলের কবিতা বলতে ঠিক যে কী তা ছেয়ে গেল আবছা রহস্যময়তায়, যার আবরণ ভেদ করে ছেঁড়া-ছেঁড়া উড়ে আসে দেখি উচ্চারণ 'আমার চেতনা শুধু শব্দের করস্পর্শে ভেঙে যায়। / অথবা তাকেই খুঁড়ে ফেলি যেন উদ্বেলিত'।৮ টের পাই এ-ও যে যদিও কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ওঁর মোট পাঁচটি, '৬১-তে বেরুনো 'চৈত্রে রচিত কবিতা' থেকে সাম্প্রতিক '৮৬-র 'খণ্ড বৈচিত্র্যের দিন' পর্যন্ত, তবু বই ধরে ধরে সালতামামি নির্ভর, বিবর্তনমুখী কোনো আলোচনা ওঁকে নিয়ে অসম্ভব, আমার পক্ষে অন্তত ; আমি কেবল পারি ওঁর খুঁড়ে আনা দৃশ্যচ্ছবির সামনাসামনি নিজেকে মেলে ধরতে, সাড়া দিতে, বাধ্যত। ফলে এ-লেখায় শেষাবধি দেখা যাবে পাঠকের ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য উন্মোচিত ঐ নিষিদ্ধ পারমাণবিক চুল্লির মুখোমুখি এক নেহাতই মানবকের আত্ম-সমর্পণ, নিরুপায়।

কবে থেকে লিখছেন উৎপল, পঞ্চাশের কোন সময় থেকে, তাঁর লেখার কৃত্তিবাসের উত্তেজনাময় দিনগুলোর ভূমিকা কতটুকু তাহলে এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাব না আমরা, বললাম। কেবল মাথা ঘামাব গোদারের ঐ 'জয় অব লার্নিং'-এর চরিত্র প্যাট্রিসিয়ার উক্তি নিয়ে, যে 'the eye must listen before it looks', দৃষ্টি এবং শোনা এই দুয়ের মধ্যে স্তব্ধতাময় যোগাযোগ যা নির্মাণ করতে পারে তা, গোদারও জানেন, কবিতা। গোদারের ছবিতে তাই বারবার উড়ে আসে তারা, কবিতারা। তাদের রোমাঞ্চকর সমস্ত অভিযানই ছবি গোদারের। এবং ঐ মন্তব্য, যে, the 'eye must listen…'। চোখ কথা শোনে! ভাষা। সে শোনে সুরেন ব্যানার্জি রোডে নির্জনতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বৃত্তান্ত, টের পায় ফুটপাতে কেনা শান্ত নতুন চিরুনীটিকে, যার দাঁতে লেগে আছে কোনো স্ত্রীলোকের দীর্ঘ কালো চুল, টের পায় সম্ভাবনাহীন পাহাড়ে-জঙ্গলে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে-আসা বসন্তকে, শুনে নেয় একলা এক ময়ূরের নিঃসঙ্গ কেকাধ্বনি, আর টের পায় দূর থেকে রহস্যময় চাঁদের অতর্কিত সমর্থনের মতো সাড়া দেয়াটুকু। শুনতে পায় উচ্চারণ, ফিসফিসে, 'বেঁচে-থাকা ক্রমশই আমার কাছে নিয়ে আসছে ফুল আর শবাচ্ছাদন / কার শব!' হয়ত আমার নয়— এরপর আর্তনাদের মতো শোনায়। চোখে পড়ে ঐ ঘর, যে ঘরে সজল থাকত, সজলের বউ আর মেয়েটি থাকত। ঐ ঘর, বলে নিই আমি, আমাদের নিজস্ব রাজ্যপাট, যার কোনো সীমানারেখা নেই কেবল কানাকড়িমূল্যের ঝকঝকে নিয়তিতাড়িত এক 'থাকা' আছে। রয়ে যাওয়া আছে।

এ-বাদে কবিতা নেই কোনো। মৃগতৃষ্ণার মতো আমাদের এই পৃথিবীতে আর কোনো আলো নেই। জেগে-ওঠা নেই। জেগে-ওঠার অভ্যন্তরে নেই কোনো ঘন শিহরণ। উৎপলের কবিতাকে, ফলে, আমি বাধ্য হয়েছি এই 'থাকা'-রই আভায় পাঠ করে নিতে। পাঠ, নির্জনে, যার শ্রোতা আমার অভ্যন্তরস্থ সেই আরেক আমি, সেই নিরক্ষর, যার কাছে

প্রশ্ন 'Whether the world is a dream or the dream is the world.'[৯]— প্রশ্ন, উত্তরহীন।

৩. □ Hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour. □ Blake

সম্ভবত, মনে হচ্ছে, কবিতা হল সেই উপলব্ধি, যার উচ্চতা ভোক্তাজনের পক্ষে অন্য ভোক্তার জন্যে ধরে দেয়া প্রথমত অসম্ভব। তবু, আমার যেটা ধারণা, তা হল, কতকগুলি চিহ্নের, সিম্বলের দেয়া-নেয়া হতে পারে, নিদেনপক্ষে। এবং উৎপলের লেখা থেকে এই চিহ্নগুলিকেই বার করে আনতে চেয়ে আমি এখন দেখছি, বোধ হয় একটা স্তরের পর তা-ও সম্ভব নয় আর এবং এইখানেই আমার মনে পড়ে যায় লাও-ৎসে কে, যে, 'He who knows does not speak/He who speaks does not know'[১০]।

উৎপলের কবিতা-বিষয়ে সবথেকে বড় 'জানা', 'knowing' এই যে, জানা কোনোরকম ঘটনা নয় মাত্র, বরং ঘটনার মারফত চেতনার সঙ্গে চেতনার-ই বলা ঠিক হবে আরো, সংঘর্ষ থেকে জাত অ্যাটিচুড কোনো। উৎপল মূলত কাজই করেন এই অ্যাটিচুডটাকে নিয়ে, গদ্য-পদ্য সর্বত্র। নাড়াচাড়া করেন। এই নাড়াচাড়া করতে করতেই, যেভাবে ক্যালিডোস্কোপে হয়, সবকিছু নড়ে গিয়ে সৃষ্টি হতে থাকে একের থেকে আরো-এক। জানা-বলতে ঠিক কী যে বলতে চাইছি পাঠক শুনুন দয়া করে না হলে বোঝা নয় কেবল, টের পেয়ে শিউরে ওঠাও যাবে না পর্যন্ত সমস্ত দিন নীলিমায় গৃধিনীর অনন্ত পতনের সঠিক অর্থ কী।

এবং আমি এও দেখি যে, ঐ অ্যাটিচুডই দাঁড় করিয়ে নিল শব্দগুলিকে টানটান করে আর উৎপল আমাদের বাধ্য করলেন পাগল প্যানের শিস বলতে ঠিক কোন আলোড়নকে বোঝায় তা অনুভব করে উঠতে, কোনো অবলম্বন ব্যতিরেকেই। বলতে কি, পঞ্চাশের হাতে-গোনা কবিদের মধ্যে উৎপলই বোধহয় একলা যাদুকর, অসহায়ভাবে যিনি তাঁর নিজের যাদুর মধ্যেই ধীরে বন্দী হতে হতে শেষাবধি, গম্ভীর, ফেটে পড়েছেন 'বোবা ও বধির আমি, এই রাত্রির মত, ঐ বাদুড়ের মত, ঐ কামটের মত আমি / গতিময় অথচ নিশ্চল' (তদন্ত/২, লোচনদাস কারিগর)— যার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য ফের ঐ এক যে, কী অর্থ এর, এ-কবিতার? এবং এই শেষবারের মতো আবারও আমার জবাব ছুটে যায় দেখি, 'জানি না'— যার পশ্চাৎপটে ঐ ব্যাপক নিরক্ষরতা, রাত্রির প্রান্তে জ্বলে জ্যোৎস্নাময়ী সিঁথি যার / সেই মেয়ে, আমার প্রেতিনী, কামড়ে ধরেছে দাঁতে এ মর-জগত' (ধূসর আতাগাছ / ৫, পৃ-৫০)। টের পাই অন্ধকার ভেদ করে অলৌকিক পশ্চাদ্ধাবন সেই— তারপর চাঁদ ওঠে। গোল থালার মতো বিশাল চাঁদ এক।

'"কাঠের আকৃতি কেমন…' তিনি জানতে চান।

'মৃত সমস্ত কিছুরই আকৃতি এক। তারা আকৃতিহীন।'"

(ধূসর আতাগাছ। পৃ. ৫১)

ঝলমলে শুঁয়োপোকাটি এগিয়ে আসছে দেখি সকালের দিকে। কবিতা শব্দটির জন্ম-শব্দ শুনতে পাই ঠিক তখনই। তখনই ঘণ্টা বেজে ওঠে।

এবং এ-ও কি শোনা যায় না, যে, 'সাহিত্য অ্যা-মর্যাল, অ-সামাজিক (এই অর্থে যে সামাজিক উত্থানপতনের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই) এবং সৌন্দর্যহীন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আসলে 'আর্গালি', পিশাচসিদ্ধ, নোংরামিতে ভরা।' (ধূসর আতাগাছ / ২, পৃ-৪৬) কবিতা-বিষয়ে, উৎপলের, টের পাই, আমার যাত্রা ফের শুরু হতে চলেছে। চোখে পড়ে ঝলমলে শুঁয়োপোকাটি, যে এগিয়ে আসছে, অনবরত।

[লেখাটি উৎপলকুমার বসুর কবিতা বিষয়ে নানা সময়ে করে রাখা কিছু খসড়া নোট্‌সের একত্রিত রূপ। কখনও পূর্ণাঙ্গ লেখাটি লিখতে পারব কি? জানি না]

□

সংযোজন □ ১

Not to solve it, as if it had a meaning, nor even to perceive its absurdity (which is still a meaning) but to ruminate it 'until the truth falls out' □ Barthes

উৎপলের লেখালেখির মুখোমুখি আমার বার্থের এই নিষিদ্ধ দিগন্তযাত্রাকেই মনে পড়ে, বারবার। নিষিদ্ধ দিগন্তযাত্রা, যতক্ষণ না, ঐ, খসে পড়ে সত্যের সমস্ত নির্মোক। মনে পড়ে এবং টের পাই কলেজ দ্য ফ্রাঁসে ১৯৭৭-এর জানুয়ারি মাসে দেয়া বক্তৃতায় বার্থ কেন কারনন্‌স্কিকে উদ্ধৃত করে পৌঁছে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন সেই রন্ধনক্রিয়ার প্রসঙ্গে যার অনিবার্য লবণটি হল 'শব্দ'। বার্থের মত ছিল, যেখানে জ্ঞান হল বিষয় সেখানে শব্দ লবণ-মাত্র, এবং 'It is this taste of words which makes knowledge profound, fecund.' ১১ টের পাই 'সাহিত্য' শব্দটি এতক্ষণে বদলে ফেলল চেহারা তার, বদলে ফেলল এবং উৎপল, কানে এল, বলছেন গোধূলিনির্ভর সূর্যের যাত্রাপথের কথা।

আগে, এ-লেখায় পাঠক দেখবেন অ্যাটিচুডের প্রসঙ্গ এসেছে। এসেছে, উৎপলের লেখা পড়তে গিয়ে আমার কাছে 'অ্যাটিচুড' ব্যাপারটারই চেহারা মূলত স্পষ্ট হয়ে ওঠার কারণে। অর্থাৎ, জটিল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা মাথায় নিয়েও আমি বলতে চাইছি, উৎপল আসলে যা লেখেন তা ঐ 'অ্যাটিচুড।' এবং, বিষয়ের প্রতি নয় বরং 'অ্যাটিচুড', শব্দের প্রতি। শব্দের পর শব্দ বুনে-বুনে, এক অ-পূর্ব শূন্যতার দিকে যেভাবে চলে যায় দৃশ্যের অতীত কোনো আলো, উৎপল ধরতে চান শব্দকেই কেবলমাত্র। এবং যেটা আসলে উৎপলের 'কবিতা' তা মূলত ঐ ধরতে চাওয়াটুকুই, কেবলমাত্র, যাকে বোঝানো যায় না।

প্রশ্ন হবে হয়তো যে, 'বোঝানো যায় না' আমি বলছি কেন। এবং এর জবাব দিতে গেলে পাঠককে ফের আমি ফিরে যেতে বলব বার্থের ঐ বক্তৃতায়, যেখানে বার্থ ভাষার হাত থেকে মুক্তির কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'মিসটিক্যাল সিংগুলারিটি'-র কথা সরাসরি।[১২] এবং পাঠক লক্ষ করুন, এখানেই ফের ফিরে আসতে বাধ্য এ-লেখায় বারবার উদ্ধৃত জেন-প্রসঙ্গ, যেখানে বলা হয়েছে সেই 'শিল্পের অতীত শিল্প'-র কথা[১৩] ; আসতে বাধ্য চিহ্ন এবং যুক্তিবোধের অতীত সেই না-অর্থের কথাও। আমাদের মনে পড়ে যেতে বাধ্য ফুকোকে, যিনি তাঁর 'ল্যাংগুয়েজ, কাউন্টার-মেমরি, প্র্যাকটিস'-এর পাতায় নিচু গলায় বলে উঠেছিলেন অন্য এক 'ভাষা'-র কথা, যা কিনা তাঁর মতে, 'দ্য ইমেজ অফ অ্যাকচুয়াল ল্যাংগুয়েজ' ব্যতীত কিছুই নয় আর। এবং এই এখানেই আমরা টের পাই ফিরে এল উৎপল বসু-র কবিতা, ফের, যার ছত্রে ছত্রে মিশে রয়েছে সমুদ্রফেরীর গান, শব্দহীন ভোরের বাতাস, শেষ রাত্রির মাংস, আর ধ্বংস ও সূর্যোদয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া অন্ধকার— প্রিয় অন্ধকার। আমার বলতে লোভ হতে থাকে কবিতা, ঐ অন্ধকারই কবিতা, যার ঠোঁট নড়ে উঠলে আয়নার ওপার থেকে ছুটে আসবেই সেই ফুলের আঙুল, যারা গোপনতা জানে ; এবং এ-ও যে, ঐ গোপনতা, আত্মার— 'বেঁচে থাকা' নামক আয়নার মধ্যে দিয়ে যা যোগাযোগ গড়ে নেয় 'মৃত্যু' নামের শান্ত বিদ্যুৎটির সঙ্গে।[১৪] উৎপলের লেখাকে হাড়েমজ্জায় অনুভব করেছেন যিনি তাঁর মনে থাকার কথা অবশ্যই 'চৈত্রে রচিত কবিতা'-র ছত্রে ছত্রে মিশে-থাকা রক্তে লীন দেবায়তন, উন্মার্গের গোধূলি, চিরতুষারময় সৌগতের সমাধিমন্দির ইত্যাদিকে— যা দিয়ে, ঐ যাকে আমি বলছি আত্মার গোপনতা, তার দিকে, সামান্য হলেও, এগিয়ে যাওয়ার এবড়োখেবড়ো এক পাহাড়ি পথ উৎপল নির্মাণ করে নেন দেখা যায়, যে পথ ব্যতীত সেই মুহূর্তে পেঁছনো অসম্ভব যেখানে গিয়ে, বার্থ বলবেন, 'ভাষা স্তব্ধ হয়ে যায়'।[১৫] এবং বলার এখানে যে, উৎপলের লেখায় এই স্তব্ধতা, এই, এ-কেই মূলত টের পাওয়ার, যার অন্তস্থ নৈঃশব্দ ভেদ করে কেবল উঠে আসে প্রশ্ন : 'কোন মৃত্যু ঔদাসীন্যহীন' ?[১৬] কোন মৃত্যু? কোন? আমার মনে পড়ে যেতে থাকে হাইজেনবার্গকে, এই প্রশ্নের মুখোমুখি, যিনি সরাসরি বলতে পেরেছিলেন যে, 'আমরা যা দেখি তা নিজে প্রকৃতি নয় বরং প্রকৃতি নিজেকে আমাদের কাছে উন্মুক্ত করে দেয় আমাদের প্রশ্ন করার পদ্ধতির সামনে'।[১৭] টের পাই এই প্রশ্নের পথে ধীরে স্তব্ধ হয়ে আসছে সব কিছু। এবং পাশাপাশি সেই জেন ঋষিকেও মনে পড়ে, যাঁর মতে, জেনকে জানার আগে পাহাড় পাহাড়ই থাকে, নদী নদীই এবং যে মুহূর্তে মানুষ জানার পথে পা বাড়ায়, পাহাড় পাহাড় থাকে না, আর নদীও থাকে না নদী, আর যে-মুহূর্তে মানুষ জ্ঞানকে লাভ করে সে-মুহূর্তে পাহাড় তার কাছে আবার পাহাড়ই হয়ে যায়, নদীও পর্যবসিত হয় নদীতেই, কেবলমাত্র। আমি, পাঠক, বলতে চাইছি লেখা[১৮]-র মাধ্যমে উৎপল, শব্দকে অবলম্বন করে ঐ 'জানা'র পথেই পা বাড়াতে চেয়েছেন।[১৯]

সংযোজন □ ২

A writer is not someone who expresses his thoughts, his passion, or his imagination in sentences, but someone who thinks sentences : *A Sentence-thinker.* □ Berthes

আমি টের পাচ্ছি, ধীরে এ-লেখা জটিলতার মধ্যে দিয়ে আলোকরেখার মতো অন্য কোনো সরল জটিলতার পথে পা বাড়াচ্ছে। এবং প্রথম এ-ও যে, ধীরে এ-লেখা 'হয়ে' উঠতে-উঠতে নির্মাণ করে নিচ্ছে আমার নিজেরও ভাবনার আরেকটি টেক্সচার যা, পাঠক-হিসাবেই, আমি নিজেও অনুসরণ করছি। এবং পাশাপাশি, টের পাচ্ছি সেই স্পর্শ যাকে বার্থ বলবেন 'bliss', বলবেন 'happening', যা-কিনা ভাষার মধ্যে অনবরত ঘটে চলে 'রচনা করা' নামক কাজটির মারফত। এবং পাঠকের সন্দেহ, জানি না, হতেও পারে এমন যে, এখানে আমি পা বাড়াচ্ছি আমার সীমানার বাইরে হয়তো বা, আসলে, উৎপল যা লেখেন, যে লেখাকে ভাবেন, যে ছবি দেখেন নিজে এবং দেখাতে চান পাঠককে, আমার ধারণা, তাকে প্রচলিত 'অর্থে'-র চেহারায় অনুবাদ করার বদলে যেটা জরুরি তা হল তাকে খানিকটা হলেও ভাষা-চেহারার বাইরে টেনে আনা, এবং বলে দেবার নয় নিশ্চয় এটা যে, ভাষা-চেহারার বাইরে এ-লেখাসমূহকে, উৎপলের, টেনে যদি আনা যায়, সত্যিই, তাহলে তা 'প্রমাণ' করবে না কিছুই, কেবল উগড়ে দেবে আরও কিছু happenings', উৎপলের লেখাকে অবলম্বন করে, বা না-করেও অনেকাংশে, যা রচনা করতে থাকবে ভিন্ন চেহারার আরেক চিহ্নসমূহের অবস্থান[২০], যা সন্দেহ নেই, পাঠক-আমার বোধকে আক্রান্ত বা প্রলুব্ধ করবে আরও কোনো ভিন্ন রহস্যের গভীরে পা বাড়ানোর জন্য। এবং আমার ধারণা, বাংলা ভাষায় জীবনানন্দ-পরবর্তী সময়ে এসে উৎপলের লেখা সেই অন্যতম বৈশিষ্ট্য-বহনকারী, যাকে অবলম্বন করে এ-যাত্রা সম্ভব, সম্ভব বার্থ যাকে বলবেন 'লিমিট-ল্যাংগুয়েজ' তার পরিসরে আভ্যন্তরীণ বদল, যা কিনা যে কোনো দেশেরই, কবিতার ক্ষেত্রে অন্তত, অত্যন্ত জরুরি। □

[উৎপলকুমার বসুর কবিতা-বিষয়ে আরও দুটি নোট্‌স সংযোজিত হল এখানে। আপাতত এ-দুটিই এ-লেখার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গরূপ হলেও বলা বাহুল্য কখনোই চূড়ান্ত রূপ নয়। অন্য পরিসরে এ-নিয়ে ফের বসা যাবে।]

---

১. বাণীও কি, নয় ?
২. শ্রেষ্ঠ কবিতা / প্রতিভাস, ১৯৯১
৩. রণনিমিত্ত হৃদয় আমার / লোচনদাস কারিগর
৪. বুদ্ধদেব। গৌতম বুদ্ধ।
৫. *The way of Zen* / A. W. Watts. p-87
৬. সরলতা মিরর হাউস / ধূসর আতা গাছ

৭. স্মৃতি / ২ / শ্রেষ্ঠ কবিতা / পৃ-৩৪। এবং এ-ও বলার যে, এ-উদ্ধৃতির লেখাটুকু পাঠের সময়, আমি যেন রোকেত্যাঁ, বইয়ের পাতা ওল্টাতে থেকেছিলাম মনে আছে, প্রথমবার। এবং এও যে, ঐ সন্ন্যাসীর মতোই, আমি টের পেতে চাইছি মনকে, পাচ্ছি না। বুঝতে পারছি, পাওয়া যায় না। আর উনি বলছেন, 'একদিন, যখন সময় হবে, বোসো এই কাব্যের পাশে। / একে ভাঙা টেবিলের মতো তুমি কাছে টেনে নাও।···/···শোনো এ-ও কাশে। / থুথু ফ্যালে। তোলে হাই। ঘুম এলে চোখ বোঁজে। যেন কাল···' Language শব্দটি অর্থহীনভাবে বড় হয়ে উঠল, দেখি। ভেসে এল। আমি তাকে স্পর্শ করি। করা মাত্র, যেভাবে শিমুল তুলো ছড়িয়ে যায়, ওড়ে, / গিয়ে ছিটিয়ে যায়। স্বর। শুনতে পাই তিনি বলছেন 'ডাকো, যারা কবিতার বিরুদ্ধতা করে / আজ ঈগলের পাখিদের রাজা স্বচক্ষে দেখুক।' (শ্রে. ক. / পৃ. ৩৫) দেখতে পাই কার্তিকের জ্যোৎস্না ভেদ করে উড়ে গেল ঐ বিশাল বেলুনটি। ভাষা···'বৈশাখ দুপুরে দূর বিমানের ধাতু আলেয়ায়। বিপুল এয়ারোড্রোম পড়ে আছে বৈমানিকহীন' (শ্রে. ক. / পৃ. ৫৬)।

৮. চৈত্রে রচিত কবিতা/১৪

৯. Bande A Part (১৯৬৪) ছবিতে, গোদারের, এই রকম করেই ভেবেছে একটি চরিত্র, ফ্রাঞ্জ।

১০. *Tao Te Ching :* Lao Tse, Ch-8

১১. Lecture (In inauguration of the chair of Literary semiology, College de France, Jan. 7, 1977) : Roland Barthes / The *Oxford Literary Review* / Autumn '79 / Vol 4 No. / p 35-36.

১২. এবং এই এখানেই, আমার ধারণা, কবিতা হল সেই শিল্প যা শব্দ দিয়ে শব্দের অতীতে যাবার, অনর্থক হলেও, প্রচেষ্টা, যা কিনা বলা বাহুল্য প্রাণান্তকর।

১৩. *Zen in the Art of Archery :* Eugen Herrigel

১৪. পাঠক খেয়াল রাখুন ফুকোকে, যিনি বলবেন সেই অন্তহীন দুর্ভাগ্যের কথা, বলে উঠবেন 'Boundless misfortune, the resounding gift of Gods, marks the point where language begins ;' (*Language, Counter memory, Practice*/M. Foucault/p 54) এবং ঠিক তার পরপরই আসবে মৃত্যুর সীমার ঠিক মুখোমুখি, খুলে যেতে থাকা মৃত্যুর প্রসঙ্গও, পরপর, যাকে উনি চিহ্নিত করে উঠবেন 'infinite space' বলে, আচমকাই। এবং হে পাঠক, উৎপলের লেখা আপনি পাঠ করেছেন, এ-অন্তহীন স্পেস-ব্যতীত আর কী দিয়ে আপনি ছুঁতে পারবেন 'আত্মবিবৃতির মতো পিরামিড' ঐ !

১৫. *Empire of Signs* : Roland Barthes/p. 74

১৬. ফেরীঘাট : উৎপলকুমার বসু। শ্রে. ক, পৃ. ৪৭

১৭. *Physics and Philosophy* : W. Heisenberg/ p. 58

১৮. পাঠক নজর রাখুন, আমি 'কবিতা' শব্দটি ব্যবহার করিনি এখানে। বলেছি 'লেখা', 'টেক্সট'।

১৯. যাঁরা উৎপলকে চেনেন তাঁদের মনে থাকতে পারে যে, ব্যক্তিগত আড্ডায় উনি বারবার এক ধরনের 'ভয়েস'-এর কথা বলেন, যা উনি শুনতে পান। এই 'ভয়েস' যে ঠিক কী, এর কোনো রহস্যময় মিস্টিক চেহারা আছে কিনা এসব নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামাবার, ঘামান ; আমি কেবল সন্দেহ তুলতে চাই এই বলে যে, এই ভয়েস হয়তো রিয়েলিটির অন্তস্থ অন্য কোনো রিয়েলিটির স্বরব্যঞ্জনা, কবি যার মাধ্যমে পেতে থাকেন এ-লেখায় খানিক আগে বলে নেয়া ঐ 'এবড়ো খেবড়ো পথ' নির্মাণের মনোবাস্তবিক উপাদানগুলিকে।

২০. আরেক চেহারায় উৎপল নিজেও এ-কাজ করেছেন পাঠক খেয়াল করে থাকবেন হয়তো 'প্রকৃতির ছবি' নামের লেখাটিতে, ওঁর 'আবার পুরী সিরিজ'-এর পাতায় (পৃ. ১৫ ও ১৭/ শ্রে. ক. / পৃ. ৩৭ ও ৩৮), 'আবার পুরী সিরিজ'-এর সময় 'প্রকৃতির ছবি' লেখাটির প্রথম অংশের পুনর্লিখনকে স্বীকার করে নিয়েও আলাদা লেখার মর্যাদা দেননি উৎপল, অথচ 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-য় এসে পুনর্লিখন বলে স্বীকৃতি দিয়েও তাকে ভিন্ন রচনা বলেই মনে করছেন উনি। যিনি খেয়াল করে পড়বেন ও-লেখার অংশদুটি পাঠ করলেই টের পাবেন আমি ঠিক কী বা কতখানি বলতে চাইছি। □

THE JOY OF ENERGY

We try to give it to all those who labour
with us to give the nation its most
important and economical energy resource Coal.
More and more is being done
to improve the living and environmental conditions
of the miners who work day in and day out
to keep the wheels of the economy moving.

Coal India Limited

10, NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA-700 001

নক্ষত্রে সাজানো ডানা

কালীকৃষ্ণ গুহ

উৎপলকুমার বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চৈত্রে রচিত কবিতা' ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়, যার রচনাকাল ১৯৫৬-১৯৬১। অর্থাৎ তাঁর ১৯ বছর বয়সের কবিতাও এই বইতে স্থান পেয়েছে। এই বইতেই উৎপলকুমারের আশ্চর্য মৌলিক আবির্ভাব ঘটল আগের দশকের লিরিক-শোভিত বাংলাকবিতার সরল ও নম্র পরিবেশে। তিনি লিখলেন :

দয়িতা, তোমার প্রেম আমাদের সাক্ষ্য মানে নাকি ?
সূর্য-ডোবা শেষ হল কেননা সূর্যের যাত্রা বহুদূর।
নক্ষত্র-ফোটার আগে আমি একা মৃত্তিকার পরিত্যক্ত, বাকি—
আঙুর ফলের ঘ্রাণ, গম, যব, তরল মধুর
রৌদ্র সমুজ্জ্বল স্নান শেষ করি।

('চৈত্রে রচিত কবিতা'র ভূমিকার অংশ)

তাঁর প্রস্তুতিপর্বের কিছুই আমাদের চোখে পড়ল না। একটিও কাঁচা কবিতা লিখলেন না তিনি। তাঁর উৎস দেখতে পেল না বাংলাকবিতার চিন্তিত ও ধুরন্ধর

পাঠক। 'সূর্য-ডোবা শেষ হল কেননা সূর্যের যাত্রা বহুদূর' এই জাতীয় দার্শনিকোচিত বাক্যের পরিচ্ছন্ন অর্থ ও যুক্তি উদ্ধার করা গেল না। ফলে বাংলা কবিতার পাঠক একই সঙ্গে অভিভূত ও বিমূঢ় বোধ করল। আজ প্রায় চার দশক পরেও উৎপলের কবিতা নিয়ে কবিতাপাঠকের ভাবনা ও মুগ্ধতাবোধ অন্তহীন। মাত্র এক বছর আগেই বাংলা কবিতার একজন মনোযোগী পাঠক এবং অনতিতরুণ কবি লিখেছেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, উৎপলকুমার বসুকে আমার বরাবরই এক বিদেশী কবি বলে মনে হয়েছে। বাঙালি কবি হিসেবে আমি তাঁকে কোনোদিন ভাবতে পারিনি। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয়েছে এ যেন কোনো বিদেশী কবির অসাধারণ বাংলা অনুবাদ।' এরকম মনে-হওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে তিনি উৎপলকুমারের কিছু কবিতার শিরোনাম এবং পঙক্তি নির্দেশ করেছেন, যেমন, 'যীশুর বাড়ির হাঁস' 'পোপের সমাধি' এবং, যেমন, 'নিরক্ষর বেশ্যাদের চিঠিগুলি লিখে দিচ্ছি এই ফাঁকা তেষট্টিতে, মরিয়ম তোমার বাগানে', 'তোমাদের কার্পাস বাগানে ঈশ্বরপ্রদত্ত গাধা চরছে একাই' ইত্যাদি। কিন্তু তাঁকে 'বিদেশী কবি' বলে মনে হওয়ার কারণ শুধু সামান্য কিছু কবিতায় বিদেশী পুরাণের অনুষঙ্গ নয় বলেই আমার ধারণা। তাঁকে 'বিদেশী কবি' বলে মনে হওয়ার প্রধান কারণ, আমার মনে হয়, তাঁর মৌলিক ভাষাবিন্যাস, মনোভঙ্গি, কল্পনার পরাবাস্তব বিস্তার, অবচেতনের আশ্চর্য। উদ্ভাস— এবং, সবকিছু মিলিয়ে, যে অচেনা **পাঠ** তৈরি করে দিয়েছেন তিনি তা-ই। তাছাড়া, তিনি কবিতায় অত্যন্ত সফলভাবে আত্মগোপন করতে পেরেছেন। ব্যক্তিগত স্তরের দুঃখ-বেদনা-প্রেম-ব্যাকুলতার প্রকাশ তাঁর কবিতায় কদাচিৎ ঘটেছে। কবিতায় তাঁর ভূমিকা একজন উদাসীন, দূরত্বসঞ্চারী, স্বগতোক্তিময় নিরপেক্ষ দর্শকের। এই ভূমিকা বাঙালি কবির কোনোদিন ছিল না কেননা, কালচেতনায় আক্রান্ত এবং প্রজ্ঞা-প্ররোচিত বাঙালি কবি প্রধানত নিজের দুঃখবেদনার কথাই গভীর হৃদয়াবেগে প্রকাশ করতে চেয়েছে। এই অর্থে উৎপল একজন 'বিদেশী' কবি।

২

উৎপলের কবিতার প্রথমপর্ব শেষ হয়ে যায় ১৯৬৪ সালে— 'পুরী সিরিজ' প্রকাশিত হওয়ার পরেই— মাত্র ২৭ বছর বয়সে। একটি কবিতা-লেখার 'অপরাধে' এক মহিলা-কলেজের এই তরুণ অধ্যাপককে বিচার করা হয়, এবং সেই বিচারের শাস্তি হিসেবে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বলা হয় তাঁকে; তিনি তা না-করে, কিছুদিন নির্বাক থেকে, ইয়োরোপ চলে যান— কেন যাচ্ছেন তা না-জেনেই, সম্পূর্ণ লক্ষ্যহীনতায়— শুধু আত্মসম্মান বাঁচানোর প্রাথমিক এবং আস্তিত্বিক প্রয়োজনে। আত্মসম্মান বাঁচানোর এতটা জরুরি প্রয়োজন ক'জন বাঙালি কবি কল্পনা করতে পারেন? তাঁরা জানেন বারংবার অপমানিত হওয়াই তাঁদের নিয়তি। জেনে, তাঁরা অপমানিতের কবিতা লিখে পরিশুদ্ধ হতে চান। উৎপল বেছে নিলেন অন্যরকম ভাগ্যপরীক্ষা। 'পুরী সিরিজ'

বইটির প্রকাশকের— হয়তো লেখকেরও— দাবি ছিল 'এতে সমুদ্র, বামন, তাঁতকল, শিকারী, সতী, নপুংসক, মিসিবাবা, এয়ারোড্রোম সূচ ও আত্মা, রণরক্ত ও সন্ধ্যাবাতাস, কৈবল্য ও ঈশ্বরোপসনার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পাঠকের ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য এক নিষিদ্ধ পারমাণবিক চুল্লী খুলে দেখানো হল এই গ্রন্থে।' এখানে, এই গ্রন্থে 'নিষিদ্ধ পারমাণবিক চুল্লীটি দেখে বাংলা কবিতার নিদ্রাহীন বা স্বপ্নোত্থিত পাঠক যেমন আনন্দ পেয়েছে তেমনি নিঃসন্দেহে বলা যায়, সে অনেকটাই বিমূঢ় বোধ করেছে। বাংলাকবিতার এতদিনের চেনা লিরিকসর্বস্বতা, আবেগময়তা, আত্মকেন্দ্রিক বোধের কাঠামো, যুক্তিবাদিতার পরিসীমা, নৈতিকতা, সমাজমনস্কতা, এবং সর্বগ্রাসী জীবনানন্দীয় বিষাদ কোথায় এখানে? এই প্রশ্ন থেকে বিমূঢ়তার জন্ম। উৎপল, দেখা যাচ্ছে, প্রায় একজন টিন-এজার হিসেবেই বাংলা কবিতায় তাঁর মৌলিক স্বর জুড়ে দিতে শুরু করেন— ৫৬ সাল থেকে— এবং এই সৃষ্টিশীলতার প্রথমপর্ব শেষ হয় ৬৪-তে, যখন ৬৪-তে, তিনি তাঁর অপূর্ব ও ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা হারিয়ে ফেলেন এক মানসভ্রমণ শেষে, যেমন বলা হয়েছে তারই আলঙ্কারিক স্বীকারোক্তিতে, যা এই: 'আমার ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা আমি হারিয়েছি বাদাম পাহাড়ে।' এই পর্বে উৎপল ছন্দোহীন কিছুই প্রায় লেখেননি, এবং এইটুকুই শুধু তাঁর ঐতিহ্য অনুসরণ। এমনকি স্বরবৃত্তেও লিখেছেন তিনি, যেমন :

মন মানে না বৃষ্টি হলো এতো
সমস্ত রাত ডুবো নদীর পাড়ে
আমি তোমার স্বপ্নে-পাওয়া আঙুল
স্পর্শ করি জলের অধিকারে

('চৈত্রে রচিত কবিতা'র ৮ নং কবিতার অংশ)

কিন্তু স্বরবৃত্ত-মাত্রাবৃত্তের আরামের গণ্ডিবদ্ধতায় থাকতে চাননি তিনি— এতখানি পারদর্শিতা সত্ত্বেও। গিয়েছেন অক্ষরবৃত্তের সম্প্রসারণে যেখানে তাঁর বিমূর্ততার চর্চা দিগন্ত স্পর্শ করে। উপায়হীনভাবেই কয়েকটি উদাহরণ রাখতে হবে যেহেতু কারো কবিতার স্বরূপ বোঝাতে হলে দরকার সেই কবিতাগুলিই, বা, অন্তত, তার কিছু অংশ।

১. বকুল তোমাকে শুধু ঈর্ষা করি, কতো না সহজে
তুমি তার মস্তকেশে ডুবে যাও অনির্বাণ
তোমার ভিতরে নেই প্রবচন, ছায়া, শান্তি, গ্রহের বীজাণু
আমার অনন্ত রক্ত ঝরে যায় অগ্নির সমাজে—

২. বালির নির্জন বুকে পড়ে-থাকা নৌকোগুলি তোমাদের জানে—
তাদের ছায়ায় বসে গান করো সারাদিন হৃদয়পণ্যের

কখনো নেমেছো ঢেউ-য়ে, নীলিমায়, স্নানে
উঠেছে শীর্ণ ধোঁয়া তোমাদের দারিদ্র-অন্নের—

৩. উটের ঘণ্টার শব্দে, দিগন্তের অদ্ভুত সম্বলে
তারা যায়— জলের কিনার ঘেঁসে পূব থেকে পূবে
আমার চোখের 'পরে পৌরুষের নারীত্বের মহান কৌশলে
জেগে ওঠে সেই জাল ক্লান্তিহীন, অবলম্বহীন।

৪. তবুও ঝড়ের শেষে, তবুও দিনের শেষ, অন্ধকার বনে
বৃষ্টির মেঘের তলে শোনা গেল আর্ত কেকারব
বুঝি নির্জনতা পেয়ে পুনর্বার মেলেছে বিশাল
নক্ষত্রে সাজানো ডানা। পেয়েছ নির্দেশ ?

৫. কেবল পাতার শব্দে আমি কাল জেগেছি সন্ত্রাসে।
ভেবেছি সমস্ত দিন এত লেখা, এত প্রশ্ন, এ-কথা—
তারও পিছে কোটি কোটি চিহ্ন— তীর শস্যের শিখরে
উঠেছে চাষের গান, স্বপ্নে দেখা মায়ের মতন।

৬. উপনয়নের তুলো উড়ছে বাতাসে
তাজমহলের সিঁড়ির কিনার দিয়ে গর্ভবতীদের আমি ক্রমাগত
উঁচু বারান্দার দিকে উঠে যেতে দেখি—

৭. পুরনো জামের বনে আমি শুধু মানুষের
শোভাযাত্রা দেখেছি শৈশবে।

৮. অনেক মলিন আছি
সারাদিন— ঢাকা আছি পরচুলাময়
আতঙ্কজনক লোমে— দু'পায়ের ফাঁকে

৯. আমি কান পেতে শুনছি কোলাহল, শোভাযাত্রার দৈববাণী
স্ত্রীলোকের রক্তক্ষরণ হচ্ছে এই মহাউৎসবের দিনে।

উদ্ধৃতিগুলির প্রথম ৪টি 'চৈত্রে রচিত কবিতা' থেকে নেয়া। পরের ৬টি 'পুরী সিরিজ'-

এর বিভিন্ন কবিতার অংশ। এখন, কথা এই যে এতগুলি উদাহরণ দিয়ে আমি কি সত্যিই কিছু বোঝাতে পারছি ? এই প্রশ্নটি সর্বতোভাবে নিজের প্রতি। আমি নিজেই কি বুঝেছি উৎপলকুমার বসুর কবিতা ? এ প্রশ্নটি নিজের প্রতি। উত্তরে বলি না, গোল করে বুঝিনি, তবে অগণিত সংকেত এবং শিহরণ পেয়েছি। অনেক কবিতা-পড়া হয়ে গেছে আমাদের। অনেক কবির কবিতা-পড়া— অনেকবার পড়ার পড়েও— বাকি আছে। যেসব কবির কবিতা-পড়া বাকি আছে এখনো উৎপলকুমার বসু তাঁদের একজন। তাঁর কবিতার বিভিন্ন বাক্যের বা প্রস্তাবের অ্যাবসার্ড সাজুয্য, তাঁর রচনার অনুভূতি-স্থাপিত বিমূর্ততা, তাঁর অবচেতন-উৎসারিত সংকেতগুলি বারবার তাঁর কবিতা পড়ে দেখতে প্ররোচিত করে। পুরনো জামের বনে আমি শুধু মানুষের শোভাযাত্রা দেখেছি শৈশবে বা স্ত্রীলোকের রক্তক্ষরণ হচ্ছে এই মহাউৎসবের দিনে বা আমার সমস্ত রক্ত ঝরে যায় অগ্নির সমাজে— এই জাতীয় অজস্র অ-লৌকিক প্রস্তাবের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মনোবিজ্ঞানীদের কাজ, যা তাঁরা হয়তো সত্যিই কোনোদিন করবেন। আমরা শুধু এইসব সংকেতগুলির বা বিমূর্ততাগুলিকে নিজের মতো করে চিনে নিতে পারি। এইসব চিনে-নেয়াতেই আপাতত আমার মতো অন্যমনস্ক পাঠকের কবিতা-পাঠের সার্থকতা।

৩

ন'বছর জুড়ে কাব্যচর্চার প্রথমপর্বের পর এক যুগ ইয়োরোপ-প্রবাসীর নিরক্ষর জীবন কাটিয়ে উৎপল ফিরে এলেন ১৯৭৮ সালে। ফিরে এসেও কিছুদিন নির্বাক থেকে একদিন সুরেন ব্যানার্জি রোডে নির্জনতার সঙ্গে দেখা হল তাঁর। একটি চিরুনি কিনে তাতে দেখতে পেলেন স্ত্রীলোকের চুল লেগে আছে। এই হল সেই নির্জনতা যা তাঁকে আবার কবিতা লিখতে প্ররোচিত করল। প্রকাশিত হল 'লোচনদাস কারিগর' এবং, আরো পরে, 'খণ্ড বৈচিত্রের দিন'। তাঁর দ্বিতীয়-পর্বের কবিতা প্রথম-পর্বের তুলনায় স্বভাবতই বেশি মেধানির্ভর, যেখানে অবচেতনও অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত। প্রথম-পর্বের ট্রান্স বা উন্মাদনা এখানে না থাকলেও এখানে তিনি মিশ্রণ ঘটিয়েছেন অধীত পরাবাস্তবতার সঙ্গে সচেতন ভাবনার, জুড়ে দিয়েছেন কিছু স্মৃতির আলোড়ন। তাছাড়া, তাঁর আশ্চর্য পর্যবেক্ষণগুলিও রয়ে গেছে এখানে, ফলে তিনি দেখেন। মাঠ পেরিয়ে গ্রাম পেরিয়ে বৌভাত খেতে চলেছে এক নির্বান্ধব গ্রাম্য হাবা কিশোর। আর তার ওই উচ্চাকাঙ্ক্ষী যাওয়াটুকুই সব। কিন্তু বাংলা কবিতার লিরিক-ঐতিহ্যের নিশ্চয়তায় ফিরলেন না তিনি। তিনি রয়ে গেলেন একজন 'বিদেশী', অর্থাৎ নন-কনফরমিস্ট, কবিতালেখার বদলে যাঁর কোনো-কিছু পাওয়ার দরকার হয়নি— অর্থ, খ্যাতি, পুরস্কার, অমরতা (যা অবশ্যই ২০/৩০/৫০ বছরের), সভার হাততালি বা কবিসম্মেলনের সভাপতিত্ব। প্রতিষ্ঠান থেকে সচেতন দূরত্বে থাকলেও তাঁর ধ্যানধারণা আত্মতৃপ্তিময় ক্ষুদ্রবুদ্ধি লেখকদের শান্তি নষ্ট করে। তিনি আনরিজিনের অনুসন্ধানে আজো খুঁড়ে

চলেছেন জ্ঞানের জগৎ— যে অবস্থান থেকে অভিভূত ও কম্পমান ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং ভঙ্গুর নাস্তিকের প্রতি একই সঙ্গে অসম্মতিসূচক হেসে-ওঠা যায়— যেভাবে হেসে ওঠেন তিনি।

লক্ষ করি, তিনি অনুসন্ধান করে চলেছেন সংগীতের সারবত্তা, মনোজগতের কিছু-কিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন সিঁড়ি, সেইসঙ্গে হয়তো অতীতহীন কোনো ঠিকাদারের সঙ্গ। কবি অনুসন্ধান করে চলেছেন আগন্তুক কোনো নবীন কবির বিরল কাব্যভাষা, অদীক্ষিত কোনো চিত্রশিল্পীর নিজস্ব কিছু রেখা ও রঙ। তিনি অনুসন্ধান করে চলেছেন সেই ঈশ্বর-অনুষঙ্গহীন আশ্রমের যেখানে কোনো বাক্য উচ্চারিত হবে না। তিনি অনুসন্ধান করেন সেইসব মানবসম্পর্কের, শৈশবস্মৃতি যা একজন প্রৌঢ়ের ভোরবেলার স্বপ্নে প্রতিফলিত হয়— বয়ে আনে নশ্বরতার সংকেত।

৪

আজ যদি কেউ প্রশ্ন করে : উৎপলকুমার বসুর কি সেই টরমেন্টেশন ছিল যা সারাজীবন একজন কবিকে আস্তিত্বিক প্রশ্নে আলোড়িত রাখে— যার প্রভাব ঘটে সুদূরপ্রসারী ও কালজয়ী কবিতায়, যেখানে ভাষাব্যবহারও তুচ্ছ? বলব, সূর্য-ডোবা শেষ হল কেননা, সূর্যের যাত্রা বহুদূর। অর্থাৎ, এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আমরা কেউ নই। আমরা কবি উৎপলকুমার বসুর প্রতি মুগ্ধতা কাটিয়ে-ওঠার আগেই পাণ্ডিত্যবিরোধী উৎপলকুমারের সঙ্গে কিছু মেলামেশা করে বুঝেছি যে তিনি স্বয়ং একটি পতিত বিশ্ব-বিদ্যালয় যার টিনের বেড়ার গায়ে আলকাতরা দিয়ে লেখা আছে এই কথাগুলি : স্বপ্ন এবং সত্য দুই-ই বাস্তব। □

‘ঝর্নাজলে সেই গ্রামোফোন…’

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

‘যমুনা ব্রিজের ’পরে গোধূলির সূর্য ডুবে যায়—

এখনি রাতের ট্রেন চলে গেল। দূরে কিনারায়
তিসিক্ষেত, বালুচর, শৈলচূড়া সবই
যেন এই নদীকূলে উৎসারিত আকুল পূরবী।

এই নদী অশ্রুনদী তবে ?

শূন্যে আকাশ জুড়ে অন্তিম আলোর কাছে পতঙ্গের রবে
বিদেশী নৌকা যায়— যেন কোন্ দিগন্তে যমুনা
শেষ হল— যেখানে স্বপ্নের দেশে স্রোত বিনা, জল বিনা
অগণ্য নৌকা ভাসে। বিস্মৃতির ঘাটে ঘাটে ততদূর

খেয়া-পারাপার করো চিরকাল তুমি পূরবীর সুর।’

'চৈত্রে রচিত কবিতা'র অন্তর্ভুক্ত এই কবিতার সান্নিধ্যে পাঠক অক্লেশে বুঝে নিতে পারেন, উৎপলকুমার বসু তাঁর তাঁতকলে অস্তউজ্জ্বল যে-সুতোটি এনে বসিয়েছেন তার আরেক প্রান্ত যেন পূরবীতে বাঁধা রবীন্দ্রনাথের 'অশ্রুনদীর সুদূর পারে…' গানে। তেমনি হয়তো আমাদের মনে পড়ে যায় 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থখানিকে এবং সেইসূত্রে 'বিজয়া'কে। 'যমুনা' শব্দটির সঙ্গে প্রেমের সুপ্রাচীন যোগাযোগের সূত্রেই হয়তো এমন প্রশ্নও জাগে— বিরহীর যমুনা নদীর অপরনাম কি তবে অশ্রুনদী? কিন্তু উদ্ধৃত কবিতাটিতে যখন আশ্চর্য এক দেশের উল্লেখ করেন উৎপলকুমার— যেখানে স্রোত বিনা, জল বিনা অগণ্য নৌকা ভাসে, তখন এক নতুন কবির অন্যতর কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পাই। আমাদের কবিতা-পাঠের অভিজ্ঞতায় স্রোত বিনা জল বিনা অগণ্য নৌকো ভাসার চিত্রকল্প কি সেভাবে পাওয়া যায়? যদি মনে পড়ে যায় 'সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশী নায়ে', তাহলে না হয় এই কবিতার 'বিদেশী নৌকা'র অনুষঙ্গ অন্যতর মাত্রা পায়। কিন্তু ওই স্বপ্নের দেশ? হয়তো এখানে 'বিস্মৃতির ঘাট'ই আমাদের কাছে সেই স্বপ্নের দেশের চিত্রার্পিত অনুষঙ্গে, পূরবীর সুরের সচলতায় কিছুটা এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা ভালো, কবিতাটি উৎপলকুমারের কথা অনুযায়ী আনুমানিক ১৯৫৩ সালে লেখা। তখন ফার্স্ট ইয়ার সায়েন্সের ছাত্র তিনি।

নানা কারণেই কবিতাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। অন্তত কবি উৎপলকুমারকে তাঁর নিজস্ব প্রবণতায় অনুধাবনের পক্ষে। একই সঙ্গে পরম্পরাকে স্বীকার এবং তাকে অতিক্রম করার প্রচেষ্টায় এই কবিতা তাই ভিন্ন মাত্রা পেয়ে যায়। এর কাঠামোয় একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনা কিছুটা দেখতে পাই, তেমনি অন্যদিকে পরম্পরা আত্মীকরণের প্রশ্নে তাঁর ব্যক্তিগত আবেশের অন্যতম ক্ষেত্র যে বাংলা গান, তাও প্রত্যক্ষ করার সুযোগ মেলে। বহিরঙ্গে এই কবিতা বাকস্পন্দকে মান্য করে যেমন অক্ষর-বৃত্তীয় ছন্দে, অন্ত্যমিলযোগে অসম মাত্রায় চরণবিন্যাসে নির্ভেজালভাবে বাংলা কবিতার একদা দুয়ার খোলা রাবীন্দ্রিক দিকনির্দেশকেও স্মরণ করায়। কিন্তু অন্তরে এই কবিতা যেন অধমর্ণ হয় রবীন্দ্রনাথের গানের কাছেই, এই বিপরীতমুখী টানকে খেয়াল না করলে হয়তো উৎপলের নিজস্ব উপার্জনকেও আমরা সঠিকভাবে চিনে উঠতে পারব না। আর এই সূত্রেই আমাদের জেনে নিতে হয় কীভাবে তাঁর পরম্পরা-বোধে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়ে এসেছে বাংলা গান। যদিও তিনি 'আধুনিক বাংলা গান'কে এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন এবং 'রবীন্দ্রনাথের পরে, অবশ্যই' এমন কথাও জানিয়েছেন। 'পুরী সিরিজ'-এর সমসাময়িক পর্যায়ে লিখিত তাঁর আপ্তবাক্য সম্বল করেই আমরা এ ব্যাপারে আরো কিছুদূর অগ্রসর হতে পারি।

দুই

পরম্পরাকে আত্মীকরণের প্রশ্নে তিনি যে নিঃসঙ্কোচ এবং পৃথিবীর সমস্ত লেখায়,

যাবতীয় শিল্পে অকাতর উত্তরাধিকারের সূত্রেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র, আবিষ্কারের জগতও যে নিহিত, এমন কথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। 'স্মৃতি : ৩' কবিতাটি শুরু হচ্ছে— 'শুকনো পাতা ঝরে যায় কবে / সুরু (সুধীরলাল) বাংলায় /…' আমরা টের পাই, তার অনুষঙ্গে প্রায় বছর চল্লিশ আগে গীত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সেই গান—

'শুকনো শাখার পাতা ঝরে যায়—
তবু ফোটে ফুল, হায় একি ভুল,
পাখি তবু গান গায়…'

('লিরিক : হীরেন বসু ; সুর : অনুপম ঘটক)

সুধীরলাল-শচীনদেব-হেমন্ত— এই তিনজনকে 'স্মৃতি : ৩' কবিতায় উৎপল স্মরণ করেছেন। পাছে আমরা বিচ্যুত হই সেই ভয়ে যেন সামান্য সংকেতও লিপিবদ্ধ করে রাখেন '…বাংলায় আধুনিক গান / (রবীন্দ্রনাথে পরে, অবশ্যই)…'

হয়তো, শুকনো পাতা ঝরে যাওয়ার অনুষঙ্গে এমনও মনে হতে পারে— 'স্মৃতি : ৩' যেন রিলকের 'হেমন্ত' কবিতাটির সূত্রে কোথাও যুক্ত হয়ে আছে। রিলকের কবিতায় আছে—

'পাতা ঝরে, পাতা ঝরে, শূন্য থেকে ঝ'রে প'ড়ে যায়,
যেন দূর আকাশে বিশীর্ণ হ'লো অনেক বাগান ;
এমন ভঙ্গিতে ঝরে, প্রত্যাখ্যানে যেন প্রতিশ্রুত।…'

(অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)

কিন্তু 'স্মৃতি : ৩'-এ পরবর্তী পংক্তিগুলি আরো একটি দিক নির্দেশ করে।

'…বিলেতে অনেক আগে কাতর
সন্তাপময় কবিতায় লেখা হ'ত
হেমন্তের ফেলে-দেওয়া পাতা ডাল
উড়ে চলে সন্ত্রাসভীত যেন
উন্মাদিনী লাল…'

এই সূত্রেই কি মনে পড়ে না শেলীর Ode to the West Wind-এর কথাও ? যেখানে শেলী বলছেন—

'O wild West Wind, thou breath of Autumn's being
Thou from whose unseen presence the leaves dead
Are driven....

Yellow, and black, and pale, and hectic red,
Pestilence-sticken multitudes : '

আর এইসব প্রভাব, অনুষঙ্গ ও অধীত বিদ্যার ঝরা পাতা ঠেলে, এক আলো-আঁধারি,

চেতন-অবচেতনে যেন মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে কবি নিজের অসংবদ্ধ স্বগতোক্তি আরম্ভ করেন প্রায় হ্যামলেটীয় ভঙ্গিতে—

'…ত্রিপুরায় আমরা (দেব
বর্মন পরিবার) তখন কত ছেলেমানুষ
সে-বছর বাড়ির সকলে
পুরীতে বেড়াতে গেল (ঝড়
হয়েছিল বহুদূরে আমরা যেন-বা
ভুলে ভেবেছিলাম বাড়িরই
অনতিদূরে ঝড় হয়েছিল)…' (স্মৃতি : ৩)

এইখানে আমরা হয়তো একই সঙ্গে দূরত্ব, দূরত্বজনিত কিছু ভ্রান্তি, বাল্যস্মৃতি এবং কিছুটা মধ্যবিত্ত বাঙালিয়ানারও দেখা পেয়ে যাই। স্মৃতিখননে উৎপলকুমার কিছু আক্রমণাত্মকও হয়ে ওঠেন বুঝিবা, এই কবিতারই আরেক পর্যায়ে। গঞ্জের শৈশব আর টাউনের কৈশোরে তাঁর স্মৃতি এরকম—

'…সেবার সিনেমা
ছিল ভ্রাম্যমাণ (বড়ুয়া ও আমাদের
পারিবারিক নিষেধের মধ্যে ছিল
বখে-যাওয়া চঞ্চল রায় ও তাঁর
ছায়ালোক প্রচারকৌশল) অবশ্য
আরো অনেক দেখেছিলাম সার্কাসের
ভাঁড়েদের অন্তর্ঘাতী তেজ ও কারুণ্য
(বিষে দুটি জানোয়ার মারা গিয়েছিল)…'

কিন্তু আমরা শেষ অব্দি ফিরে আসি আবার সেই চিরন্তন সংগীতের জগতে। যেন অস্ফুট স্বরে কবি বলেন—

'…আমাদের ছিল গ্রামোফোন
ও ফেলে-দেওয়া পিন, আমরা অনেক দূরে
হেমন্তের পাতার উপর ওগুলিই
ঢেলেছিলাম…'

কিন্তু নিষ্পত্র এই জগতও স্থির, অন্তিম কথা নয়। সংগীত-সিনেমা-কবিতার পরিমণ্ডল থেকে কবিকে অনুসরণ করে আমরা যেন পৌঁছই রাত্রি নেমে আসা এক গ্রামের বাড়িতে—

'সন্ধ্যায় অজস্র উই উড়ে আসত বন থেকে, আমরা
অন্ধকারে বসে রইতাম (সীতা
যেত কল ঘরে)…'

শব্দার্থবিদ্যার প্রয়োগ করে এখানে হয়তো আবিষ্কার করা যেতে পারে এক সাংকেতিক ভাষ্যও—

উই → বল্মীক → বাল্মীকি → সীতা

কিন্তু কবিতাটি শেষ হয় এক অতি ব্যক্তিগত, কিছুটা আত্মমগ্ন স্বীকারোক্তিতে—

'…সেদিন ছিলাম
বাল্যে, বিষণ্ণতা, তোমারই সন্তান, তোমাকেই
মাতৃজঠর বলে মনে হয়েছিল।'

তাহলে, পাঠকের বিচারে কবিতাটির বিবর্তন কীরকম দাঁড়াচ্ছে ? এই প্রশ্নের নিরিখেই আমরা দেখি কবিতাটির বিবর্তন হয়তো এই প্রকার—

সূত্রপাত → পরিচিত জগৎ → অর্ধপরিচিত জগৎ → অপরিচিত জগৎ (কবির ব্যক্তিগত) → ঐতিহ্য/মিথ → আত্মোপলব্ধি। আর এই যাত্রাপথে বাংলা গানের দীপ্তি (যাকে উৎপল 'রবীন্দ্রনাথের পরে, অবশ্যই' লিখেছেন) প্রয়োজনীয় আলোকসম্পাতে তাঁর পথরেখা চিহ্নিত করেছে নিশ্চয়।

তিন

শুকনো পাতা ঝরা, কী বিলেতে কাতর সন্তাপময় কবিতা লেখার সূত্র ধরে, রবীন্দ্রনাথ হয়ে, গ্রামোফোন, সিনেমা ইত্যাদির অনুষঙ্গে বাংলা গানের ফেলে আসা এক পর্যায়ের উল্লেখে সুধীরলাল চক্রবর্তী, শচীন দেববর্মন কি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে যে বেদনাময় রোমান্সের স্মৃতিকে আধুনিক বাংলা গানের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত টানে ব্যক্ত করেন, তার থেকেই আমাদের পক্ষে বুঝে নেওয়া সম্ভবপর হয়— বাংলা কবিতায় রোমান্টিক বিষণ্ণতার সূত্রেই আধুনিক বাংলা গানের কথায়ও যে মেলানকলি-র ছোঁয়া লেগেছিল তা এতটাই সঙ্গ-নাছোড়, স্বয়ং উৎপলকুমার সেই মুঠির বন্ধনে থেকেই উপার্জন করে নেন নিজের প্রয়োজনীয় রসদটুকু। সেই বিষণ্ণতা— বাল্যে যাকে 'মাতৃজঠর বলে মনে হয়েছিল' তার থেকেও নিষ্ক্রান্ত হয় কবিতা। এইখানেই আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে ওঠে তাঁর আরো কিছু আপ্তবাক্য—

> 'ছিল একদিন, একদা যখন ছিল 'গীতিকবিতা' এই শব্দের অগোচরে আমরা জেনেছিলাম লিরিক তুমি সরল বীণার কাঠ, তুমি দুদিনের আয়ু বৈ নও, জানতাম ঐ 'রোমান্টিসিজম' শব্দের অন্তরালে দীর্ঘশ্বাস, হায় তা-ও নিলে অবশেষে, ছিল জিপসির যৌতুকপ্রিয়তা, ছিল কৌতূহল অবশ্যই, নইলে এলাম কিভাবে এতদূর'
>
> (শীত ; ১)

হয়তো আমাদের পক্ষে একথাও মনে রাখা ভালো, বাংলায় আধুনিক গান বলতে যেমন তিনি প্রথম বন্ধনীর ভেতর জানিয়ে দেন 'রবীন্দ্রনাথের পরে, অবশ্যই', প্রকৃতপক্ষে তা

গ্রামোফোন এবং আরো পরে আসা সবাক চলচ্চিত্রের সূত্রে শ্রম-বিভক্ত আধুনিক বাংলা গানের জগৎ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সূচনা হয়েছিল যে নাগরিক বাংলা গানের, যার সঙ্গে বাংলা নাটকের গানের সম্পর্কও কিছু দূরের ছিল না তখন, সেই গানই স্রষ্টার অখণ্ড সৃজনে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাংলা গান হয়ে উঠতে পারল রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্ত এবং নজরুলের অভিভাবকতায়। গ্রামোফোন প্রযুক্তি এদেশে আসার পর স্বয়ং নজরুলেরই যোগাযোগে বাজারিকরণের চাহিদাসূত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হয়। সবাক চলচ্চিত্রের যুগে যা আরো ব্যাপক প্রভাববিস্তারে সক্ষম হয়। আর রেডিও বা আকাশবাণীর ভূমিকা তো এ ব্যাপারে অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। যে রেডিও সম্পর্কে 'পুরী সিরিজ'-এর 'ভূমিকা'য় উৎপল-কুমার লেখেন— '…তানপ্রধান রেডিও আমার শুনেছিলাম চিতচোর মনচোর জলে যেতে সই পারব না লো…'। গ্রামোফোন-রেডিও-সবাক চলচ্চিত্রের সূত্রে গড়ে-ওঠা আধুনিক বাংলা গানের শ্রম-বিভক্ত দ্বিতীয় পর্যায়ই স্মৃতি : ৩-এ 'শুকনো পাতা ঝরে যায়'-এর সংলগ্ন হয়ে যায়।

যদি আমরা খেয়াল রাখি, বাংলা কবিতার গত হাজার বছরের ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে বাংলা গানের ইতিহাসই রয়ে গেছে ব্যাপকভাবে, তাহলে, কেন তিনি আধুনিক বাংলা গানকে তাঁর পরম্পরা-বোধের প্রশ্নে গুরুত্ব দেন, তাও হয়তো আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে ভিন্নতর মাত্রায়। ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্যের প্রশ্নে শুধু কবিতা নয়, বরং বাংলা গানই যে তাঁর নিজস্ব তত্ত্ববস্তু সংগ্রহে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে কিছু বেশি, একথা বললে হয়তো খুব ভুল হবে না।

চার

ক্রমশ আমরা এও দেখতে পাব, বাংলা গান তথা সামগ্রিকভাবে সংগীত, সুর, ধ্বনি, ও মূর্ছনার প্রয়োগে তিনি আরো নিপুণ এবং কিছু জটিলও হয়ে উঠেছেন। যার কেন্দ্রে শ্রুতি-কল্পনার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। চিত্রকল্পও তখন আর একমাত্রিক কোনো ব্যাপার থাকে না। যেন চোখের বদলে কান : দৃষ্টির বদলে শ্রবণ : যেন উড়ন্ত আঁচলের বদলে পদধ্বনিকে অধিকতর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে চাইছেন। হয়তো বিমূর্ততায় পৌঁছনোর চেষ্টায় এও এক পাকদণ্ডী। এই পথ যে কিছু কঠিনতর, বলাই বাহুল্য। নিজের শ্রম আর আত্মবিশ্বাস-কে হয়তো নিজেই কিছুটা সন্দেহ করছেন, কিংবা কখনো উপহাসও করতে চান কিছুটা। এবার দেখা যাক তাঁর কবিতায় ছড়ানো দৃষ্টান্তসমূহ—

১) '…ছিল তানপ্রধান রেডিও আমার শুনেছিলাম / চিতচোর মনচোর জলে যেতে সই পারব না লো…' (ভূমিকা : পুরী সিরিজ)

২) 'বাঁশি তুমি ভেঙে ফ্যালো, সে আমাকে বলে না কিছুই।' (পুরী সিরিজ : ২)

৩) '...ঐ বাড়িটির গৃহকর্ত্রীদের হারমোনিয়াম বলে যন্ত্রখানি অযৌক্তিক মনে হয়েছিল ঐ বাড়িটির যৌক্তিকতা আছে ?...' (স্মৃতি : ২)

৪) '...ভিখারীর দলে মিশে আমি কি শুনি নি
জলের গভীরে রুদ্ধ শৃঙ্খলের ধ্বনি ?' (আরো প্রকৃতির ছবি)

৫) '...হায়, ঝর্নাজলে সেই
গ্রামোফোন বেজে ওঠে— ঘোরে নিচু সেলাইমেশিন,
স্বপ্নে তুমি কতবার তিরস্কার করেছিলে
ভাবি সারাদিন—' (সেলাইমেশিন)

৬) 'কেবল পাতার শব্দে আমি কাল জেগেছি সন্ত্রাসে'
(আবার পুরী সিরিজ-এর উৎসর্গ-পত্রের কবিতা)

৭) '...যা তোমার হাত থেকে খসে পড়ে তাই আমি সাগ্রহে ধরেছি শব্দময় মূর্ছায়, পতনে ও আত্মআবিষ্কারে পেতে আছি কান...'
(শোভাযাত্রা : ৩)

৮) '...এবারের সমুদ্রবাতাসে আমি খুলি নি জানালা শুধু আয়নায় ওঠে প্রতিধ্বনি শুধু আয়নায় ওঠে প্রতিধ্বনি...'
(প্রতিহিংসাপরায়ণ পর্দা নিয়ে তুমি খেলা করো)

৯) '...লিরিক তুমি সরল বীণার কাঠ, তুমি দুদিনের আয়ু বৈ নও...' (শীত : ১)

১০) '...স্বপ্নের ভিতরে আমি শুনেছিলাম পারিবারিক বিবাহসম্বন্ধ, জানাশোনার ভিতরে হ'লেই ভালো হ'ত...' (শীত : ১)

১১) '...এই গান গ্যারেজঘরের
ফেলেরাখা কাজ, নীল
ইস্পাতখণ্ড থেকে লাফ-দিয়ে-ওঠা
ধাতুকবিতার (খলসামগ্রী)
শেষতম হাড়'

১২) 'সমস্ত পাহাড় আজ চুপ
সব ঝর্না স্থির হয়ে আছে
প্রতিধ্বনি—গেলাস ভাঙছে
জঙ্গলে উড়ছে বোতল।' (আঁধার নামে : ২)

১৩) '...স্নানের একটু আগে
বাগান খেচরস্তব্ধ। কিছুকাল এমনই ঘটছে...' (অতিথি)

এইভাবে হয়তো উৎপলকুমারের কবিতায় যে এক বিচিত্র শব্দজগতের উল্লেখ ঘটেছে, তা দেখা যাবে। যেখানে কখনো সুর, কখনো কথ্যভাষা, কখনো যেন প্রলাপ, কিংবা কখনো হয়তো কোনো গীতিনাট্য, কী আরো বিস্তৃত সব ধ্বনি ও সুরের উপাদান

রয়েছে বলেই মনে হয়। এই সূত্রেই 'সেবাস্টিয়ান বাখ' (চৈত্রে রচিত কবিতা : ১৬ / শ্রেষ্ঠ কবিতা), 'সই লুডোখেলা', 'রামায়ণ গান' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে।

পাঁচ

কিন্তু এক্ষেত্রে এমন প্রশ্নও উত্থাপিত হয়— কাকে তিনি প্রাধান্য দেবেন ?— কথাকে, না সুরকে ; চিত্রকল্পকে, না শ্রুতিকল্পকে ; ধ্বনিমূর্ছনাকে, না কঠোর গদ্যকে ; তা নিয়ে কিছু সংশয়-আকুলও হয়তো তিনি। মনস্ক পাঠক এই পত্রিকায় তাঁর মুদ্রিত কবিতাগুলির মধ্যেও কি এ কথার প্রমাণ পাবেন না কোথাও ? পাঠকের বিবেচনার ওপর সেই ভার অর্পণ করে এটুকু অন্তত পরিশেষে বলা যায়— লোকসমাজের পরিমণ্ডলে গড়ে-ওঠা গানকে জীবন-যাপনের দ্বান্দ্বিক অবস্থানে উৎপলকুমার এই সাম্প্রতিকেও চিহ্নিত করেছেন। শহরজীবন আর গ্রামজীবনের পার্থক্যের মাত্রায় গানের ভূমিকাও তখন হয়ে উঠেছে বস্তুমূলক দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ। যখন তিনি লেখেন—

'শহরে শিখেছি যথার্থ গান, প্রতিটি সুরের রুদ্ধ বিধুর
শোকার্ত ঘর চিনেছি শহরে, গলি ও বাজার, কষিত আঙুর,
যামিনীচারিতা ; গ্রাম থেকে আমি কী-ই বা এনেছি, কথায় প্রচুর
পিছুটান ছাড়া এবং এনেছি স্মৃতিবিভ্রম ভাষাবিন্দুর এতগুলি ভুল।'

আমাদের তখন পুনর্বিবেচনা করার অবকাশ ঘটে স্মৃতি : ৩-এরই সূত্রে তাঁর একথার অন্য কোনো তাৎপর্যও রয়ে গেল কিনা। কেননা 'হেমন্তের ফেলে-দেওয়া পাতা ডাল / পায়ে পিষে আমরাও গিয়েছিলাম / সিনেমা-হলের দিকে' পংক্তির সূত্র ধরেই 'হেমন্তের পাতার উপর' গ্রামোফোনের পিন ফেলে-দেওয়ার অনুষঙ্গে বোধহয় নিজেরই সঞ্চিত স্মৃতির মায়াময় পরিবেশ থেকে একসময় নিজেকে মুক্ত করে আনার প্রচেষ্টা কীভাবে গঞ্জের শৈশব, টাউনের কৈশোর আর বড় শহরের গলি ও বাজারে, যামিনীচারিতায় ভিন্নতর মাত্রা পেয়ে যায়— কীভাবে হয়ে ওঠেন কবি উৎপলকুমার বসু, তাও আমাদের কবির আপ্তবাক্যের নিরিখেই বুঝে নিতে হয়। সুরের ভুবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর কবিতার শরীরে শেষ অব্দি যা সঞ্চার করেন— বিচিত্র শ্রুতিকল্পের উপাদানে, তাও তো অন্যতর এক সুর, তাঁরই নিজস্ব— সেখানেই পাঠক কান পেতে রাখেন, বুঝে নেন সেই সুরের সামগ্রিক বয়ন। □

☐

With best compliments from :

Lalit Chemical Industries

15 INDIA EXCHANGE PLACE
CALCUTTA-700 001

Phone : 220-4742/43/44
Telex : 021-7807 CEAE IN
Fax No. 9133 206866

Dealing in all kinds of :
Agro-Chemicals & Fertilisers,
Neem Cake, Bio-Chemicals & Bio-Fertilisers

☐

With best compliments from :

Dasmesh Transport Service

62, PHEARS LANE
CALCUTTA-700 073

☐

□
With best compliments from :

I. T. C. Limited

37, CHOWRINGHEE,
CALCUTTA-700 071.

□
With best compliments from :

M/s. Hoogly Mills Co. Ltd.

10, CLIVE ROW
CALCUTTA-700 001

□

□

'ওই যে নগরী, জন অরণ্য— শত রাজপথ, গৃহ অগণ্য
কতই বিপণি কতই পণ্য, কত কোলাহল কাকলি।... '
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোলাহল মুখর জনঅরণ্য
কলকাতা শহরের
নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যকে
উন্নত করতে
আমরা সতত সজাগ—

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলকাতা পুরসভা

□

অ্যাঞ্জেল ভি ডি ও
১, সেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০ ০৭১
পুরনো ও নতুন বাংলা ছবির একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
টাইম ও গোল্ডের সব হিন্দি ছবিরও ভি. ডি. ও ক্যাসেট
এখানে পাওয়া যায়।

□

□
With best compliments from :

CREATION
A House of Interior Decoration
BHUBANESWAR
ORISSA

□

আমাদের দাবি :
জনসাধারণের সুবিধার্থে সমবণ্টন ব্যবস্থা।
হুগলী জেলা কেরোসিন অয়েল ডিলার্স' অ্যাসোসিয়েশন
কার্যালয় : কলাহাটা, শেওড়াফুলি,
রেজিঃ নং—১৬৭৮৮
ফোন : ৬২-১৮৯৬

□

□

আমিনা সুইটস

আর—১০৮/২এ, আক্রা রোড
(পরী সিনেমার কাছে)
মেটিয়াব্রুজ
কলকাতা-৭০০ ০২৪
ফোন : ৪৯-৫৯৭৫

□

SPACE DONATED BY :
Prasanta Kumar Guin

□

☐
With best compliments from :

Partha Sarathi Nath

☐
With best compliments from :

S. L. Roy & Sons.
DURGAPUR-11
WEST BENGAL

☐

Space donated by :

Sri Saroj Kumar Dutta & Co.

All Green Vegetables, Food Merchant &
Order Supplier

Trade $\frac{\text{S K D}}{\text{S H E}}$ Mark

7, ALLUHATA, SHEORAPHULY, HOOGLY

Phone : 62-2132
62-1095 P.P.
S T D—033

□

With best compliments from :

PALWAL DAS

Dev. Officer, L. I. C.

For NEW AGENCY AND BETTER SERVICE
PLEASE CONTACT :

Life Insurance Corporation of India
City Branch No. 10,
ILACO HOUSE (5th floor)
1, Brabourne Road,
Calcutta-700 001
Office Phone : 220 8271 / 72
220 9747

□

With best compliments from :

MICROSERVICES

(A Microventure in Computer Services)
1, PARK SIDE ROAD
CALCUTTA-700 026

With best compliments from :

SEARLE (INDIA) LIMITED

Product :

TRAPP 50% E. C.
FENVAL 20% E. C.
LACER E. C.
TRAPP 5% GR
FENVAL 0.4% DP
RADAR E.C.

Declaration No. : 96/93 ☐ Oct.-Dec. 1994 ☐ Rs. 28

CITIBANK CARDS
The Best Way To Pay

সঞ্জয় চক্রবর্তী কর্তৃক ইমপ্রিন্টা, ২৪৩/২বি, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত এবং টি জি ২/২৯, তেঘরিয়া, হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০ ০৫৯ থেকে প্রকাশিত।